সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

ছুটির শরৎ

ছুটির শরৎ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদিত

নির্মল বুক এজেন্সি
২৪বি, কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

CHHUTIR SARAT
Edited by : Sunil Gangopadhyay
Nirmal Book Agency
24B, College Row
Kolkata 700 009

www.banglabooks.in

প্রথম প্রকাশ ঃ
আগস্ট ২০১০

প্রকাশক ঃ
নির্মলকুমার সাহা
নির্মল বুক এজেন্সি
২৪বি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ
নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৫/১এ, ক্যানেল ইস্ট রোড
কলকাতা-৭০০ ০১১

প্রচ্ছদ ঃ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অলঙ্করণ ঃ
পার্থসারথি মণ্ডল, শংকর বসাক, সুব্রত মাজী,
পার্থ মৈত্র, পলাশকান্তি বিশ্বাস, দিলীপ দাস

দা মূল্য ঃ ১০০টাকা

Scan by- Suchitra Sarkar

Edited by- Ajit Sarkar

www.banglabooks.in

সম্পাদকের কথা

প্রকৃতির খেয়াল খুশির ওপর মানুষ এখনো হস্তক্ষেপ করতে পারেনি, জীবনযাপনের জন্য মানুষ তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। কখন মেঘ জমবে, বর্ষণ শুরু হবে। কিংবা, দিনের পর দিন বৃষ্টি আর ভালো লাগে না। আমরা যারা শহরে থাকি, আমরা অনেক সময় মনেই রাখি না যে ঠিক সময়ে বৃষ্টি হওয়া আর না-হওয়ার সঙ্গে আমাদের বেঁচে থাকার কী গভীর সম্পর্ক। এক বছর যদি বৃষ্টি না-ই হয়, আমরা মহাবিপদে পড়ে যাবো। আবার খুব বেশি বৃষ্টি হলে তার সঙ্গে আসবে বন্যা, প্লাবন, ধ্বংস!

তাই বছরের শুরুতেই গবেষণা শুরু হয়, কেমন বৃষ্টি হবে সারা বছর। আবহাওয়াবিদরা যে ভবিষ্যৎবাণী করেন, তা অনেক সময় মেলে না। কিংবা ঠিক সময়ে না এসে বাড়িয়ে দেয় আমাদের দুশ্চিন্তা, তারপর হঠাৎ এক সকালে শোনা যায় মেঘের গুরু গুরু গর্জন। তাই তো বৃষ্টি নিয়ে রচিত হয় কত গান, মেঘ নিয়ে লেখা হয় কবিতা।

শরৎকালেও কিছু বৃষ্টি থাকে আজকাল, শেষদিকে অবশ্য সাদা হতে থাকে আকাশ। আমাদের বাংলায় শরৎকালই উৎসবের কাল। দুর্গাপুজো তো আছেই, এ বছর ঈদও পড়েছে এই শরৎকালেই। তাই শরৎকালের ছুটি আর শরৎকালের উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হলো এই সংকলন। চমৎকার চমৎকার সব গল্প, কল্প কাহিনি, ভ্রমণ আর ছবি সুন্দরভাবে সাজানো। হাতে নেবার পর যেন এক নিশ্বাসে কেটে যাবে উৎসবের মাস।

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

ছুটি সিরিজে আমাদের প্রকাশিত বই

ছুটির সানাই	(১৯৯৩)
ছুটির ঘণ্টা	(১৯৯৪)
ছুটির দিনে	(১৯৯৫)
ছুটির মজা	(১৯৯৬)
ছুটির আসর	(১৯৯৭)
ছুটির সাথী	(১৯৯৮)
ছুটির বাঁশি	(১৯৯৯)
ছুটির গল্প	(২০০০)
ছুটির আনন্দ	(২০০১)
ছুটির হাওয়া	(২০০২)
ছুটির দিগন্ত	(২০০৩)
ছুটির দুপুর	(২০০৪)
ছুটির হাসি	(২০০৫)
ছুটির আলো	(২০০৬)
ছুটির বন্ধু	(২০০৭)
ছুটির ডালি	(২০০৮)
ছুটির বসন্ত	(২০০৯)
ছুটির শরৎ	(২০১০)

সূচীপত্র

কিশোর উপন্যাস
পেহারগিরি ভয়ঙ্কর—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ১৫
নীললোহিত রহস্য—সঙ্কর্ষণ রায় ১৫৩

গোয়েন্দা রহস্য গল্প
কে ডাকে অমাবস্যার রাতে—ডাঃ অরুণ দত্ত ৮১
জম্পেসদার খেঁচিপেরি অভিযান—সোহারাব হোসেন ১১০
ঠাকুমার গাওয়া-ঘি—অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী ১৮৬
ধর্ম—তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ২২২

হাসির গল্প
পায়রা—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৭১
চোঁৎকার ক্যোঁৎকা—শক্তিপদ রাজগুরু ৮৬
হোমগার্ড বনাম—হীরেন চট্টোপাধ্যায় ১২১
ধাক্কার ধাক্কা—শোভন শেঠ ২৩৫

রূপকথার গল্প
জলপরী—দেবব্রত মল্লিক ৯৭
ব্রজকন্যার বিয়ে—অমর মিত্র ১৪০
কাগজের নৌকা—প্রশান্ত সরদার ২৩৯

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প
জানা পৃথিবীর অজানা দেশ—চুনীলাল রায় ৪৯
মহাশূন্যে একরাত্রি—সিদ্ধার্থ সিংহ ১৩২

সামাজিক গল্প
তিনটি ছবির রহস্য—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭৫
জন্মদিনে—পুণ্ডরীক চক্রবর্তী ২৬৪

অলৌকিক গল্প
রুদ্রসেনের রুদ্রাক্ষ—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১
অপার্থিব ইশারা—কুমার মিত্র ২৫৩

ভ্রমণের গল্প
এলেম নতুন দেশে—সুচিত্রা ভট্টাচার্য ৬২

জীবজন্তুর গল্প
নতুন মা—সিরাজুল ইসলাম ১৩৭

বনজঙ্গলের গল্প
আজ রাত কাল রাত—মণিলাল মুখোপাধ্যায় ২২৯
বাঘের দেখা—সঞ্জিতকুমার সাহা ২৯১

ভূতের গল্প
ভাঙা গাড়ির গ্যারেজ—বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪৩
নাড়ুবাবুর ভূত বিতাড়ন—অশোককুমার সেনগুপ্ত ১২৬
সেই অলৌকিক ট্রেন যাত্রা ও ছোট দাদু—সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ১৪৪
সুধাময় হালদারের ম্যাজিক—বাণীব্রত চক্রবর্তী ২০৬
নিশির টানে বাঁশবাগানে—তপনকুমার দাস ২৪৩
সত্যি ভূত মিথ্যে ভূত—কাশীনাথ ভট্টাচার্য ২৭২
কোলিয়ারির কবিতা উৎসব—বীথি চট্টোপাধায় ৩২১

মজার গল্প
গণেশের মূর্তি—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩৯
ওস্তগ্রামের মুংলি—কার্তিক ঘোষ ৯৪
বাঘ নয়, আমাদের চণ্ডীচরণ—নীতীশ বসু ২৫০
ছোলা—তাপস মুখোপাধ্যায় ২৮৩
ছোটমেসোর কেরামতি—বিশ্বজিৎ ৩১১

অনুভবের গল্প
দুধসাগর—অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ১৬৭
পার্শ্বডাঙার কবি—মানিক সাহা ২৮৮

মহৎ মানুষের গল্প
জীমূতবাহন ও পক্ষীরাজ গরুড়—সলিল মিত্র ১০৬

ইতিহাসের গল্প
দুর্যোগের ঘূর্ণিঝড়ে—ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৭১
রাজার সুবিচার—সৈয়দ রেজাউল করিম ২১৭
গুনুমামার ঘুড়ি—প্রবীর জানা ২৬০

নানারঙের গল্প
পটলের পৃথিবী—দীপ মুখোপাধ্যায় ১১৬
বদ্রিপাখি—সুনির্মল চক্রবর্তী ১৫০
বিপিনবাবু নেই—কল্যাণ মৈত্র ১৯২
ফিনিক্স পাখির ডানা—কালীদাস ভদ্র ২০৩
চড়াই পাখির খোঁজে—জয়ন্ত দে ২১৪
মিমোর ইন্টারভিউ—প্রশান্ত রায় বর্মন ২৮০
রুণুর কীর্তি—কৌশিক ঘোষ ২৯৬
ভোরের ডাক—সুস্মিতা মৈত্র ৩০০
অবাক যাত্রা—শুভমানস ঘোষ ৩০৪
দুর্যোগের দুর্বিপাকে—শিশির বিশ্বাস ৩১৫

আবিষ্কারের গল্প
মুমুর আবিষ্কার—উজ্জ্বলকুমার দাস ৩২৬

খেলার গল্প
এসপানিয়া ভিকতোরিওসা : বিজয়ী স্পেন
—চিরঞ্জীব ১৯৪

মানবিকতার গল্প গল্প
কইমাছ চুরি—দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯০
খিদে—পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৮

ম্যাজিকের গল্প
অদৃশ্য ভ্রমণ—যাদুকর সমীরণ ২৭৭

বিচিত্র গল্প
আজব খবর—বরুণ মজুমদার ১৪৭

কমিকস
লালুভুলু-র জনসেবা—দিলীপ দাস ৭
ছক্কা ফক্কা র স্কুল পালানো—দিলীপ দাস ১৭৬

লালু-ভুলু-র
জনসেবা
দিলীপ দাস
চল তো লালু, ঐ গাছতলায় এক সাধু বসে আছেন। উনি কী বলতে চান শুনে আসি।
আজ হঠাৎ তোর কী হল বল তো ভুলু?
জয় হো!
জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।
সেবা হি পরম ধর্ম।
শুনলি তো সাধুবাবার কথা?
চল, আজ থেকে আমরা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করবো।
এ সব নেতা-নেত্রীদেরই মানায় তুই কোন দুঃখে এই হ্যাপা সামলাতে যাবি?
এটা মহৎকাজ। এর জন্য যে কেউ এগিয়ে আসতে পারে।
তবে এর জন্য চাই দিল্।
ওঃ, তাই বোধহয় কবি লিখেছেন- "দিল দিয়া দর্দ্ লিয়া।"

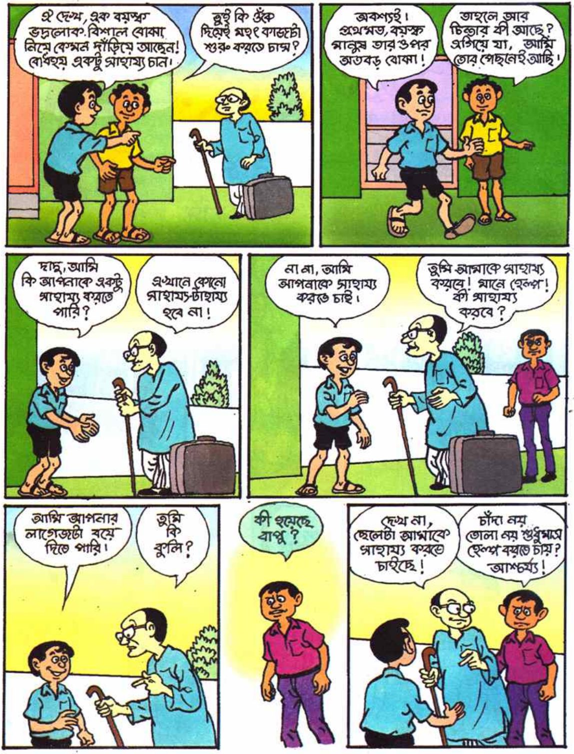
ঐ দেখ, এক বয়স্ক ভদ্রলোক বিশাল বোঝা নিয়ে কেমন দাঁড়িয়ে আছেন! বোধহয় একটু সাহায্য চান।
তুই কি ওঁকে দিয়েই মহৎ কাজটা শুরু করতে চাস?
অবশ্যই। প্রথমত, বয়স্ক মানুষ তার ওপর অতবড় বোঝা!
তাহলে আর চিন্তার কী আছে? এগিয়ে যা, আমি তোর পেছনেই আছি।
দাদু, আমি কি আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারি?
এখানে কোনো সাহায্য-টাহায্য হবে না!
না না, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।
তুমি আমাকে সাহায্য করবে! মানে হেল্প! কী সাহায্য করবে?
আমি আপনার লাগেজটা বয়ে দিতে পারি।
তুমি কি কুলি?
কী হয়েছে বাপু?
দেখ না, ছেলেটা আমাকে সাহায্য করতে চাইছে!
চাঁদা নয় তোলা নয় শুধুমাত্র হেল্প করতে চায়? আশ্চর্য্য!

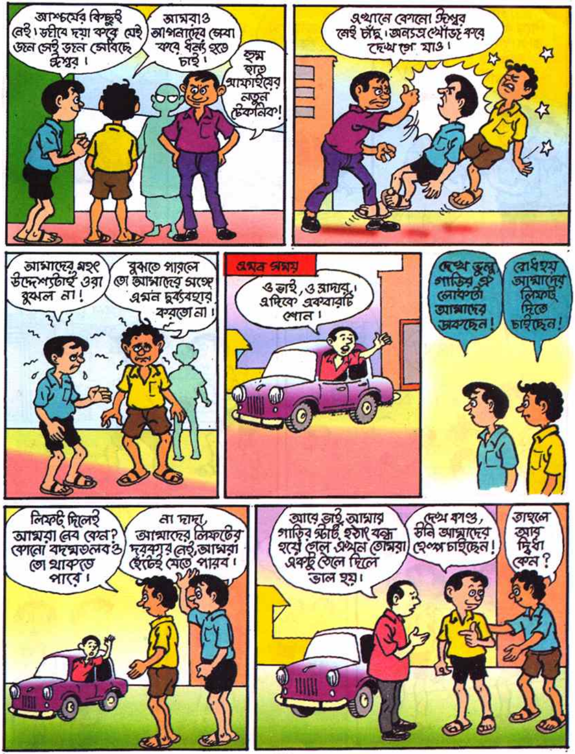
আশ্চর্যের কিছুই নেই। ভগবানে দয়া করে যেই জন সেই জনে সেবিছে ঈশ্বর।
আমরাও আপনাদের সেবা করে ধন্য হতে চাই।
হুম হাতু আফাইয়ের নতুন টেকনিক!
এখানে কোনো ঈশ্বর নেই চাঁদু। অন্যত্র খোঁজ করে দেখ গে যাও।
আমাদের মহৎ উদ্দেশ্যটাই ওরা বুঝল না!
বুঝতে পারলে তো আমাদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করতো না।
এমন সময়
ও ভাই, ও দাদারা। এদিকে একবারটি শোন।
দেখ ভুল্লু গাড়ির ঐ লোকটা আমাদের ডাকছেন!
বোধহয় আমাদের লিফট্ দিতে চাইছেন!
লিফট্ দিলেই আমরা নেব কেন? কোনো বদমতলবও তো থাকতে পারে।
না দাদা, আমাদের লিফটের দরকার নেই, আমরা হেঁটেই যেতে পারব।
আরে ভাই, আমার গাড়ির স্টার্ট হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল এখন তোমরা একটু ঠেলে দিলে ভাল হয়।
দেখ হাগু, উনি আমাদের হেল্প চাইছেন!
তাহলে আর দ্বিধা কেন?

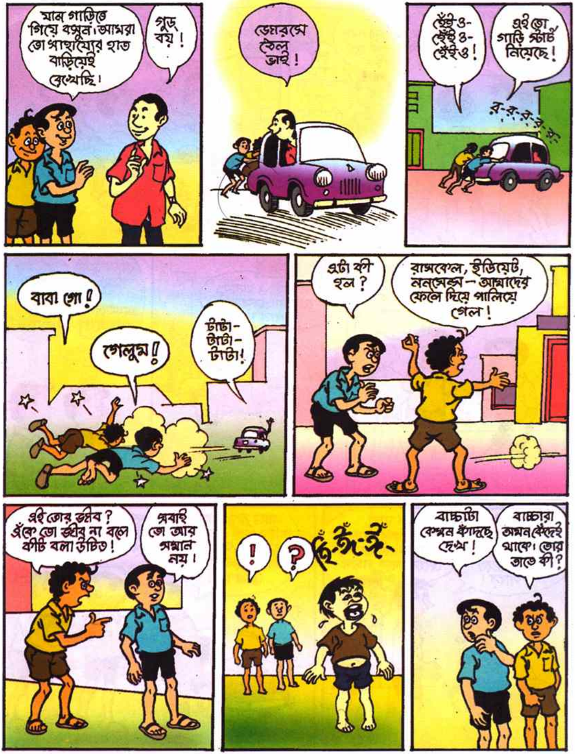
যান গাড়িতে গিয়ে বসুন। আমরা তো সাহায্যের হাত বাড়িয়েই রেখেছি।
গুড্ বয়!
ভেরি ভেরি থ্যাংকস ভাই!
হেঁই ও- হেঁই ও- হেঁইও!
এই তো গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে!
র-র-র-র-র
বাবা গো!
গেলুম!
টাটা- টাটা- টাটা!
এটা কী হল?
রাসকেল, ইডিয়েট, ননসেন্স — আমাদের ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল!
এই তোর ভদ্দর? ওঁকে তো ভদ্দর না বলে কীট বলা উচিত!
সবাই তো আর সমান নয়।
!
?
হিঁ-হিঁ-হিঁ-
বাচ্চাটা কেমন কাঁদছে দেখ!
বাচ্চারা অমন কেঁদেই থাকে। তোর তাতে কী?

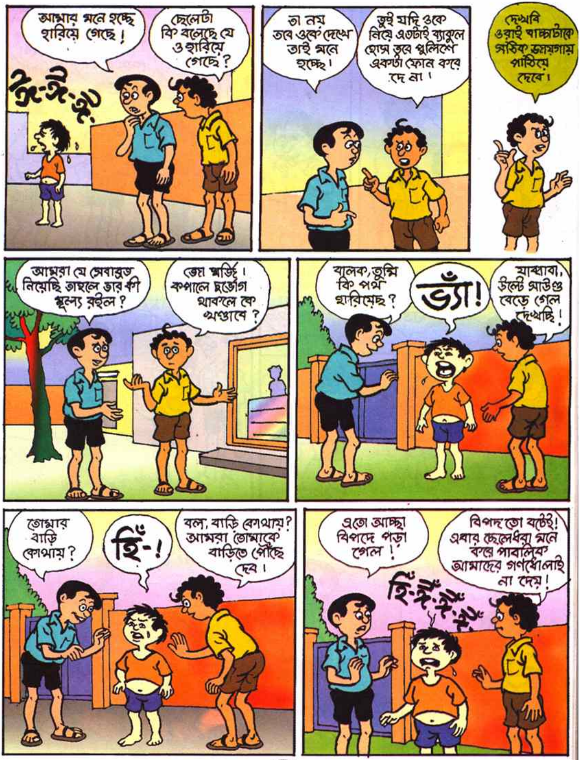
আমার মনে হচ্ছে হারিয়ে গেছে !
ছেলেটা কি বলেছে যে ও হারিয়ে গেছে ?
তা নয় তবে ওকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।
তুই যদি ওকে নিয়ে এতটাই ব্যাকুল হোস তবে পুলিশে একটা ফোন করে দে না।
দেখবি ওরাই বাচ্চাটাকে সঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দেবে।
আমরা যে সেবাব্রত নিয়েছি তাহলে তার কী মূল্য রইল ?
কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে খণ্ডাবে ?
বালক, তুমি কি পথ হারিয়েছ ?
ভ্যাঁ!
বাব্বাবা, উল্টে আওয়াজ বেড়ে গেল দেখছি !
তোমার বাড়ি কোথায় ?
হিঁ-!
বল, বাড়ি কোথায় ? আমরা তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেব।
এতো আচ্ছা বিপদে পড়া গেল !
বিপদ তো বটেই! এবার ছেলেধরা মনে করে পাবলিক আমাদের গণধোলাই না দেয় !

আজেবাজে কথা বলিসনি তো। তোমার কি খিদে পেয়েছে? কিছু খাবে?
লজেন্স খাবে?
দাও!
চাকুম-চুকুম-চকাস
আর এত্তা দাও!
দেখলি তো ছেলেটার খিদে পেয়েছিল?
এই নাও আর একটা।
এবার বল তোমার বাড়ি কোথায়?
আগে আর এত্তা লজেন দাও।
নিশ্চয়ই দেব। আগে বল তুমি কোথায় থাক?
জানি না। তুমি আমার লজেন দাও।
কিছু না বললে লজেন্স পাবি না।
ভ্যাঁ!
যাঃ কল্লা! অকারণ ভ্যাঁ করার কী হল?
ভ্যাঁ-আঁ-আঁ
এবার ঠেলা সামলাও!

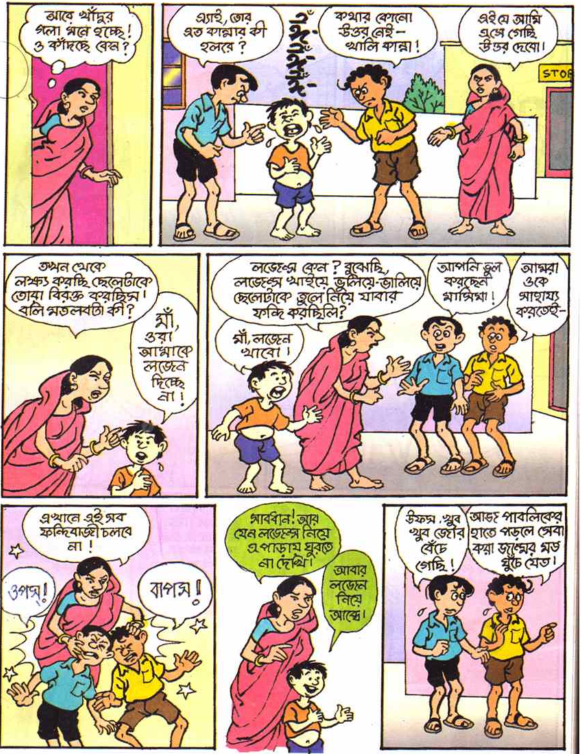
আরে খাঁদুর গলা মনে হচ্ছে! ও কাঁদছে কেন?
এ্যাই, তোর এত কান্নার কী হলরে?
ওঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ-
কথার কোনো উত্তর নেই— খালি কান্না!
এই যে আমি এসে গেছি উত্তর দেবো।
STOP
তখন থেকে লক্ষ্য করছি ছেলেটাকে তোরা বিরক্ত করছিস। বলি মতলবটা কী?
মাঁ, ওরা আমাকে লজেন দিচ্ছে না!
লজেন্স কেন? বুঝেছি, লজেন্স খাইয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যাবার ফন্দি করছিলি?
মাঁ, লজেন খাবো।
আপনি ভুল করছেন মাসিমা!
আমরা ওকে সাহায্য করতেই—
এখানে এই সব ফন্দিবাজী চলবে না!
ওপস্!
বাপস!
সাবধান! আর যেন লজেন্স নিয়ে এ পাড়ায় ঘুরতে না দেখি।
আবার লজেন নিয়ে আস্বে।
উফস্, খুব খুব জোর বেঁচে গেছি!
আজ পাবলিকের হাতে পড়লে সেবা করা জন্মের মত ঘুচে যেত।

ঐ যাঃ, ঐ বৃদ্ধা মহিলা হঠাৎ কেমন পড়ে গেলেন দেখ ভুলু!
পড়ে গেলেন, আবার উঠে পড়বেন। এর জন্য চিন্তার কিছু নেই।
চেষ্টা করেও উঠতে পারছেন না তাই বলছি।
তোর যদি আক্কেল না হয়ে থাকে তো তুই যা।
খুব লেগেছে? উঠুন ঠাকুমা, আমি ধরছি।
আঃ, তুমি এসেছ বাবা!
পাটা হঠাৎ মচকে গেল। তুমি এসে না ধরলে আমাকে ওখানেই পড়ে থাকতে হত! দীর্ঘজীবি হও বাবা।
এ তো আমাদের কর্তব্য ঠাকুমা।
এই তো, আমরা এসে গেছি। তুমিও এসো। একটু মিষ্টিমুখ করে যাবে।
কী ব্যাপার, লালু সেই যে ঢুকল আর বেরোবার নাম নেই! কপালে দুঃখ থাকলে কে ঠেকাবে। ঐ বলতে না বলতেই বেরোচ্ছে!
কী, সব ঠিকঠাক আছে তো?
মোটেই না। তুই একটা রিক্সা ডাক, আমি হেঁটে যাবার ক্ষমতা হারিয়েছি।
যা ভেবেছি তাই। এখন বুঝলি তো জীবেদয়া কত ভয়ঙ্কর হতে পারে?
খুবই ভয়ঙ্কর! মুড়ি ভিজে যা সন্দেশ খাওয়ালেন পেট আইঢাই!
অ্যাঁঃ!

রহস্য উপন্যাস

পৈহারগিরি ভয়ংকর

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

কোতনি সুনায় পৈহারে ব্লক। একটা মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে। লাইন মেরামতির কাজ শেষ হলেও নতুন তৈরি ওভারব্রিজটা ড্যামেজ হয়েছে। অতএব দায়িত্ব বাড়ল আমাদের। টেনযনমডার আরণ্যক পরিবেশ ছেড়ে এতদূরে আসতে কেউই রাজি হচ্ছিল না। আমিও রাজি ছিলাম না। কিন্তু হঠাৎ করেই এ.এস.এম. এর প্রমোশন দিয়ে ওই দূর দেশে আমাকে যেতে বাধ্য করা হল। আমিও অফারটা বলতে গেলে লুফেই নিলাম।

অনেক পাহাড় পর্বত বন জঙ্গলের দেশে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও কোতনি সুনায়ে যেতে আপত্তি অনেকেরই। তার একটাই মাত্র কারণ কোতনি সুনায় আতংকময়। ইতিমধ্যে ওখানে কাজ করতে গিয়ে এক বছরের মধ্যে দু'দুজন খালাসীর রহস্যময় মৃত্যু হয়েছে। সারাদিনের কাজকর্মের পর রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে তাঁবুতে শুয়েছে, সকালে কাজের সময় পার হয়ে গেলেও আর ওঠেনি। অনেক ডেকেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন বোঝাই গেল এ ঘুম আর ভাঙবে না। যেমন তেমন মৃত্যু তো নয় ঘুমন্ত মানুষটির শরীর থেকে শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত কোনও কিছুতে যেন শুষে নিয়েছে।

প্রথমে একজন। তারপরে আরও একজন। প্রথমজনের মৃত্যুর পর পালা করে রাত জেগে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সবার নজর এড়িয়ে দ্বিতীয়জনের মৃত্যুর ফলে এটা যে কোনও প্রেত বা পিশাচের কাজ এই ধারণা বদ্ধমূল হল সবার মনেই।

প্রমোশনের চিঠি পাওয়ার পর বি.আর.আই সুব্বা রাও আমাকে বললেন, 'এত অল্পবয়সে সম্মানজনক একটা পোস্ট যে আপনি পেলেন এটা আপনার ভাগ্যজোর বলতে হবে। তবে ওই জায়গায় বেশিদিন আপনাকে থাকতে হবে না। পরে অন্যত্র বদলির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। সামনের মাসে ওখানকার স্টেশন মাস্টার রিটায়ার হয়ে যাচ্ছেন। ততদিন আপনি এইসব লেবারদের নিয়ে ওখানে কাজের তদারক করুন। পোস্টিং নেবার জন্য আর নতুন করে যেতে হবে না আপনাকে।'

সুব্বা রাওয়ের কথামতো আমি আমার গ্যাং নিয়ে পৌঁছলাম কোতনি সুনায়ে। তখন সন্ধে হতে খুব বেশি দেরি নেই। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মাঝখানে ছোট্ট স্টেশন। আশপাশে কোনও ঘর বা গ্রামের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তবুও কাদের জন্য যে স্টেশনটি করা হয়েছে তা কে জানে? একটিই মাত্র ঘর রয়েছে স্টেশনে। সেটিই অফিস, সেটিই টিকিট কাউন্টার, সেটিই সব। স্টেশন মাস্টারও সেখানেই থাকেন। উনি বিদায় হলে আমাকেও থাকতে হবে। সব কিছু দেখে চোখে যেন জল এল। আমার সঙ্গে যে সব গ্যাংম্যানরা এসেছিল তারাও বিষণ্ণ মনে আশ্রয়ের জন্য তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লোকালয় বর্জিত এই জায়গায় কী করে যে কাটাবে কয়েকটা দিন সেই চিন্তাই পেয়ে বসল সকলকে।

এখানকার স্টেশনমাস্টার ঘনশ্যাম চৌবেজি অত্যন্ত ভাল মানুষ। উনি আমার অসহায় অবস্থা দেখে বললেন, 'খুব বাজে জায়গা তাই না? তবে একটা কথা, আপনি কিন্তু ওইসব লেবারদের সঙ্গে তাঁবুতে থাকবেন না। আপনি আমার ঘরেই শোবেন। আমি চলে গেলে ওখানেই তো থাকতে হবে আপনাকে।'

আমি বললাম, 'তা হবে। তবে এখনও তো একমাস চাকরি আছে আপনার।'

'কে বললে? আঙুল গুণে কয়েকটা দিন। আমি চলে গেলে এখানে স্টেশন মাস্টারের বদলে এ.এস.এম থাকবে। অর্থাৎ আপনি। ফাঁকা জায়গা বলে এখানে শীত একটু বেশি। আমি একটা ক্যাম্পখাট আনিয়েছি। তাতে তো দুজনকে ধরবে না। আপনাকে মেঝেয় চটের বস্তা ফেলে শোবার ব্যবস্থা করে দেব। তবে কিনা এখানে খাওয়াদাওয়ার কষ্ট খুব। পকেট ভর্তি টাকা থাকলেও ভালমন্দ কিছুই খেতে পাবেন না।'

আমি বললাম, 'ভাল না হোক মন্দ কিছুও তো পাব না। জনবসতিই তো নেই এখানে।'

মি. চৌবে বললেন, 'ওই যে দূরের পাহাড়টা দেখছেন—।'

তাকিয়ে দেখলাম বেশ কিছুটা দূরে ক্ষেতি জমির লাগোয়া একটা ডলফিনাকৃতি বড় পাহাড় অনেকটা জায়গা নিয়ে মাথা উঁচু করে আছে। পাহাড়টি ন্যাড়া। সেখানে কোনও গাছ গাছালির চিহ্নমাত্র নেই। স্টেশন থেকে কম করেও দু'আড়াই কিলোমিটার দূরত্বে তার অবস্থিতি।

আমি বললাম, 'দেখলাম, ন্যাড়া পাহাড় একটা।'

'ওখানেই গ্রাম। প্রয়োজনীয় সব কিছুই অল্পস্বল্প ওখানে পাবেন। সপ্তাহে দুদিন হাটও বসে। হরিরামকে বললে সে-ই সবকিছু নিয়ে আসবে।'

'হরিরাম কে?'

'এখানকার স্টাফ। খালাসির পোস্টে আছে। আমার দোকান বাজার সব কিছু সে-ই করে দেয়।'

একটু পরেই হরিরাম এল। প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্তর কেনার জন্য দূরের গ্রামে গিয়েছিল সে।

চৌবেজি বললেন, 'এই দাদাবাবু আমার জায়গায় এসেছেন। এখন থেকে ইনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ওঁর শোবার জন্য চটের বস্তা ইত্যাদি যা আছে তাই দিয়ে একটা গদী বানিয়ে দে। আর রাতের খাওয়ার জন্য ডাল রুটি বানা।'

হরিরাম আমাকে সেলাম ঠুকে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'চায় পিয়োগে বাবুজি?'

আমিও হাসির বিনিময় করে বললাম, 'হলে মন্দ হয় না।'

চৌবেজি হরিরামকে বললেন, 'বাবুজি কীরে! স্যার বলবি ওনাকে। উনি নতুন স্টেশন মাস্টার।'

আমি বললাম, 'না না। স্যার নয়, বাবুজিই বলুক। দাদাজিও বলতে পারে।'

হরিরাম তখনই চা বানাতে চলে গেল। একটিই মাত্র ঘর। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসা। টিকিট কাউন্টার, সব।

হরিরাম চা করলে চা খেয়ে আমি লেবারদের কাছে এলাম। এখনও আমি ওদের ইনচার্জ। অতএব ওদের দেখভাল করতেই হবে। ওরা ততক্ষণে অভ্যস্ত হাতে তাঁবু খাটানোর কাজ শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। দু'একজন রান্নার আয়োজন করছে। সরঞ্জাম সবকিছু নিয়েই এসেছি আমরা। চাল ডাল আলু পেঁয়াজ আটা সবই আনা হয়েছে। আমি ওদের বললাম, 'আজ আমি স্টেশন মাস্টারের অতিথি। তোমরা যেন আমার জন্য কিছু কোরো না।'

লেবাররা বলল, 'শুধু আজ কেন, যে কদিন থাকব আমরা আপনি ওঁর ওখানেই ব্যবস্থা করে নিন।'

'দেখি কি করা যায়।'

এখন চৈত্রের শুরু। তবুও বেশ শীত শীত ভাব আছে। রাতে নাকি আরও বেশি ঠান্ডা পড়বে। তা পড়ুক, গরমের চেয়ে শীত ভাল।

আমি ছোট্ট স্টেশনের এ মাথা থেকে ওমাথা ঘুরে বেড়ালাম। হেলে যাওয়া সরু ওভারব্রিজটার অবস্থা দেখলাম। খুব একটা বড়ো ধরনের ক্ষতি হয়নি। এ কাজের জন্য অতদূর থেকে আমাদের টেনে নিয়ে আসার দরকার ছিল না। তবে স্ক্র্যাপিং এবং পেন্টিং-এর প্রয়োজন আছে। চারদিক ঘুরে দেখতে দেখতে প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্ট হওয়া সেই ডলফিন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এমন সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন চৌবেজি। বললেন, 'খুব বোর লাগছে তাই না?'

'তা তো লাগবেই। যেখানে জনবসতি নেই সেখানে কি মন টেকে? এ যেন এক মহাশ্মশান। এখানে রক্তচোষা ডাইনরা থাকবে না তো থাকবে কারা?'

চৌবেজি হাসলেন। বললেন, 'প্রথম প্রথম আমারও খুব খারাপ লাগত। পরে সব সয়ে গেছে।'

'আপনি কতদিন আছেন এখানে?'

'এই স্টেশন তৈরি হওয়ার পর থেকেই আছি।'

'আচ্ছা যে দুজন কর্মচারী মারা গেল এখানে তাদের মৃত্যুটা ঠিক কীভাবে হল বোঝা গেল কিছু?'

'না। ওই রহস্যের কিনারা আজও হয়নি। রাতে ঘুমিয়েছে সকালে আর ওঠেনি। শরীরের সবটুকু রক্ত কেউ যেন শুষে নিয়েছে। সকলেরই ধারণা কোঁনও অপদেবতা বা ডাইনের প্রকোপে পড়েছে ওরা।'

'আপনার কি ধারণা?'

'আমার কোনও ধারণা নেই। আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। আবার চোখের সামনে ওই মর্মান্তিক মৃত্যুকেও অবিশ্বাস করতে পারি না।'

'ওইসব দেখে শুনে আপনার ভয় করে না?'

'করে বৈকি। কিন্তু কী আর করব বলুন? চাকরি ছেড়ে তো পালাতে পারি না। তবে হরিরাম আর আমি ঘরের মধ্যে থাকি বলেই বোধ হয় নিরাপদে আছি। কোনও ভূত প্রেত বা ডাইনি ভেতরে ঢোকার সাহস পায় না। যা কিছু হয় সবই খোলা জায়গায় তাঁবুর ভেতরে। সেজন্যই আপনাকে আমি তাঁবুতে থাকতে বারণ করছি। দুদিন পরে এটাই তো আপনার ঘর হবে। তাই এখানেই থাকুন পাকাপাকিভাবে। নিরাপদে থাকবেন।'

আমি বললাম, 'আমার কিন্তু এসব শুনে খুব ভয় করছে।'

চৌবেজি হেসে বললেন, 'ভয় করলেই ভয়। আমি আছি কী করে? হরিরামও বহাল তবিয়তে আছে।'

সে রাতে গরম ডাল রুটি খেয়ে অনেক গল্পগুজবের পর আরামে ঘুমোলাম। না, কোনও রক্তচোষা আমার রক্ত শুষে নিতে আসেনি। এমনকি টেনযনমডার মতো মশার উপদ্রবও এখানে একেবারেই নেই।

পরদিন সকাল থেকেই স্টেশন চত্বরটা জমজম করে উঠল। কোন গ্রাম গ্রামান্তর থেকে কত যে দেহাতি লোক এল তা কে জানে? নাগপুর গামী একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসতেই সব ফাঁকা হয়ে গেল।

ট্রেন থেকে নামলও কয়েকজন। নেমেই তারা ডলফিন পাহাড়ের দিকে হাঁটা শুরু করল। রয়ে গেল শুধু দুজন। চঞ্চলা নদীর মতো উজ্জ্বল দুটি মেয়ে। চোদ্দ থেকে পনেরোর মধ্যে বয়স। মাজা কালো গায়ের রং। একটু তামাটে ভাবও আছে। আজানুলম্বিত বেণী। হরিণীর মতো টানা টানা চোখ। আর রমণীয় সৌন্দর্যে ভরা মুখ। কালো রূপে যে এত আলো থাকতে পারে তা এদের না দেখলে বোঝা যাবে না। ওরা দুজনে স্টেশনের কলে আকণ্ঠ পুরে জল খেল। তারপর হাসি হাসি মুখ করে স্টেশনরুমের কাছে আসতেই চৌবেজি বললেন, 'আজও তোরা টিকিট কাটিসনি তো?'

মেয়েদুটি হেসে গড়িয়ে পড়ল।

চৌবেজি বললেন, 'এই দ্যাখ, নতুন ছোকরাবাবু এসেছেন। টিকিট না কাটলে জেলে পাঠিয়ে দেবে।'

ওরা তাতে মোটেই ভয় পেল না। ওদেরই মধ্য থেকে একটু বড় মেয়েটি আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ বাবুজি, তুমি আমাদের জেলে পাঠাবে?'

আমি হেসে বললাম, 'শুধু শুধু জেলে পাঠাবো কেন? টিকিট না কাটলে ফাইন করব। সেই টাকা দিতে না পারলে তবেই জেলে পাঠাব।'

মেয়েটি এবার আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমাদের জেলে পাঠাতে তোমার মন কেমন করবে না?'

ওর কথায় হেসে ফেললাম আমি। বললাম, 'করবে। তবু—।'

মেয়েটি তার মোহিনী মায়ায় আমাকে আচ্ছন্ন করে বলল, 'তুমি খুব সুন্দর দেখতে বাবুজি। তোমার মনও সুন্দর। আমরা তো বুনো পাহাড়ি মেয়ে। তবু জানি তুমি আমাদের কখনও টিকিট দেখতে চাইবে না।'

কী সহজ সরল চিন্তাধারা ওদের। আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিত হয়ে গেলাম।

চৌবেজি বললেন, 'তোরা মিষ্টি মিষ্টি কথায় বেশ মন ভোলাতে পারিস তো? তা এত সকালে এলি, গিয়েছিলি কোথায়?'

'জয়রাম নগরে গিয়েছিলাম।' বলে সঙ্গী মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, 'এই তুরার দাদিমার তবিয়াত খুব খারাপ, তাই দেখতে গিয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'তোমরা থাকো কোথায়?'

'পৈহারে। ও-ই যে দূরের পাহাড়টা দেখছ ওইখানেই থাকি আমরা। তুমি যাবে বাবুজি আমাদের গ্রামে?'

'যাব। তবে এখন তো নয়। সময় হলেই যাব।'

ওরা চলে গেল। যাবার সময় মেয়েটি দূর থেকে হেঁকে বলল, 'আমার নাম মধু আছে বাবুজি, মধু।'

আমি মনে মনে বললাম তোমার নাম কেন, হাসিতেও মধু, কথাও মধুময়। আর চেহারাও অনন্ত মাধুর্যে ভরা।

ওরা চলে যাবার পর একটা মেল পাস করল। তারপর আপ ডাউনে কখনও মালগাড়ি, কখনও মেল এক্সপ্রেস। প্যাসেঞ্জার ট্রেন নেই বললেই চলে। মেল এক্সপ্রেসও থামে না।

হরিরাম চা বিস্কুট দিয়ে গেল আমাকে।

আমি তাই খেয়ে লেবারদের কাছে এলাম। সেখানেও আর একপ্রস্থ চা হল। তারপর সবাই মিলে কাজের জায়গায় এসে দেখতে লাগলাম ওভার ব্রিজের অবস্থাটা। একটা অংশ একটু বেশি রকম হেলে পড়েছে। ওটাকে সোজা করতে আরও লোকজন এবং বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির দরকার। সেইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে আজ দুপুরের মধ্যেই নাগপুর থেকে একটা টিম এসে পড়বে। ঠিক মতো কাজ হলে দুদিনেই শেষ। তারপর সামান্য স্ক্র্যাপিং করে পেন্টিং করতে হবে।

আজ আমার আর বিশেষ কোনও কাজ নেই। যা কিছু কাজ তা লেবাররাই বুঝে নেবে। এখন আমাকে চৌবেজির সঙ্গে গল্প করেই সময় কাটাতে হবে। আমি যখন অকারণে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পায়চারি করছি তখনই লাল সিং নামে একজন লেবার এসে বলল, 'এখন তো আমাদের কোনও কাজের চাপ নেই। তা চলুন না ওই পাহাড়ের দিক থেকে ঘুরে আসি। অমনি হাট বাজার কোথায় কি

আছে না আছে তাও দেখে আসা যাবে। তাছাড়া আমাদের কাছে রশদও যা আছে তাতে খুব জোর কালকের দিনটা চলে যাবে। পরের দিনগুলোর জন্যও তো কিছু কেনাকাটার দরকার।'

আমি বললাম, 'তা অবশ্য মন্দ বলোনি। এখানে চুপচাপ বসে থেকেই বা কি করব? চলো ঘুরে আসা যাক।'

আমি লাল সিংকে দুটো ব্যাগ, টাকা পয়সা যা নেবার সব নিয়ে আসতে বলে চৌবেজির কাছে এলাম। উনি তখন একমনে কী সব পেপার ওয়ার্ক করছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'এসেছেন ভালই হয়েছে। কতকগুলো পেপার ওয়ার্কসের কাজ আপনাকে দেখিয়ে দেবো। খুব সামান্য কাজ। তা বলছিলাম কি আপনি যখন পোস্টিং নিতে এসেই গেছেন তখন আগেভাগেই আপনাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই।'

আমি বিনীতভাবেই বললাম, 'বলুন না কীসের দায়িত্ব নিতে হবে?'

'আপনি যদি দু'একটা দিন একটু ম্যানেজ করে নিতে পারেন তাহলে আজ সন্ধের ট্রেনে আমি একবার আকোলায় যেতাম। দু'দিন। তিনদিনের দিন আমি ফিরে আসব। এখানকার ট্রেন আসা যাওয়ার সময় হরিরাম সব জানে। রাত্রিদিন দুটোই ও সামলে নিতে পারবে।'

'বেশ তো আপনি যান। আমার দিক থেকে কোনও অসুবিধে নেই। আমি সামলে নিতে পারব। তাছাড়া কয়েকদিন বাদে এই কাজই তো আমায় করতে হবে। তাই হাতেখড়িটা আগেই হয়ে যাক।'

বলে ওনাকে বললাম পাহাড়ে যাবার কথা।

শুনে বেজায় খুশি হয়ে বললেন, 'যান না ঘুরে আসুন। দু'একজন লেবারকেও সঙ্গে নিয়ে যান। ওদেরও কিছু কেনাকাটার দরকার।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেই উদ্দেশ্যেই আরও যাওয়া।'

এরপর লাল সিং এলে ওকে নিয়ে রওনা হলাম সেই ডলফিন পাহাড়ের দিকে। দারুণ সুন্দর পাহাড়। পাথরও বেশ রংচঙে। তবে একদম ন্যাড়া। কোথাও কোনও গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। আমরা ফসল ওঠা আবাদি অনাবাদি জমির মাঝখান দিয়ে মোরাম বিছানো পথ ধরে সেই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললাম। অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার পর সেই রুক্ষ পর্বতটা আমাদের আরও কাছে এল। চটান পাথরের জন্য পাহাড়ে কোনও গাছপালা না থাকলেও পাহাড়ের পাদদেশে যে গ্রাম সেটি বেশ লতায় পাতায় ছাওয়া। অজস্র পলাশ ফুলে ভরে আছে চারদিক।

সেই পলাশ বনতলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ি গাঁও দেহাতে খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় পাহাড়ের কোলে বৃহৎ একটি বটগাছের নীচে বজরঙ্গবলী হনুমানজির মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ালাম। সেখানে লোকজনও রয়েছে কিছু। সপ্তাহে দুদিন হাট বসে এখানে। দু'একটি দোকানপত্তরও আছে।

আমরা রেলবাবু জেনে সবাই বেশ সমীহ করতে লাগল আমাদের।

লাল সিং ওর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো চাইতেই সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই পাহাড়ের আশপাশে নাকি অনেক গ্রাম ও মানুষের বসতি আছে। আগে সবাই সওদা করতে জয়রামনগরে যেত। এখন কোতনি সুনায়ে স্টেশন হওয়ায় গ্রামের লোকেদের কষ্ট দূর হয়েছে। এখানেই সবকিছু পাওয়া যাচ্ছে বলে অতদূরে কাউকে আর যেতে হয় না।

চাল ডাল আটা তেল নুন মশলা সব কিছু বেশি পরিমাণে নেওয়া হলে ওখানকারই একজন লোক মালগুলো ঝাঁকায় চাপিয়ে দু'টাকার বিনিময়ে সেগুলো পৌঁছে দিতে রাজি হল।

লাল সিং ঝাঁকাওয়ালার সঙ্গে বিদায় নিলে আমি পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে গ্রামের আরও ভেতরদিকে এগিয়ে চললাম। গ্রাম দেখার চেয়েও আমরা চোখদুটো কিন্তু সেই দুজনকে খুঁজতে লাগল। সেই দুই চঞ্চলা কিশোরী। তুরা আর মধু। প্রথম দেখাতেই ওদের সরলতা দিয়ে আমার মনকে এমনভাবে জয় করে নিয়েছে ওরা যে ক্ষণ অদর্শনও আমার কছে এখন অসহ্য মনে হচ্ছে। বিশেষ করে মধুর মাধুরিমা অনন্ত। তুরা কম কথা বলে। তবে মিষ্টি হাসির জাদুতে যা কিছু বলার তা প্রকাশ করে দেয়।

গ্রামের মানুষজন কেউ কেউ নবাগত আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। কেউ শুধুই হাসির বিনিময় করল। এইভাবে যেতে যেতে একসময় বড় একটি তালাওয়ের ধারে এসে উপস্থিত হলাম আমি। সেখানে কত কত মেয়ে পুরুষ স্নান করছে। শিশুরা খেলা করছে মায়ের আঁচল ধরে। কিন্তু ওদের দুজনের একজনও নেই। একবার ভাবলাম কাউকে জিজ্ঞেস করি ওদের কথা। আবার

ভাবলাম সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না। লোকে আমায় ভাবাবেগ তো বুঝবে না অন্যরকম ভাববে। তাই আর বেশি না এগিয়ে সেই রঙিন পাথরের পাহাড়টার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। আমাকে ওইভাবে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অল্পবয়সী এক যুবক এগিয়ে এসে হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'ক্যা দিখতা হ্যায় দাদাজি।'

বললাম, 'তোমাদের এই পাহাড়টাকে দেখছি। কী সুন্দর এর ওপরে ওঠা যায় না?'

'হাঁ হাঁ। কিউ নেই? কোই যাতে নেহি ওপর।'

'এই পাহাড়ের ওপারে গ্রাম আছে?'

'হ্যায়। লেকিন জায়গা নেহি, পুরা জঙ্গল। তা দাদাজি আপ কৌন কামকে নিয়ে আয়া ইধার?'

আমি পরিচয় দিয়ে বললাম, 'কিছু কেনাকাটা করতে এসেছিলাম। অমনি তোমাদের গ্রামটাও দেখে গেলাম। ভারী সুন্দর। ভাবছি সময় পেলেই একবার করে আসব এদিকে।'

'তব তো বড়ি খুশি কি বাত। আপ রোজ আ্যাইয়ে না ইধার। গাঁওবালেকো আচ্ছা লাগে গা।'

আমি 'আসব' কথা দিয়ে ফিরে এলাম।

অনেকটা সময় সেখানে কাটিয়ে স্টেশনে যখন ফিরলাম তখন চৌবেজি হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'ইউ আর ভেরি লাকি।'

আমি বললাম, 'কেন?'

'আপনার পোস্টিং অন্য জায়গায় হয়ে গেছে।'

'কোথায়?'

'মনোহরপুরে। এই নিন আপনার চিঠি। তবে এখন কদিন আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।'

মনোহরপুর, সরাইকেলা, জরাইকেলা সবই আমার অতি পরিচিত জায়গা। আমার গ্যাং নিয়ে অনেকবার ওইসব জায়গায় গিয়ে কাজ করে এসেছি। তাই আনন্দের আর অবধি রইল না আমার। কে যে নেপথ্যে থেকে এমন উপকারটি করলেন তা কে জানে? এখানে আসছেন মি. সাহানি নামে একজন। এবং স্টেশন মাস্টার হয়েই। এই ভয়ংকর নির্জনে এবং অতংকময় পরিবেশে আমাকে থাকতে হবে মাত্র পনেরো দিন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম নিচ্ছি নাগপুর থেকে অনেক লোকজন বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি সহ এসে হাজির হল। ওদের দেখে আমাদের লেবাররাও এগিয়ে গেল সহযোগিতা করতে। কাল সকাল থেকেই শুরু হবে কাজ। পরপর আরও দুটো বড়সড় তাঁবু পড়ল লেবারদের।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে এল। আমি চৌবেজিকে বললাম, 'আপনি যাওয়ার ব্যাপারে কি ঠিক করলেন?'

চৌবেজি ম্লানমুখে বললেন, 'ভাবছি কি করব। এই অবস্থায় আমার কি যাওয়াটা ঠিক হবে? অথচ খুবই একটা জরুরি কাজ ছিল বাড়িতে।'

'মন করেছেন যখন চলে যান। আমাকে কি করতে হবে একটু বুঝিয়ে দিলে আমি নিশ্চয়ই সামলে নিতে পারব।'

'কোনও পেপার ওয়ার্কস করতে হবে না আপনাকে। বাকি কাজ যা তা হরিরামই সামলে নিতে পারবে। কোনও কিছু অসুবিধা হলে ও জানাবে আপনাকে। আপনি সেইমতো কাজ করে দেবেন।

সন্ধের ট্রেনে চৌবেজি বিদায় নিলেন। ঠিক হল কালকের দিনটা উনি থাকবেন। পরশুই ফিরে আসবেন

আবার। যাবার আগে কয়েকটা বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে ডাল রুটি খেয়ে চৌবেজির ক্যাম্পখাটেই শয্যাগ্রহণ করলাম। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলাম হরিরামের সঙ্গে। আমার পোস্টিং বদল হওয়ার চিঠিটা চৌবেজির হাতে কে দিয়ে গেল তা কে জানে? এ ব্যাপারে আমার কোনও জানার আগ্রহ নেই। তবে এই দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির মতো প্রান্তরে যে দিনের পর দিন থাকতে হবে না এটাই আমার কাছে স্বস্তির ব্যাপার।

খুব ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন শয্যাত্যাগ করে সারা গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরে বেরোলাম। হরিরাম আমার আগেই ঘুম থেকে উঠে ট্রেন পাস করানোর জন্য পাখা হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফরমে। দেখে অত্যন্ত ভাল লাগল। সারাটা দিনে রাতে ওকে ঘুমোতে দেখলাম কই? শুধু কাজ আর কাজ। অথচ ভারতীয় রেলের কাছে এদের প্রাপ্য কতটুকুই বা? তাই রেল নয়, আমার মতে হরিরামের মতো কর্মচারীরাই আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

একটা মালগাড়ি ঝমঝম শব্দে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেলে হরিরাম বলল, 'বৈঠিয়ে বাবুজি। হাম চায় লেকে আতে।'

আমি বললাম, 'এইসময় চা একটু পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু কাল সন্ধে থেকে আমি তো সমানে তোমাদের খেয়ে যাচ্ছি।'

হরিরাম বলল, 'অ্যায়সা বাত বোল না বাবুজি।' তারপর বলল, 'আপনি এখানে থাকবেন শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। এখন শুনছি আপনার পোস্টিং মনোহরপুরে হয়েছে। সবই শিউজি কি কিরপা।'

হরিরাম চলে গেল। সেই অবসরে আমি স্টেশনের কলে ব্রাশ করে মুখ চোখ ধুয়ে নিলাম।

একটু পরে চা এল। সঙ্গে বিস্কুটও। আমি চা খেতে খেতে কত কথাই না ভাবতে লাগলাম। এমন সুন্দর ভোর অথচ কোথাও একটা পাখির ডাক নেই। পাখিটা বা আসবে কোথা থেকে? গাছপালাই তো নেই।

চা খেয়ে যখন হেলে পড়া ওভারব্রিজটার দিকে তাকিয়ে আনমনে রয়েছি ঠিক তখনই আমার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হল। এক গাদা বেলফুলকে যেন ছড়িয়ে দিল আমার মাথায়। পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখি মধু আর তুরা। ওদের হাতে অনেক বেল ও রজনীগন্ধা। এত ফুল ওরা কী করবে তা কে জানে? কাঁধের ঝোলাতেও ফুল।

ফুল নিয়ে যাই করুক ওরা ওদের দেখা পেয়ে আমার আনন্দের আর শেষ রইল না। দুজনের হাসির ঝরনাধারায় মন আমার সিক্ত হয়ে গেল। বললাম, 'এত সকালে তোমরা? কোথাও যেন যাবে বলে মনে হচ্ছে?'

মধু বলল, 'হ্যাঁ বাবুজি। পাশের স্টেশনে যাব। এগুলো দিয়ে আসতে।'

'তোমরা বুঝি ফুল বিক্রি করো?'

'হ্যাঁ বাবুজি, আমার দাদা কুন্দন ফুলের চাষ করে। তুরাদেরও বাগান আছে। সব ফুল ঝরে যায়। তাই পরের স্টেশনে গিয়ে বিক্রি করে দিই।'

'এইসব ফুল বেচে কত টাকা পাবে তোমরা?'

'দশ টাকা।'

'তাহলে আজ আর তোমাদের কষ্ট করে কোথাও যেতে হবে না। সব ফুল কিনে নেবো আমি। এগুলো দিয়ে স্টেশনটাকে যতটা পারো সাজিয়ে দাও।'

মধু বলল, 'বাবুজি!'

তুরা ওর মুখের দিকে তাকাল। আমি বললাম, 'যা বলছি তাই করো।'

মধু বলল, 'সব ফুল তুমি নিয়ে নাও বাবুজি। তোমাকে টাকা দিতে হবে না।'

আমি আদরের সুরে বললাম, 'তাই কি হয়? তবে একদিনই। রোজ তো নয়।'

'আমরা তো রোজ আসি না বাবুজি।'

'কেন আসো না?'

'এত ফুল তো রোজ হয় না।'

'না হোক। আজ আমি সব ফুল কিনে নেবো। কাল তোমাদের গ্রামে গিয়ে দুজনের একজনকেও দেখতে না পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আজ তোমাদের সঙ্গে নিয়েই গ্রামে যাব। আমাকে ওই পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যাবে তোমরা?'

এই প্রথম কথা বলল তুরা। বলল, 'আপনার বহুত তখলিফ হয়ে যাবে বাবুজি। খুব কষ্ট হবে।'

'হোক। তোমরা দুজনে পাশে থাকলে সব কষ্টকেই আমি জয় করে নেবো।'

ওরা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল? ডাউন ট্রেন এল। ওরা উঠল না। ফুলগুলো নিয়ে

ইচ্ছামতো সাজাতে লাগল চারদিকে।

সাজানো শেষ হলে আমি জোর করে মধুর হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিলাম।

ও বলল, 'আমাদের গ্রামে চলো না বাবুজি! তোমাকে অনেক কিছু খাওয়াব। পাহাড়ে ওঠাবো। ওর পিছনে যে বড় পাহাড় সেখানে আঁধেরি জঙ্গল। হরিণ দেখাবো।'

'আমি ওই বড়ো পাহাড়েও উঠব।'

বড় পাহাড়ের নামে আঁৎকে উঠল দুজনেই।

মধু বলল, 'ওখানে ডাকু আছে বাবুজি। ডাইন আছে। রক্তচোষা আছে। মানুষ দেখলে ওরা শেষ করে দেয়। আমরা কেউ ওই বড়ো পাহাড়ে যাই না।'

'তা যদি না যাও তাহলে কী করে বুঝলে ওখানে ডাকু আছে ডাইন আছে রক্তচোষা আছে?'

'আমরা সব জানি বাবুজি। তুরার বাবা ওই বড়ো পাহাড়ে গিয়ে আর ফেরেনি। তিনদিন পরে তার দেহটা পাওয়া গিয়েছিল। শরীরের সব রক্ত তখন শুষে নিয়েছে ওরা। সেই থেকে কত দুঃখে দিন কাটে ওদের।'

আমি বললাম, 'তোমাদের গ্রামে কারও কাছে বন্দুক আছে?'

'না বাবুজি। বন্দুক আমরা রাখি না।'

'কেন রাখো না? চোর ডাকাতের উপদ্রব যেখানে বেশি সেখানে তো ওইসব রাখতেই হবে। না হলে যখন তখনই ওরা এসে হামলা করবে গ্রামবাসীদের ওপর।'

তুরা বলল, 'না বাবুজি। ওরা আমাদের চেয়েও বুনো। তবে গ্রামে কোনও উপদ্রব করে না। কিন্তু ভুল করেও কেউ ওদের এলাকায় ঢুকে পড়লে তার আর নিস্তার নেই।'

আমি বললাম, 'তা যদি হয় তাহলে তোমার বাবা জেনে শুনে কেন ওখানে গিয়েছিল?'

'তা তো জানি না। মনে হয় জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল ওদের এলাকায়।'

আমি বললাম, 'ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। ওদের এলাকায় ঢুকে পড়লে মৃত্যু অবধারিত। এ ক্ষেত্রে একজন মানুষ খুন হতে পারে। কিন্তু তার শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নেয় কারা? আমাদের দুজন শ্রমিক যারা ভুলেও ওই বড়ো পাহাড়ে যায়নি তারাই বা রক্তচোষার খপ্পরে পড়ে কি করে? সবচেয়ে বড়ো কথা এই দুজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁবুর ভেতরে।'

মধু বলল, 'ওরা অশরীরী।'

আমি বললাম, 'এই রহস্যের জট আমি খুলবোই। সেই অশরীরী কীভাবে এসে মানুষের রক্তপান করে তা আমাকে জানতেই হবে।'

যাই হোক, এখন কাজের সময়। লেবারদের কাজের জায়গায় পাঠিয়ে আমি হরিরামকে জানিয়ে মধু ও তুরার সঙ্গে পৈহারের গ্রামে এলাম। সেই পলাশবনের ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ যাওয়ার পর তালাওটা ডানদিকে রেখে বাঁদিকের পথ ধরলাম। কাল এ পথে আমি আসিনি। এদিকে মহুয়াবন খুব ঘন। আর সেই বনেরই এক প্রান্তে কয়েকঘর মানুষের বসতি। মধু ও তুরারা সেখানেই বাস করে পাতার কুটিরে। মধুর বাবা মা কেউ নেই। দাদা আছে। তুরার বাবা নেই মা আছে। দুজনেরই ঘরের সংলগ্ন বাগানে ফুলের চাষ।

মধুর দাদা কুন্দনকে আমি গতকাল দেখেছি। তাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম পাহাড়ে ওঠার কথা। এখন আমাকে দেখেই হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'বাবুজি পাহাড়ে উঠবেন বুঝি?'

আমি হেসে বললাম, 'তেমনই ইচ্ছে আছে।'

কুন্দন এবার মধু ও তুরার দিকে তাকালে মধু বলল, 'বাবুজি আমাদের সব ফুল কিনে নিয়েছে।'

'সব? লেকিন কিঁউ?'

আমি বললাম, 'ওরা ওই কটা টাকার জন্যে ফুল নিয়ে চলে গেলে সন্ধের আগে ফিরত না। অথচ আমার খুব ইচ্ছে এখানকার এই সুন্দর পাহাড়ের ওপর ওঠার।'

কুন্দন হেসে বলল, 'যা বাবুজিকে পাহাড়ে নিয়ে যা।' বলে নিজের কাজে চলে গেল।

আমি মধুদের দাওয়ায় এসে বসলে তুরা ও মধু দুজনে মিলে ঘন বেলের সরবত করে খাওয়াল আমাকে। এখানে পলাশ ও মহুয়ার সঙ্গে বেলবনও আছে অনেক। আর কী বড় বড় বেল। সচরাচর যা বাজারে দেখা যায় না।

বেলের সরবতটা খেতে শরীরে যেন অসুরের শক্তি এল।

এরপর মধু বলল, 'এবার চলো বাবুজি পাহাড়ে যাই।'

আমি তো যাবার জন্যই এসেছি। তাই বলামাত্রই উঠে দাঁড়ালাম। তুরা মধু দুজনেই চলল আমার সঙ্গে। পলাশবনের ভেতর দিয়েই পাহাড়ে ওঠার পথ। সেই পথ বেয়ে ধীরে ধীরে খানিকটা ওপরে ওঠার পরই বুঝলাম

বৃথা চেষ্টা। আর কোনও পথই নেই। এবার পথ নিজেদেরই আবিষ্কার করে যেতে হবে। এক একটি বড় বড় পাথরের চাঁই বেয়ে উঠতে হবে ওপরে। পা হড়কে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে এখানে। তবু এই পর্বতারোহণ থেকে আমি পিছু হটলাম না। এ ব্যাপারে মধু আর তুরা আমাকে খুব সাহায্য করতে লাগল। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর গায়ের ঘাম ঝরিয়ে এক সময় পাহাড়ের মাথায় উঠলাম। ওপরে ওঠার পর মনে হল আমি যেন এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছি। ওপরটা সমতলের মতো। সেখান থেকে বহুদূরের দৃশ্য খুব ভালভাবে দেখা যায়। একদিকে কোতনি সুনার মধ্যে এই ডলফিন পাহাড়। অদূরে পৈহারগিরি।

মধু আর তুরা। ওরা দুজনে আমার দুটি হাত ধরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় অনেকটা দূরে নিয়ে গেল। তারপর বেশ বড়সড় একটি মসৃণ পাথরের ওপর বসলাম আমরা।

মধু বলল, 'ওই যে দূরের বড় পাহাড়টা, ওই হল পৈহারগিরি। ওই পাহাড়ে অপদেবতারা থাকে। কেউ ওখানে গেলে তার শরীরের সবটুক রক্ত শুষে নিয়ে মেরে ফেলে তারে।'

আমি বললাম, 'তা যদি হয় তাহলে তুমি আমাকে ওখানকার জঙ্গলে হরিণ দেখাতে নিয়ে যাবে বললে কেন?

'জঙ্গলে তো আমরাও যাই। বিপদ পাহাড়ে উঠলে।'

'আমি জঙ্গলেও যাব। পাহাড়েও উঠব। ওই রক্তচোষাদের রক্তপিপাসা আমি বন্ধ করবই।'

মধু শিউরে উঠল, 'বাবুজি!'

আমি বললাম, 'ভয় কী! ভয় করলে এক এক করে সবাইকেই একদিন শেষ হয়ে যেতে হবে। ওই বড় পাহাড়ে যারা থাকে তারা নীচে নামে না?'

'হ্যাঁ, হাটবাজার করতে আসে।'

'তাহলে? ওরা যদি গ্রামে ঢোকে তাহলে আমরাই বা পাহাড়ে উঠব না কেন?'

'কিন্তু বাবুজি—!'

'কোনও কিন্তু নয়। শুধু একটা বন্দুক কিংবা পিস্তল হাতে পাওয়ার অপেক্ষা। আমি তো যাবই। তোমরাও যাবে আমার সঙ্গে। অবশ্য তার আগে একদিন গিয়ে জঙ্গলের পথঘাট চিনে আসতে হবে।'

মধু বলল, 'আমার কসম বাবুজি, ওই কাজ তুমি করতে যাবে না। ওই পৈহারগিরি ভয়ংকর।'

আমি বললাম, 'আমারও কসম তুমি আমাকে বাধা দেবে না। শুধু তাই নয় আমার যাওয়ার ব্যাপারেও সাহায্য করবে।'

মধু আমার চোখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল। তুরা মুখ নামিয়ে নিল।

আমি বললাম, 'তুরা, তুমি কি চাও না যে রক্তচোষার দল তোমার বাবাকে নির্মমভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিল সেই রক্তচোষারা নিপাত যাক? আমি চাই। কেননা আমাদের দুজন লেবারকেও রক্ত চুষে হত্যা করেছে ওরা। এ কাজ করতে গিয়ে যদি আমার জীবন বিপন্ন হয় তাতেও আমি পিছু হঠব না।'

তুরা বলল, 'রোদের তাপ বাড়ছে। এবার নীচে চলুন বাবুজি। আমাদের ঘরে আন্ডাকারি দিয়ে দুমুঠো ভাত খেয়ে নেবেন।'

আবার সেই বিপজ্জনক পথ বেয়ে নীচে নামা।

তুরা আমার একটা হাতে টান দিয়ে বলল, 'আসুন বাবুজি আমাদের ঘরে।'

মধুর এতে কোনও আপত্তি নেই দেখলাম। আমাকে হাসিমুখে ওর সঙ্গে যেতে বলল। ও-ও এল সঙ্গে। ওদের হাব ভাব দেখে বুঝতে পারলাম আমি এই গ্রামে পদার্পণ মাত্রই আমার অজান্তে চমৎকার অতিথিসেবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

এই পাহাড়তলির বুনো গাঁওদেহাতে কী চমৎকার আতিথেয়তা। তুরাদের বাড়িতে যাওয়ামাত্রই ওর মা চাটাই পেতে বসতে দিল। স্নানের জন্য সাবান গামছা এমনকি একটা শাড়িও দিল।

আমি শাড়িটা অবশ্য নিলাম না। দুটো গামছা নিয়েই সেই তালাওতে গিয়ে স্নানটা সেরে এলাম। তারপর মোটা চালের ভাত, পেঁয়াজ মুসুরির ডাল, আলু পেঁয়াজ ভাজা, ডিমের ওমলেট ও কারি খেলাম তৃপ্তি করে। শেষ পাতে ঘরে পাতা খাট্টা দই।

খাওয়া দাওয়ার পর অল্প একটু বিশ্রাম নিয়ে রওনা হলাম স্টেশনের দিকে। বেচারি হরিরাম রান্নাবান্না করে নিশ্চয়ই এতক্ষণে হানটান করছে আমার জন্যে। অথচ আমি নিরুপায়। দেহাতি মানুষগুলোর আমার প্রতি ভালোবাসার এই অর্ঘ্য আমি গ্রহণ না করে কি পারি?

আমি যখন স্টেশনে ফিরলাম দুপুর তখন দুটো। হরিরাম সত্যিই হানটান করছিল আমার জন্য। আমি যেতে আশ্বস্ত হল। ওদিকে কাজও তখন পুরোদমে চলছে। হেলে যাওয়া ওভারব্রিজকে সোজা করা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে সেটা অনেকটা কব্জায় এসেছে। বিকেল চারটে পর্যন্ত একটানা কাজ চলল। তারপর ইস্তফা দিয়ে স্নানাহার করতে গেল সবাই।

আমি হরিরামকে বললাম, 'আমার যা খাবার তা রেখে দাও। রাতে খেয়ে নেবো। আমি গ্রামেই অনেক কিছু খেয়ে এসেছি।'

হরিরাম বলল, 'ঠিক আছে বাবুজি। তবে একটা কথা, ওইসব দেহাতি মেয়েদের পাল্লায় একদম পড়বেন না। ছোকরা বয়স আপনার। কে কখন কি একটা বদনাম রটিয়ে দেয় তা কে জানে? ওরা এমনিতে ভাল রাগলে কিন্তু জ্ঞান থাকে না ওদের।'

আমি বললাম, 'না না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। খুব সরল প্রকৃতির ওরা। তাছাড়া আছিই বা আমি কদিন?'

হরিরাম হেসে বলল, 'যা আপনি ভাল বুঝবেন।'

হরিরামের আশংকাটা অমূলক নয়। বন্যেরা এমনই প্রকৃতির। তবে আমার সঙ্গে শত্রুতা করার মতো আচরণ আমি করবই না।

হরিরামের কাছ থেকে সরে এসে আমি এবার লেবারদের তাঁবুতে এলাম। লাল সিং তখন সবে খেয়ে উঠে পায়চারি করছে। আমি ওকে বললাম, 'তোমরা এই যে তাঁবুর মুখ খোলা রেখে শুচ্ছো, জানো তো রাতে এ জায়গা নিরাপদ নয়। এর আগে দু'দুজন লেবারের জীবনান্ত হয়েছে।'

লাল সিং বলল, 'তাঁবুর মুখ খোলা না রাখা ছাড়া উপায় নেই বাবুজি। এটা তো ঘর নয় যে খিল কপাট দিয়ে শোবো। তবে যে কদিন এখানে আছি রাতে আমি সজাগ থাকব।'

'তাই থেকো।'

এরপর লাল সিংকে বললাম, 'তোমার ওই দেশি যন্তরটা কি সঙ্গে এনেছ?'

লাল সিং হেসে বলল, 'তা এনেছি বৈকি। পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে ঘুরি সঙ্গে ওইরকম একটা রাখতেই হয়। আপনারটা কী হল?'

'সেটা তার আজ করছে না।'

'তা হঠাৎ ওই জিনিসটার প্রয়োজন হল কেন?'

'ওই রক্তচোষাদের ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছি। ভাবছি একবার ওখানে হানা দেব।'

লাল সিং কপাল কুঁচকে বলল, 'বাবুজি, আপনার কমতি উমর। ভাল ঘরের লেড়কা আপনি। দুদিনের জন্য এখানে এসে কেন নিজেকে বিপদে ফেলবেন?'

'অনেক ভেবেচিন্তেই আমি একাজ করতে চলেছি। সেই দু'জন লেবারের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা মনে করো। যেভাবে তাদের সারা শরীরের রক্ত শুষে নেওয়া হয়েছে তা মনে করলেও গায়ে কাঁটা দেয় না কি?'

'ও তো অনেক পুরানা ঘটনা।'

'কিছুদিন আগে ওই দূরের পৈহার গ্রামেরও একজনের একই পরিণতি হয়েছে। এখন তুমি যদি ওটা আমাকে দাও তাহলে সাহস করে এগোতে পারি।'

লাল সিং বলল, 'কবে যাবেন বলুন? আমিও আপনার সঙ্গে যাব। একা ছাড়ব না আপনাকে।'

আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, 'সত্যি! তুমি আমার সঙ্গে যাবে লাল? যদি যাও তো খুব ভাল হয়। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি যমকেও ডরাবো না।'

লাল সিং বলল, 'এখন কাজের চাপটা একটু বেশি আছে। দু'একদিনের মধ্যেই হালকা হয়ে যাবে। তখনই যাবো। পারলে আরও দু'একজনকে সঙ্গে নেবো। দেখি কোন রক্তচোষায় এসে আমাদের রক্ত চোষে।' এই বলে ওর দেশি পিস্তলটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা আপনার কাছে রাখুন। পরে আমাকে ফেরত দেবেন। এরকম আরও দু'একটা আমার স্টকে আছে।'

আমি বললাম, 'এত সব পাও তোমরা কোত্থেকে?'

লাল সিং হেসে বলল, 'চোরাই মাল। চোরের ওপর বাটপাড়ি করে জোগাড় করেছি এগুলো।' বলে কতকগুলো কার্তুজও আমাকে উপহার দিল।

এরপর সারাটা বিকেল সন্ধে সবার সঙ্গে গল্প করে কাটালাম। রাতে ডাল রুটি খেয়ে আরামে নিদ্রা গেলাম। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল হরিরামের ডাকে। বলল, 'বাবুজি, আপনাদের আরও একজন লোক চলে গেল।'

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললাম, 'তার মানে?'

'আপনাদের ওই লাল সিং না কি যেন নাম, কাল রাতে রক্তচোষা এসে ওর সবটুকু রক্ত পান করে চলে গেছে।'

আতংকে ভয়ে বুক কেঁপে উঠল আমার। সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করে তাঁবুতে এলাম। এসে দেখি লাল সিং-এর মরদেহ ঘিরে লেবাররা জটলা করছে। এই রহস্যময় ব্যাপারে তারাও এমনই ভয় পেয়েছে যে কেউ আর এখানে থাকতে রাজি নয়। তবুও আমি ওদের অভয় দিয়ে বললাম, 'আর দুটো দিন তোমরা একটু কষ্ট করো। মাঠের ওপর তাঁবু না বিছিয়ে খোলা জায়গায় প্লাটফরমে এসো। দিনে পালা করে কাজ করো, ঘুমোও। রাতে সবাই জেগে থাকো।'

একজন মধ্যবয়সী লেবার গফুরদা বললেন, 'এটা কি একটা কথার মতো কথা হল কালীভাই?'

আমি গফুরদাকে বললাম, 'না। এটা কোনও যুক্তিপূর্ণ কথা নয়। তবে আমাদের উচিত হবে যে করেই হোক ওই হিংস্র শয়তানকে ধরা। ওর আবির্ভাব হয় রাতে। তাই রাতেই আমাদের সজাগ থাকতে হবে।'

অন্য লেবারটা বলল, 'তাতেই বা লাভ কী রক্তচোষা তো রোজ আসে না। তিন মাস কি ছমাস পরে আবার হয় তো আসবে।'

আমি বললাম, 'এমনই ঘটনা। তবে রোজ এসেই বা করবেটা কী? তাঁবুতে লোকজন থাকলে তবেই ওর আগমন। সারা বছরই তো জায়গাটা সুনসান থাকে। এখন লোকজন আসতেই ওর আবির্ভাব।'

লাল সিং-এর মরদেহ নিয়ে কী করব এই যখন ভাবছি ঠিক তখনই ঘনশ্যাম চৌবেজির আগমন হল সেখানে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার। আপনি ফিরে এলেন যে! আপনার তো কাল আসার কথা।'

উনি বললেন, 'ভাগ্যে এসে পড়লাম। না হলে কী করতেন বলুন তো? আপনিও বিপাকে পড়তেন, আমারও চাকরি নিয়ে টানাটানি হত। ভাগ্যক্রমে যে কাজের জন্য গিয়েছিলাম সেটা কালই হয়ে গেছে। তাই চলে এলাম। কেননা আমার মন পড়ে রয়েছে এই দিকে।'

আমি এবার লেবারদের কয়েকজনকে কাজে যেতে বলে দু'চারজনকে সজাগ থাকতে বললাম। যদিও এখন কাজের পরিবেশ নয় তবুও কাজে যেতে বললাম এই কারণে যে যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে ততই মঙ্গল। কাজ শেষ হলেই বিদায়। একটা দিন ত আর বেশি থাকার দরকার হবে না এখানে।

লেবারদের কাজে পাঠিয়ে আমি লাল সিং-এর দেহটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। যদি রক্তচোষাই হয় তাহলে কোনখান দিয়ে ওর রক্ত শুষে নিয়েছে তা দেখতে হবে। ওর সারা দেহ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে পায়ের বুড়ো আঙুলের কাছে একটা ক্ষত চোখে পড়ল। বুঝলাম ওই ক্ষতস্থান দিয়েই ওর সব রক্ত শুষে নেওয়া হয়েছে। এবার আগন্তুকের পদচিহ্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু না। কোথাও কোনও চিহ্নই নেই।

এমন সময় বাসুদেব নামে একজন কর্মচারী হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, 'বাবুজি, একবার আসুন তো এদিকে।'

আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কোথায়?'

'আসুন না।' বলে আমাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল মাঠের মাঝখানে সেই তালাওটার দিকে।

গিয়ে দেখলাম আর এক রহস্যময় ব্যাপার। তালাওয়ের ধারে বড়ো একটি পাথর ও ঘাসের বনে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। দেখেই শিউরে উঠলাম। নির্ঘাত এখানে কেউ খুন হয়েছে। না হলে এত রক্ত এখানে আসে কী করে?

আমি বললাম, 'তুমি তো দারুণ একটা জিনিস আমাকে দেখালে বাসুদেব। কিন্তু এত সকালে তুমি এখানে কী করতে এসেছিলে?'

বাসুদেব বলল, 'আমার খুব সকালে স্নান করা অভ্যেস। তাই স্নান করতে এসে এই রক্ত দেখেই চমকে উঠি। তখনই মনে হল যে রক্তচোষা লাল সিং-এর রক্ত পান করেছে সে জল পিপাসায় এখানে এসেই ওই রক্ত বমি করেছে। মনে হওয়া মাত্রই কাউকে কিছু না জানিয়ে আপনাকেই শুধু ডেকে এনে দেখালাম।'

আমি বললাম, 'ভালই করেছ। ব্যাপারটা এমনই হবে। কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। আর দু'একদিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেলে পালাই চলো এখান থেকে। বেশি জানাজানি হলে লেবাররা আরও ভয় পেয়ে যাবে। তখন আর কাজ করতে চাইবে না কেউ।'

'কিন্তু বেলায় যখন স্নান করতে এসে ওরা এই রক্ত দেখবে তখন কি হবে?'

'ততক্ষণে রোদের তাপে অনেক রক্ত শুকিয়ে যাবে। তবু যদি কারও চোখে পড়ে তা হলে যে যা ভাবে তাই ভাববে। আমরা আর এটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবো না।'

তালাওয়ের ধারে আর বেশিক্ষণ না থেকে চলে

এলাম। লাল সিং-এর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। ওর দেওয়া পিস্তলটা এখনও আমার কাছে। ওই ভয়ংকর পরিবেশে অভিযান করার সময় লাল সিং-এর মতো একজন সাহসী ও ডাকাবুকো লোক সঙ্গে থাকলে আমার মনোবল অনেক বেড়ে যেত। মধু ও তুরা আমাকে সঙ্গ দিলেও আসল কাজে এগোবার সময় ওরা আমাকে পদে পদে বাধা দেবে। তার কারণ ওরা কখনও চাইবে না আমার কোনও ক্ষতি হোক।

স্টেশনে ফিরে আসতেই হরিরাম বলল, 'চায় পিজিয়ে বাবুসাব।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সকাল থেকে যা গেল তাতে এখনও পর্যন্ত এক কাপ চা-ও পেটে পড়েনি।'

স্টেশন মাস্টার চৌবেজি বললেন, 'হঠাৎ তালাওয়ের দিকে গেলেন কেন?'

দেখে যখন ফেলেছেন তখন এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই। আমি যা দেখেছি তা বললাম। আর এও বললাম ব্যাপারটা গোপন রাখতে। এরপর চা পান সেরে হরিরামকে বললাম, 'আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। তোমরা খেয়ে নিও। খুব বেশি দেরি হলে আমার ভাত ডাল আমি রাতেই খেয়ে নেব।'

হরিরাম বলল, 'আপনি কি আবার ওই গ্রামের দিকে যাচ্ছেন?'

আমি আস্তে করে বললাম, 'হ্যাঁ।' বলেই রওনা দিলাম পৈহারের দিকে।

গ্রামের দিকে চলেছি। ডলফিনের মতো পাহাড়টা এখন যেন কেমন বিভীষিকার মতো মনে হচ্ছে। কত কি চিন্তা করতে করতে চলেছি আমি। রক্তচোষার সন্ধান কি আমি সত্যিই পাবো? ওই বড় পাহাড়ে উঠতে গেলে বন্যরা আমার ওপর চড়াও হবে না তো? সেইসঙ্গে আরও একটা দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মধু তুরা কাল আমাকে অত আদর আপ্যায়ন করল অথচ আজ সকাল থেকে ওদের কারও পাত্তা নেই কেন? আমি তো ভেবেছিলাম সকাল হলেই ওরা হাসি হাসি মুখ করে 'বাবুজি' বলে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। আরও

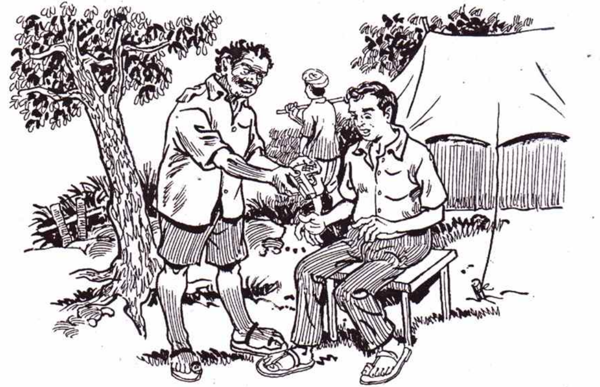

www.banglabooks.in

একবার ওদের গ্রামে যাবার জন্য আবদার করবে। তার জায়গায় কেউই তো এল না এতটা বেলা পর্যন্ত। কারণটা কী?

আমি চলার গতি একটু দ্রুত করে একসময় এসে পৌঁছলাম সেই ডলফিন পাহাড়টার কাছে। তারপর শাল মহুয়ায় বন পার হয়ে ওদের গ্রামে যেতেই তুরার সঙ্গে দেখা। তুরা কেমন যেন বিষণ্ণ বদনে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবুজি আপনি?'

আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। তবে কি হরিরামের কথাটাই ঠিক? ও তো বারণ করেছিল বন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে। ওদের স্বজাতিরা ব্যাপারটা অন্যভাবে নিতে পারে। তবু বললাম, 'তোমরা তো গেলে না তাই আমিই এলাম তোমাদের খোঁজ নিতে। মধু কোথায়?'

তুরা বলল, 'ওর খুব মন খারাপ বাবুজি। ওর দাদা কুন্দন, কাল সেই আপনার সঙ্গে দেখা হল। মধুকে বলল, যা বাবুজিকে পাহাড়ে নিয়ে যা।'

'হ্যাঁ, বলল তো।'

'বলে চলে গেল। সেই যে গেল আর ফেরেনি।'

'সেকী!'

'আমার মনে হয় ও আর ফিরবে না। আমার বাবার মতোই অবস্থা হবে ওরও। তিন চারদিন বাদে প্রাণহীন রক্তশূন্য দেহটা কোথাও না কোথাও পড়ে থাকতে দেখা যাবে।'

আমি বললাম, 'কাল রাতে আমাদের একজন লেবারকে রক্তচোষায় শেষ করেছে। আর সেই জন্যেই আমি তোমাদের গ্রামে এসেছি ওই বড় পাহাড়ের পথের সন্ধান জেনে নেব বলে।'

তুরা বলল, 'না বাবুজি, অমন কাজটি করবেন না। আমাদের যা হবার হোক। আপনি কেন প্রাণে মরবেন? বাবুজি, মধু আমি দুজনেই আপনার ভাল চাই। তাই বলছি—।'

'আমাকে মধুর কাছে নিয়ে চলো।'

তুরা আমি দুজনেই মধুর ঘরে এলাম। পাশাপাশি ঘর দুজনের। একই পরিবারের মতো।

আমাকে দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠল মধু। বলল, 'তুমি কেন এলে বাবুজি? চলে যাও এখান থেকে।'

আমি কঠিন গলায় বললাম, 'চলে যাব বলে তো আসিনি। এই ঘোর বিপদে তোমাদের পাশে দাঁড়াব বলে এসেছি।'

মধু অশ্রুসজল চোখে বলল, 'কিন্তু বাবুজি, সিজার জানিয়ে দিয়েছে বাবুজি যেন এই গ্রামে দোবারা না আসেন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সিজার কে?'

'আমাদের গ্রামের মুখিয়া। ওর কথা সবাই শোনে।'

'আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

তুরা ও মধু পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললাম, 'কী হল? আমাকে নিয়ে চল তার কাছে। আমি গিয়ে তোমাদের মুখিয়াকে বলব ওই রক্তচোষাদের মোকাবিলা আমি করতে চাই। এ ছাড়া আমার অন্য কোনও মতলব নেই।'

ওরা তখনও কেমন যেন ভয় পেতে লাগল।

আমি মধুকে বললাম, 'তুমি কি চাওনা তোমার দাদা কুন্দন ফিরে আসুক?'

'হ্যাঁ চাই।'

'তাহলে? এইভাবে ঘরের কোণে বসে থাকলে হবে? সে মানুষটা কোথায় গেল তার কোনও বিপদ হল কি না এসব দেখবে তো?'

'কিন্তু সিজারের কথা তো অমান্য করার সাধ্য কারও নেই।'

'সেটা তোমাদের ক্ষেত্রে। আমি বাইরের লোক। আমি ওকে মানব কেন? ভয়ই বা পাব কেন?'

মধু তখন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তুরা, তুই ঘর সামাল। আমি বাবুজিকে নিয়ে সিজারের কাছে যাই। আমাদের আসতে দেরি হলে চিন্তা করিস না।'

তুরা বলল, 'তাই যা।'

মধু আমাকে ওই গ্রামের শেষ প্রান্তে সিজারের আস্তানায় নিয়ে এল। মাথা ভর্তি পাকা চুলে ভরা বৃদ্ধ সিজার আমাকে যথেষ্ট খাতির করে একটি শিমুল গাছের নীচে বেদীতে বসালেন। সিজারকে দেখে মনে হল এককালে উনি অত্যন্ত বলবান পুরুষ ছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'ভেলিগুড়ের চা চলবে নাকি বাবুজি?'

আমিও হেসে বললাম, 'নিশ্চয়ই। এখানে চিনি দেওয়া চা কোথায় পাব বলুন?"

সিজার হাঁক দিলেন, 'সংজ্ঞা!'

অমনি গোলমুখের তামাটে রঙের একটি মেয়ে ঝোপড়ির চালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

সিজার বললেন, 'চা নিয়ে আয়।'

সংজ্ঞা চলে গেলে সিজার মধুকে বললেন, 'বাবুজির সঙ্গে আমার কথা আছে। তুই ঘরে যা।'

সিজারের আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা কারও নেই। তাই মাথা নত করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল মধু।

একটু পরেই চা এল। চা খেতে খেতেই কথা হল। সিজার বললেন, 'আপনিই এখানকার রেলবাবু?'

'হ্যাঁ। তবে বেশিদিনের জন্য নয়। আমাদের সামান্য কয়েকদিনের কাজ শেষ হলেই আমি চলে যাব। আমার পোস্টিং হয়েছিল এখানেই। পরে সে অর্ডার ক্যানসেল হয়েছে।'

'ভালই হয়েছে বাবুজি। এ আপনার মতো লোকের থাকবার জায়গা নয়। দুদিন থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'এখনই ভাল লাগছে না।' তারপর বললাম, 'মধু আর তুরার মুখে শুনলাম আপনি নাকি আমাকে এই গ্রামে আসতে বারণ করে দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ বাবুজি। কাল যখন আপনি ওই পাহাড়ের মাথায় উঠছিলেন তখনই আমি আপনাকে দেখেছি। পরে যখন শুনলাম আপনি ওই পৈহারগিরিতে যেতে চাইছেন তখনই ভয় পেলাম। এত কমতি উমর আপনার। অথচ ওখানে গেলে আপনি বিপদে পড়বেন। ওই পৈহারগিরিতে যে সব বুনোরা থাকে ওরা মানুষ নয় বাবুজি। বাপ ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি অনেক আগে ওরা নাকি মানুষ মেরে খেত। এখন শিয়াল কুকুর মেরে খায়।'

'মানুষের রক্তও খায় নিশ্চয়ই?'

'না না বাবুজি। তাহলে এ গ্রামে কোনও মানুষ থাকত না। আমরাও ছেড়ে কথা বলতাম না। মেরে তাড়াতাম ওদের।'

'তা হলে রক্তচোষা কারা?'

সিজার আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'ওই বুনোরা রক্তচোষা নয়। ওরা খুব নিরীহ। তবে কিনা নির্বোধ। ওদের সংস্কারে ঘা লাগলে ওরা আর ঠিক থাকে না। ওই পৈহারগিরির অনেক ওপরে একটি গুহার মধ্যে ওদের এক দেবী আছে। সেই দেবী হলেন শূকরকালী। অনবদ্য এক কালীমূর্তি। অসুরের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখটা শূকরের মতো।'

'আপনি দেখেছেন সেই কালীকে?'

'না। ওখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। তবে বুনোদের মুখেই শুনেছি। ওই পৈহারগিরি দেবীর কারণে অত্যন্ত পবিত্র ভূমি। তাই বহিরাগত কারও ওই পাহাড়ে পা দেবার অধিকার নেই। এখানে যে গভীর জঙ্গল আপনি সেখানে ঘুরে বেড়ালে শিকার করলে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। কিন্তু ওই পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করলেই বিপদ। যে কেউ উঠলে নারীপুরুষ নির্বিশেষে তাকে বলি দিত ওরা। পরে সেই বলির প্রসাদ সবাই পেত।'

'এখনও কি ওইভাবে নরবলি দেয় ওরা?'

'না। তার কারণ ওই পাহাড়ে কেউ যায় না।'

'তাহলে আমাদের তিনজন লেবার, তুরার বাবার অমন মর্মান্তিক মৃত্যু হল কী করে? ওদের শরীরের সবটুকু রক্ত শুষে নিল কে?'

এমন সময় সংজ্ঞা আবার এল। শালপাতার ঠোঙায় অনেকটা হালুয়া নিয়ে আমার সামনে রেখে কেমন যেন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। গায়ের রং তামাটে হলেও ওর সুন্দর সুগোল মুখে হাসির ঝিলিক। আঠারো কুড়ি বছরের মেয়ে। অরণ্যের দীপ্তিময় চেহারা।

আমি হালুয়া খেতে শুরু করলে সিজার হেঁকে বললেন, 'এক লোটা পানি দে রে সংজ্ঞা।'

সংজ্ঞা আবার এল। এক ঘটি জল আমার সামনে রেখে সিজারের নজর এড়িয়ে আমার নাকে একটু জল ছিটিয়ে মুচকি হেসে পালাল।

সিজার বলল, 'বছর দুই হল ওই বুনোদেরই স্বজাতি এক তান্ত্রিক কোথা থেকে যেন এখানে এসে হাজির হয়েছে। এই সব পৈশাচিক কাণ্ড সে-ই করে বেড়াচ্ছে। সে এসেই হুকুমজারি করেছিল এখানে কোনও রেলওয়ে স্টেশন হবে না। যা হবে তা জয়রাম নগরে।'

'সেখানে তো স্টেশন আছেই।'

'ওটাই থাকবে। নতুন আর কোনও নয়। তবুও স্টেশন হল। ওরও রাগ চরমে উঠল তাই। ফলে প্রাণ গেল দুজন লেবারের।'

'কাল আরও একজনের গেছে।'

'সে খবরও পেয়েছি।'

'কিন্তু ওখানে স্টেশন হলে তান্ত্রিকের অসুবিধেটা কোথায়?'

'শুধু তান্ত্রিক নয়, আসলে বুনোরাও চায় না এখানে স্টেশন হোক। তার কারণ ওই শূকরকালীর গুহায় ওদের রাজাদের আমলের প্রচুর সঞ্চিত ধন আছে। এখানে স্টেশন হলে জনপদ গড়ে উঠবে। তার ওপর এই জঙ্গল কেটে এখানে রেলবগী তৈরির কারখানা হবে। আর সে সব হলে পাহাড়ে লোক আটকানো সম্ভব হবে না।'

'এটাই তা হলে আসল কারণ?'

'ঠিক তাই।'

'এবার বলুন তো কোন উপায়ে মানুষের শরীর থেকে রক্তশুষে নেয় ও?'

'তা তো বলতে পারব না।'

'আমার উদ্দেশ্য সেটাই জানার। মন্ত্রের জাদুতে হয়তো কাউকে সাময়িকভাবে সম্মোহিত করা যায় কিন্তু শরীরের রক্ত শুষে নেওয়া যায় না।'

'খায় বাবুজি। ওই তান্ত্রিকের অসাধ্য কিছু নেই।'

'আমি কিন্তু আজই সকালে আমাদের এক মৃত কর্মীর পায়ে একটু ক্ষত দেখেছি। তাতেই আমার ধারণা হয়েছে কেউ কোনও সূচলো বস্তুর দ্বারা ওই জায়গা থেকে রক্ত শুষে নিয়েছে।'

সিজার কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে বললেন, 'ঠিক দেখেছেন?'

'কোনও ভুল নেই। এবার বলুন রেলের লোকেদের ভয় দেখানোর জন্য না হয় ওই বুনো তান্ত্রিক রক্তশোষক হয়েছে কিন্তু তুরার বাবা কোন দোষটা করল? মধুর দাদা কুন্দন বেপাত্তা হল কেন?'

'তাহলে বলি শুনুন বাবুজি। ওই বুনোদের মধ্যে সবাই যে খুব ঠান্ডা মাথার তা তো নয়। কয়েকজন উগ্র লোকও আছে। খরগোশ ধরা নিয়ে তুরার বাবার সঙ্গে ওদের বচসা হয়। তারই পরিণতিতে ওই মৃত্যু।'

'আশ্চর্য! ওদের সঙ্গে ঝগড়া হলেই ওরা প্রাণে মারবে আর নিজেরা নির্ভয়ে চলাফেরা করবে সর্বত্র?

'তাই তো হচ্ছে।'

'মধুর দাদা কুন্দনকে তাহলে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?'

'ওকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।'

'কী কারণে?'

'ওর বোন মধু আপনাকে গ্রামে নিয়ে এসেছে। পাহাড়ে উঠিয়েছে তাই। আপনাকে ভয় দেখিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বললে কুন্দন রাজি হয় না। ওদের লোকই একথা আমাকে জানালে আমি কথা দিয়েছি ওদের হয়ে আমিই আপনাকে গ্রামে আসতে বারণ করে দেবো। আপনি আর এখানে না এলে ওরা ছেড়ে দেবে কুন্দনকে। সেই জন্যেই আমি আপনাকে গ্রামে আসতে বারণ করেছি বাবুজি। তার চেয়েও বড় কথা আপনি এখন ওদের টার্গেট হয়ে পড়েছেন। তাই সবসময় সাবধানে থাকবেন।' তারপর আদর করে ডাক দিলেন, 'সংজ্ঞা, সংজ্ঞারে!'

হরিণনয়না লাস্যময়ী সংজ্ঞা ছুটে এল ডাক শুনে।

সিজার বললেন, 'যা বাবুজিকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।'

সংজ্ঞা বলল, 'আসুন বাবুজি।'

আমি সিজারকে বললাম, 'ওই বুনো তান্ত্রিককে আপনারা খুব ভয় পান। তাই না মুখিয়াজি?'

সিজার আস্তে করে ঘাড় নাড়লেন।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। ওই বুনো তান্ত্রিক আর তার চ্যালাদের উচিত শিক্ষা না দিয়ে আমি যাব না এখান থেকে।'

সিজার ভয় পেয়ে বললেন, 'ওদের পিছনে লাগতে যাবেন না বাবুজি। ফল ভাল হবে না।'

আমি হেসে বললাম, 'লড়াই না করে পরাজয় বরণ আমি করি না। ওই শত্রুদের মোকাবিলা করার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আপনি বুনোদের জানিয়ে দিন কুন্দনকে যেন ওরা এখনই ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আর আজ থেকে পৈহারের এই গ্রামও ওদের জন্য নিষিদ্ধ। এই গ্রামের মাটিতে বুনোদের কেউ পা দিলেই মরতে হবে তাকে।'

সিজার শিউরে উঠলেন, 'বাবুজি!'

'ভয় পাবেন না। ভয় পেলেই পেয়ে বসবে ওরা। পৈহারগিরিতে আপনারা যাবেন। আর এই গ্রামের একজনেরও যদি রক্ত শোষণ করে ওরা তবে দলবদ্ধ হয়ে ওই তান্ত্রিককে মেরে তাড়াবেন আপনারা।' বলে একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আপনারা না পারেন আমাকে বলবেন। ওই তান্ত্রিকের দফা আমিই শেষ করে দেব।'

সংজ্ঞা এবার ফোঁস করে উঠল। বলল, 'বাবুজি ঠিক কথাই বলেছেন দাদুভাই। আমরা যদি পৈহারে না যাই

তো ওরাই বা আসবে কেন? আর ওই তান্ত্রিক যখন মন্ত্রবলে যার তার জীবন নিচ্ছে তখন ওঁকেও তো এখানে থাকতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

সিজার কি ভাবলেন কে জানে? একসময় একটু গম্ভীর হয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এরকমই হওয়া উচিত।'

সংজ্ঞা এবার আমার হাতে মৃদু একটু টান দিয়ে বলল, 'আসুন বাবুজি।'

আমি ওর সঙ্গ নিয়েই বনপথ ধরে বেশ খানিকটা এলাম। সংজ্ঞা হঠাৎই একসময় একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবুজি, আপনি আমার মনের কথাটাই বলেছেন দাদুভাইকে। আমরা যদি ওদের ওখানে যেতে না পারি তাহলে ওরা কেন আসবে?'

আমি সংজ্ঞার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি তাহলে আমাকে সমর্থন করছ?'

সংজ্ঞা বলল, 'করছি। তবে আপনি তো চলে যাবেন বাবুজি।' বলে আমার দুটো হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'আপনি চলে গেলে আমরা তো মনে কোনও জোর পাবো না।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'কে বলল আমি চলে যাচ্ছি?' ওই রক্তচোষার রহস্যভেদ না করে আমি যাচ্ছি না। তোমরা রুখে দাঁড়াও। আমি তোমাদের পাশে আছি। তাছাড়া কুন্দন ফিরে না আসা পর্যন্ত ওদের ভয়ে এ গ্রাম ছেড়ে আমি যাব না।'

'কিন্তু বাবুজি, কুন্দনকে যদি ওরা মেরে ফেলে?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার রিভলভারটা বার করে বললাম, 'তাহলে এক এক করে ওদের সবাই মরবে। ওই তান্ত্রিকের মন্ত্রের চেয়েও আমার বুলেটের শক্তি অনেক বেশি।'

সংজ্ঞা যেন সংজ্ঞা হারাল আমার কথায়। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর হঠাৎই আমার কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'আর কেউ না থাকুক আমি আপনার পাশে আছি বাবুজি।'

আমি বললাম, 'তা হলেই হবে।' তারপর বললাম, 'আমি তো বাইরের লোক এখানকার পথঘাট কিছুই চিনি না। তবুও আমি পৈহারগিরিতে গিয়ে ওই তান্ত্রিকের মুখোমুখি হতে চাই। তুমি কি পারবে ওই পাহাড়ে যাওয়ার পথটা আমাকে চিনিয়ে দিতে?'

'পারব। যদিও ওই পাহাড়ে আমি উঠিনি কখনও তবু আপনি গেলে আমি আপনাকে একা ছাড়ব না। আমিও সঙ্গে যাব।'

এবার আমিও ওর দুটো হাত শক্ত করে ধরে বললাম, 'তাহলে জয় আমাদের অনিবার্য।'

এমন সময় আমাদের মাঝখানে হঠাৎই ঝাঁকড়া চুলের এক বুনো লোক এসে দাঁড়াল। তার দুচোখে যেন আগুন জ্বলছে। সে আমার দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, 'এ বাবুজি! তুমকো মানা কর দিয়া না, হিঁয়া অনেকে লিয়ে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মানা তো আমি শুনছি না। এখন থেকে এই গ্রামেই আমি থাকব। শুধু তাই নয় তোমাদের প্রত্যেককে আমার কথা শুনে চলতে হবে। আমরা যদি পৈহারগিরিতে যেতে না পারি তোমরাও এই গ্রামে পা রাখবে না।'

বুনোটা বলল, 'তু বাহার কা আদমি। পরদেশী। নিকাল যা হিঁয়াসে।'

আমি বললাম, 'তোদের ওই তান্ত্রিক কোন দেশী? আগে ওকে তাড়া। পরে আমি যাব।'

বুনোটা হঠাৎ ওর গুপ্তস্থান থেকে একটা ধারালো ছোরা বার করে আমার পেটে ঠেকাল। তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে বলল, 'আভি নিকাল যা।'

সেই মুহূর্তে সংজ্ঞা বাঘিনি হয়ে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে না পড়লে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। সংজ্ঞা এক ধাক্কায় ওকে দু'হাত দূরে ফেলে দিতেই আমিও পিস্তলটা বার করবার সুযোগ পেলাম। সেটা ওর দিকে তাগ করে বললাম, 'এই জিনিসটা কি সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে?'

পিস্তল দেখে দারুণ ভয় পেল বুনোটা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই আমি ওর চুলের মুঠি ধরে বললাম, 'যা। এখুনি কুন্দনকে নিয়ে আয়। ও ফিরে এসেছে দেখে তবে আমি এই গ্রাম ছেড়ে যাব।'

বুনোটা বিনা প্রতিবাদে যাবার উপক্রম করতেই বললাম, 'আর এও জেনে যা ওর যদি কোনও ক্ষতি হয় তাহলে পৈহারগিরিতে গিয়ে তোদের সব কটাকে গুলি করে মারব আমি।'

সংজ্ঞা বলল, 'আর একটু হলেই শয়তানটা আপনাকে শেষ করে দিত। ভাগ্যে বুদ্ধি করে ওটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম।'

'সেজন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এতেই বোঝা

গেল পৈহারগিরিতে যেতে হলে তোমার মতো চটপটে ও সাহসী মেয়েকেই আমার দরকার।'

'এখন তো অনেক বেলা হয়ে গেছে বাবুজি। আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'মধু আর তুরার সঙ্গে দেখা করে আমি একবার স্টেশনে যাব। তবে সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসব এখানে। এর মধ্যে যদি ওরা কুন্দনকে ফিরিয়ে না দেয় তাহলে আজই ওদের মোকাবিলা করব। ওই তান্ত্রিককে বধ করলেই পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসবে।'

'পাহাড় তো অশান্ত নয়।'

'কে বললে? কোনও বহিরাগত, এমনকি তোমরাও ওখানে গিয়ে পড়লে যেখানে ওদের বলি হতে হয় সেখানে কীসের শান্তি? ওটা তো হত্যাপুরী। তাই এখন থেকে ওই পৈহারগিরিতে অবাধ গতি হবে সকলের। বাধা দিলে সমতলেও বাধা পাবে ওরা।'

'কুন্দন যদি ফিরে আসে তাহলে কী করবেন?'

'তাহলেও অভিযান হবে। আজ রাতের অন্ধকারেই ওদের ওই গুহামন্দিরে হানা দেব আমরা। তুমি আমি তো যাবোই, তুরা আর মধু কি বলে দেখি। যদি আরও কেউ যেতে চায় তাকেও সঙ্গে নিও। তবে একটা কথা, ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়। তাহলেই ওরা সতর্ক হয়ে যাবে।'

সংজ্ঞা বলল, 'কেউ না যাক, আমি যাব।'

'তুমি তো যাবেই। তুমি না গেলে এই অরণ্যে দিশাহারা হয়ে যাব আমি। আমার আসল উদ্দেশ্য কি জান? তান্ত্রিক বধ নয়, ও কী উপায়ে মানুষের শরীর থেকে রক্ত শুষে নেয় সেটাই জানার। মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপারটা স্রেফ বুজরুকি।'

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমরা মধুর ঘরে এলাম। তুরা ও মধু দুজনেই তখন হতাশ দৃষ্টিতে দূরের পৈহারগিরির দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

আমরা যেতেই ওরা ছুটে এল আমাদের কাছে।

মধু বলল, 'তুমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছো বাবুজি? আর আসবে না?'

সংজ্ঞা বলল, 'কেন চলে যাবেন বাবুজি? কী কারণে?

বাবুজি আজ থেকে আমাদের এখানেই থাকবেন।'

তুরা আর মধু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। তাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

সংজ্ঞা বলল, 'ভেতরে চল। কথা আছে। বাবুজিকে সরবত দে। ভুক লাগছে বাবুজির।'

মধু বলল, 'আমি এখুনি ভাত ডিম তৈরি করে দিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'ওসবের দরকার নেই। আমাকে সরবতই দাও।'

তুরা সঙ্গে সঙ্গে বেলের সরবত তৈরি করে ফেলল। সেই সরবত সংজ্ঞাকে আমাকে দিয়ে নিজেরাও খেল।

খেতে খেতেই আমাদের পরিকল্পনার কথা বললাম ওদের। শুনে ওরা এমনই চমকিত হল যে প্রথমে কোনও কথাই বলতে পারল না। পরে উল্লাসে ফেটে পড়ল দুজনে।

আমি বললাম, 'অনেক বেলা হয়েছে। এবার আমি যাই?'

মধু বলল, 'দুমুঠো খেয়ে গেলে হত না বাবুজি?'

সময় হবে না। তাছাড়া এখনই গিয়ে আমার কাজের লোকেদের সঙ্গে দেখা না করলে ওরা অন্যরকম ভাববে। মনে করবে আমিও হয়তো রক্তচোষাদের পাল্লায় পড়ে গেছি। আমি ওখানে গিয়ে সকলকে জানিয়ে সন্ধের আগেই ফিরে আসব। আজ রাতেই অভিযান। তোমরা সবাই তৈরি থেকো।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার কোতনি সুনারে ফিরে এলাম আমি। লাল সিং-এর মৃত্যুতে সবাই খুব ভেঙে পড়েছে দেখলাম। ফলে তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে ফেলার তৎপরতাও বেড়েছে। কেননা সবাই এখন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে।

আমি এখানকার তালাওতে গিয়ে স্নান সেরে পাড়ে উঠে সেই জমে থাকা রক্তের দাগগুলো পরীক্ষা করলাম। রোদের তাপে সেগুলোর অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। দাগগুলো লক্ষ্য করতে করতে হঠাৎই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম একটি ঝোপের ধারে প্রায় এক হাত লম্বা বেলুনের মতো মোটা একটি প্রাণী ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে। দেখে মনে হল নিশাচর কোনও প্রাণীতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে সেটাকে। প্রাণীটার চোখ মুখের কোনও অস্তিত্ব নেই। যেন অতিকায় একটি কেঁচো অথবা মেটেলি সাপ। সেটাকে দেখে আমার চিন্তাভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল। সন্দেহটা সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা পেল আমার কাছে। তবে কি...।

তবে কি এটাও কোনও সূত্র? আমি আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা চলে এলাম স্টেশনে। দুপুরের খাওয়াটা চটপট সেরে নিলাম। ভাত ডাল আর পেঁয়াজের ঝাল খেয়ে দেহটা একটু চাঙ্গা হতেই স্টেশন মাস্টার চৌবেজিকে বললাম, 'স্যার, আজ আমি ওই পৈহার গ্রামের দিকে যাচ্ছি। রাতে ফিরব না। বুঝলে দু'একটা দিন ওখানে থেকেই যাব আমি। আমার জন্য কেউ যেন চিন্তা করবেন না।'

চৌবেজি বললেন, 'তা নাহয় না ফিরলেন কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'আমাদের তিনজন স্টাফের হত্যাকারী ওই পৈহারগিরিতে ঘাঁটি করে আছে। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে আমি ফিরব না।'

'কে সেই হত্যাকারী? কারা একাজ করছে?'

'আমি ঘুরে এলেই সব জানতে পারবেন।'

চৌবেজি বললেন, 'যা করবেন খুব সতর্ক হয়েই কিন্তু।'

এরপর আমি লেবারদের সঙ্গে দেখা করে তাদেরও ইঙ্গিত দিয়ে লাল সিং-এর ঝোলা হাতড়ে আরও কিছু কার্তুজ বার করে রওনা দিলাম পৈহার গ্রামের দিকে।

তখন সন্ধে হয় হয়। গ্রামে পৌঁছেই একটি দুঃসংবাদ পেলাম। কুন্দনকে মৃত অবস্থায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গেছে। মধু তুরা সবাই গেছে সেখানে। শুধু একজনই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল মধুদের চালাঘরে। তার মুখেই ওই অশুভ সংবাদটা পেলাম। সে হল সংজ্ঞা।

আমি সংজ্ঞাকে বললাম, 'চলো জঙ্গলে যাই।'

সংজ্ঞা বলল, 'না না এখন নয়, রাতের অন্ধকারেই যাব।'

'অনেক দেরি হয়ে যাবে। কুন্দনের ডেডবডি যেখানে পড়ে আছে সেই জায়গাটা আমার একটু দেখা দরকার।'

সংজ্ঞা বলল, 'দাঁড়ান তাহলে টাঙ্গিটা নিয়ে আসি। একেবারে শুধু হাতে জঙ্গলে যাওয়া ঠিক নয়।' বলেই মধুর ঘর থেকে একটা টাঙ্গি নিয়ে দরজায় সিকল দিয়ে বলল, 'চলুন বাবুজি।'

আমি নিঃশব্দে ওর সঙ্গ নিয়ে চললাম। জঙ্গল খুব গভীর। আমার সঙ্গে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলোয় পথ

দেখে সংজ্ঞার সঙ্গে চললাম। জঙ্গল গভীর হলেও পথরেখা আছে সেই পথরেখা ধরেই এগিয়ে চললাম। পথ চলার মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের বাধা টপকাতে টপকাতে যখন পৈহারগিরির প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি তখনই কতকগুলো আলোর রেখা দেখতে পেলাম। সেই আলো লক্ষ্য করে পৌঁছতেই দেখলাম একটি বড় পাথরের খাঁজে কুন্দনের মৃতদেহ পড়ে আছে। সারা শরীর রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। চোখ দুটো ইঁদুরে বা অন্য কিছুতে খুবলে নিয়েছে। দেখে মনে হল গতরাতেই হত্যা করা হয়েছে ওকে। ইতিমধ্যে দেহটা ফুলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। শরীরে কোথাও কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। তবুও নাকে রুমাল চাপা দিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে হঠাৎই ঘাড়ের কাছে চুলের গোছার নীচে ক্ষতচিহ্ন একটু পেলাম। দেখে শিউরে উঠল সারা শরীর। একই কায়দায় খুন করা হয়েছে কুন্দনকেও।

গ্রামের লোকেরা ওর দেহটা মাটি চাপা দেবার জন্য গর্ত খুঁড়ছে। তুরা আর মধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এক জায়গায় বসে। আমি টর্চের আলো ফেলে চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম কোথাও কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না তা দেখবার জন্য। কিন্তু না। সন্দেহজনক তেমন কোনও কিছুই আমার চোখে পড়ল না।

যাই হোক, গ্রাম থেকে অনেক দূরে এই গভীর জঙ্গলে দাহ করার অসুবিধার কারণেই গ্রামের লোকেরা মাটি চাপা দিল কুন্দনকে। সব কাজ শেষ হলে শোকার্ত মধুকে নিয়ে ফিরে এলাম ওদের কুটিরে।

এই আকস্মিক ঘটনায় কেমন যেন হয়ে গেছে মধু। অমন হাসিখুশি মেয়েটা ঝরঝর করে কেঁদেই চলেছে শুধু। আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। ওই হত্যাকারীদের অথবা হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হবে। এই রহস্যের উন্মোচন আজই হওয়া চাই। নিজের জীবনের বিনিময়েও এর প্রতিশোধ আমি নেবোই নেব।'

সংজ্ঞা বলল, 'হ্যাঁ, আজই' এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। আপনি একটু অপেক্ষা করুন বাবুজি। আমি দাদুভাইকে বলে আসছি আজ আমি মধুর ঘরে থাকব। অভিযানের কথা বলব না। পারি তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসব।'

এতক্ষণে কথা বলল মধু, 'না। কাউকে সঙ্গে আনবি না। আমরা চারজনেই যাব।' তারপর তুরাকে বলল, 'তুই বাবুজিকে তোদের ঘরে নিয়ে গিয়ে যা হোক দুটো খাইয়ে দে। নইলে পেটে খিদে থাকলে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমার জন্য একটু দুধ নিয়ে আয়।'

মধুর কথা মতো তুরাদের ঘরে গিয়ে একটু ডাল রুটি আর অনেক আগে তৈরি হালুয়া খেলাম। গরম দুধ খেলাম এক গেলাস। তারপর আবার মধুর ঘরে এলাম। তুরা ওর জন্য দুধ এনেছিল। তাই খেয়ে যাবার প্রস্তুতি করতে লাগল ও।

একটু পরেই সংজ্ঞা এল। ওর সঙ্গে বেঁটেখাটো চেহারার এক যুবক। নাম ডিকি। দেখেই মনে হল দারুণ শক্তিধর ও। আর খুবই বেপরোয়া প্রকৃতির।

মধু বলল, 'ডিকি, তুই কি যাবি আমাদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, সংজ্ঞা তো তাই বলল।'

সংজ্ঞা বলল, 'ডিকিটা দারুণ ডাকাবুকো। তাই দলে নিলাম। আমরা তো সোজা পথে পৈহারগিরিতে যাব না। যাব জঙ্গলের বাঁকা পথে। সে পথে জন্তু জানোয়ারের ভয় বেশি। ডিকির একটা বড়ো গুণ ও গন্ধে টের পায় কোথায় কোন জানোয়ার আছে।'

অতএব আর একটুও দেরি না করে আমরা রীতিমতো তৈরি হয়ে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করলাম। আমার হাতে টর্চ। ডিকির হাতে মশাল। এখনও পর্যন্ত এই জঙ্গলে কতকগুলো হরিণ ও শেয়াল ছাড়া আর কোনও জন্তুই চোখে পড়েনি। একটা বুনো শূয়োরের অবশ্য দেখা পেয়েছিলাম। তাও অনেকটা দূর থেকে।

পৈহারগিরি যাবার দুটো রাস্তা। একটি হল বুনোদের গ্রাম দিয়ে, অন্যটি আরও ঘন জঙ্গলের মধ্যে দুরন্ত চড়াইয়ের পথে। এই পর্যন্ত রাস্তা তুরা, মধু বা গ্রামের মানুষদের সকলেরই চেনা। এরপরই বুনোদের এলাকা। বুনোরা দু'চারজন ছাড়া এমনিতে সবাই খুব ভাল। কিন্তু ওদের সংস্কারে ঘা লাগলেই ওরা বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

ডিকি এখানেই থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী করবেন বাবুজি? এই পথেই যাবেন? না অন্য পথ ধরবেন?'

সংজ্ঞা বলল, 'অন্য পথে তো ভীষণ চড়াই। তাও পথ আছে বলে মনে হয় না। আমরা পাহাড়িরা পারলেও বাবুজি যদি না পারেন?'

আমি বললাম, 'অন্য পথের অভিজ্ঞতা কি তোমাদের কারও আছে?'

আমি বললাম, 'ভয় পাবার লোক হলে আমি কি এই হত্যাপুরীতে সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে আসতাম?'

মধু বলল, 'বাবুজি, এগুলো সেই সব মানুষের মাথা। যাদের ওরা বহু আগে সংস্কার বশে বলি দিয়েছে।'

আমরা যখন গ্রাম্য পথ ধরে পৈহার পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি ঠিক তখনই ঘটে গেল বিপর্যয়। আমাদের কথাবার্তা শুনে অথবা মশালের আলো দেখে প্রায় দশ বারোটা পাহাড়ি কুকুর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল আমাদের। তারপর গগনফাটা চিৎকারে ঘুমিয়ে থাকা গ্রামের মানুষদের সজাগ করে দিল। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সশস্ত্র বুনোরা এবার তীর কাঁড় ও বল্লম নিয়ে তেড়ে এল আমাদের দিকে। চারদিক থেকে এমনভাবে আমাদের ঘিরে ফেলল ওরা যে আর আমাদের পালাবার কোনও উপায় রইল না।

আমার ধমক খাওয়া সকালের সেই বুনোটা ওদের প্রতিনিধি হয়ে এসে আমার বুকে বল্লম ঠেকিয়ে ওদের ভাষায় বলল, 'নেত্রা হাদিশ সান্নাটা। উধার দেখ।'

তাকিয়ে দেখলাম এক জায়গায় প্রায় শতাধিক মড়ার মাথার খুলির স্তূপ।

আর এক বুনো আমার কপালে ছুরি ঠেকিয়ে বলল, 'তেরা অ্যায়সা হিম্মৎ ক্যায়সে হুয়া? তু বাহারকা আদমি পাহাড় পর আয়া কিঁউ?'

অন্যান্য বুনোরা বলল, 'আর তুই ফিরে যেতে পারবি নারে দিকু। তোদের সবাইকে মরতে হবে।'

আমি বললাম, 'আমরা তো মরব বলেই এসেছি। তবে তোরাও কেউ বাঁচবি না। এখন তোদেরও নীচের গ্রামে নামা নিষেধ। হাট বাজার সব বন্ধ। যে যাবি তাকেই মেরে ফেলব আমরা। এই নিয়মই চালু করেছি। এখন থেকে জানিস তো আমি সরকারের লোক? এরপর অনেক লোকজন নিয়ে এসে পুলিশ এনে মেরে ধরে একশা করব তোদের। এই খুলির পাশে তোদের মাথার খুলিও জড়ো করব আমরা। তোদের গ্রামে তোদেরই সর্বনাশ ঘটাবো।'

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম বুনোটা

ডিকি বলল, 'আমরা কেউই পৈহারগিরিতে কখনও উঠিনি। শুধু পাহাড়ের আকৃতি দেখেই চড়াইটা অনুমান করছি।'

মধু বলল, 'আমার মনে হয় সোজা পথে যাওয়াই ভাল। এখন এত রাতে গ্রাম ঘুমিয়ে আছে। কেউ টেরও পাবে না।'

তুরা বলল, 'তবু সাবধানের মার নেই। সবটা না হোক, এই গ্রামটা অন্তত এড়িয়ে চলো।'

আমরা ওর কথামতো অন্য পথই অবলম্বন করলাম। কিন্তু না। খানিক যাওয়ার পরই বুঝলাম এ পথ অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমাদের চোখের সামনেই পথ রোধ করে আছে পাহাড়ের খাড়াই। অতএব তারই পাশ দিয়ে আবার সেই গ্রামের পথই ধরতে হল।

গ্রামে ঢুকেই দেখি বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ের ছোট বড় পাথরের ওপর একটি করে মৃত মানুষের মাথায় খুলি সাজানো। সেগুলো বহুদিনের পুরনো।

ডিকি বল্লল, 'এসব দেখে যেন ভয় পাবেন না বাবুজি।'

উপহাস করে বলল, 'তু কুছ নেহি করপাওগে। তোদের রক্ত দিয়েই আজ আমাদের শূকরকালীর পুজো হবে। সবাইকে বলি দেবো আমরা। তার আগে তোর রক্ত শুষে নেবে দেবীর অনুচররা।' বলেই মুখ দিয়ে বিকট একটা শব্দ বের করল।

অমনি দেখা গেল একটা শিকারি বাজ পাহাড়ের উচ্চস্থান থেকে আকাশপথে উড়ে এসে আমাদের মাথার ওপর ঘুরপাক খেতে লাগল। সেই বুনো দুজনের একজন হঠাৎই আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটিতে। আর তখনই কী যেন একটা থপ করে পড়ল আমার গায়ে। বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা কিছু যেন লেপটে গেল আমার ঘাড়ে।

এতক্ষণ আমি পিস্তল বার করবার এতটুকু সুযোগও পাইনি। এবার সেটাকে বার করেই সেই মরণদূতের পক্ষীটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। এক গুলিতেই শূন্য থেকে মাটিতে পড়ল সেটা।

গুলির শব্দে অন্যান্য বুনোরা খুব ভয় পেয়ে গেল।

সংজ্ঞা তখন ভয়ার্ত চিৎকার করছে 'জোকা! জোকা!' মধু আর তুরা ছুটে এসে আমার ঘাড় থেকে সেই বস্তুটাকে গায়ের জোরে উঠিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে। কিন্তু দিলে কি হবে সেটা প্রায় তিন হাত লাফিয়ে মধুর গায়ে পড়ল। তুরা আর সংজ্ঞা দুজনে মিলে এবার ওর গা থেকে সেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিতেই সেটা আবার ছিটকে এসে পড়ল আমার পায়ে। আমাদের অবস্থা দেখে বুনোরা তখন দারুণ মজা পেয়ে হাতে তালি দিয়ে নাচছে, হাসছে। প্রায় ছ'ইঞ্চি লম্বা সেই পোকার মতো বস্তুটাকে পা থেকে ছাড়াতে হিমশিম খেয়ে গেলাম। অবশেষে ডিকিই সেটাকে ছাড়িয়ে তার গায়ে মশালের আগুন দিতে নিস্তেজ হল সেটা।

আমি ডিকিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কী?'

ডিকি বলল, 'জোকা।'

এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা। এটা আসলে মারাত্মক রকমের একটা পাহাড়ি জোঁক। আর ওই বাজপাখিটা হল মরণের দূত। তান্ত্রিক এতদিন এই কৌশলেই বাজিমাত করছিল। ওই বাজপাখিটা তারই ট্রেনিং মতো মারাত্মক এই সব জোঁক কোনও মানুষের গায়ে অথবা সামনে ফেলে দেয়। তারই প্রভাবে জোঁকটা যাকে সামনে পায় তার শরীরে লেপটে গিয়ে সমস্ত রক্ত শুষে নেয়। এইভাবেই মৃত্যু হয়েছে আমাদের তিন তিনজন লেবারের। তুরার বাবা ও কুন্দনও মরেছে এই রক্তচোষা জোঁকের কবলে পড়ে। মনে হয় জোঁকগুলো এমনই বিষাক্ত যে ওরা যাকে ধরে সে কিছু টেরও পায় না। আর জোঁকটা বেলুনের মতো ফুলে যখন খসে পড়ে দেহ থেকে, মাঠের মাটি অথবা জলের দিকে যায় তখন ওই বাজপাখিটাই সেটাকে তুলে নিয়ে মনোমতো কোন স্থানে বসে তার রক্তপান করে। তালাওয়ের ধারে এমনই একটি জোঁককে আমি দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য! একটি মানুষের সারা শরীরের রক্ত ওই একটা জোঁকের পক্ষে শুষে নেওয়া কি সম্ভব? ব্যাপারটা তাহলে এমনও হতে পারে হয় একাধিক জোঁক ফেলে দেওয়া হয় এই নিধন কার্যের সঙ্গে অথবা দারুণ বিষাক্ত এই জোঁক রক্তপান শুরু করলে শরীরের সমস্ত রক্ত তীব্র বিষক্রিয়ায় আপনা থেকেই জল হয়ে যায়।

আমি যখন এইসব চিন্তাভাবনা করছি ঠিক তখনই একটা বল্লম এসে আমার পায়ের তলায় মাটিতে গিঁথল। কে কোথা থেকে আমার প্রাণ নাশের জন্য ছুড়ল এটা তা বুঝতে পারলাম না। শুধু একটা পৈশাচিক হাসির সঙ্গে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'দেবীজিকা দূতিকে যো মার ডালা উয়ো আদমিকো মরনা হি পড়েগা।'

চমকের ঘোর কাটিয়ে উঠতেই দেখি ভীষণ দর্শন এক নরদানব আমার সামনে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসছে। তার পরনে কালো পোশাক কপালে লাল টিপ্পা। এই তাহলে সেই তান্ত্রিক। যার কুবুদ্ধিতে বুনোরা উঠছে বসছে। এবং এতগুলো প্রাণ রক্তচোষার কবলে পড়ে বিনষ্ট হয়েছে। আমি ক্ষণবিলম্বও না করে তান্ত্রিককে লক্ষ্য করে আমার পিস্তলের গুলি চালালাম।

আবার অট্টহাসিতে ভরে গেল চারদিক। কোথায় তান্ত্রিক? চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল শয়তানটা। নেপথ্য থেকে ওর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। যার অর্থ ওদের বধ্যভূমিতে পাঠিয়ে দাও।

নির্দেশ পাওয়ামাত্রই বুনোরা দারুণ হিংস্র হয়ে ছুটে এল আমাদের দিকে। আমি দ্বিতীয়বার গুলি করার আগেই মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে আমাকে টেনে হিঁচড়ে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। আমি আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখে অন্ধকার দেখলাম।

অনেক পরে যখন চোখে মুখে জলের ঝাপটা পেয়ে একটু প্রকৃতিস্থ হলাম তখন বুঝলাম কোনও স্যাঁতসেঁতে গুহার মধ্যে আমি পড়ে আছি। আমি কি এখানে বন্দি?

মনে হয় না। তাহলে তো হাত পা বাঁধা থাকত। আমি একটু উঠে বসবার চেষ্টা করতেই কে যেন আমাকে ধরে শুইয়ে দিল। তার নরম হাতের পরশে বুঝলাম সে মেয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে?'

'আমি সংজ্ঞা।'

'তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ?'

'না। ডিকি ওদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করে আমাদের দুজনকে নিয়ে এসেছে এখানে।'

'মধু আর তুরা কোথায়?'

'বুনোরা ওদের ধরে নিয়ে গেছে।'

আমি শিউরে উঠলাম সে কথা শুনে। বললাম, 'সেকী! ওই দুর্বৃত্তরা তাহলে তো প্রাণে মারবে ওদের।'

'হ্যাঁ, দুজনকেই বলি দেবে ওরা।'

'ডিকি, ডিকি কোথায়?'

'সে গেছে ওদের সন্ধানে।'

আমি একটু চুপ থেকে বললাম, 'তুমিও কি আঘাত পেয়েছ?'

'জোর আঘাত পেয়েছি। ওরা যখন আবার আপনাকে মারতে যায় আমি তখন রুখে দাঁড়াই। তখনই ওদের লাঠির আঘাত আমার ওপর পড়ে। ঠিক সেই সময় ওদের সামনে একটা বল্লম পড়ে থাকতে দেখে আমি সেটা নিয়ে গিঁথে দিই সেই আক্রমণকারীর পেটে। ততক্ষণে ডিকি লংকাকাণ্ড করে দিয়েছে। ওর হাতের মশালের আগুন বুনোদের দু'একজনের ঘরে শুকনো ঝোপে ঝাড়ে লাগিয়ে দিতেই সবাই যে যার ঘর বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সুযোগেই ও আমাদের নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখে এখানে।'

'কিন্তু মাথায় আঘাত পাওয়ার পরই আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে টেনে হিঁচড়ে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। সে কে?'

'আমিই তো? শয়তান বুনোটা আবার আঘাত করতে এলে আমি বাধা দিতে গিয়ে জখম হই। তখনই বল্লমের খোঁচায় প্রাণান্ত করি ওর।'

আমি বললাম, 'যেখানে বুনোদের সঙ্গে আমাদের বিবাদ হল সে জায়গাটা এখান থেকে কতদূর?'

'বেশিদূর নয়। আমরা ওই জায়গাটারই একটু নীচের দিকে খাদের গায়ে একটা গুহার ভেতরে আছি।'

'এখানে কোনও ঝরনা আছে কি জান?'

'জানি না। গুহার ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে পড়া জল আপনার চোখে মুখে ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাই।'

আমি আর শুয়ে না থেকে ওকে ভর করে উঠে বসলাম। অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গায়ে অনুভব করছি। বললাম, 'তোমার আঘাতটা কোথায়?'

'ঘাড়ে। আপনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন বলেই জ্ঞান হারিয়েছেন।'

'আমি এখন অনেকটা সুস্থ। তোমার আঘাত কীরকম? তুমি কি যেতে পারবে আমার সঙ্গে?'

'পারব বাবুজি। আমি পাহাড়িয়া মেয়ে। কিন্তু আপনি এই অবস্থায় কী করে যাবেন?'

'আমি সামলে নিয়েছি নিজেকে।'

'তাহলে একটু অপেক্ষা করুন। ডিকিকে আসতে দিন। ওকে সঙ্গে না নিয়ে দুজনের যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'ধরো ডিকিও যদি ওদের হাতে বন্দি হয়ে থাকে?'

এই সম্ভাবনার কথাটা বোধ হয় চিন্তা করেনি সংজ্ঞা। বলল, 'তাইতো।'

আমি ওকে অবলম্বন করে গুহার বাইরে এলাম। সারাটা আকাশ নক্ষত্রমালায় ছেয়ে আছে। তারই এক ফাঁকে কাস্তের মতো একটি বাঁকা চাঁদ। গুহা থেকে বেরিয়ে দুজনে বড় বড় পাথরের চাঙড় বেয়ে ওপরে উঠলাম। ততক্ষণে অগ্নিকাণ্ডে এখানকার অনেক শুকনো ঝোপঝাড় ভস্মীভূত হয়েছে। গ্রামের ঘরবাড়িও দু'একটা জ্বলছে তখনও দাউ দাউ করে। আমি সেদিকে মনোনিবেশ না করে আমার টর্চটাকে খুঁজতে লাগলাম। বেশি খুঁজতে হল না। সেই বুনোটা যেখানে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সেখানেই মৃত বাজপাখিটার কাছে পড়েছিল টর্চটা। আমি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সংজ্ঞার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন বলো কী করবে? ডিকির জন্য অপেক্ষা করবে, না মধু তুরাকে ওদের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে আনবে?'

সংজ্ঞা বলল, 'আমার মাথায় কিছু আসছে না। যা আপনি ভাল বুঝবেন তাই করুন। ওরা হয়তো এতক্ষণে মেরেই ফেলেছে ওদের।'

আমি বললাম, 'তাহলে এগিয়ে চলো। ডিকিও যে ওদের খপ্পরে পড়ে গেছে তা বেশ বুঝতে পারছি।'

আমরা আর কোনও বাঁকাচোরা পথে নয় সহজ পথেই এগিয়ে চললাম। বেশিদূর যেতে হল না গুহারমন্দিরের

আলো আমাদের চোখে পড়ল। সেইসঙ্গে শোনা যেতে লাগল বুনোদের পৈশাচিক উল্লাস।

সংজ্ঞা হঠাৎই আমার একটা হাত শক্ত করে ধরল। বলল, 'বাবুজি, এভাবে আর না এগোনোই ভাল।'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কীভাবে এগোব?'

এতক্ষণ ভাল করে তাকিয়ে দেখিইনি ওর দিকে। এবার সেই অন্ধকারে গুহামন্দিরের মশালের আলোর আভায় ওর রাঙা মুখখানি দেখে কেমন যেন হয়ে গেলাম।

সংজ্ঞা বলল, 'কী দেখছেন বাবুজি?'

'তোমাকে। কত সুন্দর তুমি।'

'মধু, তুরা ওরাও তো।'

'তুমি অনবদ্য।'

সংজ্ঞার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল। বলল, 'আপনি তো কাজ শেষ হলেই এখান থেকে চলে যাবেন বাবুজি। আমরা তো কেউ আপনাকে ধরে রাখতে পারব না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমার মনটা তো পড়ে থাকবে এখানে। আজকের এই রাত তো ভোলবার নয়।'

'বাবুজি!'

'তোমাদের আমি কখনও ভুলব না। আবার আসব।'

'তাহলে আমার গা ছুঁয়ে বলুন।'

আমি দু'হাতে ওকে আমার খুব কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'আসব, আসব, আসব।'

এমন সময় হঠাৎই তান্ত্রিকদের মন্ত্রধ্বনি ও ডংকা বেজে ওঠার শব্দ কানে আসতেই সংবিত ফিরে পেলাম আমরা।

সংজ্ঞা বলল, 'তাড়াতাড়ি চলুন। মনে হচ্ছে ওদের খুব বিপদ।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। পা চালিয়ে জোরে চলো।'

এবার আমরা পরস্পরের হাত ছেড়ে অন্ধকারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওপরে উঠতে লাগলাম। একসময় আমরা গুহা মন্দিরের কাছে এসেই দেখি একটি গাছের সঙ্গে ডিকিকে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছে ওরা। ডিকি কেমন ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে বসে আছে। আর শূকরকালীর সেই ভয়ংকরী দেবী মূর্তির সামনে একটি হাড়িকাঠে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মধুর মাথাটা গলিয়ে দিয়ে কাতান হাতে সেই শয়তান বুনোটা তান্ত্রিকের নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

তান্ত্রিক চিৎকার করে মন্ত্র পড়ছে। ওর গলায় করোটির মালা। কী সাংঘাতিক।

তুরাও হাত পা বাঁধা অবস্থায় গড়াগড়ি দিচ্ছে মধুর পাশে। মধুকে বলিদানের পর তুরাকে বলি দেবে ওরা। তারপর ডিকিকেও।

আমি একবার সেই ভয়ংকরী শূকরশালীকে দর্শন করলাম। তারপর উল্লাস দেখলাম বুনোদের। তান্ত্রিক যত মন্ত্র পড়েছে বুনোরা ততই উল্লসিত হয়ে ডংকা পিটছে।

সংজ্ঞা আমার গায়ের কাছে ঘন হয়ে বলল, 'ওদের বাঁচান বাবুজি!'

আমি আর কালবিলম্ব না করে কাতানধারী সেই বুনোটাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিলাম।

পাহাড় ও বনভূমে মরণের ডংকা ছাপিয়েও একটা শব্দ উঠল 'ডিস্যুম।'

বুনোটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সেখানেই। বাকি যারা ছিল তারা দারুণ ভয় পেয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

সংজ্ঞা গেল ডিকির বন্ধন মোচন করতে।

আমি ধেয়ে গেলাম তান্ত্রিকের দিকে। তান্ত্রিক তখন প্রাণভয়ে ঢুকে পড়েছে শূকরকালীর গুহায়। কিন্তু গেলে কি হবে? আমার হাত থেকে ওকে রক্ষা করার মতো কেউই সেখানে নেই। আমি পিস্তল উদ্যত করতেই ও দেবীবেদীকায় আছাড় খেয়ে পড়ল। মশালের আলোয় দেবীমূর্তির যে ভয়ংকরী রূপ দেখলাম তাতে কেঁপে উঠল বুকের ভেতরটা। দেবীবেদীকার নীচে অসংখ্য নরমুণ্ডের করোটি। তান্ত্রিক হঠাৎই সেখান থেকে একটি ধারালো ছোরা বার করে বিদ্যুৎগতিতে ছুড়ে দিল আমার দিকে।

আমি চকিতে বেঁকে না দাঁড়ালে মৃত্যু আমার অনিবার্য ছিল। আমি আর বিলম্ব করা ঠিক নয় ভেবে তান্ত্রিককে টার্গেট করলাম।

তান্ত্রিক ভয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'মাৎ মারো। মুঝে মাৎ মারো বাবুজি।'

আমি বললাম, 'মরতে তোমাকে হবেই শয়তান। তবে গুলিতে নয়। তোমার অস্ত্রেই তোমাকে ঘায়েল করব আমি।'

আমার কথা তান্ত্রিক কী বুঝল কে জানে? সে আরও ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

মশালের আলোয় আলোকিত সেই গুহামন্দিরে আমি তখন অন্য জিনিস খুঁজছি। হঠাৎ সেটা চোখে পড়ল

আমার। তান্ত্রিকের দিকে রিভলভার তাগ করেই সেদিকে এগোলাম আমি।

তান্ত্রিক ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'নেহি বাবুজি, অ্যায়সা মাৎ করো।'

আমি বললাম, 'যে মৃত্যুবাণ তুমি পুষে রেখেছো এতদিন ধরে তাতেই তোমার মরণ হোক এটাই আমি চাই।'

আমার সামনে একটা কাচের জারে রাখা ছিল অজস্র মারণজোকা। সেই জারটা নিয়ে এসে ওর দিকে ছুড়ে দিয়েই বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে।

রক্তমাংসয় ওই নধর শরীর তান্ত্রিককে নাগালে পেয়ে জোকাগুলো ল্যাটা মাছের মতো ছটফটিয়ে রক্ত পিপাসায় তান্ত্রিকের গায়েই লেপটে গেল। হাতে পায়ে কপালে গলায় শুধু জোকা আর জোকা।

আমার কাজ শেষ। সংজ্ঞা ততক্ষণে মুক্ত করেছে ডিকিকে। ডিকি আর সংজ্ঞা মুক্ত করেছে মধু ও তুরাকে।

পৈহারগিরির সেই ভয়ংকর রাতে মুক্তির আনন্দে আমরাই এবার ডংকা বাজিয়ে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলাম। হাড়িকাঠ দুটোর ওপর অনেকগুলো শুকনো কাঠ সাজিয়ে তাইতে আগুন করল ডিকি। সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ধোঁয়ায় গুহার ভেতরটাও ভরে গেল নিমেষে।

ডিকি বলল, 'নাচ তোরা নাচ। আজ সারারাত ধরে এই আগুনকে ঘিরে নাচ দেখা বাবুজিকে। কাল সকাল না হলে নীচে নামছি না কেউ। আমি ততক্ষণে একটা শিকার পাই কিনা দেখে আসি।'

ডিকি চলে গেলে সংজ্ঞা, মধু ও তুরা সেই আগুনকে ঘিরে কী নাচই না নাচল। ওদের সেই নৃত্যে অপটু আমিও যোগ দিলাম।

একটু পরেই একটা হরিণশিশুকে বুকে নিয়ে লাফাতে লাফাতে এল ডিকি। বলল, 'পেয়েছি-পেয়েছি। আজ রাতে এটাই দেবীর প্রসাদ হবে আমাদের।'

নাচ থামিয়ে আমি বললাম, 'তার মানে?'

'হরিণের মাংস খুব সুস্বাদু বাবুজি।'

'আমি জানি। কোন হরিণমায়ের বুক থেকে এই ছোট্ট শিশুটিকে তুমি তুলে নিয়ে এলে ডিকি?'

'বাবুজি! এটা আমাদের শিকার।'

'ওকে ছেড়ে দাও। ওই বুনোটার, ওই তান্ত্রিকের প্রাণ সংহার করেছি বলে এই হরিণশিশুটিকে আমি কিছুতেই বধ্য হতে দেব না।' বলে ডিকির বুক থেকে আমিই হরিণশিশুটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুক্তি দিলাম।

ডিকির পিছু পিছু হরিণীমা'ও এসেছিল বুঝি। তাই সন্তানকে ফিরে পেতেই তীব্র গতিতে উধাও হয়ে গেল সেখান থেকে।

রাত্রি শেষ হতে আগুনও নিভল। মৃত বুনোটাকে ডিকি হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল খাদের দিকে। আমি পায়ে পায়ে গুহামন্দিরের সামনে গিয়ে ভেতরে না ঢুকে বাইরে থেকেই তান্ত্রিকের শোচনীয় অবস্থাটা দেখলাম। রক্তচোষা জোকারা ওর সারা শরীরের সবটুকু রক্ত শুষে নিয়ে বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তিটুকু দিতে পেরে আনন্দিত আমরা সবাই। শুধু কুন্দনের জন্যই যা দুঃখ একটু রয়ে গেল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আমরা অবতরণ শুরু করলাম। প্রথমে ডিকি, ওর পিছনে তুরা। সংজ্ঞা আর আমি মধুর হাত ধরে নামতে লাগলাম। বেচারি মধু, ওর আর নিজের বলতে কেউ রইল না। পৈহারগিরির আতংকও দূর হল।

ছবি : দিলীপ দাস

মজার গল্প

গণেশের মূর্তি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মহাদেববাবু মানুষটি বড় ভালো। দোষের মধ্যে তিনি গরিব। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আর সেইজন্য বাড়িতে তাঁকে যথেষ্ট গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তাঁর স্ত্রী মনে করেন ভালোমানুষীর জন্যই মহাদেববাবু কোনো উন্নতি করতে পারলেন না। একটা দোকানে সামান্য কর্মচারীর কাজ করেন তিনি। সামান্য যা পান তা থেকেও গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করেন। কেউ ধারটার করলে শোধ চাইতে পারেন না। দুষ্টু লোকেরা তাঁকে ঠকানোরও চেষ্টা করে। মহাদেববাবু ভালোই জানেন, এ জীবনে তিনি আর উন্নতি করতে পারবেনও না। তাঁর সেইজন্য তেমন দুঃখও নেই। তবে ছেলেপুলেরা খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট পেলে তাঁর খুব দুঃখ হয়। বেশি পয়সার লোভ তাঁর নেই। তবে আর সামান্য কিছু বেশি টাকা যদি রোজগার করতে পারতেন তাহলেই হতো।

একদিন কাজ-কর্ম সেরে রাত্রিবেলা মহাদেববাবু বাড়ি ফিরছেন। পথে একটা মস্ত বটগাছ পড়ে। এই বটতলায় মাঝে মাঝে এক আধজন সাধু এসে কয়েকদিন ধুনি জ্বালিয়ে থানা গেড়ে বসে। ধর্মভীরু মহাদেববাবু সাধু-সজ্জন দেখলেই সিকিটা আধুলিটা যাই হোক প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে যান।

আজ দেখলেন বটতলায় বিরাট চেহারার এক প্রাচীন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। তাঁর বিশাল জটা আর দাড়ি-গোঁফ। মহাদেববাবু চটি ছেড়ে ভক্তিভরে একখানা সিকি প্রণামী দিয়ে প্রণাম করলেন।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, কী চাস তুই?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না বাবা।

সাধুরা সর্বত্যাগী, তাঁদের কাছে কিছু চাইতে মহাদেববাবুর লজ্জা করে।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, কিছুই চাস না?

না বাবা, আপনার কাছে চাইব? আপনি নিজেই তো সবকিছু ত্যাগ করে এসেছেন।

সাধুর মুখভাব দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। দুই জ্বলজ্বলে চোখে কিছুক্ষণ মহদেববাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ পাশে রাখা একটা ঝোলা থেকে একটা ছোটো গণেশমূর্তি বের করে বললেন, এটা নিয়ে যা।

মহাদেব মূর্তিটা ভক্তিভরে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। পেতলের তৈরি ছোটো সুন্দর একখানা মূর্তি।

সাধু বললেন, মাথার কাছে রেখে রাতে শুবি।

যে আজ্ঞে। কিন্তু বাবা, আমার তো আর পয়সা নেই, এর দাম দেবো কি করে?

কে কার দাম দিতে পারে রে ব্যাটা! দাম দেওয়া কি সোজা! যা, বাড়ি যা।

ভারী যত্ন করে মূর্তিটা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মহাদেব। তাঁর বিছানার কাছে শিয়রে একটা কুলুঙ্গিতে মূর্তিটা রেখে রাতে শুলেন।

ঘুমিয়ে আছেন, হঠাৎ মাঝরাতে টুক করে কি যেন একটা তাঁর পেটের ওপর পড়ল। তিনি চমকে জেগে উঠে জিনিসটা হাতড়ে নিয়ে আলো জ্বেলে দেখলেন, একটা কাঁচা টাকা। তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন। টাকাটা কোত্থেকে এল তা আকাশ-পাতাল ভেবেও বুঝতে পারলেন না।

পরদিন কাজে যাওয়ার সময় তিনি বটতলার সাধুটিকে আর দেখতে পেলেন না। শুধু ধুনির ছাই পড়ে আছে। সাধুজী চলে গেছেন। ইচ্ছে ছিল, আজ একটা টাকা প্রণামী দিয়ে যাবেন, তা আর হল না।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রিবেলা ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমোলেন মহাদেববাবু। আর কী আশ্চর্য! আজও মধ্যরাতে তাঁর পেটের ওপর আগের রাতের মতোই একটা কাঁচা টাকা কোথা থেকে যেন এসে পড়ল। ঘুম ভেঙে মহাদেববাবু অবাক হয়ে বসে রইলেন। এটা কী হচ্ছে? এ কি গণেশঠাকুরের মহিমা? তিনি গণেশমূর্তিকে একটা প্রণাম করে বললেন, ঠাকুর তোমার কত দয়া!

তা রোজই এইভাবে একটা করে টাকা পেতে লাগলেন মহাদেববাবু।

মাসান্তে তাঁর ত্রিশটি টাকা অতিরিক্ত আয় হল। তাতে সংসারেরও সামান্য উন্নতি হল। মহাদেববাবু ত্রিশ টাকা থেকে পাঁচটি টাকা জমিয়ে ফেললেন। টানাটানির সংসারে এতকাল একটি পয়সাও সঞ্চয় হতো না।

গণেশবাবার পয়েই যে এ কাণ্ড ঘটছে তাতে তাঁর আর সন্দেহ রইল না। সাধুবাবা তাঁকে কী আশ্চর্য জিনিসই না দিয়ে গেলেন। কৃতজ্ঞতায় রোজ তাঁর চোখে জল আসে।

বছর ঘুরল। ক্রমে ক্রমে মহাদেববাবুর অভাবের সংসারে একটু করে লক্ষ্মীশ্রীও ফিরছে। অল্প অল্প করে টাকাও জমছে। মহাদেববাবু তাতেই খুশি। তাঁর বেশি লোভ নেই।

মহাদেবের এই সামান্য বৈষয়িক উন্নতিও দু'একজনের চোখে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন হলেন, উল্টোদিকের বাড়ির মদন চৌধুরী। মদন পয়সাওলা লোক, তবে খুব হিসেবী। সবাই জানে তিনি হাড় কেপ্পন।

একদিন মদনবাবু এসে মহাদেবের সঙ্গে আলাপ জমালেন। নানা কথায় ধীরে ধীরে মহাদেবের বৈষয়িক উন্নতির প্রসঙ্গও এল।

মদন জিজ্ঞেস করলেন, তা মহাদেব, তোমার মহাজন কি তোমার বেতন-টেতন বাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

আজ্ঞে না মদনদা।

তাহলে তোমার মুখখানায় যে আজকাল হাসি-খুশি ভাব দেখছি! বউমাও তো তেমন গঞ্জনা দিচ্ছেন না তোমাকে? বলি ব্যাপারখানা কী?

মহাদেব অতি সরল সোজা মানুষ। তিনি অকপটে সরলভাবে গণেশমূর্তির ইতিবৃত্তান্ত সব মদন চৌধুরীকে বলে ফেললেন।

মদন চৌধুরীর চোখ লোভে চকচক করতে লাগল। বললেন, বাপু হে, তুমি তো মস্ত আহাম্মক দেখছি। গণেশবাবার কাছে বেশি করে চেয়ে নাও না কেন? মোটে একখানা করে টাকা—ওতে কী হয়?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, না দাদা, উনি খুশি হয়ে দিচ্ছেন, এই ঢের। তার বেশি আমার দরকার নেই।

মদন চৌধুরী খুব চিন্তিত মুখে উঠে চলে গেলেন।

তিনি-চার দিন পরে মহাদেববাবু একদিন কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে ফুল-জল দিতে গিয়ে দেখেন, কুলুঙ্গিতে গণেশমূর্তিটি নেই। মহাদেববাবুর মাথায় বজ্রাঘাত। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গণেশমূর্তি পাওয়া গেল না। মহাদেববাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন, তাঁর দু'চোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাদেববাবু মনে মনে বললেন, এত সুখ তো আমার কপালে সওয়ার কথা নয়।

ওদিকে মদন চৌধুরীর আহ্লাদ আর ধরে না। মাথার কাছে তাকের ওপর গণেশমূর্তি নিয়ে শুয়ে প্রথম রাত্রেই তিনিও একখানি কাঁচা টাকা পেয়ে গেলেন।

সকালবেলা তিনি গণেশমূর্তিকে প্রণাম করে বললেন,

মহাদেবটা আহাম্মক বাবা। ও তোমার মহিমা কী বুঝবে? ও রোজ একটা করে বাতাসা ভোগ দিত, সেইজন্যই তো দুপুরবেলা চুপি চুপি আমি তোমাকে চুরি করে এনেছি। ও বাড়িতে তোমার যত্ন হচ্ছিল না। তোমাকে রোজ আমি সন্দেশ ভোগ দেবো। টাকাটা দয়া করে পাঁচগুণ করে দাও।

তাই হল। পরের রাতে পর পর পাঁচটি কাঁচা টাকা এসে পড়ল মদন চৌধুরীর পেটের ওপর। তিনি আহ্লাদে ডগোমগো। গণেশ তাঁর কথা শুনেছেন! সকালবেলায় তিনি গণেশকে প্রণাম করে বললেন, তোমার হাত খুলে গেছে বাবা। তাহলে টাকাটা এবার পঞ্চাশগুণ হোক।

তাই হল। মাঝরাতে বৃষ্টির মতো তাঁর পেটের ওপর মোট আড়াইশোটা কাঁচা টাকা পড়ল। তাতে মদন চৌধুরীর পেটে বেশ ব্যথাও লাগল। কিন্তু টাকা পেয়ে আহ্লাদে তাঁর ব্যথার কথা মনেই রইল না। সকালে তিনি গণেশবাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা, দয়াই যদি করলে তাহলে টাকাটা এবার হাজার গুণ করে দাও।

রাত্রিবেলা যা ঘটল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না মদন চৌধুরী। মধ্যরাতে হঠাৎ যখন তাঁর পেটের ওপর টাকা পড়তে শুরু করল তখন তিনি আহ্লাদে উঠে বসলেন। ওপর থেকে টং টং টং টং করে টাকা পড়তে

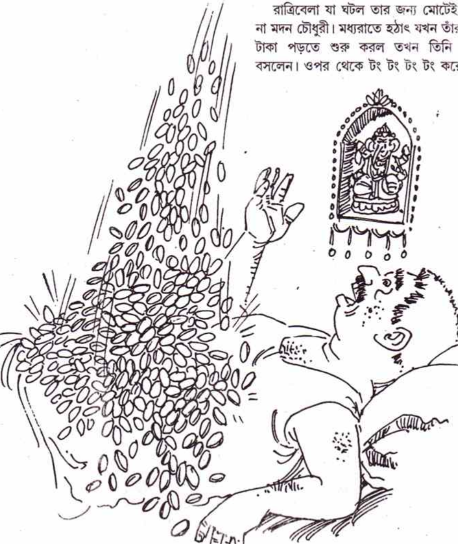

লাগল মাথায়, গায়ে, হাতে, পায়ে। আড়াই লাখ টাকার বৃষ্টি যখন শেষ হল তখন মদন চৌধুরীর মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে, শরীরের নানা জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। টাকার স্তূপে সম্পূর্ণ ঢাকা।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন শরীরে একশো ফোঁড়ার ব্যথা। নড়তে পারছেন না। কিন্তু লোভ বলে কথা। ফের গণেশের মূর্তির দিকে চেয়ে বললেন, বাবা, প্রাণ যায় যাক, টাকাটা দু'হাজার গুণ করে দাও।

তারপর দুরু দুরু বক্ষে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ যেন বজ্রনির্ঘোষের একটা শব্দ হল। তারপর বিশাল জলপ্রপাতের মতো টাকা নেমে আসতে লাগল। আহ্লাদে দু'হাত তুলে চেঁচালেন মদন চৌধুরী। কিন্তু আহ্লাদটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। পঞ্চাশ কোটি টাকার বিপুল ভারে তিনি চাপা পড়ে গেলেন। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার মতো অবস্থা। ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি।

জ্ঞান ফেরার পর যখন হামাগুড়ি দিয়ে টাকার স্তূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর শরীরে আর শক্তি বলে কিছু নেই। মাথা ঘুরছে, জিব বেরিয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। গণেশবাবার মূর্তির দিকে চেয়ে তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আর চাই না বাবা, আমার প্রাণটা রক্ষে কর।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! মাঝরাতে ফের টাকার প্রপাত নেমে আসতেই আতঙ্কিত মদন চৌধুরী বিছানা থেকে নেমে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু কাঁচা টাকাগুলো তাঁর মাথায় আর গায়েই এসে পড়তে লাগল। ঘরখানা টাকায় ভরে গেল। আর এই বিপুল টাকার নীচে আবার চাপা পড়লেন মদন চৌধুরী।

পরদিন সকালে কাজে বেরোনোর আগে মহাদেব চাট্টি মুড়ি খাচ্ছিলেন। কাঁপতে কাঁপতে মদন চৌধুরী এসে তাঁর সামনে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই মহাদেব, আমাকে ক্ষমা করো। এই নাও তোমার গণেশ। আমিই চুরি করেছিলুম লোভে পড়ে তার শাস্তি ভালোমতোই পেয়েছি।

গণেশমূর্তি ফিরে পেয়ে মহাদেবেরও চোখে জল এল।

মদন চৌধুরী চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, বহু টাকা দিয়েছিলেন গণেশবাবা। আজ সকালে কেঁদে কেটে বললাম, বাবা তোমার টাকা ফেরত নাও। ও আমার চাই না। এ ধর্মের টাকা লোভী লোকের জন্য নয়। তা দয়া করে গণেশ সব টাকা ফেরৎ নিয়েছেন আমার ঘরে আর একটাও টাকা নেই। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

মহাদেব গণেশমূর্তিকে আবার কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলেন। গণেশ যেন হাসতে লাগলেন।

ছবি :পিণ্টু মণ্ডল

www.banglabooks.in

ভূতের গল্প

ভাঙা গাড়ির গ্যারাজ

বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

লোকে বলে মন্টার কারখানায় নাকি খোদ বিশ্বকর্মা ঘুরে বেড়ান। নইলে মোটর সারানোর ব্যবসাতে এমন রমরমা হয়। মন্টা অবশ্য এইসব শুনে হাসে। ভগবানে তার বিশ্বাস নেই। তার কারখানায় কোথাও কোনো ঠাকুর দেবতার ছবি নেই। তবে তার কর্মচারীদের দাবিতে বিশ্বকর্মা পুজোটা করতেই হয়। যার মূল আকর্ষণ রাতে গান-বাজনা এবং কবজি ডুবিয়ে খাওয়া-দাওয়া।

ইদানীং একটা নতুন লাইন ধরেছে মন্টা। দুর্ঘটনায় পড়া গাড়ি কেনা। জলের দরে কিনে তারপরে সেটিকে সারিয়ে সুরিয়ে রংটং করে ভালো দামে বেচে দেওয়া। মন্টা যাকে বলে ঝেড়ে দেওয়া।

ভাঙা গাড়ি সারানোর কাজ যেদিন থেকে শুরু হল সেদিনই এক জবরদস্ত মেকানিক পেয়েছিল মন্টা, নাম মোক্তার। লোকটার চেহারা ভারি বদখৎ। কিন্তু সে যখন কালিঝুলি মাখা জামাকাপড় পরে থ্যাঁতলানো গাড়ির নীচে শুয়ে পড়ে কিংবা ওয়েল্ডিং করে অথবা লোহার চাদর কাটে তখন তাকে ঠিক পীরের মতো লাগে। মনে হয় খুব বড় একজন সাধক নিভৃতে তাঁর সাধনা করছেন একাত্ম হয়ে। লোকটা কম কথার মানুষ। মাইনেকড়ির কথা শুনে বলেছিল, যা দেবেন, দেবেন। তবে একটা উপকার করলে ভালো হয়। রাতে গ্যারেজটায় যদি থাকতে দেন, বড় সুবিধে হয়।

আপনার বাড়ি মানে দেশ কোথায়? মন্টা জানতে চেয়েছিল।

মুর্শিদাবাদের চিকনাডাঙা গ্রামে।

ওখানে কেউ আছেন?

হ্যাঁ সবাই আছে। তবে ওদিকে আমি যাই খুব কম।

সেই পরব-মোচ্ছবের সময়। বাকিটুকু সময় কলকাতাই আমার দেশ। আল্লা যেমন মেহেরবান, কলকাতাও তাই। এই না বলে ডান হাত তুলে সে কলকাতাকে আদাব জানায়।

মন্টা ওর গ্যারাজে থাকা নিয়ে আপত্তি করেনি। ইস্টার্ন বাইপাসের কিছু ভিতরে ওর মস্ত কারখানায় রাতে পাহারাদারি করার জন্য দু'জন গার্ড আছে। আর আছে অতি ভয়ঙ্কর চারটে ডোবারম্যান। অচেনা লোক রাতে কোথাও দেখলেই তারা নিঃশব্দে গিয়ে তাদের টুঁটি চেপে ধরবে। কাজেই অঢেল জায়গায় একটা এক্সট্রা লোক থাকলে কীই বা আসে যায়।

তা মোক্তারের পয় আছে বলতে হবে। ও আসার পর থেকেই থ্যাবড়া গাড়ি কারখানায় আসতে লাগল বেশি বেশি করে। মন্টার সামনে গাড়িগুলো যখন আনলোড হয় তখন ওর শরীর শিউরে ওঠে। ও নিজেও মারকাটারি গাড়ি চালায় তাই ভাঙা গাড়ির তোবড়ানো স্টিয়ারিং দেখেই ও বলে দিতে পারে দুর্ঘটনায় পড়া ড্রাইভার মারা গেছে, না বেঁচে গেলেও যেতে পারে। কদিন আগে একটা মারুতি ওমনি এল, যার ছবি মাসখানেক আগে প্রায় সব কটি কাগজেই বেরিয়েছিল। ছয়জনের ফ্যামিলির সবাই শেষ হয়ে গেছিল্ল রেলগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে। সাদা চ্যাপ্টা মারুতিটা যখন মাটিতে নামিয়ে রাখা হচ্ছে তখন সে যেন আর্তনাদ শুনল গাড়িটার, নাকি মানুষের নাকি কানের ভুল।

মোক্তার এল খবর পেয়ে। সব কিছু মন দিয়ে পরীক্ষা করে বলল, খরচা আছে। ইনজিনটা নতুন লাগাতে হবে। তারপর বডি ডেন্টিং। সে যা হোক হয়ে যাবেখন।

মন্টা বলল, মনটা বড় খারাপ হয়ে যায় মোক্তার, এইসব দেখলে, বুঝলে কিনা। ওর গলা বেশ ভারি শোনাল।

মোক্তার তার ঝকঝকে দাঁতে হাসল। বলল, কিছু মনে নেবেন না বাবু, আমি লোকের খারাপ চাই না, এখন কিন্তু এইসব গাড়িই আসবে আরো বেশি করে।

মন্টা চমকে ওঠে কথাটা শুনে, তারপর বলল, তার মানে।

মোক্তার অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, এত গাড়ি বাড়ছে, তার গতি করতে হবে না? বাড়াবাড়ি করলেই মরতে হবে। এ আল্লার বিধান। এখন আবার ন্যানো আসতে শুরু করেছে বাজারে। রাস্তাঘাটের কী অবস্থা হবে তা ভেবে দেখেছেন? মরবে অনেক মানুষ মরবে। অনেক গাড়িরও এন্তেকাল হবে। তখন তো আপনার পোয়া বারো। বলে সে ফের হাসল। তারপর বলল, এ গাড়িটায় হাত দেওয়ার আগে কিছু কাজকর্ম আছে সেগুলো সারতে হবে।

মন্টা কথাটার মানে ঠিক বুঝল না। সে কথা ঘোরানোর জন্য বলল, কাল রোববার। পরশু বন্ধ আছে। যদি চাও দেশে ঘুরে আসতে পার।

মোক্তার খুব গম্ভীরভাবে বলল, এই গ্যারাজের মাটিই এখন আমার দেশ। দুদিন ভেতরে টুকটাক কাজটাজ সারি। একা একা কাজ সারার অনেক সুবিধে।

দুদিন পর মঙ্গলবার। সেদিন সকালে মন্টা গ্যারাজে এসে দেখে চারদিকে থমথমে ভাব। কেউ কথা কইছে না। ওর অফিস ঘরে বসেছিল বাচ্চু। ডগ ট্রেনার কাম কীপার। সে বলল, মন্টাদা একটা ঝামেলা হয়েছে।

কীসের ঝামেলা? চাঁদাফাঁদা চাইছে কেউ? নাকি চুরিচামারি? মন্টা উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

না না, তা নয়। তবে গত পরশু রাত থেকে গ্যারেজে একটা অদ্ভুত উলটোপালটা ব্যাপার হচ্ছে।

উলটোপালটা? মন্টা অজান্তেই অনেকটা চোখ বড় করে বলে উলটোপালটা ব্যাপার কীরকম?

গত দু-রাত কুকুরগুলো ঘর থেকে বেরোয়নি মানে বেরোতে চায়নি।

কেন?

ওরা রবিবার রাতে রোজকার মতো টহলে বেরিয়েছিল। হঠাৎ কারখানার ওই কোণটায় যেখানে ভাঙা মারুতিটা পড়ে আছে, ওখানে গিয়ে ওরা পরিত্রাহি চ্যাঁচাতে থাকে।

বাইরে অমন রোদ ঝলমলে দিন। ঘড়িতে সকাল দশটা বাজে। তবু মন্টা যেন দৃশ্যটা দেখতে পায়। ঝিমধরা অন্ধকারে একটা থ্যাঁতলানো গাড়ি, যাকে ঘিরে চারটে কুকুর ডাকছে।

তারপর? মন্টা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করে।

তারপর আমি ম্যাগলাইট টর্চটা নিয়ে দৌড়ে যাই ওদিকে। এদিক-ওদিক আলো ফেলি দেখি কেউ কোথাও নেই।

তারপর?

ততক্ষণে কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাড়িটার ওপর।

আমিও পৌঁছে গাড়িটার ভেতর আলো ফেলি। দেখি একটা দেহ।

অ্যাঁঃ মন্টার সারা শরীরের সব রোমকূপগুলি বুরুশের দাঁড়ার মতো সোজা হয়ে ওঠে। বলো কী? দেহ? কার?

না না চিন্তার তেমন কিছু নেই। প্রথমে তাই ভেবেছিলাম বটে। পরে দেখি আমাদের মোক্তার। ওই চ্যাপটা গাড়ির মধ্যে ঢুকে সে ঝিমোচ্ছে। ওকে ডাকাডাকি করে তোলার পর, ও বলল, ও নাকি কিছু কাজ করছে। গাড়িতে হাত দেওয়ার আগে এমনটা আপনাকে বলে রেখেছিল? সত্যি?

হ্যাঁ। ওরকম একটা কথা বলেছিল বটে তবে ওটা আবার কী ধরনের কাজ? তা তোমার কুকুরগুলো তারপর কী করল?

ওরা এরপর হঠাৎ ন্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল ওদের ঘরে। এবং ঘরে গিয়েও ওরা থরথর করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল ওরা ভীষণই ভয় পেয়েছে। ওদের ডাকগুলো তখন বদলে গেছে। যেন কান্নার শব্দ। এবং ওদের মুখ থেকে ফেনা বেরচ্ছিল।

কালও তাই হয়েছে?

হ্যাঁ। কাল তো ওরা ঘর থেকে বেরলোই না। সমানে ঘরের গ্রিলের গেটটার সামনে যায়, বাতাস শোঁকাশুঁকি করে তারপর ঘরের ভেতরের দিকে দৌড়ে যায়।

আর মোক্তার?

সে কোথায় ছিল তা আমরা আর খুঁজে দেখিনি। কাল কিন্তু দাদা আমাদের সকলেরই খুব গা ছমছম করছিল।

বেলার দিকে মন্টা তার কারখানার ভেতর ঘুরতে গেল। মোক্তারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একটু পরেই। সে তখন ওই চুরমার মারুতির সামনে ধ্যানস্থ হয়ে কি সব মাপজোক করছে। মুখচোখ ভাবলেশহীন। মন্টা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, আরে মোক্তার কী সব শুনছি তোমার নামে? তুমি নাকি রাতে—

মোক্তার মাথার ওপর দুই হাত আড়ামোড়ার স্টাইলে তুলে বলল, আরে ওদের কথা আর বলবেন না। সব রাম ভীতু। রাতে ঘুম হয় না ভালো। তাই গাড়ির ভেতর ঢুকে দেখছিলাম গাড়ির কন্ডিশনটা কেমন আছে।

তাই বলে অত রাতে। অন্ধকারে?

জী। তাতে অসুবিধে তো তেমন কিছু নেই। তা কাল রাতে এখানে ঢুকে দুটি দ্রব্য লাভ হল। আপনি রেখে দিতে পারেন।

কী?

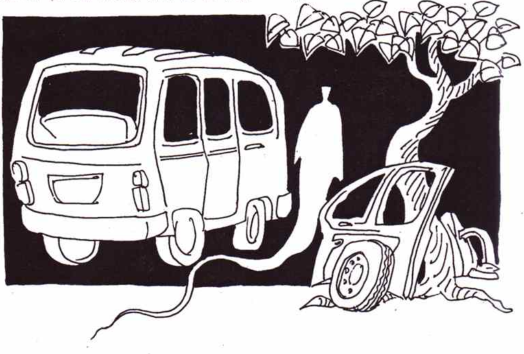

এই দেখুন। এটি সোনার হার। এই না বলে সে একটি বেশ ভারি সোনার হার মন্টার হাতে দিয়ে বলল, এটি নয়না দেবীর ছিল। ওঁর শাদির দিনে ওঁর ডাক্তার স্বামী এটি ওঁকে কিনে দিয়েছিলেন। হারটায় রক্ত লেগেছিল। শুকিয়ে একেবারে পাউডার। তা আমি ঝেড়ে মুছে রেখেছি। জিনিসটা ভালো না?

মন্টা অভ্যাসবশত হারটা হাত পেতে ধরেই বুঝতে পারল এটা ছোঁয়া তার পক্ষে উচিত হয়নি। ওর মনে হল, এইসব জিনিস সংগ্রহ করতেই কি তার রাত জাগার এত উৎসাহ?

আরও একটা জিনিস ছিল স্যর। সেটা আপনাকে দেব কিনা বুঝতে পারছি না। তবে দেওয়াটা অবশ্যই উচিত। কেননা আপনি হলেন সব কিছুর মালিক। এখানে যা কিছু আছে সবকিছুরই জিম্মাদার আপনি। ঠিক কিনা।

জিনিসটা কি তাই বলো না।

এই যে এইটে। এই না বলে সে মাড়ি শুদ্ধ চারটি ওপড়ানো দাঁত দেখাল। বলল, এই দাঁত ডাক্তারবাবুর। নকল দাঁত নয় আসল। অ্যাকসিডেন্টে কেটে যাওয়া। এই দেখুন না মাড়ি শুকিয়ে কালো হয়ে আছে।

মন্টা সভয়ে দু হাত পিছনে নিয়ে বলল, আরে ছি ছি, এ নিয়ে আমি কী করব? ওটা গঙ্গায় ফেলে দিও।

আচ্ছা স্যর। আর হারটা তা হলে রাখছেন?

মন্টা হারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, না, এটা অবশ্যই ফেলে দেবে। দামী জিনিসের ওপর লোভ মন্টু মণ্ডলের নাই।

বাঃ। খুব ভালো হল স্যর। আসলে এই জিনিসটা ওঁরা আগলাচ্ছিলেন কিনা। তা ছাড়া গাড়িটা সারাতে দিতেও ডাক্তারবাবু রাজি নন। কাল স্পষ্ট বলছিলেন, কেন এই গাড়িতে হাত দিচ্ছ মোক্তার। এ গাড়ি তো আমার।

মোক্তার রহস্যময় হাসি হেসে বলে, আসলে এই গাড়ি তো আমিই দেখাশুনো করতাম। আর শুধু এই গাড়িটা কেন? এখানকার চার-চারটে অ্যাকসিডেন্টের গাড়ির মালিকেরা আমার পরিচিত। ওই যে লালা প্রায় আমসত্ত্ব হয়ে যাওয়া গাড়িটা দেখছেন ওর মালিক ছিল রিচা ভালোটিয়া। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোডে একটা টেলর ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা হয়। তখন রিচার গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় একশো কুড়ি কিলোমিটার। ওর বডি বলে কিছু ছিল না। কোদাল দিয়ে চেঁচে ডোম ওর লাশ বের করেছিল। গাড়িটার ভেতরটা দেখবেন নাকি? রিচার খানিকটা এখনো এখানে ওখানে আছে। রিচা নিজেকেই নিজে পাহারা দেয়। আর একটা কথা শুনবেন স্যর? রিচা ম্যাডামও চায় না ওঁর গাড়ি সারানো হোক। ওরা সকলেই নিজেদের চেয়ে নিজেদের গাড়িকে ভালোবাসত বেশি।

মন্টার গলাটা তেতো হয়ে আছে। বাইরের পৃথিবী কি সুন্দর। রোদ ঝলমলে দিন। ঠান্ডা বাতাস বইছে। পেঁপে গাছের ডালে দুটো বুলবুলি বসে নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলছে। শব্দ করে খুব নিচু দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। সবকিছু কী স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ। শুধু মোক্তার যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সেখানে সময়টা থমকে আছে। সে খুব দ্রুত ভাবছিল, এখন সে কী করবে। মোক্তার যা বলছে তার সব সত্যি না-ও হতে পারে। কার কখন কী মতলব হয় কে বলতে পারে? কিন্তু লোকটা আপদমস্তক নির্লোভ এইসব রহস্যময় ঘটনা মন্টাকে খুব ঝামেলায় ফেলে দিল। সে এখন কী করবে? কে তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দেবে? কলকাতা শহরে ২০১০ সালে এইসব ঘটনা ঘটতে পারে? মরা লোকেরা তার গ্যারাজ ইজারা নিয়ে বসে আছে?

মন্টার এক বন্ধু আছে উদয়। ওদের সঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। এখন কলকাতা পুলিশের মেজকর্তা। তা বড় মাপের মানুষের বড় মন সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু উদয় পুরনো সব বন্ধুদের মনে রেখেছে। কারো দরকারে আপ্রাণ করে। ওরাই সঙ্কোচে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না। উদয়ের মোবাইল নাম্বারটা ওয়ান টাচ ডায়ালিং করা থাকে। বলা তো যায় না হঠাৎ কখন দরকার টরকার পড়ে?

ফোনটা ঠিক দুবার বাজতেই ওপার থেকে ভরাট স্বর বলল, বলো ভাই মন্টু কেমন আছ? মন্টু শুকনো গলায় বলল, ভাই একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি। উদয় অমনি আন্তরিকভাবে বলল, আমাকে বলো না কি করতে পারি। সব শুনে ও বলল, মোক্তরের একটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও। আর আমি তোমাকে একটা ইমেজ ইনটেন্সিফায়ার মুভি ক্যামেরা পাঠাচ্ছি ওটা ওই ভাঙা গাড়িগুলোর সামনে গোপনে ঝুলিয়ে রাখ। তারপর দেখছি।

উদয়ের কথামতো সব কাজ হল। তবে আরো চিন্তার ব্যাপারটা ঘটল এই যে মন্টার ছোট্ট ক্যানন কোম্পানির ক্যামেরায় সব ছবি উঠলেও মোক্তারের ছবি অনেক চেষ্টা

করেও পাওয়া গেল না। লোকটাকে তাক করে ছবি লুকিয়ে যা তোলা হয়েছে সেখানে গ্যারেজেরই নানা অংশেরই ছবি উঠেছে কিন্তু মোক্তার স্রেফ ভ্যানিস। ব্যাপারটা সে উদয়কে জানাতে ওর মুখেও গভীর চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

দুদিন পর লালাবাজারের পুলিশের সদর দফতরে গেল সে। উদয় অফিসেই ছিল। ওকে দেখেই সে উত্তেজিত ভাবে বলল, তোমার গ্যারেজের যে ছবি উঠেছে সেগুলো পৃথিবীর সব কটা টিভি চ্যানেল লুফে নেবে, অবশ্য তুমি যদি রাজি থাক।

মন্টা ঢোঁক গিলে বলল, কেন কী ব্যাপার ভাই?

উদয় বলল, তুমি নিজের চোখেই দ্যাখো না। এমন ঘটনার রিপোর্ট বিদেশে একটা ঘটেছিল বটে, তবে কলকাতায় এই প্রথম।

ওরা পাশের ঘরে গিয়ে বসতেই একটা এল. সি. ডি. প্রজেক্টর চালিয়ে দিল একজন। ঠান্ডা অন্ধকার ঘর। মন্টা নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট বোধ করছিল। প্রথমে সাদা পরদায় একটু ঝিলমিলে দাগ তারপর ভেসে উঠল ঘন অন্ধকারে তার কারখানার ছবি। ঠিক যেন প্রেতপুরীর মতো দেখাচ্ছে। সবজে ফ্লুরোসেন্ট হালকা আলোর মধ্যে বোঝা গেল, ডাক্তারের ত্যাবড়া গাড়িটা দাঁড়িয়ে। ছবির মধ্যে নিশুতি রাতের ব্যাপারটা চমৎকার ধরা পড়েছে। ক্যামেরার সামনে দিয়ে একটা বাদুড় উড়ে গেল বেশ পোজ দিয়ে। ক্যামেরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ভাঙা গাড়ির দিকে।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগোতে থাকল গাড়িটার দিকে। লোকটার চেহারাটা হিলহিলে লম্বা। যেন হাড়গোড় নেই। থলথলে জেলি ফিশের মতো অবয়ব অথচ লম্বা মানুষ। সে গাড়িটার কাছে গিয়েই যেন মিলিয়ে গেল কোথাও। মন্টা অস্ফুট গলায় বলল, এই মোক্তার।

উদয় বলল, আমি গেস করছিলাম তাই। তবে ওর নামটা দিয়ে খোঁজ খবর করে যা পাচ্ছি তা কিন্তু বেশ ইনটারেস্টিং। ওই নামে একজন মারা গেছে মাস আষ্টেক আগে। আমাকে ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ডের ও.সি. জানিয়েছেন, মোক্তার নামে একজন খুব নামী মোটর মেকানিক ছিল পার্ক সার্কাসের মুসকান মোটোরসের। ডেন্টিং-এর কাজ খুব ভালো জানত। ভাঙা গাড়িকে নতুন করে তুলতে ওর কোনো জুড়ি ছিল না। একবার একটা গাড়ি সারিয়ে ট্রায়াল দিতে বেরিয়ে রেসকোর্সের সামনে একটা কোকোকোলার ট্রাকের সঙ্গে হেড-অন কলিশনে সব শেষ। এইবার বাকি ছবিগুলো দ্যাখো।

মন্টা তারপর দেখল অনেক কিছুই। এইবার সে বুঝল কেন মোক্তারের ছবি তার ক্যামেরায় ওঠেনি। তবে পুলিশের ক্যামেরায় তোলা চলমান ছবি দেখে দিব্যি বোঝা যাচ্ছিল, মোক্তার ঠিক তারই মতো হিলহিলে চেহারার কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে যদিও তার কোনো শব্দ নেই। একটি মহিলা অবয়ব ঠিক যেন বাতাসে সাঁতরে মোক্তারকে নিয়ে গেল পাশে রাখা গাড়িটির সামনে। মন্টা বুঝল, এই রিচা। খুব উত্তেজিত হয়ে সে কি সব বলছিল আর মোক্তার হাত কচলাচ্ছিল। মন্টা ভাবল, এই তাহলে তার কথায়, 'কিছু কাজ' ও কি তাহলে অশরীরিদের এজেন্ট? মোক্তার নিজেও কি তাহলে প্রেতলোকের বাসিন্দা? কিন্তু তাহলে দিনের বেলায় ওকে দ্যাখা যেত কী করে? এইসব ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে গেল। মন্টার শরীর কাঁপছিল। সে উদয়কে বলল, এইবার এসব বন্ধ করো আমি আর দেখতে পারছি না। আমাকে একটা ফোন করতে হবে গ্যারাজে এক্ষুনি। এই বলে সে মোবাইল ফোনে তার ম্যানেজার খোকাকে ধরল। তারপর তাকে বলল, খোকা, মোক্তারকে দ্যাখ তো। কোথায় আছে?

মোক্তার। সে আবার কে? খোকার গলা শুনে স্পষ্ট বোঝা গেল সে ভারী অবাক হয়েছে।

আরে ন্যাকামি করছিস নাকি? আমাদের নতুন মেকানিক। এই কদিন অ্যাকসিডেন্টের গাড়িগুলো নিয়ে যে কাজ করছিল।

খোকা সেই কথা শুনে বলল, কিন্তু দাদা আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না, কে এই মোক্তার?

মন্টা ভয়ানক অবাক হয়েছে। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, হাজিরা খাতাটা দ্যাখ আমি নিজের হাতে ওর নাম লিখেছিলাম ওই খাতায়।

একটু পরেই উত্তর এল দাদা আমাদের খাতায় ওই রকম কোনো নামই নেই।

বেশ তুই তাহলে আমাদের ডগ ট্রেনারকে ডাক।

ও তো আমার সামনেই বসে আছে। এই নাও কথা বলো।

কিন্তু কথা বলে লাভ হল না কিছুই। সে-ও মোক্তারের

নাম শুনে অবাক। বলল, দাদা এমন নাম বাপের জন্মে শুনিনি। মোক্তার আবার নাম হয় নাকি। মোক্তার তো আদালতে থাকে।

ফোনটা কেটে দেয় মন্টা। তারপর উদয়কে বলে, কেসটা খুব সন্দেহজনক রে। মোক্তার নামে কেউ নাকি আমার কারখানায় কেউ ছিলই না। হ্যাঁ ভাই এরকম হয়?

উদয় কোনো উত্তর দিতে পারল না। তবে তাকে দেখে বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল তার পুলিশের চাকরিতে এরকম অভিজ্ঞতা সচরাচর কারোর হয় না। বন্ধুর মুখ দেখে তার বিলক্ষণ চিন্তা হচ্ছিল। সে বলল, সঙ্গে লোক দিচ্ছি। তোমাকে ছেড়ে আসবে। মন্টা মাথা নেড়ে বলল, না। তার দরকার নেই। আমার গাড়ি আছে।

তুমি তা হলে এখুনি যাবে, চেয়ার ছেড়ে উঠে উদয় জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ এক্ষুনি গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

বাইপাশে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল মন্টা। সে এত জোরে গাড়ি চালায় না। কিন্তু আজ তার মাথা কাজ করছে না। সে ভগবান কিংবা ভূত মানে না অথচ তারই গ্যারাজে এইসব ঘটছে? গাড়ি চলছিল সোজা পথে। হঠাৎ তার সামনে চলে এল লাল রঙের একটা বোতল ভর্তি শরবতের গাড়ি। ভয়ঙ্কর ধাতব শব্দ হল একটা। তারপর অনেকগুলো বোতল ভাঙার রিনরিনে শব্দ। মন্টা দেখল শরবতের গাড়ির আড়াল থেকে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বেরোচ্ছে মোক্তার। মন্টার খুব কাছে এসে সে বলল, স্যর আপনাকে বলেছিলাম না অ্যাকসিডেন্টের সংখ্যা আরও বাড়বে?

মন্টা স্পষ্ট দেখল, তার বডিটা ঠিক টিকটিকির মতো চ্যাপটা হয়ে লেপ্টে আছে তোবড়ানো স্টিয়ারিঙে। চারদিকে প্রচুর রক্ত লোকজন, কিন্তু তার কোনও কষ্ট নেই। সে মোক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিল হাত। তারপর বলল, ভালোই তো। আমরা ফের একসঙ্গে কাজ করব।

মোক্তার বলল, ইনসালা।

ছবি : সুব্রত মাজী

পরিবেশ বিজ্ঞানের গল্প

জানা পৃথিবীর অজানা দেশ

চুনীলাল রায়

ঘেনুদার হাত ধরেই আসা। জায়গাটা আমার কাছে নতুন। মেসে আজ অন্য বন্ধুরা নেই বলেই বের হবার সুযোগ হ'ল। কিন্তু ঘেনুদার সঙ্গে যে জয়নালদাদা নাসরিমা বউদি আর তাদের ছেলে মেয়ে ডালি আর হাসানের পরিচয় যাতায়াত যে অনেকদিনের সে খবর আমার জানা ছিল না।

ঘেনুদার সঙ্গে আমার মতো অজানা অচেনা অপরিচিত একজনকে দেখে ওঁরা প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু ঘেনুদাকে দেখে জয়নালদা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। মৃদু হেসে বললেন, আসবার সময় হল তাহ'লে? কিন্তু বোসো। থাকো। আজ আর যেতে পাবে না।

শেষে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকেও কিন্তু একই কথা বলছি। আপনার অসুবিধা হবে নাতো?

আমি তো ওঁর কথা শুনে খুব মজা পেলাম। অদ্ভুত লোক! আমি কিছু ভাবতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললাম, না না। অসুবিধার কি আছে? কাল রোববার। তাছাড়া নতুন জায়গা। এখানকার মানুষজন প্রকৃতি পরিবেশ সব দেখব। জানব। চিনব।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জয়নালদা বললেন, আপনার কথা শুনে খুব আনন্দ পেলাম। আসলে আমার বন্ধু আসাতে একটু স্বস্তি পেয়েছি। আসলে গত একমাস ধরে আমরা এখানে খুব আতঙ্কে আছি। কথা নেই বার্তা নেই এগাঁয়ের লোক ঘুম থেকে উঠে দেখে তাদের উঠোনে। লাউমাচায়। ক্ষেতের এখানে সেখানে মুরগীর বাচ্চা গিরিগিটি ছুঁচো ইঁদুর। এমন সব ছোটখাটো প্রাণীর মাংস কারা যেন খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলে রেখেছে। কেবা কারা যে এসব করছে তার কোনও হদিশ আজ অবধি কেউ করে উঠতে পারেনি।

ঘেনুদা তখন চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখেছেন। আমি তখনও লুচি আর বেগুনভাজা খেতে ব্যস্ত।

ঘেনুদা হাত তুলে হাসান-কে ডাকলেন। বললেন, এই যে সাহেব। তুমি ভূগোল পড়েছো? কোন্ কোন্ প্রাণী কোথায় থাকে কোথায় থাকতে পারে? জানা আছে কিছু?

ঘেনুদার কথা শুনে হাসান মাথা চুলকায় একটু। তারপর বলে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ। সব বইয়ে আছে। খুব ভালো বই। স্যারেরাও বলেছেন। জ্যোতির্ময় সেনের লেখা। আনব? দেখাবো?

ডালি কথা বলে এবার, যা না। কথা বলার কি আছে? হ্যাঁ আমি সেই ফাঁকে একটা জিনিস পড়ে শোনাব। কাগজে বের হয়েছিল।

কথা বলতে বলতে ডালি কাগজপত্তর ঘেঁটে একটা চিরকুট বের করে। আমি মুখ তুলে চেয়ে দেখি জয়নালদা আর নাসরিমা বউদি কখন এসে ড্রয়িংরুমের সোফায় এসে বসেছেন। এবার ডালি গড়গড় করে পড়তে থাকে। অলোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, বর্তমান প্রসঙ্গে পরিস্থিতি বলতে দুটি মাত্র বোঝায়—একটি হল নির্দিষ্টকালের মঞ্চে বিবিধ প্রাকৃতিক পরিবেশগত পার্থক্য বা সিনক্রোনি। অন্যটি কালপ্রবাহে পরিবর্তনজনিত বৈশিষ্ট্য। ডায়াক্রোনি।

পড়তে পড়তে ডালি একটু থামে। আবারও পড়া শুরু করে, প্রথমে দেখি পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য। এশিয়া মহাদেশের উত্তর মধ্য ও দক্ষিণে এবং সুমাত্রা ও জাভার মতো দ্বীপের যে সব জায়গায় বাঘ থাকে সেগুলি পাতাঝরা বন (নাতিশীতোষ্ণ ও উষ্ণ মণ্ডলীর আর্দ্র ও শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য বা ডেসিডুয়ার্স বনাঞ্চল) অথবা নদীমোহনায় লবণাক্ত জলাভূমির অরণ্য (ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চাল)। সেখানে পরিবেশগত কারণে বাঘ অতি ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন প্রাণী।

ডালি পড়ছিল। আমি তাকিয়ে দেখি হাসান বই হাতে দাঁড়িয়ে। তার কখন সুযোগ আসবে সে জন্যে বিড়বিড় করে কীসব যেন বলছে। আর ঘেনুদা? তাঁর চোখ বোজা।

ডালির কথা শোনা যায় আবার। দ্বিতীয়ত, তৃণভূমির প্রাণীদের মধ্যে আত্মরক্ষার তাগিদে খাদ্যসংগ্রহকারী ও শিকারির থেকে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষায়, আচরণগত বৈশিষ্ট্য বংশগতির ধারায় লক্ষ কোটি বছরে ক্রমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আচরণ বৃত্তির এইরকম অভিযোজন শুধু উদ্ভিদভোজী ও তৃণভোজী অ্যান্টিলোপ নয়, সিংহের মতো মাংসাশীর ক্ষেত্রেও সত্য। কালপ্রবাহে ক্রমবিবর্তনের প্রভাব ও পরিবেশের কথা এভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখলে বাঘের তুলনায় সিংহের সাহসিকতা কম বলা উচিত হবে না।

ডালি পড়তে পড়তে মুখ তোলে এবার। হাত নেড়ে নেড়ে বলে, ব্যাস। আর একটু। হলেই আমার শেষ। তখন ভাই পড়বে।

ডালির পড়া আবারও শোনা যায়, সাভানা তৃণভূমির মধ্যে নিরক্ষীয় সূর্যের অগ্নিশিখাতে জর্জরিত ছায়াশূন্য অঞ্চলে হলদেটে সবুজ ঘাসের জমিতে কেশরী সিংহের এবং সুন্দরবনের গাছ ও ঝোপ ঝাড়ের আলো আঁধারিতে ডোরাদার বাঘের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের-ভিন্ন স্বাদের।

ডালির পড়া শেষ হয়। ঘেনুদার গলা শোনা যায়। প্রকৃতি পরিবেশ। মানুষ জীবজগৎ। সবাই রয়েছে জড়াজড়ি করে। কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু নদীর বন্যায় গাঁ ভেসে গেলে বাড়ি ডুবে গেলে। মানুষ আর তার পোষা জীবজন্তু নতুন জায়গায় চলে যায়। বাড়ি তৈরি করে। নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করে। নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয় সবাই। এসব কথা মনে রাখা ভালো। মনে রাখা দরকার। কই হে হাসান সাহেব। তোমার বই থেকে পড়ে শোনাও এবার।

ঘেনুদার কথা শুনে হাসান সাহেব এবার কেন জানি না বেশ গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর খুব তাড়াতাড়ি হাতে রাখা বইয়ের পাতা ওলটাতে থাকে। বেশ ভারি গলায় পড়তে থাকে, নিরক্ষরেখা থেকে যতই উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায় উত্তাপের পরিমাণ ততই কমতে থাকে।

উত্তাপের পার্থক্য পৃথিবীতে কয়েকটি তাপমণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। তাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের প্রকৃতিরও পার্থক্য ঘটে। যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলে চিরহরিৎ অরণ্য, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তৃণ, ক্রান্তীয় মরু অঞ্চলে কাঁটা জাতীয় গাছ, মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষ এবং মেরু অঞ্চলে মস্, শৈবাল ইত্যাদি জন্মায়।

পড়তে পড়তেই হাসান পাতা ওলটায়। অরণ্যের শ্রেণিবিভাগ করতে গেলে প্রথমেই মনে হয় বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকারের গাছপালা কেন দেখা যায়? এই বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, উত্তাপ ও মাটির পার্থক্য। ভূমির উচ্চতা, উষ্ণতা, পাহাড়ের অবস্থান, সমুদ্রের দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহ, অক্ষাংশ প্রভৃতি কারণে এই পার্থক্যগুলো ঘটে থাকে।

হাসান পড়ছিল। জয়নালদা ঘেনুদা আর আমি শুনছিলাম। নাসরিমা বউদি তখন ভেতরের ঘরে গেলেন।

হাসান ধীরে ধীরে পড়ছিল। প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে জলবায়ু প্রধান। অবস্থানগত কারণ ছাড়াও ভূপ্রকৃতি ও জলভাগ কোন অঞ্চলের জলবায়ুকে প্রভাবান্বিত করে। আবার জলবায়ুও পরোক্ষভাবে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ুর ওপর কোন স্থানের মাটির গুণাগুণ নির্ভর করে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলে ল্যাটেরাইট মাটি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে, আবার খুব শুষ্ক মরু অঞ্চলের মাটি বালুকাময়। রাশিয়ার উষ্ণ জলবায়ু আংশিকভাবে কৃষ্ণমৃত্তিকা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

তবে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম। জলবায়ুর পার্থক্যের জন্যই নিরক্ষীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা খাদ্য সংগ্রাহক, মরু অঞ্চলের লোকেরা পশুপালক যাযাবর, আবার মৌসুমী অঞ্চলের বাসিন্দারা কৃষিজীবী। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ওপর জলবায়ুর প্রভাব খুব বেশি। এই জন্যে উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে ধান ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে গম চাষ ভালো হয়। অন্যদিকে মরু অঞ্চলে কাঁটাজাতীয় গাছ, মেরু অঞ্চলে শৈবাল ও গুল্ম, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে পাইন, ফার, বার্চ, উইলো গাছ আর নিরক্ষীয় জলবায়ুতে রোজউড্, মেহগনি গাছ জন্মায়। তুন্দ্রা অঞ্চলে সাদা ভাল্লুক, বন্য হরিণ, সিন্ধু ঘোটক, তৃণভূমি অঞ্চলে বাঘ-সিংহ-হরিণ দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া মানুষের বাসস্থান, পোশাকও জলবায়ু নির্ভর। জলবায়ু মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের একঘেয়ে জলবায়ু সেখানকার মানুষদের বৈচিত্র্যহীন ও নিরানন্দময় করে তুলেছে। অপরদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় বা মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে ঋতুপরিবর্তন বা ঘূর্ণিঝড় মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য আনে ও অধিবাসীদের নিত্য নতুন কাজে উৎসাহিত করে।

অনেকক্ষণ ধরে হাসান পড়ছিল। এবার সে থামে। মনে হল তার গলাটা যেন শুকিয়ে গেছে। সে ঢোক গিলে বলে, পানি। দিদি পানি।

ডালি এবার জলের বোতলটা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। হাসান জল খায়। সবার দিকে তাকায়। ঘেনুদা বলেন, গুড। চালিয়ে যাও।

হাসানের মুখে হাসি দেখা দেয়। সে হাসিমুখে আবার পড়া শুরু করে। নিরক্ষীয় অঞ্চল হল ঘন জঙ্গলে ঢাকা বর্বর লোকদের বাস—এমন এক জলবায়ুর দেশ যেখানে প্রকৃতির দরাজ হাতের ছোঁয়ায় প্রতিটি জিনিস সহজেই পাওয়া যায়। সত্যি বলতে কি এখানকার অধিকাংশ লোক অরণ্যচারী, উদ্ভিদ বলতে বড়ো বড়ো গাছ, জলবায়ু একঘেয়ে। প্রচুর উত্তাপ, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা এখানে উদ্ভিদ জন্মাবার পক্ষে আদর্শ এলাকা। এখানে বহু ধরনের উদ্ভিদ জন্মায় যে তাদের সহজে আলাদা করা কষ্টকর।

হাসান বই থেকে একনাগাড়ে পড়ে চলছিল। মনে হল সে যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হাসান একটু থেমেছিল এমন সময় অন্য এক কিশোরের গলা শুনে আমি সে দিকে মুখ ঘোরালাম। সে বলল, দাদা আমায় দে। আমি পড়ি।

জয়নালদা বলেন, হাসান। দে আনিসকে দে।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে জয়নালদা বলেন, এ হল আনিসউর রহমান। আর ওটা ওর বড়ো ভাই সামসুর রহমান। আমার ছোটভাই ফৈজু। তার আর আমিনার ছেলে।

জয়নালের কথা শেষ হতে ওরা দুভাই হাত তুলে আমাদের সালাম জানায়।

এবার আনিস দেখে নেয় কি কি পড়তে হবে। আর বেশ জোরে জোরে পড়তে থাকে। প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে স্থানীয় জীবজন্তু উল্লেখের দাবী রাখে। সমগ্র অঞ্চলে বহু ধরনের পোকামাকড়, গাছে বসবাসকারী অসংখ্য জন্তু তৃণভোজী, মাংসাশী প্রাণী ও প্রচুর জলচর

প্রাণী রয়েছে। প্রাণিজগতের এইটুকু সাদৃশ্য প্রায় সবখানেই দেখা যায়। এছাড়া প্রতিটি অঞ্চলে নিজস্ব বিশেষ প্রজাতি আছে।

পড়তে পড়তে আনিসের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে যে দাদার মতোই সুন্দর করে পড়তে পারছে একী কম গর্বের কথা?

আনিসের কথা শোনা যায়, বহুসংখ্যক উজ্জ্বল প্রজাপতি থেকে অসংখ্য ঘুণপোকা, মশা, মাকড়সা, ভয়ঙ্কর শুঁড়ওয়ালা পিঁপড়ে, গরুর উকুন ও ডাঁশ পর্যন্ত দেখা যায়। এদের কোনটা হুল ফোটায়, কোনটা রক্ত চোষে, কোনটা রোগ বহন করে। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু পতঙ্গ জন্মাবার অনুকূল অবস্থা। কুয়াশা হয় না বলে তাদের জীবনচক্রে কোন বাধা ঘটে না। এখানে মৌমাছির মত হামিখিং পাখি থেকে শুরু করে তোতাপাখি রঙ-এর ছদ্মবেশধারি পাখি ও সরীসৃপের মধ্যে মারাত্মক বিষধর সাপ আছে। যেসব বনে ফল, সুপারি, রস, ছাল, পাতা পাওয়া যায় সেখানে বাঁদর, স্লথ, বাদুড় ও অন্যান্য জন্তু থাকে। আফ্রিকার গোরিলা ও অকাপি উল্লেখযোগ্য প্রাণী। নদীতে মাছ ও জলহস্তী প্রচুর আছে। প্রায়ই দেখা যায় কুমীর নদী-তীরে ঘুমোচ্ছে। হিপ্পোপোটামাস কেবলমাত্র আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের নদীর শান্ত জলে দেখা যায়।

আনিস মাথা নাড়িয়ে খুব উৎসাহে পড়ে চলেছিল। মরু অঞ্চলে জন্তু-জানোয়ার কম দেখা যায়। মরুভূমির শুষ্ক পরিবেশে খুব অল্প খাদ্য ও জল খেয়ে বেঁচে থাকবে এমন জন্তুই সেখানে দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশিরই জলের একমাত্র উৎস। শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য মরুভূমির জন্তু-জানোয়ারদের রঙ ধূসর বা লাল হয়। বেশির ভাগ প্রাণীই ছোট। মরু শৃগাল ও এক ধরনের কৃষ্ণসার মৃগ সাধারণত সাহারাতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। গর্তে বাস করা ও দৌড় ঝাঁপ করা প্রাণী সচরাচর মরুভূমিতে দেখা যায়। কয়েক ধরনের পাখিও দেখা যায়। কেবলমাত্র মরূদ্যান ছাড়া আর কোথাও

সরীসৃপ দেখা যায় না। উটই একমাত্র মরুভূমির পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সবচেয়ে বেশি খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

আনিস পড়তে পড়তে পাতা ওলটায়। রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চল মোটা লেজওয়ালা কিরঘিজ ও কারাকুল ভেড়ার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু শীতপ্রধান উত্তরদিকের অসমতল ওখরা এলাকা ভেড়া চাষের পক্ষে উপযুক্ত। ভেড়া গরুর চেয়ে খাড়া ঢালে চলাফেরা করতে পারে। এরা ঘাস ছাড়াও গুল্ম ও কম জল খেয়ে বাঁচতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের টেকসাস্-এডোয়ার্ড মালভূমিতে অন্যান্য পশুর চেয়ে অ্যাঙ্গোরা ছাগল বেশি পোষা হয়।

আমি নজর করলাম আনিস একদমে সবটা পড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। তার গলা শোনা যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের দুটি উপ-বিভাগ রয়েছে। যথা তুন্দ্রা ও চিরতুষার দেশ। তুন্দ্রা উদ্ভিদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা বেঁটে ধরনের। এই বেঁটে গাছগুলো মাটির ভেতরে অনেকদূর পর্যন্ত শেকড় চালিয়ে দেয় যাতে শীতের হাত থেকে তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। মেরু অঞ্চলে উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা কম। প্রাণিজগতেও একই প্রকার বৈপরীত্য দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে সব প্রাণীর রক্ত গরম তারা খুব কম তাপমাত্রায় টিকে থাকে। তাই দেখা গেছে তাপমাত্রা শূন্যের অনেকটা নীচে নেমে যাওয়া সত্ত্বেও মেরু ভাল্লুকরা বরফের ওপর অনায়াসেই শুয়ে থাকতে পারে। কোনো কোনো প্রাণীর দেহে প্রায় তিন সেন্টিমিটারের মতো পুরু চর্বি ও তৈলাক্ত লোম। এ ধরনের লোম থেকে অতিরিক্ত সূর্যরশ্মি সহজে প্রতিফলিত হয়। শরীরের ত্বকে উত্তাপের স্পর্শ কম লাগে। অতিরিক্ত শীত ও গরমের হাত থেকে পাখিদের রক্ষা করে তাদের পালক।

আনিস পড়া শেষ করে। বই বন্ধ করে হাসানের হাতে তুলে দেয়।

ঘেনুদা বলে ওঠেন ভেরি গুড। ভেরি গুড। ব্যাস এবার তো আমরা সবাই জানা পৃথিবীর কিছু কথা জানলাম। বুঝলাম যে পৃথিবীর যেখানে যেমন ভূপ্রকৃতি তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে গাছপালা জীবজন্তু আর মানুষ বেঁচে রয়েছে। টিকে থাকছে হাজার হাজার বছর ধরে। কিন্তু এখন এক বড়ো অসুবিধা এসে হাজির হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বদলে যাচ্ছে। বায়ু দূষণ। প্রকৃতিও দূষণের শিকার হয়ে পড়েছে। তাই মঙ্গলগ্রহে মানুষ নতুন করে সভ্যতা গড়ে তুলতে চাইছে। কিন্তু অন্যরা যাবে কোথায়? আমার এক ভাই ইমন। ইমন চক্রবর্তী জানিয়েছে গত শতকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে মাত্র শূন্য পয়েন্ট ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। অথচ প্রাণিজগতে ইতিমধ্যেই এর প্রভাবে বিপুল আলোড়ন জেগেছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় কানাডার রেড ফক্স প্রজাতির সদস্যরা ক্রমশ উত্তরে সরতে সরতে নশো কিলোমিটার দূরে বাফিন দ্বীপে এসে পৌঁছেছে যা কিনা আদতে আর্কটিক ফক্সদের বাসভূমি। কিন্তু এই আর্কটিক ফক্স বা উচ্চতর অক্ষাংশের অন্যান্য প্রাণী, বিশেষতঃ মেরু অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে, শীতলতর 'আরও উত্তর' বলে আর কিছু নেই। অথচ নিম্নতর অক্ষাংশ থেকে আসা প্রাণীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হচ্ছে তাদের বাসভূমি, জীবনধারণের অন্যান্য রসদ।

ঘেনুদা ধীরে ধীরে অনেকটা কথা বলে একটু থামলেন। আর সেই ফাঁকে আমিনা বেগম এসে ওঁর হাতে ধরিয়ে দিলেন এককাপ গরম কফি। আর নাসরিমা বৌদি আনলেন লুচি আর বেগুনভাজা। মুখে বললেন, দাদা রাতে কিন্তু আপনার পছন্দের চিকেন বিরিয়ানি করছি। ঈশার পর দেব।

লুচি বেগুনভাজা আর কফি খেতে আমাদেরও একটু সময় লাগল। ঘেনুদা আবারও শুরু করলেন। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে প্ল্যাঙ্কটনের সংখ্যা দ্রুত কমছে। আন্টার্কটিকায় এমন বহু সামুদ্রিক প্রাণী ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে যারা এখানকার পেঙ্গুইনের মুখ্য খাদ্য। ফলে নানা প্রজাতির পেঙ্গুইনের সংখ্যা কমছে। সুমেরু অঞ্চলের সমগ্র বাস্তুতন্ত্রই আজ বিপন্ন। বরফগলা জল সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উপকূলবর্তী ও দ্বীপীয় অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র। সুন্দরবন অঞ্চলে লবণাক্ত জলের পরিমাণ বাড়ছে, মুখ্য বৃষ্টিপাত ঘটছে মৌসুমি বাতাস চলে যাওয়ার পরে। এর ফলে যে সার্বিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তাতে সেখানকার বাঘ ও বার্কিং ডিয়ার-এর মতো অনেক প্রাণী আজ অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি। উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রাকৃতিক কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের অবদান। ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধি তথা জলবায়ুর পরিবর্তনের ধারা এখন এতটাই দ্রুত যে, তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না প্রাণীদের অভিযোজন শক্তি। অরণ্য ছেদন, ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ, বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের

আধিক্য—এই প্রতিটি ঘটনার পিছনে আছে মানুষের ক্রিয়াকলাপ।

কথা বলতে বলতে ঘেনুদা থেমে গেলেন। ঘরে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। আমি জয়নালদার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম তিনিও কিছু বুঝতে না পেরে ঘাড় নাড়ছেন।

আমার খুব অস্বস্তি লাগল। কিন্তু ভাগ্য ভালো বলতে হয়। ঘেনুদা মুখ খুললেন, বড় বউমা। তোমাকে যে একটা খাতা করতে বলেছিলাম। করেছো?

ঘেনুদার কথা শুনে নারসিমা বউদি ঘরের ভেতরে গেলেন। আর খুব তাড়াতাড়ি এক মোটাসোটা বাঁধানো খাতা এনে ঘেনুদার হাতে দিলেন। বললেন, দাদা। এই নিন আপনার আদেশে করা সেই খাতা। ওরা বাঁচতে চায়।

ঘেনুদা খাতাটা হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখলেন। ওঁর মুখে এক পরিতৃপ্তির হাসি। বললেন, বাঃ। বেশ হয়েছে।

এবার খাতা বন্ধ করে তিনি কথা শুরু করলেন। এই বইয়ে রয়েছে সারা দুনিয়ার এমন কিছু সত্যি ঘটনা। এমন কিছু তথ্য যা থেকে জানা যাবে যে দীন দুনিয়ার মালিক কিছুতেই চান না তাঁর সৃষ্টি এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক। তিনি পৃথিবীর সবাইকেই ভালোবাসেন। যে বাঁচতে চায়। যে সৃষ্টিকর্তাকে পুজো করে তাকে তিনি মরতে দেবেন কেন? যে নিজেকে ভালোবাসে সে তো অন্যকেও ভালোবাসবে। অন্যকেও বাঁচতে দেবে। বাঁচতে সাহায্য করবে। তাই এই বইতে রয়েছে এমন কিছু অবাক করা ঘটনা যা শুনলে সবাই শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াবে সেই মালিকের দয়ার কাছে।

ঘেনুদা কথা শেষ করলেন। হাত ইশারায় ফৈজু-কে কাছে ডাকলেন। খাতাটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন, তুমি ধীরে ধীরে পড়ে শোনাও। জয়নাল সেই ফাঁকে মগরিব-এর নামাজটা সেরে নিক।

ফৈজু খাতাটা খোলে। সবাই-কে দেখায়। আমি অবাক হয়ে দেখি পাতায় পাতায় পত্রিকা আর খবরের কাগজের কাটিং লাগানো। পাশে নোটস্।

ফৈজু পড়তে থাকে। ২০০৯ সনে আফ্রিকার গ্যবন দেশে নতুন এক পাখি আবিষ্কার করেছেন স্মিথ সেনিয়ান ইনসটিটিউশন। জলপাই রঙের এই পাখি চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। ওজন গড়ে আঠারো গ্রাম মাত্র। চোখের কাছে সাদা ছোট-ছোট দাগ রয়েছে। এই পাখি খুবই সুন্দর এবং শৌখিন। গাছের ডালে যখন চুপটি করে বসে থাকে মনে হয় যেন রঙিন পাপড়ি মেলে ফুল ফুটে আছে। এখানে বলা দরকার যে ভারতের এবং বিশ্বের অন্যতম পাখি বিশারদ ডক্টর সালিম আলী প্রচুর সংখ্যক পাখি আবিষ্কার করেছিলেন।

ফৈজু পড়ছিল। দুটো বিরল প্রজাতির ঈগল পেঁচা বর্ধমানের বনসংরক্ষণ কেন্দ্রে ছিল। একটি ওখান থেকে পালাতে গিয়ে মারা পড়েছে। ঘটনাটি দুহাজার ছয়ের ডিসেম্বরের। আবার এক খবর থেকে জানা যাচ্ছে যে দুহাজার সাত সনের জানুয়ারি মাসে থাইল্যান্ডের সমুদ্র উপকূল থেকে পাওয়া গেল উত্তর আমেরিকার নদী, হ্রদ আর পুকুরের ভক্ষ্যকাছিম। লোকে খুব অবাক হয়েছে। কেননা তাদের ধারণা হয়েছিল যে এই জীবটি তাদের সমুদ্র উপকূল থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ফৈজু পড়ছিল। একত্রিশে জানুয়ারি দুহাজার আট। তানজানিয়ার পাহাড়ে থাকে তারা। নতুন প্রজাতির বিচিত্র দর্শন এক স্তন্যপায়ী জীব। আকারে বিড়ালের চেয়ে বড় নয়। যেন খুদে সাইজের হরিণ আর কাঠবেড়ালির সংকর জীব। ধূসর মুখ, শুঁড়ের মতো লম্বা নাক, ভারী পেট, পেছনটা মিশকালো, সরু পায়ের এই প্রাণী খুঁজে পেয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার একাদেমি আর সায়েন্স-এর গবেষক গ্যালেন র‍্যাথবান। এতদিন অজানা এই প্রাণীর নাম হয়েছে রাইনো কেসিয়ন আদজুন গোয়েনসিস।

অতবড়ো খটমটো একটা নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে ফৈজু একটু থতমত খেয়েছিল। সে পড়া থামিয়ে সবার দিকে একটু লাজুক দৃষ্টিতে তাকাল। আর সেই ফাঁকে সামসুর আব্বাজানের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে বেশ জোরে জোরে পড়া শুরু করল। মে ২০০৬। তানজানিয়ার রাঙউয়ী পাহাড়ে পাওয়া গেছে রাঙ উয়ীবাস কিপুনজী নামের এক বিরল প্রজাতির আফ্রিকান বাঁদর। গত তিরাশি বছরের মধ্যে এই প্রজাতির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল এই যে দক্ষিণ তানজানিয়ার এই পাহাড়ী অঞ্চল হ'ল তাদেরই আশ্রয়শিবির যারা পৃথিবীর অন্য জায়গা থেকে এরই মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

সামসুর পড়তে পড়তে একটু চোখ তোলে। তারপর চোখ নামায়। আবারও পড়তে শুরু করে। আগস্ট ২০০৬।

বিরল হাঁসের দেখা পাওয়া গেল মানস উদ্যানে। বিশ্বের অন্যতম বিরল হাঁসের দেখা মিলল অসমের এই উদ্যানে। এর পোশাকি নাম হোয়াইট উইঙ্গড উডডাক। বন্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্য মানসের এই নতুন অতিথিকে দেখতে পেয়ে সকলেই বিস্মিত। এই নতুন অতিথিকে আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন রাক্সা জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পক্ষী বিশারদ আনোয়ারুদ্দিন চৌধুরী। তাঁর কথায়, ঘন জঙ্গল শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে এই হাঁসও ক্রমশ বিরল হয়ে পড়ছে।

আমি খুব মন দিয়ে সামসুরের পড়া শুনছিলাম। এবার একটু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি ডালি সামসুরের কাছ থেকে খাতাটা নিয়ে নিল। আর গড়গড় করে পড়া শুরু করল। তাইওয়ানের পূর্ব দিকের সমুদ্রতটে প্রায় আশি রকমের অজানা ক্রাস্ টেশা-প্রাণীর খোঁজ পেয়েছেন সমুদ্র বিজ্ঞানীরা। কঠিন খোলার আবরণে ঢাকা এদের শরীর। এখবর হ'ল ২০০৭ সনের জুন মাসের। একই সময়ে ফরাসীরা ফিলিপিন্সে আবিষ্কার করলেন ওইরকম প্রজাতি।

এটুকু পড়তে পড়তেই ডালির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনে হল সে আরো কিছু পড়তে চায়। ডালি পড়ে। জলপাইগুড়ি এপ্রিল ২০০৭। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার গহন অরণ্যে বিরল প্রজাতির বাদামি বর্ণের সাপের দেখা মিলল উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে। একমাত্র বিখ্যাত সর্প বিশারদ মার্কোশিয়ার লেখা, রেপটাইলস অ্যান্ড অ্যাম্ফিবিয়ান বইতে এধরনের সাপের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ভারতে এ ধরনের সাপের সন্ধান মিলল এই প্রথম। নাম-পরিচয়হীন এই সাপগুলির বিশেষত্ব কী এবং এরা কতটা বিষধর তা নিয়ে বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন। মূলত আমেরিকা এবং আফ্রিকার গহন অরণ্যে দেখতে পাওয়া এই বিরল প্রজাতির সাপগুলি উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে কীভাবে বেঁচে রয়েছে তা অবাক করেছে সাপ বিশারদদের। উত্তরবঙ্গের সাপ বিশারদ মিন্টু চৌধুরীর বক্তব্য, অদ্ভুত রঙের এই ধরনের সাপের সন্ধান ভারতবর্ষের কোথাও এতদিন পাওয়া যায়নি।

ডালি পড়তে পড়তে বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে কী কাণ্ড! কী কাণ্ড! ঘেনুদা বললেন, আসল কথা কি জানো? আমি আগেও অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি। একজায়গার প্রাকৃতিক পরিবেশ বদলে গেলেও পৃথিবীর অন্য কোথাও সেই পরিবেশ রয়ে গিয়েছে। পশুপাখি গাছপালা এখন নিজেদের সেই পরিবেশ খুঁজে বের করতে চাইছে। খুঁজে নিচ্ছে। ডালি তুমি পড়া শুরু কর।

ঘেনুদার কথা শুনে ডালি আনন্দ পায়। একটু হেসে পড়া শুরু করে। জুন ২০০৭। পদবিহীন সরীসৃপের খোঁজ পাওয়া গেল ওড়িশায়। একদল প্রাণিবিজ্ঞানী সুন্দরগড়ের বনে জঙ্গলে সমীক্ষা ও পরীক্ষাকার্য চালাতে গিয়ে সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন ওই নতুন প্রজাতির প্রাণীটিকে। সাপের মতো দেখতে এই টিকটিকি সেপ সোফিসগণ এবং সিনসিডি প্রজাতির অন্তর্গত। কালচে সোনালি রঙের এই প্রাণীর দেখা মেলে সাধারণত শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ আমেরিকায়। গবেষকদের নেতা সুশীলকুমার দত্ত বলেছেন, এই প্রাণীটিকে খুঁজে পাওয়াটা বৈজ্ঞানিক এবং ভৌগোলিক দিক থেকে নিঃসন্দেহে বড় সাফল্য। পদবিহীন সরীসৃপটি পৃথিবীর আদিম যুগের বাসিন্দা বলেই মনে করা হচ্ছে। ১৮৭০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের গোলকুণ্ডায় এই জাতীয় দু-একটি প্রাণী মিলেছিল। তারপরেই এই প্রথম।

ডালি পড়া থামায়। ঘেনুদা মুখ দিয়ে কেবল উচ্চারণ করেন, হুম। সারা ঘরে আর কোনো শব্দ নেই। আমি ভাবি ঘেনুদা কি আমাদের কোনো নতুন পৃথিবীর এক ভবিষ্যত পরিবেশের কথা জানাবেন সবাইকে?

ডালি একটু পড়া থামিয়েছিল। এবার আমিনার হাতে খাতাটা তুলে দিয়ে বলল, চাচী। তুমি পড়ো।

ডালির কথায় আমিনা খুব লজ্জা পায়। অসহায়ের মতো সবার মুখের দিকে তাকায়। জয়নাল মুখের ইশারায় সম্মতি দেয়। আমিনা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সে ধীরে ধীরে পড়া শুরু করে। জুন ২০০৭। ধরেই নেওয়া হয়েছিল অন্য অনেক বন্য প্রাণীর মতো কালো বাঘও হারিয়ে গিয়েছে ওড়িশার জঙ্গল থেকে। সাধারণত, কালো বাঘ পাওয়া যায় দক্ষিণ-পশ্চিম চীন, মায়ানমার, অসম, নেপালে। এদের খোঁজ মেলে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের মতো দেশে। আফ্রিকাতেও। দক্ষিণ ভারতের এদের দেখা গিয়েছে। সাম্প্রতিক ব্যাঘ্র গণনায় ময়ূরভঞ্জ জেলার সিমলিপাল সংরক্ষিত অরণ্যে তিনটি বিরল প্রজাতির কালো বাঘের, মেলানি স্টিক প্যান্থার, সন্ধান মিলেছে।

আমিনা বেগম পড়ছিলেন। ঘরের সবাই খুব উৎসুক হয়ে তাঁর পড়া শুনছিলেন। অগস্ট ২০০৬। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের চুকচুকি এলাকায় জালে ধরা পড়েছে

অদ্ভুত দর্শন বিল্লি মাছের। গত সাত দশকে কোথাও ওই মেনিমুখো মাছের হদিশ মেলেনি। কিন্তু মৎস্য বিশেষজ্ঞ বিমলচন্দ্র বলেছেন, "শুধু টিকে থাকা নয়। চুকচুকি জলাশয়ে একাধিকবার জাল ফেলে আমরা নিশ্চিত, বেশ ভালোভাবেই বেঁচেবর্তে আছে।" সমীক্ষায় বিল্লির পাশাপাশি সন্ধান মিলেছে আড়াই ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের চেনুয়া মাছের। ব্রিটিশ গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী যা কিনা বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়ে বেশি মেলার কথা। চেনুয়া মিলেছে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের জলাশয়ে। অনিমেষ বসুর কথায়, যেটা এখানকার জলে মেলার কথাই নয়, তাও মিলছে।

আমিনা বেগম পড়ছিলেন। আর আমি অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলাম নারসিমা বউদির দিকে। কী অসীম ধৈর্য ধরে। কীরকম পড়াশোনা করে খুঁজে পেতে এসব তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন কতো দিন কতো বছর ধরে।

আমিনা বেগমের কথা শোনা যায় আবারও। জুন ২০০৭। গায়ের রঙ বাদামি। বড়বড় জ্বলজ্বলে চোখ। ধারাল নখ। দেড় ফুট লম্বা শরীর। ফুট দুয়েক লম্বা লেজ। সামনের দুপায়ের সঙ্গে পিছনের দু'পায়ের চার চৌকো জায়গায় পাতলা চাদরের মতো চামড়া। এই জায়েন্ট ফ্লাইং স্কুইরেল বিশাল উড়ুক্কু কাঠবিড়াল ঝাড়খণ্ডে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। ফরেস্ট অফিসাররাও ধারণা করতেন এই কাঠবেড়ালির আরেকটাও বেঁচে নেই। কিন্তু এই ২০০৭ সালের-জুন মাসে পূর্ব সিংভূমের মুসাবনিতে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে সুরদা গ্রামে এই প্রাণীর একটিকে বসে থাকতে দেখা গেল।

একটু দম নিয়ে আমিনা বেগম আবারও পড়া শুরু করেন। একশো বছর পরে পাওয়া গেল বিরল প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ। গুয়াহাটি নভেম্বর ২০০৬। টেনেটুনে এক ফুটমতো লম্বা। দুটো পাঁপড়ির ফুল আর দুটো পাতার বৃন্ত। তাতেই একেবারে সেরে যায় পেটের গণ্ডগোল বা আন্ত্রিকের মতো সমস্যা। শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলেও এ কাজে আসে। আবার ওই পাতার রসে জব্দ হয়ে যায় পাহাড়ি জোঁক। এই ভেষজ উদ্ভিদের নাম বেগনিয়া টেসারিকার্পা। নির্বিচারে বনজঙ্গল কাটার ফলে অনেকদিন তার দেখা মেলেনি। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়েই গিয়েছে। প্রায় ১১৭ বছর পরে তাকে পুনরাবিষ্কার করলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা। বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার দুই গবেষক কুমার অম্বরীশ এবং এম আমাদুদ্দিন অরুণাচল প্রদেশে কাজ করতে করতে একে খুঁজে পান। চিন সীমান্তের কাছে উজানি সুবণসিরি জেলায় লিগু গ্রামে পাহাড়ের খাঁজে আর পূর্ব চাংলাঙ জেলার নামডাকা জাতীয় উদ্যানেও এই উদ্ভিদের দেখা মেলে।

একদমে অনেকটা পড়ে ফেলেন বেগম সাহেবা। ঘেনুদার মুখ গভীর পরিতৃপ্তি আর আনন্দে ভরে উঠেছে তখন। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, আমরা এখন অবধি যা যা তথ্য পেলাম তা থেকে এটুকুই বুঝলাম যে গাছপালা পশুপাখি যারা পৃথিবীর যে যে প্রাকৃতিক পরিবেশে এক সময় জন্ম নিয়েছিল বেড়ে উঠেছিল প্রাকৃতিক দূষণের ফলে সেই পরিবেশের পরিবর্তন হল। গাছপালা পশুপাখি হারিয়ে গেল। হয়তো আত্মগোপন করে রইল। তারপর এখন আবার সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ তারা হয়তো ফিরে পেয়েছে পৃথিবীর অন্য কোথাও আমাদের জানা পৃথিবীর অজানা কোনও দেশে। তারা সেখানে আবারও আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঘেনুদা থামলেন। হাসানের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি সাহেব? তুমিতো আশুতোষ কলেজের ছাত্র। জুয়লজি, আর বট্যানি নিয়ে পড়ছো? তোমার কি মনে হয়? কিছু বলবে?

ঘেনু জেঠুর কথা শুনে হাসান একটু সময় চুপ করে থাকে। তারপর খুব ভেবে চিন্তে বলে, বড়ো চাচার আদেশ আমি কি করে অমান্য করব? তবে আমার এ বিষয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু যদি আদেশ করেন তবে আমি অন্য একটা কথা বলতে পারি। কদিন আগে মানে এই ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই কাগজে বের হয়েছে খবরটা।

হাসানের কথা শুনে ঘেনুদা একটু নড়ে চড়ে বসেন। বলেন, বাঃ। বেশ। এতো বেশ ভালো কথা। বলোই না সেকথা। শুনি আমরা।

কথা শেষ করে ঘেনুদা এবার আমাদের মুখের দিকে তাকান। বলেন, কি তোমাদের কি মত? শুনবে তো তোমরা?

আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু কোনও কথা বলি না। ঘেনুদা এবার বলেন, নাও হাসান সাহেব। শুরু করো তোমার কথা।

হাসান কথা শুরু করে এবার। পিরানীজ পর্বতমালার বুনো ছাগল আইবেক্‌স্‌ ২০০০ সনেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই সময়কার ছাগলের কানের এক হিমায়িত চামড়া সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আর তার কোষ মানে সেল সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন স্প্যানিশ বায়োলজিস্ট অ্যালবার্টো ফাগুনান দেজ আর যোশ ফচ। তাঁরা আইবেকসের এক ক্লোন তৈরি করে ফেললেন। কিন্তু কপাল, জন্মের অল্পক্ষণের মধ্যেই দমবন্ধ হয়ে সে বাচ্চাটা মারা গেল। তবে তাঁরা ভয় পাননি। তাঁরা বলছেন পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া জীবজগৎকে তাঁরা এভাবেই ফিরিয়ে আনবেন একদিন।

হাসান কথা শেষ করল। ঘেনুদা হাসলেন হো হো করে। বললেন, ঠিক আছে। পরে তা ভেবে দেখা যাবে। এখন খাতা আগে শেষ হোক্‌।

ঘেনুদা কথা শেষ করে তাকালেন জয়নালদার দিকে। বললেন, এবার তুমিই পড়ে শোনাও।

জয়নালদা পড়া শুরু করার আগেই বলেন, তোমরা ধ্রুবজ্যোতি ঘোষের নাম শুনে থাকবে। তিনি পূর্ব কোলকাতার এক জলসম্পদকে বাঁচাবার চেষ্টা করে চলেছেন। অনেকেই সহযোগিতা করছেন তাঁকে। পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে এমন কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণী এখানে আশ্রয় পেয়েছে। এদের সংখ্যা অনেক। দেশ বিদেশের নানান পাখি আশ্রয় নেয় এই বিশাল জলাশয়ে। জানতে ইচ্ছে করে এখানকার ভূবৈচিত্র্য সম্বন্ধে। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে এই জলাশয় কেমন করে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে আজও?

কথা শেষ করে জয়নালদা পড়া শুরু করেন। ২০০৬ সনের সেপ্টেম্বর। রামানা অ্যাটহেরিয়া অরুণাচল প্রদেশে এক নতুন প্রজাতির পাখি আবিষ্কার করলেন। স্থানীয় জায়গার নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখলেন বুগুন লিওসিচলা। আবার ১৪০ বছর পর কোলকাতার উপকণ্ঠে নরেন্দ্রপুরে খোঁজপাওয়া গেল গায়ক পাখি লার্জ বিলড্‌রিড ওয়াবলার-এর। ১৮৬৭ সালে হিমাচল প্রদেশের রামপুরের কাছে শতদ্রুনদীর উপকূলে প্রথম খোঁজ পাওয়া গেছিল ওই প্রজাতির একটিমাত্র পাখির। তারপর হাজার খোঁজ করেও পৃথিবীর কোনও প্রান্তেই আর দেখতে পাওয়া যায়নি ছোট্ট এই পাখিটিকে। এতো বছর কোথায় লুকিয়েছিল? গানের সঙ্গে কথা বলতে পারলে হয়তো জানা যেতো সেকথা। অথবা হয়তো এখন সেই হারানো আবহাওয়া আর পুরনো পরিবেশ ফিরে পেয়ে সে ফিরে এসেছে নতুন করে। কে জানে? কে দেবে এসব কথার উত্তর?

পড়তে পড়তে জয়নালদার গলায় আবেগ ঝরে পড়েছে তখন। কিন্তু একটু সময়ের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি পড়া শুরু করলেন। কেনিয়ার এক অজানা জায়গা থেকে আবিষ্কার হয়েছে নতুন প্রজাতির এক বিষধর সাপের। যার নাম রাখা হয়েছে নাযা অ্যাসেই। কেউটে সাপের এই বিষ ছেটানো সাপ আগে কখনও দেখা যায়নি। এতো লম্বা যে বলার নয়। এর এক কামড়েই পনের কুড়িজন লোক মারা পড়তে পারে। খবর ডিসেম্বর ২০০৭।

জয়নালদা পড়ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর নানডেল স্টেট ফরেস্টে আবিষ্কার হয়েছে ফক্সগ্লোভ শ্রেণীর এক উদ্ভিদ ইউফ্রেশিয়া আরগুটা। একশ বছর আগে এই উদ্ভিদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এখবর জুলাই ২০০৮-এর। প্রায় ঐ সময়েই খবর এল বার্বাডোজ থেকে। স্প্যাঘেটি-র মতো সরু দশ সেন্টিমিটার লম্বা এক সাপ। আগেকার জানা তিনহাজার একশ সাপের বাইরে নাম রাখা হয়েছে লেপটো টিফোলোপস।

এবার জয়নালদা হাসতে হাসতে বললেন ২০০৭ সনের ফেব্রুয়ারিতে নিউ ইয়র্কের ব্রনক্স নদীতে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। কয়েকশো বছর পরে এক বীভার চলে এল শহরের ঐ নদীতে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ফটো তুলে ঘটনাটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে। উত্তর আমেরিকার এক প্রাণী যে ঐ নদীতে বাস করতে পারে, বেঁচে থাকতেও পারে তারই প্রমাণ হল। এভাবে আরো এক অবাক ঘটনা ঘটল ২০০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে। উত্তর প্রদেশের সারনাথ রেল স্টেশনে। নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চলের বিরল প্রজাতির এক উড্ডুক্কু লেমুর পাওয়া গেল সেখানকার এক কাগজের বাক্সে। আবার ২০০৭ সনের নভেম্বর মাসে ব্রাজিল দেশের আমাজন অঞ্চলে শূয়োরের মতো স্তন্যপায়ী এক জীব পেককারি-র সন্ধান পেলেন বৈজ্ঞানিকেরা। প্রশ্ন জাগে মনে এরা কারা? এতদিন কোথায় ছিল? কিভাবে বেঁচেছিল তারা? নতুন পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারবে এই ভরসাতেই তো তারা এসেছে। প্রাকৃতিক দূষণকে এরা কিভাবে জয় করবে? অথবা বলা চলে দূষণকে জয় করতে পারবে বলেই তো তারা এসেছে। মানুষ কেন তবে মেনে নিতে পারছে না? পারবে না? হেরে যাবার ভয়ে কুঁকড়ে রয়েছে? এক আতঙ্কে আগে থেকেই মরে যাচ্ছে? অসুখ হবার আগে সাবধানে থাকা ভালো। কিন্তু এতো ভয় কেন মরার?

জয়নালদা একটু থামলেন। ঘেনুদা দেখলেন আনিস খুব উকিঝুঁকি দিচ্ছে বড়ো চাচীর খাতাটা দেখবার জন্যে। হাতে নেবার জন্যে। ঘেনুদা বললেন, জয়নাল এবার তুমি আনিসকে পড়তে দাও। ওর খুব ইচ্ছে।

আনিস পড়তে গিয়ে থেমে যায়। বলে, আবার সেই তানজানিয়ার বাঁদরের কথা। সেই বাঁদরের ডি এন এ পরীক্ষা করে জানা গেছে তারা হল এক সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির। দি এজ অব্ ডিসকভারি ইজ বাই নো মীনস্ ওভার।

আনিসের কথা শুনে ঘরে উপস্থিত আমরা সবাই আস্তে আস্তে হাততালি দিয়ে ওকে উৎসাহিত করি।

আনিস মহা উৎসাহে পড়া শুরু করে। মে ২০০৭ সনের ঘটনা। কলম্বিয়ার ক্লাউড ফরেস্টে আবিষ্কার হল হামিং বার্ড-এর এক নতুন প্রজাতি। গরগেটেড পাফলেগ। ঐ বছরেরই জুলাই মাসে ভিয়েৎনামের জঙ্গলে পাওয়া গেল নিশ্চিহ্ন হবার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা এক প্রজাতির বাঁদরের যাদের হাঁটু থেকে পায়ের গাঁট পর্যন্ত অংশ ধূসর। বারণে লঙ্ অবাক হয়ে বলেছেন ছোট্ট একটা জায়গায় এক প্রজাতির এতজনের বাস করা বিস্ময়কর। পাশাপাশি রয়েছে দুটো খবর নভেম্বর ২০০৬ থেকে জানা যাচ্ছে কুচবিহারের চিলাপাটা জঙ্গলে থাকা বিরল প্রজাতির দুই গেছো ব্যাঙের খবর। আবার ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ আবিষ্কৃত বারোটি নতুন প্রজাতির ব্যাঙের খবর। যেখানে বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে গেছে নানানভাবে সেখানে এদের বেঁচে থাকার খবর বিস্ময়কর। সেই সঙ্গে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনেমের নাসাউ মালভূমিতে আবিষ্কৃত বেগুনী আভাযুক্ত ব্যাঙ। এগুলি এখন বিরল হয়ে এসেছে।

আনিস পড়ে চলছিল আন্টার্কটিকা-কে ঘিরে থাকা দক্ষিণ সমুদ্রের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক পরিবেশেও বেঁচে রয়েছে কঠিন খোলায় আবৃত জীব থেকে মাংশাসী প্রাণী।

ঘেনুদা হাত তুলে আনিসকে থামতে বললেন। পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, রায় মনে হচ্ছে খাতার খবর শেষ হতে চলেছে। তুমি তাড়াতাড়ি শেষ করো। তারপর আমি বলব। আর শেষে জানাব। সবাই তখন বুঝবে কারা এখানকার মুরগীর ছানা। হাঁসের বাচ্চা। ইঁদুর

ছুঁচোর মাংস খুবলে নিয়েছে। মেরে ফেলেছে।

আমি খাতা নিলাম আনিসুরের কাছ থেকে। পড়া শুরু করলাম। অন্ধ কাঁকড়াবিছা। ২০০৬ সনের মে মাসে আবিষ্কার হল জেরুজালেমের এক গুহা থেকে। বিজ্ঞান এদের কোনও খবর পায়নি আগে। পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকেই সেই পুরণো পরিবেশেই রয়েছে তারা। ঐ বছরেরই নভেম্বর মাসে জানিয়েছেন মেলানি ফ্রেজিয়ার। এক নতুন খবর। তিনি বলছেন উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কীট পতঙ্গের সংখ্যা পৃথিবীতে বেড়ে যাবে। ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র। কিন্তু তখন দেখতে হবে ঐ পরিবর্তিত পরিবেশে কারা মানিয়ে থাকতে পারবে আর কারা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চিরদিনের মতো।

আমি খাতা শেষ করে ঘেনুদার হাতে তুলে দিলাম। আমার হাত থেকে খাতা পেয়ে ঘেনুদা সেটা মাথায় ঠেকালেন। তারপর সোফার পাশের টুলে রাখলেন।

ঘেনুদা এবার বললেন, আমি প্রথমে দুচারটে কথা বলে নেবো। তারপর অজানা দেশের তেপান্তরের মাঠে আমাদের ঘোড়া ছুটিয়ে দেবো। আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপের কথা স্মরণ করো। প্রাকৃতিক সম্পদ আর জীবজগতের বৈচিত্র্যে তা ছিল অভিনব নয়ন মনোহর। ১৭৭৮ সনে কাপ্তেন জেমস কুক এই দ্বীপে যাবার পর থেকেই বহিরাগত মানুষের আক্রমণ শুরু হয়ে যায় এর বিশাল বিরাট বিপুল সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য। কিন্তু এখন অন্য আরেক বিপদ এসে হাজির। কুকুর লেলিয়ে দিয়ে সেইসব বিপদজনক ক্ষতিকারক শূয়োরদের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে হচ্ছে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদকে। মানুষই এগিয়ে এসেছে এখানকার জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্যে।

ঘেনুদা থামলেন। চোখ বুজলেন। এবার চোখ খুলে বললেন, আমার বন্ধু 'গার্ডেন স্যার' মদন মোহন বেরা-র কথা একটু বলি। মেদিনীপুর শহর ছাড়িয়ে সাতের ডাঙ্গা গ্রামে সে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে। যত রাজ্যের দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ ভেষজ গাছ এনে লাগিয়েছে তার বাগানে। অবশ্য তাঁর নিজের ধারণা যে পশ্চিম মেদিনীপুর বিশেষ করে ঝাড়গ্রামই হ'ল ওষধি গাছের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপযুক্ত জায়গা।

ঘেনুদা কথা বলতে বলতে থামলেন। বললেন, সে নিজে বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই। ঐ জায়গায় জলবায়ু, আবহাওয়া মাটি সবকিছু যাচাই করেই সেতো একথা বলেছে। প্রাকৃতিক দূষণ থেকে কি তবে প্রকৃতি ওখানে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে? যাক্ থাক সে কথা। এবার বলি সৌমেন আদিত্য-র কথা। হাওড়া জেলার এক ছোট্টগাঁয়ে সে গড়ে তুলেছে এক গ্রীণ হাউস। শীতের দেশের কোনও উদ্ভিদ নয় কিন্তু বিরল ক্যাকটাস মানে হারিয়ে যাওয়ার মুখে যেসব মনসা গাছ রয়েছে তারাও স্থান পেয়েছে ঐ হাউসে। দক্ষিণ আফ্রিকা। নামিবিয়া। অ্যাঙ্গোলা। সোমালিয়া মাদাগাসকার। মেক্সিকো আর ইথিওপিয়ার বিরল উদ্ভিদ স্থান পেয়েছে আদিত্যর আশ্রয়ে। থাইল্যান্ডের এক বয়সী মহিলা পিকুনে সাঙ্কু, সুত্তয়ান হল সৌমেনের প্রেরণা। কিন্তু আমার মনে ছোট্ট এক প্রশ্ন এ সব জায়গা কি প্রাকৃতিক দূষণ থেকে এড়িয়ে থাকতে পেরেছে? যদি পারে তবে তো তা পেরেছে মানুষের সুস্থ চিন্তা। মায়া মমতা আর স্নেহ যত্নেই। পৃথিবীর সব মানুষই যদি এঁদের মতো হতো তবে কি আর চিন্তা ছিল কিছু?

ঘেনুদা কথা বলছিলেন। ঘরের সবাই মনোযোগী ছাত্রর মতো শুনছিল। যদিও মাঝে মধ্যে চা কফি আর মুড়ি চানাচুর খাবার শব্দ একটু আধটু হচ্ছিলই।

আফ্রিকার মাদাগাসকার বা বর্তমানের মালাগাসির কথাই ধরনা কেন? সেখানকার পুবদিকের পাহাড় শ্রেণিতে প্রতি বছরই প্রায় একটা করে নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কার হচ্ছে। আর লবঙ্গ চালান যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ায়। কিন্তু সেই আর্থিক ফসলের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে তার রেন ফরেস্টকে কেটে সাফ করার চেষ্টা হচ্ছে। তাহলে সেখানে দূষণ তো অনিবার্য।

ঘেনুদা কথা বলতে বলতে একটু যেন অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন। একটু সময় চুপ করে থাকলেন। একটু জল খেলেন। মুখ তুলে সবার দিকে তাকালেন। কথা শুরু করলেন আবারও।

তোমরা বোধহয় বৃটিশ পর্বতারোহী হামিস ম্যাকইনেস-এর নাম শুনেছ। তাঁর লেখা বই ক্লাইম্ব টু দি লস্ট ওয়ার্ল্ড। উনি আর তাঁর সঙ্গী জো ব্রাউন। ডন হুইলল্যানস। মো অ্যানথনি অন্য এক নতুন পথ ধরে উঠতে চেয়েছিলেন মাউন্ট রোরাইমা। যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ টেবলটপ মাউনটেন। এই জায়গায় রয়েছে তিনটি দেশের অধিকার। গিয়ানা, ভেনিজুয়েলা আর ব্রাজিল। পুনটো ট্রেস নামের জায়গায় তিনটি দেশের সীমানা মিলেছে। এই

রোরাইমা-র কথা শুনেই স্যার আর্থার কোনান ডয়েল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস দি লস্ট ওয়ার্ল্ড লিখেছেন। এখনও সেখানে পৃথিবীর আর কোথাও যা নেই তেমন জীবজন্তু ও উদ্ভিদ রয়ে গিয়েছে। এখানে আসলে মনে হবে এই হল সেই জায়গা যেখানে পৃথিবী একদিন শুরু হয়েছে। মনে হবে এখানে সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর গত শত সহস্র বছরেও তার কোনও নড়চড় হয়নি। তোমরা জেনে রাখো যে আমাজনের গহন অঞ্চলে রয়েছে মাউনটেনস অব দি মিস্টস। এখানকার সর্বোচ্চ পর্বত পিকোডা নেবলিনা সবে মাত্র আবিষ্কার হয়েছে ১৯৫৩ সনে।

ঘেনুদার কথা যেন আর শেষ হবার নয়। কিন্তু তাঁর লেকচার কখনওই নীরস ঠেকেনি আমার কাছে। অন্যদের কাছেও ঠেকেনি। তা না হলে কি ছোট বড়ো সবাই এত সময় ধরে এতকথা শুনে যেতো? সেই কখন শুরু হয়েছে আমাদের আলোচনা?

ঘেনুদা কথা বলছিলেন। পৃথিবীর আরেক জায়গার কথা বলি। যেখানে অনেক অত্যাচার সহ্য করেও প্রকৃতি আশ্রয় দিয়ে রেখেছে পৃথিবীর কিছু বিরল প্রাণীকে। বিরল প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদকে। এই জায়গাকেও বিবর্তনবাদের এক কেন্দ্র বলা চলে। আঞ্চলিক অনেক উদ্ভিদ এবং পশুর উদ্ভবস্থল এ জায়গা। কাপুয়াসমাভ স্নেক রয়েছে এখানে যে তার চামড়ার রঙ বদলাতে পারে। এখনকার নদীর জলনিকাশী ব্যবস্থার সঙ্গে এর এক যোগ রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এই জায়গা হল বোর্ণিও। যে দ্বীপের শাসনভার রয়েছে ইন্দোনেশিয়দের। মালয়েশিয়া আর সুলতানেট অব্ ব্রুনি-র ওপর। এখানে আশ্রয় পেয়েছে সুমাত্রান রাইনোসারাস। ক্লাউডেড লেপার্ড। কিন্তু ভয় হয় আর কতদিন? এখানকার রেইন ফরেস্ট শেষ হবার মুখে যে!

ঘেনুদা কথা বলতে বলতে ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর নিজেই হৈহৈ করে উঠলেন, আরে গল্পে গল্পে যে এত রাত হয়ে গিয়েছে খেয়ালই করিনি। ঈশার নামাজের সময় যে প্রায় হয়ে এল। তবে আর দেরি নয়। আরেকটু বললেই আমার ছুটি।

জয়নালদা একটু হেসে বললেন, ভয় নেই। এখনও অনেকটা সময় আছে। চালিয়ে যাও।

জয়নালদার কথা শুনে ঘেনুদা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, থ্যাঙ্কস্। তবে আমি শুরু করছি ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার হারাপান রেইনফরেস্ট। এখানে রয়েছে ২৬৭ রকমের পাখি। আর বিভিন্ন বিচিত্র পশুজগৎ। এশিয়ান হাতি। সুমাত্রার বাঘ। ক্লাউডেড লেপার্ড। সান বিয়ার। মালায়ান পরাকিউপাইন। আর রয়েছে বিচিত্র ফুলের সমারোহ। একে সম্প্রতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার ঘটে গিয়েছে ২০০৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। ইন্দোনেশিয়ার নিউ গিনির ফোজা পর্বতমালায় গার্ডেন অব্ ইডেন আবিষ্কার করলেন আন্তর্জাতিক এক বৈজ্ঞানিক দল। এই দল আবিষ্কার করেছে নতুন প্রজাতির কুড়িটি ব্যাঙ। চার রকমের প্রজাপতি আর পাঁচরকমের পাম গাছ। আর সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁরা ফটো তুলে নিয়েছেন বার্লেপস সিক্স ওয়্যার্ড বার্ড অব প্যারাডাইস নামে একটি পাখির। যার মাথায় রয়েছে ছটি সরু তারের মতো পাখা। বিজ্ঞানীদের কাছে এই পাখিটি হারিয়ে গিয়েছে বলে এতদিন মনে করা হচ্ছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা এই পশুপাখিদের সবাই কিন্তু নির্ভাবনায় মানুষদের কাছে এসেছে। জানিয়েছিলেন ওই দলেরই একজন ব্রুস বিহলার। কিন্তু শুধু এখানেই শেষ নয়। ২০০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ওই কোজা পাহাড়ে গিয়ে ক্রিস্টোফার হেলগেন আবিষ্কার করেছেন এতো দিনের অজানা বিরাট বিরাট ইঁদুরের। যারা শহুরে ইঁদুর থেকে কম করেও পাঁচ গুণ বড়ো। এছাড়াও ওখানে রয়েছে পৃথিবীর সব থেকে ছোট প্রজাতির এক ক্যাঙ্গারু। ওই জায়গা তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল।

ঘেনুদা কথা থামালেন। চশমাটা খুলে মুছলেন। আমি বললাম দাদা সবতো হল। কিন্তু এঁদের সেই সমস্যাটা। আপনি জানাবেন বলেছিলেন।

ঘেনুদা বললেন, চিন্তা নেই। আমি জানি এসব ট্যারান্টুলাদের কাজ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে একটাই। অস্ট্রেলিয়া উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকা যে বিষাক্ত ভয়ঙ্কর প্রজাতির এই মাকড়সাদের বাসভূমি তাঁরা এই কোলকাতার উপকণ্ঠে আজ এসে হাজির হল কিভাবে?

আমি এবার ধীরে ধীরে বললাম, দাদা প্রাণিবিশেষজ্ঞ আর আই পোকক ১৯০০ সনে ছোটনাগপুর আর বর্ধমানে ট্যারান্টুলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে লিখেছেন। তাছাড়া আপনি জানেন ১৯৭৩ সালে দার্জিলিঙের

জঙ্গলে। ২০০৪ সনে খড়্গপুরে। পরে বীরভূমে। পুরুলিয়ায়। উত্তর চব্বিশ পরগণার সোদপুরে। কোচবিহারের গোসানিমারি আর জলপাইগুড়ির গরুমারা জঙ্গল ছাড়াও মহানন্দা অভয়ারণ্যের লাটপাংচার এলাকায় এই ভয়ঙ্কর জীবটির দেখা পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া বারাসতে পাওয়া গেছে বিরল প্রজাতির ব্যাঙ। কোলকাতার আকাশে দীর্ঘদিন বাদে দেখা গেছে শকুন। আর পৃথিবীর নানা প্রান্তে অদ্ভুত ধরনের সাপ। পশুপাখি পোকামাকড় গাছপালা আবিষ্কার হবার খবর এখন প্রায়ই কাগজে বের হচ্ছে। এরা কোথায় লুকিয়েছিল এতদিন?

ঘেনুদা আমার কথা শেষ হলে আমার মুখের দিকে হাসিহাসি মুখ করে তাকালেন। বললেন, এ তথ্য আমার কাছেও তো রয়েছে। ভাবতো এতদিন এতবছর যে সব উদ্ভিদ প্রাণী পৃথিবীর পরিবেশ বদলে যাবার কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে অথবা হারিয়ে গিয়েছে বলে লোকের ধারণা ছিল দেখা যাচ্ছে যে এখনকার এই দূষিত পরিবেশেও তারা বেঁচে আছে? ফিরে এসেছে? অথবা পৃথিবীর যেখানে যেখানে তাদের বেঁচে থাকার পরিবেশ রয়েছে তাঁরা খুঁজে খুঁজে সেখানেই চলে যাচ্ছে? তাছাড়া ২০০৭ সনের মার্চ মাসেই তো জ্যাক উইলিয়ামস বলে দিয়েছেন পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের এক নতুন বিন্যাস ঘটতে চলেছে। পুরনো ভূগোলে যে যে জায়গার জলবায়ু মানুষ পশুপাখি ফুলের কথা বলা হয়েছিল তারা তখন আর থাকবে না। নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশে নতুন জীবন গড়ে উঠবে সেখানে।

ঘেনুদা তাঁর লেকচার শেষ করেন। সবাই ওঁর কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার ওঁর কথা শেষ হতে সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠেন।

তবে জয়নালদা বললেন, যাই বলো। তাহলে এই বিষাক্ত মাকড়সার হাত থেকে রক্ষা পেতে আমাদের তো সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

ফৈজু কথা বললে এবার, দাদা ঈশার নামাজটা পড়ে নাও। আমার পড়া হয়েছে।

কথা শেষ করে উনি আমাদের ডাকেন। বলেন, আপনারা হাত মুখ ধুয়ে নিন্। আসুন। খাবার রেডি।

ওখান থেকে ফেরার পথে আমি বারবার ভাবছিলাম দিনটা কেমন দেখতে দেখতে একসময় শেষ হয়ে গেল। তাছাড়া আমার জানা পৃথিবীতে জয়নালদা আর তাঁর পরিবারের সবাই? এঁরাওতো আমার কাছে এক নতুন দেশ আবিষ্কারের মতো। তাছাড়া আজকের আলোচনা? সবই তো জানা পৃথিবীর এক অজানা জগতের খোঁজ পাবার মতো।

আমি থাকতে না পেরে ঘেনুদা-কে কথাটা বলেই ফেললাম। আমার কথা শুনে ঘেনুদা আমার মুখের দিকে একটু সময় তাকালেন। পরে হাসতে হাসতে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, বাঃ বেশ বলেছো তো!

ছবি : পলাশকান্তি বিশ্বাস

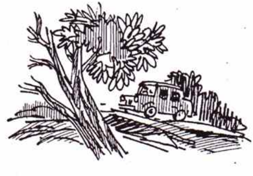

ভ্রমণের গল্প

এলেম নতুন দেশে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

প্রথমে মেলবোর্ন, পরে সিডনি। দু'জায়গায় পর পর দু'শনিবার সাহিত্যসভা আর তার আগে পরে পনেরো ষোলো দিন চুটিয়ে বেড়ানো। প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে এমন একটা চমৎকার নেমন্তন্ন পেয়ে পাড়ি জমিয়েছিলাম অস্ট্রেলিয়ায়। সঙ্গে ভাই-কাম-ভ্রমণগার্জেন কুণাল। নভেম্বরের গোড়ায় দক্ষিণ গোলার্ধের ওই মহাদেশে তখন বসন্তকাল। সিডনিতে রাস্তায় রাস্তায় বেগনি রং জাকারান্ডা ফুল। মেলবোর্নে লাল টুকটুক বটলব্রাশ।

মেলবোর্নে তরুণ-অনসূয়া, যাদের বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম, আমন্ত্রণ জানানোর সময়েই মজা করে বলেছিল, অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেই কিন্তু এয়ারপোর্টের বাইরে ক্যাঙারু খুঁজবেন না। অনেক সাহেব যেমন ভারতে এসেই রাস্তায় বাঘ হাতি আর সাপ আশা করে, সে রকম আর কী! তবে, হ্যাঁ, মা ষষ্ঠীর, থুড়ি, মা মেরির কৃপায় অস্ট্রেলিয়ায় এখন প্রচুর ক্যাঙারু, যথাস্থানে, যথাসময়ে তাদের দর্শন মিলবে জঙ্গলের দিকে। ঘুম-কাতুরে খুদে ভাল্লুক কোয়ালার দেখা মেলাও অসম্ভব নয়। কিংবা শেয়াল-সদৃশ ডিংগো-র।

তা, পাক্কা সাড়ে তিন ঘণ্টা সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে বসে থেকে, দু'দফায় মোট এগারো ঘণ্টা আকাশে উড়ে যখন সন্ধেরাতে মেলবোর্নে পৌঁছলাম, ক্যাঙারু, কোয়ালা, ডিংগো মন থেকে বেবাক উধাও। হা-ক্লান্ত দশায় তখন একটা চিন্তা। সুটকেস, হ্যান্ড-লাগেজ, ভ্যানিটি ব্যাগ, সর্বত্র রয়েছে আমার জাবর কাটার মালমশলা। সুপুরি, মউরি আর লেবু-বিটনুনে মজানো মুখরোচক জোয়ান। বিমানবন্দরে স্নিফার ডগ গন্ধ শুঁকেই না ধরে ফেলে! সিগারেট জর্দা চলতে পারে, কিন্তু কোনও ধরনের শস্যদানা, ফলমূল, খাবারদাবার নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ায় বেজায় কড়াকড়ি। যথাযথ প্যাকেট করা মাল না হলে সঙ্গে সঙ্গে তা চালান হয়ে যাবে কোয়ারেনটাইনে।

বহু বছর আগে কে এক মিসেস প্যাটারসন নাকি

ইংল্যান্ড থেকে কী এক সর্বনেশে বীজ নিয়ে গিয়েছিলেন, তা থেকে ঝোপঝাড় গজিয়ে নাকি নানান রোগ ছড়িয়েছে ও দেশে। অস্ট্রেলিয়ানরা ওই জংলা গাছের নাম দিয়েছে মিসেস প্যাটারসনের অভিশাপ। ওই সব কারণেই হয়তো এত সাবধানতা। নাকি বিচ্ছিন্ন ওই মহাদেশে নানান বিরল প্রজাতির প্রাণী আর উদ্ভিদ আছে, তাদের স্বার্থেই...।

যাক গে যাক। কপাল ভালো, এয়ারপোর্টে সে দিন নো গন্ধবিশারদ কুকুর। আমার খোলা সুপুরি জোয়ানের অনারেই বোধহয় সি-এল নিয়েছিল। নিশ্চিন্ত মুখে অভিবাসনের গণ্ডি পেরিয়ে দেখি, তরুণ-অনসূয়া তো বটেই, আমাকে স্বাগত জানাতে হাজির আছে বাংলা সাহিত্য সংসদের এক ঝাঁক হাসিমুখ।

মেলবোর্নের বাংলা সাহিত্য সংসদের গড়নটা একটু অন্য রকম। দশটি মাত্র বাঙালি পরিবার মিলে তৈরি করেছে এই সংসদ। পাঁচটি এ-পার বাংলার, পাঁচটি ও-পার বাংলার। আছেন প্রতীশ-টুকু, তরুণ-অনসূয়া, রিংকু-রঞ্জন, নারায়ণ-অদিতি, মঞ্জরী-অরিন্দম। আছেন নাহিদ-মুনির, লুলু-লুৎফর, তুহিন-শিল্পী, খাদিজা, বীথি-নিখিল, আর হেমায়েত হোসেন। অবশ্য এঁদের উৎসাহ জোগাচ্ছেন আরও বেশ কিছু বাঙালি।

সংসদের সদস্যরা বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় বসেন নিয়মিত, নিজেদের পত্রিকায় গল্প-কবিতা লেখেন, অভিনয় করেন বাংলা নাটক, আসর জমান বাংলা গানের। ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনির মধ্যেও বাংলা ভাষাকে টিকিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছেন এঁরা। স্থানীয় লাইব্রেরিতে পর্যন্ত বাংলা বই রাখিয়েছেন। আমাদের দেশে বাংলা ভাষার কদর কমছে দিন দিন, অথচ, দূর প্রবাসে শত ব্যস্ততার মাঝেও মাতৃভাষাকে আঁকড়ে থাকার এই প্রয়াস, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় দুই বাংলার কাঁধে কাঁধ মেলানো—এও তো এক মধুর সত্যি।

বাংলা সাহিত্য সংসদ অতিথিপরায়ণতাতেও কম যায় না। এয়ারপোর্ট থেকে শুরু হয়েছিল আদর-আপ্যায়ন, তার পর তো প্রায় রোজই রাতে কারও বাড়িতে ভোজ। দল বেঁধে। আর, দিনের বেলা তো বেরিয়ে পড়েছি এ দিক, ও দিক। মাত্র সাত দিনে প্রায় চষে ফেললাম মেলবোর্ন আর তার আশপাশ।

তরুণ-অনসূয়ার বাড়ি গ্লেন ওয়েভারলিতে। অঞ্চলটার নাম মনাশ। সেখান থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে আসতে গেলে ইয়ারা নদীকে ফুঁড়ে যাওয়া একটা টানেল পেরোতে হয়। টানেলটা বেশ লম্বা, কিন্তু নদীটা বড্ড সরু। এই নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল মেলবোর্ন শহর। ইয়ারা ভালিতেই ফলে দুনিয়ার অন্যতম সেরা আঙুর, যা থেকে তৈরি হয় পৃথিবী-বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান ওয়াইন। শীর্ণকায়া ওই স্রোতস্বিনীর মহিমা বোঝা অবশ্য আমাদের মতো নদীনালার দেশের মানুষদের পক্ষে একটু কঠিন।

তা যাই হোক, ইয়ারার দু'পাড়ে ছড়ানো মেলবোর্ন শহরটা কিন্তু সত্যিই ভারী সুন্দর। মসৃণ রাস্তাঘাট, ছবির মতো বাড়িঘর, অফিসপাড়ায় আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকার সারি। কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই, সার বেঁধে প্রায় নিঃশব্দে ছুটছে সুশৃঙ্খল গাড়িঘোড়া। নজরে পড়ার সুবিধের জন্য সাইকেল-আরোহীদের গায়ে বাধ্যতামূলক চকচকে পোশাক, মাথায় হেলমেট, বেপরোয়া ভাবে যত্রতত্র রাস্তা পার হচ্ছে না কোনও পথচারী। নজরদারির জন্য পথেঘাটে ঘাপটি মেরে আছে পুলিশের ক্যামেরা।

সুদৃশ্য ট্রাকে মাল যাচ্ছে ঢাকাঢুকি দিয়ে, সভ্যভব্য হয়ে, বর্জ্য ধোঁয়া কাউকে না জ্বালিয়ে উঠে যাচ্ছে ঊর্ধ্বপানে, হাঁপ জিরনোর জন্য ফুটপাথে মাঝেমধ্যেই পরিচ্ছন্ন বেঞ্চি, ইট-কাঠ-সিমেন্ট-ইস্পাতের অরণ্যে সবুজের সমারোহ... মানসচক্ষে কলকাতাকে যেমনটা দেখতে চাই, ঠিক সে রকমই। আমাদের এই পোড়া শহর থেকে প্রায়ই ট্রাম উঠিয়ে দেওয়ার কথা চলে, অথচ, মেলবোর্নের ব্যস্ত এলাকায় ট্রামের কী রমরমা! ঝকঝকে বাহারি ট্রাম সদর্পে চক্কর খাচ্ছে অফিসপাড়ায়।

সাদার্ন ওশানের একটা ফালি (ব্যাস স্ট্রেট) খাঁড়ির মতো ঢুকে এসেছে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। ঝাঁক ঝাঁক সিগালে ভরা সমুদ্রতটটিও ভারী মনোরম। ওই সমুদ্রের ধারেই নাকি শেন ওয়ার্ন থাকেন। বাড়িটা কোথায় খোঁজা হল না।

সমুদ্রের দিকে যাওয়ার পথে চোখে পড়েছিল বেশ কিছু পুরনো ধাঁচের কটেজ। ওগুলো নাকি অস্ট্রেলিয়ায় বাস করতে আসা ব্রিটিশদের গোড়ার দিকের ঘরবাড়ি। এমন কিছু মান্ধাতার আমলের নয় অবশ্য। অস্ট্রেলিয়ায় সাদা চামড়ার মানুষদের ইতিহাসই বা ক'দিনের! সবে তো দুশো পেরিয়েছে। মেলবোর্নের বয়স একশো ষাট-সত্তর। সিডনিতে যখন বন্দিদের নিয়ে ইংরেজদের ল্যাজেগোবরে

দশা, তখনই লেফটেন্যান্ট জন মারে এসে ঘাঁটি গাড়লেন মেলবোর্ন থেকে শ'খানেক মাইল, দূরে, পোর্ট ফিলিপে। সেখানকার আবহাওয়া ছিল ভয়ঙ্কর খারাপ। অ্যান্টার্কটিকা থেকে ধেয়ে আসা কনকনে বাতাস আর উল্টোপাল্টা ঝড়ের দাপটে টেকাই ছিল দায়।

আরও বছর তিরিশ পর জন ব্যাটম্যান নামের এক পশুপালক জাহাজ নিয়ে প্রথম মেলবোর্নে এসে পৌঁছন। তখন ওখানে থাকত ওয়াইওরাং নামের এক আদিবাসী সম্প্রদায়। সাহেবদের যা রীতি, টুপিটাপা দিয়ে, স্রেফ কিছু জিনিসপত্রের বিনিময়ে আদিবাসীদের কাছ থেকে হাতিয়ে ফেলল দু'লক্ষ হেক্টর জমি। পত্তন হল মেলবোর্নের। তারও বছর দশেক পর ইয়ারা নদীর ধারে গড়ে ওঠে বসতি। বাসিন্দা কিছু বন্দি, আর ভাগ্যের সন্ধানে দেশ থেকে চলে আসা কিছু ব্রিটিশ।

এর পর ১৮৫১ সালে হঠাৎই মেলবোর্নের উত্তর দিকে সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেল। ব্যস, দিকে দিকে রটে গেল বারতা। দেশ-বিদেশ থেকে সোনার লোভে ছুটে আসতে লাগল মানুষ, প্রায় ঘুমন্ত মেলবোর্ন সেই হট্টগোলে বনে গেল দিব্যি ঝলমলে মহানগর।

সে নাকি এক আজব সময় গেছে মেলবোর্নে। চতুর্দিকে তখন থিকথিক করছে সদ্য সোনা তুলে আনা সৌভাগ্যবানের দল। তারা শ্যাম্পেন দিয়ে বাথটব ভরাত, পাইপ ধরাত ব্যাঙ্কনোট জ্বালিয়ে, আর রেসের মাঠে ওড়াত লাখ লাখ পাউন্ড। তখন থেকেই শুরু হয় পৃথিবীর সব চেয়ে বিখ্যাত ঘোড়দৌড়। মেলবোর্ন কাপ।

বরাতজোরে ওই কাপের সময়েই গিয়ে পড়েছিলাম মেলবোর্নে। চার দিকে কী উৎসবের ধুম, বাপ্‌স! সাজগোজের নতুন নতুন ফ্যাশনে ছেয়ে গেছে শহরের মল, বিচিত্র টুপি পরে ঘুরছে মেয়েরা। মেলবোর্ন কাপের দিন তো জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে জমকালো শোভাযাত্রা বেরোল রাজপথে। একটা ঘোড়াদৌড়ের জন্য মেলবোর্ন সহ গোটা ভিক্টোরিয়া স্টেটে অফিসকাছারি, স্কুল-কলেজ সব বন্ধ। আস্ত একটা মহাদেশ কাজকর্ম ফেলে দুপুর দুটো থেকে তিনটে চোখ রেখেছে টিভি পর্দায়, ভাবা যায়?

কার না ঘোড়া দৌড়য় এই রেসে! ইংল্যান্ডের রানি, সৌদি আরবের রাজা, আমেরিকার ধনকুবের...। এ বার অবশ্য কাপ জিতল এক জাপানির ঘোড়া। ডেল্টা ব্লুজ। বাঙালিদের দেখি সকলেরই মাথায় হাত। অফিসে অল্পস্বল্প ডলার লাগিয়েছিল যে! অন্য ঘোড়ার পিছনে।

আবার আসি সোনার গল্পে। প্রথম যেখানে সোনা পাওয়া গিয়েছিল, সেই ব্যালারাটে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন মুনিরভাই আর হেমায়েতভাই। এখন ব্যালারাট এক আধুনিক শহর। তবে, মূল খনির জায়গাটায় সযত্নে বানিয়ে রাখা আছে দেড়শো বছরে আগেকার পরিবেশ। ভিক্টোরিয়ান যুগের কাঠের বাড়ি, কাঠের পানশালা, আদ্যিকালের ব্যাঙ্ক, সেকেলে চেহারার দোকান, এবড়োখেবড়ো মাটির রাস্তা, অতীত দিনের পোশাকে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে নারী-পুরুষ— সময়টাই যেন টাইম মেশিনে পিছিয়ে গেছে। একেবারেই কৃত্রিম, তবে আসল বলে ভ্রম হয়। মুগ্ধ হয়ে মাথায় লেসের ব্যান্ড জড়ানো, লম্বা গাউন এক নীলনয়নাকে রাজকুমারী বলে ডেকেও ফেললাম, সে মেয়ে তো হেসে খুন।

সোনার কুচির আশায় বেলচায় খানিক বালি আর পাথরও তুললাম ঘোলা জলের স্রোত থেকে। অন্ধকার গর্তে নেমে দেখে এলাম পাথর খুঁড়ে সোনা পাওয়ার নিখুঁত লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। চার্লি চ্যাপলিনের গোল্ড রাশের সেই অদ্ভুত জায়গায় পৌঁছেছি, ভাবতেই যে কী শিহরণ তখন!

ফিলিপ আইল্যান্ডেও যাওয়া হল এক দিন। প্রতীশদা আর টুকুর সঙ্গে। সিলমাছ আর ফেয়ারি পেঙ্গুইন দেখতে। ভোর থেকে সে দিন মেলবোর্নে টিপটিপ বৃষ্টি। সঙ্গে গায়ে ছুঁচ ফোটানো ঠান্ডা বাতাস। কিন্তু, কী আশ্চর্য, বেলা একটু বাড়তেই ঘন মেঘে ছাওয়া আকাশ দিব্যি পরিষ্কার। দুপুরে তো রীতিমত কড়া রোদ্দুর। মেলবোর্নের নাকি এটাই মজা, একই দিনে চারটে ঋতুই দেখা যায় হঠাৎ হঠাৎ। দক্ষিণ মহাসাগর থেকে বাতাস এল তো ঠকঠক কাঁপো, উত্তরের মরুভূমি হাওয়া পাঠাল তো গরমে ভাজা ভাজা হও। এই রোদ এই বৃষ্টি, এই গরম, তো এই ঠান্ডা—এটাই নাকি টিপিকাল মেলবোর্ন ওয়েদার।

ফিলিপ আইল্যান্ডে অবশ্য ঠান্ডাই ঠান্ডা। হাড়-কাঁপানো হুহু হাওয়া বইছে সর্বক্ষণ। তবে, এ ঠান্ডা নাকি কিছুই নয়, শীতকালে এলে নাকি রক্ত জমে যায়। শুনে বুঝলাম কেন ব্রিটিশরা পোর্ট ফিলিপ থেকে মেলবোর্নের দিকে পা বাড়িয়েছিল। সমুদ্রের ধারে সেখানে পালে পালে সিগাল। কলকাতার কাকের মতো হ্যাংলামি করে তারা, পারলে হাত থেকে খাবার ছিনিয়ে নেয়। তবে, দ্বীপের প্রান্তে,

ব্যাস স্ট্রেটের ধার ধরে, সিলমাছ দেখতে চলেছি, দু'পাশে পাহাড়ের ঢাল ছেয়ে আছে রঙিন ঘাসফুল আর কলরবমুখর সিগালে, এ দৃশ্য চোখে লেগে থাকবে বহুদিন।

আর ফেয়ারি পেঙ্গুইন? সে তো এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। দ্বীপের আর এক প্রান্তে ওই সব খুদে খুদে উকিলবাবুদের বাস। কাকভোরে ঝাঁক বেঁধে সমুদ্রের অনেক ভেতরে চলে যায় তারা, ফেরে সেই সূর্য যখন ডুবুডুবু। মানে, আটটা, সোয়া আটটা। প্রথমে এক জন জল থেকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করে নেয় চার দিক, তার পর সিগনাল দিলে বাকিরা দলে দলে বেরিয়ে আসে সমুদ্র থেকে। অতঃপর দ্রুত পায়ে দুলে দুলে বাসায় প্রত্যাবর্তন। অফিস (সমুদ্র) ফেরত কর্তাকেভ আহ্বান জানাতে গিন্নি দাঁড়িয়ে আছেন গর্তের মুখে, কিংবা পেটে মাছ বোঝাই গিন্নিকে স্বাগত জানাতে কর্তা, দুষ্টুমি করে কোনও কোনও দুশ্চরিত্র টুকুস সেঁধিয়ে যাচ্ছে অন্যের সংসারে, কেউ বা আস্তানা খুঁজে না পেয়ে দিশেহারা, ডাকাডাকি হল্লাগুল্লা চলছে জোর—এ দৃশ্যও কি ভোলা যায়!

ওঃহো, আর একটা গল্প তো বলাই হয়নি। ফিলিপ আইল্যান্ড যাওয়ার পথে হইহই করে একটা ওয়াইনারিতেও ঢুকেছিলাম সে দিন। মালিক এক বৃদ্ধ ইটালিয়ান। নাম জোয়ান্নি। তিনি সগর্বে জানালেন, মাফিয়াদের দেশ সিসিলি তাঁর আদি বাসভূমি। চল্লিশ বছর বয়স অবধি তিনি ছিলেন বাড়ি বানানোর পেশায়, সব ছেড়েছুড়ে এখন আঙুর ক্ষেত নিয়ে মেতেছেন। নিছক ব্যবসায়ী নন, ওয়াইন তৈরি তাঁর প্যাশন। বছরে হাজার পাঁচেক বোতল যদি বানান, তো নিজেরাই সেবন করেন কম করে দু'হাজার বোতল। জোয়ান্নির শোরুমের বাইরে দেখি এক লাউগাছ। শুনলাম, লাউডগার স্যুপ খান জোয়ান্নি, লাউডগা সেদ্ধ করে স্যান্ডুইচের পুর বানান। আর সাধের লাউ ভক্ষণ করেন কুচি কুচি করে কেটে, রসুন দিয়ে ভেজে। অভিনব ইটালিয়ান রেসিপিতে আমরা রীতিমত চমৎকৃত।

ইটালিয়ান খানা অবশ্য মেলবোর্নে উপভোগ করেছি তারিয়ে তারিয়ে। লাউডগার স্যান্ডুইচ নয়, অক্টোপাস স্কুইড অয়েস্টার আর কোয়েল পাখির নানান প্রিপারেশন। গ্রিল্ড বেবি অক্টোপাস। ব্রাসেত্তা। অয়েস্টার ফিলপ্যাট্রিক। কোয়েল আলাভার্দি দিয়ে। মেলবোর্নের লাইগন স্ট্রিটে সার সার শুধু ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ, কাস্টমারদের তারা খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করে।

লাইগন স্ট্রিটে নৈশাহার সেরে রাতের আলো ঝলমল মেলবোর্নও দেখা হল একদিন। ক্যাসিনোয় ঢুকে ভাগ্যপরীক্ষা করতে গিয়ে খোয়ালাম বেশ কয়েক ডলার। চমৎকার রোদ ঝরা দিনে তরুণ-অনসূয়ার সঙ্গে চলে গেলাম গ্রেট ওশান ড্রাইভে। পাহাড় কেটে, সমুদ্রের গা

ধরে, সে এক অনুপম রাস্তা। ইচ্ছে ছিল সেই অবধি যাব যেখানে সমুদ্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এগারোখানা পাহাড়। নাকি বারোখানা? যিশুর বারো জন শিষ্যের মতো?

কিন্তু সে দিন যে আবার জিলংয়ে রানার বাড়িতে বার-বি-কিউয়ে নেমন্তন্ন, অতএব লর্নের সোনালি সৈকত থেকে ফিরতে হল আমাদের।

লর্ন যাওয়ার পথে সাহেব-মেমদের বিয়েও দেখলাম একখানা। মনকাড়া নিসর্গের টানে চার্চ ছেড়ে গাঢ় নীল সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে, প্রাচীন বাতিঘরকে সাক্ষী রেখে, আংটি দেওয়া নেওয়া করছে বর-বউ! আহাঃ কী রোমান্টিক!

তা, খানাপিনা, দেখা, ঘোরা অনেক তো হল। ক্যাঙারুর দর্শন তো মিলল না এখনও। লর্ন থেকে ফেরার পথে তরুণ গাড়ি নিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরেছিল খানিক, ঝুপ করে যদি সামনে এসে পড়ে। মিশন ফেল্ড। নো ক্যাঙারু। শুনে সাহিত্য সংসদের সদস্যদেরও কপালে ভাঁজ। মেলবোর্নের আশে পাশে এত ক্যাঙারু অথচ একটাও দেখানো যাবে না! এ তো প্রেস্টিজ কা সওয়াল। এ দিকে আমাদের মেলবোর্নের মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে।

অগত্যা ছোট্ ছোট্। ড্যান্ডেনং পাহাড়। তরুণ-অনসূয়ার সঙ্গে নারায়ণ-অদিতিও বেরিয়ে পড়েছে ক্যাঙারু অভিযানে। তাদের তরুণী কন্যা মিমিও।

অবশেষে মুখরক্ষা হল, সাক্ষাৎ মিলল বাবুদের। যেখান থেকে মেলবোর্নের জল সরবরাহ করা হয়, সেই কার্ডিনিয়া জলাধারের কাছে পাহাড়ের ঢালে চরছিলেন তাঁরা। প্রথমে ঘাবড়ে চম্পট দিচ্ছিলেন, যেই না ফোটো সেশন শুরু হল, অমনি নট নড়নচড়ন। পোজ দিয়েই চলেছেন নানান ভঙ্গিমায়! টুপটাপ লাফ দেখাচ্ছেন। শেষে এমন হল, হ্যাট হ্যাট করলেও তারা যায় না। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রাণী যে ছবি তোলাতে এত ভালোবাসে, আমার জানা ছিল না।

সে দিন আর একটি পাওনা ছিল বরাতে। উপরি। খানিক দূরে শেরব্রুক ফরেস্টে ভারী সুন্দর পাখি দেখলাম রাশি রাশি। গাছ সাদা করে বসে থাকা হলদে-ঝুঁটি কাকাতুয়া, ডানায় লাল-নীল-হলুদ-সবুজ রং ছোপানো অপরূপ রোজেলা, রংবেরঙি পায়রা। এবং লাফিং কোকাবুরা। পৃথিবীর বৃহত্তম মাছরাঙা। শেষ বিকেলে এক ঝটকায় এতগুলো পাখি দেখতে পেয়ে খুশিতে তর হয়ে গেল মনটা।

রাতে সে দিন বিদায়-ভোজ রিংকু-রঞ্জনদের বাড়ি। সঙ্গে গান, আবৃত্তি, বাঁশি, মাউথ অর্গানের জমজমাট আসর। বিদেশে বেড়ে ওঠা অল্পবয়সী মেয়েরাও কী চমৎকার শুদ্ধ উচ্চারণে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাংলা গান গাইল। এরা যে দেশেই থাকুক, বাংলা ভাষাকে এরা মরতে দেবে না, এ আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

ডেরায় ফিরে গুছিয়ে নিলাম বাক্সপেঁটরা। কাল সকালেই আমাদের বেরিয়ে পড়ার কথা। সিডনির পথে।

সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছিলাম মেলবোর্ন থেকে। গাড়িতে। সারথি, প্রতীশদা। সঙ্গে তাঁর ঘরণী টুকু। প্রথমে কথা হয়েছিল মেলবোর্ন থেকে সিডনি প্লেনেই যাব, আমিই কাঁচিয়ে দিয়েছি প্ল্যানটা। দূর! হুস করে উড়ে গেলে দেশ দেখা যায় নাকি? যেতে হয়ে ধীরে, সুস্থে, চার পাশটা দেখতে দেখতে, অচেনা পৃথিবীটাকে চাখতে চাখতে। সে দিক দিয়ে আমার পছন্দ ছিল ট্রেন, তবে টুকুর তরফ থেকে গাড়িতে যাওয়ার প্রস্তাব পেয়ে মোটেই আপত্তি করিনি। যে ভাবে খুশি চলব, যেখানে ইচ্ছে থামব, রাত্তিরে থেকে যাব কোনও এক নাম-না-জানা শহরে— এর চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত আর কী?

তবু, মনে একটা সঙ্কোচও ছিল। মেলবোর্ন থেকে সিডনির দূরত্ব প্রায় নশো কিলোমিটার। অস্ট্রেলিয়াকে বেড় দিয়ে থাকা প্রিন্সেস হাইওয়ে দিয়ে গেলে সময় লাগে প্রায় দশ ঘণ্টা. এতটা পথ প্রতীশদা গাড়ি চালিয়ে যাবেন, আবার পর দিনই ফেরা...। শুধু তা-ই নয়, হাইওয়ে ছেড়ে অন্য একটি সিনিক পথ দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবেন প্রতীশদা। ঘুরপথে সময় বেশি লাগবে, তবে বেড়ানোর সুখটা নাকি হবে জব্বর। কিন্তু, তার জন্য বছর বাষট্টির মানুষটার ওপর বেশি ভার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না তো?

প্রতীশ ব্যানার্জি অবশ্য হতবাক করে দিয়েছেন। দু'দিনের দীর্ঘ যাত্রায় এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ক্লান্ত দেখিনি। আমরা হয়তো খেয়েদেয়ে ঢুলছি, প্রতীশদা কিন্তু সর্বদা টানটান। যেন এক টগবগে তরুণ। উৎসাহী স্বরে পথের ধারাবিবরণী দিয়ে চলেছেন অবিরাম। কোথায় কখন বুশ ফায়ার হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়ার কোথায় ব্রাউন

কয়লা পাওয়া যায়, কোথায় বা সোনা। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়, এত দিন প্রবাসে থেকেও প্রতীশদার বাংলায় কোনও সাহেবি টান নেই। পেশায় বৈজ্ঞানিক এই ভদ্রলোকটি ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্ত। নিজে ভালো বাঁশি বাজাতে পারেন। সেতারও। গৃহকর্মেরও তিনি বিশেষ দক্ষ। ওপেল কাটার আজব নেশা আছে, আবার ছবি তোলারও। এছাড়া, তিনি এখন মেলাবোর্নের সব চেয়ে ব্যস্ত বাঙালি পুরুত। তরুণও অবশ্য পুরুতগিরি করছে আজকাল। মাউথ অরগ্যানে দক্ষ শিল্পী, খড়গপুর আই আই টি-র ইঞ্জিনিয়ার তরুণ ভট্টাচার্য তো আমরা মেলবোর্নে থাকাকালীনই টুকুস করে একটা গৃহপ্রবেশের পুজো সেরে এল। বিদেশে থাকলে যে বাঙালিরা কত ভাবে বিকশিত হয়!

যাই হোক, আমাদের সিডনি যাত্রাটা গোড়া থেকেই খুব জমে উঠেছিল। পাঁচ মিনিট পর পরই প্রতীশদার হাত ঘুরে যাচ্ছে পিছনে। টুকু, আমায় একটা ললি দাও! টুকু, এক টুকরো কাঁচামিঠে আম দাও! লজেন্স কিংবা আম মুখে পুরেই নতুন উদ্যমে শুরু হচ্ছে ধারাভাষ্য। এই দেখুন, পাশ দিয়ে রেল-লাইন চলেছে। ওই দেখুন, ছোট্ট শহরেও একটা ওয়ার মেমোরিয়াল।

হ্যাঁ, ওয়ার মেমোরিয়াল একটা লক্ষ করার ব্যাপার বটে! অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ব্রিটিশদের তো এক ধরনের গাঁটছড়া বাঁধা আছে, তাই ব্রিটিশরা যেখানেই যুদ্ধ করতে যায়, অস্ট্রেলিয়ান সেনাও সেখানে যাবেই। এবং মরবে অনেকে। তাদের স্মৃতিতে ছোট বড় প্রতিটি শহরেই একটা করে স্মৃতিস্তম্ভ। ক্যানবেরার ওয়ার মেমোরিয়াল তো রীতিমত দ্রষ্টব্য বস্তু। যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের সংগঠনও আছে শহরে শহরে। রিটার্নড সোলজারস লিগ। আর এস এল। অস্ট্রেলিয়ায় এদের বেশ দাপট। পয়সাও। নানান রকম চারিটি শো করে ডলার তোলে এরা, জুয়ার আসরও বসায় কোথাও কোথাও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত এক অস্ট্রেলিয়ান সৈনিকের দাদার সঙ্গে আলাপ হল পথে। তিরাশি বছরের কিথ প্রতীশদা আর টুকুর পারিবারিক বন্ধু। থাকেন মেলবোর্ন থেকে বেশ কিছুটা দূরে, এক ছোট্ট ছিমছাম শহর। ব্যাচেলর মানুষটি এই বয়সেও যথেষ্ট কর্মঠ, বাগান আর সমাজসেবা করে দিন কাটান। চল্লিশের দশকে মারা যাওয়া ভাইয়ের স্মৃতি এখনও তাঁর মনে জ্বলজ্বল করছে। ওই বিচ্ছিন্ন মহাদেশে এরকম আরও কত মানুষ যে সর্বনাশা যুদ্ধের দগদগে ঘা বয়ে বেড়াচ্ছে বুকে!

তা, খেতে খেতে, থামতে থামতে, দেখতে দেখতে ভালই যাচ্ছিলাম আমরা। তাসমান সাগর থেকে স্থলভূমিতে ঢুকে আসা লেক এন্ট্র্যান্সের শোভায় মোহিত হয়ে, কান নদী পেরিয়ে প্রিন্সেস হাইওয়ে ছেড়ে ঢুকে পড়লাম নৈসর্গিক রাস্তায়। দূরে দিগন্তে আবছা পাহাড়ের সারি, পথের দু'ধারে হয় ঘন জঙ্গল, নয় অনন্ত চারণভূমি। জনমনিষ্যিহীন প্রান্তরে শয়ে শয়ে ভেড়া কিংবা গরু চরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কটেজ, কী ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে। এত ফাঁকা, এত নির্জন যে, মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। হিংসেও হয় একটু একটু। আমাদের এইটুকু রাজ্যেই প্রায় আট ন'কোটি মানুষ, আর ভারতের প্রায় আড়াই গুণ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা মাত্র দু'কোটি—কেন যে এমন হয়! অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার মধ্যিখানটা নেহাতই বন্ধ্যা। মরুভূমি। মানুষের বসতি তো শুধুমাত্র সমুদ্র উপকূল আর তার আশপাশে। লোক তো এখানে কম হবেই। তবু, বিকেলের দিকে যখন একের পর এক জনপদ পেরচ্ছি, তখন এক আজব অনুভূতি। কী সুন্দর ছবির মতো এক একটা শহর! নিয়ম মতো গির্জা, স্কুল, পেট্রল পাম্প, একটা ম্যাডোনাল্ডস, কিংবা একটা কে এফ সি, কিংবা হাংরি জ্যাক, আলো-ঝলমল শপিং সেন্টার, সবই আছে, এমনকী কটেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মালিকের গাড়িটিও, কিন্তু কোথাও একটা লোক নেই। হুবহু রূপকথার ঘুমন্ত পুরী যেন।

এমন এক নির্জন দেশে রাস্তাতেও যে মানুষজনের দেখা পাওয়া যাবে না, এটা তো স্বাভাবিক। যায়ওনি। শুধু, মাঝে মাঝে উল্টো দিক থেকে ধেয়ে আসা এক-আধটা গাড়ি, কখনও বা সামনে এসে পড়া অতিকায় ট্রাক, কিংবা কোনও উদাসী মানুষের ক্যারাভ্যান, বলে দেয় আছে, আছে, লোক আছে।

যাত্রার আগে একটা আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন প্রতীশদা। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাব, পথে বুশ ফায়ার শুরু হলেই চিত্তির। এই বসন্ত আর গ্রীষ্মকাল নাকি বুশ ফায়ারের আদর্শ সময়। তার ওপর পৃথিবীর এই শুষ্কতম মহাদেশে বছর কয়েক ধরে খরা চলছে, দাবানলও তাই বেড়েছে খুব। তা, আগুনের মুখোমুখি না পড়লেও তার

নমুনা দেখলাম স্বচক্ষে। মাইলের পর মাইল গামট্রি-র মিছিল পুড়ে কালো হয়ে আছে প্রতীক্ষা করছে পরবর্তী দাবানলের।

এই সব জঙ্গল পেরিয়ে, ছোট ছোট পাহাড় টপকে, পটে আঁকা ছবির মতো মাঠঘাট অতিক্রম করে সন্ধের মুখে মুখে পৌঁছলাম কুমায়। স্নোয়ি মাউন্টেনের কোলে ছোট্ট শহর, কনকনে ঠান্ডা। মোটেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাতটুকু কাটিয়ে গাড়ি ফের ছুটল স্নোয়ি মাউন্টেনের আরও ভেতরে। স্নোয়ি মাউন্টেন নিয়ে অজস্র উপকথা আছে অস্ট্রেলিয়ায়। বিখ্যাত কবি ব্যান্জো প্যাটারসনের অনুপম ব্যালাড 'দা ম্যান ফ্রম স্নোয়ি রিভার' তো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। অস্ট্রেলিয়ায় আসা প্রথম যুগের লড়াকু মানুষদের প্রতীক হিসেবে ওই চারণগাথার নায়ক অস্ট্রেলিয়ায় দারুণ জনপ্রিয়। ব্যান্জো প্যাটারসনের মূর্তিও আছে জল-টলটল নীল লেক জিন্ডাবাইনের পাড়ে। শুনলাম, লেকের জল নাকি শীতকালে জমে বরফ হয়ে যায়, তখন স্কিইং করতে চলে আসে বহু পর্যটক।

পাহাড় ঘেরা মনোহর হ্রদটিকে ছেড়ে এবার গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ বেয়ে সোজা ক্যানবেরা। শান্তশিষ্ট, সবুজ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী। মেলবোর্নে ক্যাঙারু দেখার জন্য অত ছটফট করেছি, এ দিকে ক্যানবেরা যাওয়ার সময়ে রাস্তায় মাঝে মাঝেই ক্যাঙারু। জ্যান্ত নয় মরা। হঠাৎ গাড়ির সামনে এসে গেলে হেডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায় বেচারাদের, বেঘোরে প্রাণ হারায়। যাই হোক, আমার ক্যাঙারু-দর্শন বুঝি পরিপূর্ণ হল ক্যানবেরার রেস্তোরাঁয়। ক্যাঙারু-পাই খেতে খেতে। মাঝে ক্যাঙারু-ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল, এখন জীবটি সংখ্যায় বৃদ্ধি পাওয়ায় বারণ-টারন আর নেই। মন্দ নয় মাংসটা, দিব্যি সুস্বাদু। অনেকটা হরিণের মাংসের মতো।

ক্যানবেরায় অন্য একটা অস্ট্রেলিয়াকেও দেখতে পেলাম আচমকা। পুরনো পার্লামেন্ট ভবনের সামনে তাঁবু খাটিয়ে বসে আছেন আদিম জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ। বিদেশিরা তাঁদের মাটি কেড়ে নিয়েছে, তারই প্রতিবাদে ১৯৭২ সাল থেকে টানা ধর্না চালাচ্ছেন। নিজেরাই নিজেদের তাঁবুর নাম দিয়েছে অ্যাবরিজিন'জ পার্লামেন্ট। দুই কৃষ্ণকায় মহিলা ছিলেন তাঁবুতে, কথাবার্তা বলে বুঝলাম অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁদের বিস্তর অভিযোগ। লেখা পড়া শেখানোর নাম করে সাহেবরা তাঁর কোল থেকে ছেলেমেয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে, ফলে একটা আস্ত প্রজন্মই নাকি বাপ-মা, পরিবার, পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পুরোপুরি। এটা নাকি সুপরিকল্পিত শিশুহত্যা। ভূমিপুত্রদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত।

অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের বেশ কিছু শিল্পকর্মের নমুনা দেখে এসেছি মেলবোর্নে। ব্যুমেরাংয়ের গায়ে, আরও নানান টুকিটাকি সামগ্রীতে। শুনেছি ডিরিজিডুর মোহময় সুর। মোটা লম্বা বাঁশের চোঙে ফুঁ দিয়ে অমন সুর বার

করা সহজ কথা নয়। আদিবাসীদের দাবি মিটবে কি না জানি না, তবে ওই সব চিত্রকলা আর সুরকে বাঁচিয়ে রাখার কিন্তু একটা আলাদা মূল্য আছে। নয় কি?

ক্যানবেরা ছেড়ে বেরতে বেরতে বিকেল প্রায় পাঁচটা বাজল। এ বার হিউম হাউওয়ে ধরে সোজা সিডনি। নোঙর ফেলব সিডনির শ্রীমন্ত মুখার্জির বাড়িতে। তা, প্রতীশদা খালি শ্রীমন্তর ঠিকানা জানেন, বাড়ি চেনেন না। তবে, সমস্যা হল না। গাড়িতে লাগানো জি-পি-এস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) নিখুঁত ভাবে পৌঁছে দিল শ্রীমন্তর দরজায়। কাজের দিনের রাত দশটাতেও শ্রীমন্তর বাড়ি তখন বাঙালি মুখে টইটম্বুর। মেলবোর্নের বাঙালিদের মতো এঁরাও দিব্যি সাহিত্য-অনুরাগী। এস এম জি আয়োজিত সাহিত্যসন্ধ্যায় এঁরাই শ্রীমন্তর বিশেষ বল-ভরসা। অবশ্য, তার সঙ্গে শ্রীমন্তর বউও আছে। মিষ্টি।

মেলবোর্নেই টের পেয়েছিলাম, সিডনি আর মেলবোর্নে একটা সূক্ষ্ম রেষারেষি আছে। সিডনিতে এসে ব্যাপারটা বেশ খোলামেলা হয়ে গেল। সিডনি বলে সিডনিই সেরা, মেলবোর্ন বলে মেলবোর্ন। এই টানাপোড়েনের জন্যই কি মেলবোর্ন সিডনি ছেড়ে ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী হয়েছে?

সত্যি কথা বলতে কী, সিডনি আর মেলবোর্নের চেহারায় একটা পার্থক্য কিন্তু আছেই। মেলবোর্নের আছে একটা ধ্রুপদী আভিজাত্য, তুলনায় সিডনি অনেক বেশি আধুনিক, অনেক বেশি কসমোপলিটান। আয়তনেও সিডনি বেশ বড়। ভারেও। হবে না-ই বা কেন, সিডনিই তো অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশদের আদি শহর। ১৭৭০ সালে এই শহরেই জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন ক্যাপ্টেন জেমস কুক। আর, তার বছর কুড়ি পর থেকে নির্বাসিত বন্দিদের পাঠানো শুরু হয় এই মহাদেশে। অর্থাৎ, মেলবোর্ন তৈরি হওয়ার বছর চল্লিশ আগে। সিডনিতে গাড়িঘোড়া, মানুষজন, ভিড়ভাট্টা সবই একটু বেশি বেশি। সিডনি হারবার অঞ্চলটা তো মানুষে মানুষে গমগম করে। কোন দেশের লোক যে এসে আস্তানা গাড়েনি সিডনিতে! গ্রিস, ইটালিয়ান, লেবানিজ, কোরিয়ান, চাইনিজ তো মেলবোর্নেও দেখেছি, কিন্তু সিডনিতে এঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। চিনারা তো প্রায় প্রতি দিনই বাড়ছে। ভিয়েতনামি, তাই, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ানও কম নেই। আছে পূর্ব ইউরোপের অনেক মানুষও। শ্রীমন্তদের বাড়ির পিছনেই তো একখানা রুমানিয়ান অর্থোডক্স চার্চ। কালো মানুষরা সিডনিতে একটা আস্ত ব্ল্যাক টাউনই বানিয়ে ফেলেছে।

আর বাঙালি? মেলবোর্নে শ'তিনেক এ-পার বাংলার পরিবার, তো শ'পাঁচেক ও-পার বাংলার। সিডনিতে সংখ্যাটা প্রায় দ্বিগুণ। আধ ডজন দুর্গাপুজো হয় সিডনিতে, রেডিয়োয় বেশ কয়েকটা বাংলা চ্যানেল চলে, নিয়মিত বাংলা পত্রিকা বেরোয় কয়েকখানা, আছে বাংলা টিভি চ্যানেলও। অর্থাৎ, বাংলাভাষার স্বাস্থ্য সিডনিতে খারাপ নয়। অনেকটাই অবশ্য ও-পার বাংলার দৌলতে। তবে, অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠানে মেলবোর্নের মতোই গঙ্গা-পদ্মা হাত ধরাধরি করে আছে। সাহিত্যসন্ধ্যার দিন বাংলাদেশের ডালিয়া চৌধুরি, বনি আমেদ, জিয়া আহমেদেরা নিষ্ঠা ভরে কী পরিশ্রমটাই করলেন! প্রত্যয়-অর্পিতা, অঞ্জলি-গোরা, আশিস-শম্পা, দীপেন-স্মরণি, বাবলুবাবুদের পাশাপাশি। নাটকে অভিনয় করল শর্মিলার সঙ্গে মানিজে আবেদিন। বেশ লাগে দেখতে।

সিডনির কিছু স্মৃতি বুঝি কোনও দিনই মন থেকে মোছা যাবে না। এই শহরেই প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। মিষ্টি আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিল কায়ামায়, পথে পড়ল বুলাই লুক আউট। অনেকটা উঁচু থেকে প্রশান্ত মহাসাগরকে দেখে বুকটা শিরশির করে উঠল। সেই একই নীল জল, ঢেউগুলোও পুরীর বঙ্গোপসাগরের মতোই, তবু যেন কেমন অন্য রকম। পৃথিবীর মোট স্থলভূমিকে যে মহাসমুদ্রটা ঢেকে দিতে পারে, যার অতল গহ্বরে ডুবে যাবে মাউন্ট এভারেস্ট, ঝড় উঠলে যার ঢেউ তিন তলা ছাপিয়ে যায়, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে গা ছমছম না করে পারে? পাশেই গাছে কাকাতুয়া, মাটিতে অস্ট্রেলিয়ান সাদা-কালো কাক ম্যাগপাই...অন্য দিন হলে জুলজুল চোখে দেখতাম তাদের, সে দিন যেন নজরেই পড়ল না।

কায়ামা পৌঁছেও ঘোরটা লেগে ছিল চোখে। সেখানে আর এক ভেলকি। মহাসাগরের ঢেউয়ের ধাক্কা পাথরে তৈরি করেছে গর্ত। ব্লো-হোল। সমুদ্রের জল ব্লো হোলে ঢুকে বসনতুবড়ির মতো নেচে উঠছে। ব্লো-হোল ফিলিপ আইল্যান্ডেও দেখেছি, তবে, ভাঁটা চলছিল বলে জলের

খেলাটা দেখা হয়নি। গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে হঠাৎ হঠাৎ বেহিসেবি স্পিডে চড়ে যাওয়া সাদা মনের মেয়ে মিষ্টি খুব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখাল আমাদের। অস্ট্রেলিয়ার স্পেশাল ডিশ ফিশ অ্যান্ড চিপ্‌স আর এক বার খাওয়া হল কায়ামায়। ফিলিপ আইল্যান্ডের মাছটা ছিল হোয়াইটিং, কায়ামায় বারামুণ্ডি। তপসে আর ভেটকির জাতভাই দু'জন।

এরপর আরও কয়েক বার মোলাকাত হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে। ম্যানলি বিচে, বন্ডাই বিচে...। তবে, রথীন মুখোপাধ্যায় আর বিবি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শহরের উত্তর প্রান্তে নর্থ হেডে গিয়ে মহাসমুদ্রটাকে দেখা একটা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। অনেকটা উঁচু খাড়া পাহাড়, তার পায়ে আছাড় খাচ্ছে ঢেউ, ফেনায় ফেনায় অপূর্ব আলপনা আঁকা হয়ে যাচ্ছে জলতলে...সে এক অপার্থিব ছবি। ক্ষ্যাপা লোকেরা কি ওই সৌন্দর্যের টানেই গাড়িসুদ্ধ ঝাঁপ মারত সমুদ্রে? পাহাড়ের ওপর ভাগটা তাই অত মজবুত করে ঘিরে দেওয়া হয়েছে?

সমুদ্রের দিকে গিয়েছিলাম নদীপথেও। মেডো ব্যাঙ্ক থেকে সুদৃশ্য লঞ্চে চেপে, পারামাট্টা নদী বেয়ে সোজা মোহনায়। সিডনি হারবার। লঞ্চ যত এগোচ্ছে, কাছে আসছে সিডনির স্কাইলাইন, বিখ্যাত সিডনি হারবার ব্রিজ, অত্যাশ্চর্য সিডনি অপেরা...ফুরফুরে হাওয়ায় ডেক-এ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে কী ভাল যে লাগছিল! ফেরিঘাটে নেমে, প্রায় বাবুঘাটের ভিড় টপকে, সোজা চলে গেলাম অপেরা হাউসের সামনে। আহা! কী চোখ-জুড়ানো স্থাপত্য! যেন সমুদ্রের ধারে পাপড়ি মেলছে এক পদ্মফুল! আমাদের সে দিনের সঙ্গী মালা ঘোষের সৌজন্যে চড়া হয়ে গেল সরকারি বাসেও। মর্সিডিজ কোম্পানির তৈরি বাস। ইস! আমাদের দেশে যে কবে ওই সব বাহারি বাস আসবে! শহরে যথেষ্ট বাস আর ট্রেন চলে সিডনিতে। পাতালরেল সিডনিতে চড়া হয়নি, মেলবোর্নেও না।

ট্রেনে চড়ার শুধু একটাই সুযোগ এসেছিল। হয়নি। ঝকঝকে আধুনিক ট্রেন নয়, সে ছিল আদ্যিকালের রেলগাড়ি। চলে ট্যুরিস্টদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। কপাল খারাপ, সে দিনের মতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সার্ভিস। ব্লু মাউন্টেনের আশেপাশেই নাকি ঘুরত-ট্রেনটা। অবশ্য ব্লু মাউন্টেন আমরা তার আগেই দেখে এসেছি। সিডনি থেকে শ'খানেক মাইল দূরে নীল পাহাড়ের ধারে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল সোমা আর দিব্যেন্দু। সোমার মা-ও ছিলেন সঙ্গে। মেয়ে আসন্নপ্রসবা বলে সিডনিতে এসেছেন তিনি, আর মেয়ের কখন কী হয়ে যায়, সেই ভয়ে ঠকঠক কাঁপছেন। তা, ডাকাবুকো মেয়ের সে হুঁশ থাকলে তো! নিজে গাড়ি চালিয়ে ব্লু মাউন্টেন যাবেই, থ্রি সিসটার্স নামের তিনখানা বাঁটকুল পাহাড় আমাদের দেখাবেই, কাটুম্বাতে কালামারি খাওয়াবেই। ফেরার পথে অবশ্য বউকে আর স্টিয়ারিং ধরতে দেয়নি দিব্যেন্দু। পর দিনই তো সোমা ভর্তি হল হাসপাতালে, জন্ম দিল মেয়ের। সোমার সাহস দেখে আমি থ।

এ ভাবেই ছুটে বেড়িয়ে হুস করে কখন ফুরিয়ে গেল সিডনির দিনগুলোও। সিডনির মধ্যমণি অঞ্চলটাকে তো দিনের বেলা চুটিয়ে দেখেইছি, রাতের সিডনিও দেখলাম সিডনি ছাড়ার আগে দিন। সে দিন গাড়ি চালাল শ্রীমন্ত, শর্মিলা আর শর্মিলার বর বাবলুবাবু আমাদের গাইড। আলোয় উদ্ভাসিত সিডনি অপেরা যেন নতুন করে দেখলাম রাতে, দেখলাম আলো-ঝলমল হারবার ব্রিজ, উলুমুলু পোর্ট। শুনলাম লেডি ম্যাকনির গল্প। মহিলার স্বামী নাকি সমুদ্রে যেতেন, আর স্বামীর জাহাজ কবে ফিরবে, তার প্রতীক্ষায় চেয়ারের মতো দেখতে এক পাথরে বসে থাকতেন মহিলা। দিনের পর দিন। বেচারি।

তা, রাতের সিডনি দেখতে বেরিয়ে রেড লাইট এলাকাই বা বাকি থাকে কেন! রাতভোর জেগে থাকা ওই পাড়াটাও প্রদক্ষিণ করে এলাম বার দুয়েক। সুন্দরী সুন্দরী মেমসাহেব দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথে, বই পড়ার ছলে অপেক্ষায় আছে খদ্দেরের, দেখে কেমন ইংরেজি সিনেমার দৃশ্য বলে মনে হয়।

ব্যস, এর পরেই তো নতুন দেশ দেখা শেষ। কাকভোরে সিডনি এয়ারপোর্ট। রাস্তায় এক দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ টানেল, যেন ফুরোতেই চায় না। ও-পারে বেরিয়ে দেখি আমরা বিমানবন্দরের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি।

সিঙ্গারপুরগামী প্লেনে উঠে আবার টানেলটার কথা মনে পড়ল এক বার। শেষ মুহূর্তে ওই লম্বা সুড়ঙ্গটার বোধহয় খুব প্রয়োজন ছিল। ও-পারে রয়ে গেল সিডনি, মেলবোর্ন, ক্যানবেরা, স্নোয়িং মাউন্টেন...। তাদের ছবি মনে এঁকে এ-পার থেকে ফিরছি আমি। ফিরছি।

হাসির গল্প

পায়রা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার দিদিটা পুরো একটা পাগলি। স্কুলে গরমের ছুটি। এই সময়টায় স্কুল বিল্ডিং রঙ করা হয়। মহা বিপদ হয় পায়রাদের। রঙমিস্ত্রিরা পায়রা-টায়রা বোঝে না। ভারায় উঠে ভলভল করে বিড়ি টানে, গলগল করে গান গায়। খ্যাস খ্যাস করে রঙের পোঁচড়া মারে। বাসা থেকে পায়রার ডিম ফেলে দেয়। পায়রাদের বসতে দেয় না, থাকতে দেয় না। স্কুলের গায়েই নন্দদের বিশাল বনেদি বাড়ি। টেরিফিক বড়লোক। জীবনে কখনো রুটি খায়নি। লুচি আর পরোটা। কথায় কথায় পোলাও। পাঁঠা আর মুরগির ভুষ্টিনাশ। বাড়ির ছোট ছেলেরা কমলাভোগ দিয়ে ক্রিকেট খেলে। আইসক্রিমে মানিপ্ল্যান্ট। গিজগিজ করছে গাড়ি। লাল, নীল, হলদে, সবুজ। নন্দদের অনেক বেড়াল। খেয়ে খেয়ে এক-একটা কেঁদো বাঘের বাচ্চা। এদের মধ্যে একটা বেড়াল ছোটলোক শয়তান। রোজ একটা করে পায়রা ধরবেই ধরবে। এক নম্বরের জানোয়ার। হুমদো মতো দেখতে। মেটে মেটে গায়ের রঙ।

এক ঝাঁকানিতে ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় চাঁদের

আলো এসেছে। দিদি ঝুঁকে আছে মুখের ওপর। রাত কটা কে জানে! থানার পেটা ঘড়ি একটু পরেই হয়তো বাজবে। জানলার বাইরে ঝপ ঝপ শব্দ করে কি একটা উড়ে গেল। রোজই যায়, দেখতে পাই না। দিদি বলে, পরী। বিদ্যাধরীতে চান করতে আসে। আমাদের গ্রামের একটা মেয়ে লক্ষ্মীপুজোর রাতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ফকির দাদু বলে, সে পরী হয়ে গেছে। লক্ষ্মীর পুজোর রাতে মেয়ে অদৃশ্য হলে বুঝতে হবে সে পরী হয়ে গেছে। ছেলে অদৃশ্য হলে, দেবদূত। যদি হঠাৎ কোনো কুকুর লক্ষ্মীপুজোর রাতে অদৃশ্য হয়ে যায়, সে নির্ঘাত হবে যমদূত। এ-সব আমাদের হরিদার একেবারে মুখস্থ। নলহাটির গুরুদেব কৃপা করে শিষ্যকে এই সব জ্ঞান দিয়েছেন। সেই গুরুদেবের এমন ক্ষমতা নিজেকে ইচ্ছামতো ছোট-বড় করতে পারেন। এই শিশুর মতো ঘরের মেঝেতে হামা দিচ্ছেন তো কিছুক্ষণ পরেই সাত-আট ফুট লম্বা একটা মানুষ বোম্বাই আম পাড়ছেন।

দিদির উত্তেজিত গলা, 'শিগ্‌গির ওঠ, শিগগির ওঠ।'

'কেন কী হয়েছে?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে। বড় টর্চটা নিয়ে আমার সঙ্গে চল।'

'কোথায় যাব?'

'কোনো প্রশ্ন নয়।'

সদর দরজাটা বিশাল। জমিদারি আমলের। দুজনে ধরাধরি করে খিলটা সবে নামিয়েছি। একটু শব্দ হয়েছে। পাশেই হরিদার ঘর। দরজা খুলে গেল হরিদার ঘরের। ধূপের গন্ধ। কথাটা সত্যি। বাড়ির সবাই যখন ভোঁস ভোঁস ঘোষ, হরিদা তখন পুজোয় বসে।

'চোরের মতো দুজনের কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

দিদির কাঁদো কাঁদো গলা, 'পায়রাগুলো বোধহয় সব মরে গেল!'

'কার পায়রা, কিসের পায়রা?'

'স্কুলের পায়রা।'

'মরে গেল কেন? লেখাপড়ার চাপে!'

'স্কুলবাড়ি মেরামতি হচ্ছে। মদন মিস্ত্রি সব ফোকরে ইট গুঁজে দিয়েছে। পাশেই নন্দদের বাড়ি। বাইশটা বেড়াল। সব কটাই জানোয়ার। ধরছে আর খাচ্ছে।'

হরিদা দালান থেকে উঠোনে নামলেন, 'উপায়? মেজবাবুকে জিগ্যেস না করে কিছু তো করা যাবে না। কিছু তো করতেই হবে। তোমরা আগে মেজবাবুকে ডাকো।'

জ্যাঠামশাই বিছানায় উঠে বসলেন। সব শুনে বললেন, 'বন্দুক নামা।'

দিদি বললে, 'আমরা পায়রাদের বাঁচাবার কথা বলছি, মারার কথা নয়।'

'সে আমি বুঝেছি। পায়রাদের বাঁচাতে হলে নন্দদের বেড়ালগুলোকে পাইকিরি দরে মারতে হবে। ঠাঁই, ঠাঁই, ঠাঁই।'

আমাদের পেছনে হরিদা। হরিদা বললে, 'মারামারি, রক্তপাত, এসব ভালো নয়। পায়রাদের বাসা খুলে দিতে হবে।'

'কে খুলবে?'

'যে বন্ধ করেছে।'

'কে বন্ধ করেছে?'

'ওই যে, মদন মিস্ত্রি।'

'কার হুকুমে? নিশ্চয় কারো হুকুম আছে।'

'সে তো অবশ্যই।'

'এই হুকুম যে দিয়েছে সে নরকে যাবে। সকাল হোক, আমি একটা হুলুস্থুলুস বাধিয়ে দোবো।'

দিদি বললে, 'অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। পায়রারা সব পালক হয়ে যাবে।'

'তা হলে?'

হরিদা বললে, 'মদনকে বিছানা থেকে তুলে ভারায় তুলতে হবে। একটা একটা করে ইট ফোকর থেকে সরাতে হবে। ভোর হওয়ার আগেই কেল্লা ফতে।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'চলো মদন।'

নিশুতি রাত। ফটফটে চাঁদের আলো। নারকোল গাছের ঝিরিঝিরি পাতা বাতাসে দুলছে। টপটপ করে যেন দুধ ঝরে পড়ছে। গঙ্গার পাশ দিয়ে ইট বাঁধানো একটা পথ। চলেছে, চলেছে। নির্জন একটা পল্লীর দিকে। সেখানে সবাই মাছ ধরে। জোয়ার এসেছে কখন। ভরা গঙ্গা। পরের পর, পরের পর নৌকো বাঁধা। টলটল করছে। কালীমন্দিরের চূড়াটা কে বুঝি রুপোর পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে আজ রাতে। ক্রমে গাছের জটলা আরো বাড়ল। ছায়া ছায়া, নির্জন। একের পর এক চালাবাড়ি। দিদি আমার হাতটা ধরে আছে। আমার দিদিটা যে এত সুন্দর, এই চাঁদের আলোর ছায়াপথে না এলে বোঝাই

যেত না ; যেন ছোট্ট মা দুর্গা।

ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, 'ভয় করছে?'

বললুম, 'তুই তো আছিস।'

'এই রকম চাঁদের আলোর রাতে আমরা এবার থেকে বেড়াতে বেরবো। দূর দূর, অনেক দূরে চলে যাব, তখন সূর্য উঠবে। মহাপ্রভুর মন্দিরে কীর্তন জেগে উঠবে।'

উঃ, কি ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে, স্বপ্ন দেখছি।

হারুর খুব সাহস। রাত্তির বেলায় ঘুমোয় না। বিছানায় মটকা মেরে পড়ে থাকে। মা ঘুমিয়ে পড়লেই পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে। দীনবন্ধুদার মাছধরা নৌকোয় চেপে কত দূরে দূরে চলে যায়। একবার গঙ্গার ধারের একটা বড় মাঠে দেখেছিল, একই রকম চেহারার একশোজন বুড়ো ধেই ধেই করে নাচছে। দীনবন্ধুদা তিনবার জোরে জোরে 'রাম, রাম' বলতেই সব অদৃশ্য।

তেঁতুল গাছের তলায় মদনদার বাড়ি। চালে লাউ গাছ। ফুল ফুটেছে। চাঁদের দুধ খাচ্ছে। শিশুর মতো। হারু কিন্তু ঠিক বলেছিল, রাত্তির বেলা মানুষের নাক মোটা মোটা হয়ে যায়, ঠোঁট পুরু পুরু আর চোখ দুটো হয়ে যায় গুহার মতো। হরিদার মুখটা ঠিক ওই রকম দেখাচ্ছে। তাকাতে ভয় করছে। যেন দৈত্যের মুখ।

রাস্তার দিকের ঘর। জানলা খোলা। বেপরোয়া নাক ডাকছে। মশারি ফেলা। মদনদা শুয়ে আছে। পাশে শুইয়ে রেখেছে ইয়া মোটা একটা লাঠি। এত জোরে নাক ডাকছে, মনে হচ্ছে, একটা লরির চালে কেউ শুয়ে আছে।

জ্যাঠামশাই ডাকছেন, 'মদন, মদন।' থেমে গেল নাকের গর্জন। লাঠিটা পাকড়ে ধরেছে। হরিদা বললে, 'মেজবাবু! সাবধান, ঝেড়ে দেবে।'

জ্যাঠামশাই বাজখাঁই গলায় ডাকলেন, 'মদনা!'

ঘুম চটকে গেল। মশারি তুলে মুণ্ডুটা বের করে বললে, 'আই বাপ্! মেজবাবু!'

মদনদা বেরিয়ে এল, 'এত রাতে? আপনি?'

'পায়রাদের উচ্ছেদ করলে কার হুকুমে?'

'আজ্ঞে পায়রা? কার পায়রা?'

'ইস্কুলের পায়রা। যে-ইস্কুলে তুমি মেরামতির কাজ করেছ। ফোকরে ফোকরে পায়রারা থাকত, তুমি সব ইট গুঁজে দিয়েছ।'

'আই বাপ্, সে খবরও পৌঁছে গেছে আপনার কাছে!'

'হ্যাঁ গেছে। এখন চলো।'

'কোথায় যাব?'

'কোথায় আবার, ইস্কুলে। ভোর হওয়ার আগে একটা, একটা করে ইট বের করবে।'

'এই রাতে! অন্ধকারে!'

'অন্ধকার? ফটফট করছে চাঁদের আলো।'

'আপনি কটা পায়রার জন্যে ভাবছেন? ওরা নিজেদের জায়গা ঠিক খুঁজে নেবে।'

'না, নেবে না। ওরা যেখানে ছিল সেইখানেই থাকবে। তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে বের করে দিলে কেমন লাগবে?'

'তা ঠিক।'

'তবে?'

'তা হলে রাতারাতি খুলে দি। ভারা তো বাঁধাই আছে। সকালে খুলতে গেলে ওরা চেল্লাবে।'

'পঞ্চাশ বছর ধরে পায়রারা ওখানে আছে। ওটা ওদের জায়গা। ওরা আদালতে গেলে কি হবে? রায় ওদের দিকেই যাবে।'

'আজ্ঞে, আদালতেও পায়রা আছে। রাজভবনে আছে। পায়রা কোথায় নেই!'

মদনদা ভারায় উঠছে আর বলছে, 'নিজেকে কিরকম যেন চোর, চোর মনে হচ্ছে।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'বকবক না করে ইট খোলো।'

একশো-দেড়শো পায়রা কার্নিশে সার দিয়ে বসে আছে। অসহায় ছবি। মদনদা তাদের কাছাকাছি পৌঁছতেই

সব ছুটে এল যেন আদর করতে। মাথায় বসছে, কাঁধে বসছে। ডানার ফট্‌ফট্ শব্দ। মদনদা ওপর থেকে বললে, 'মেজবাবু! আদরের বহরটা একবার দেখুন। এরা মানুষের চেয়ে ঢের ভালো।' পাশের পাঁচিলে নন্দদের সেই খুনি গোদা বেড়ালটা ঘাপটি মেরে পাতার আড়ালে বসেছিল। ম্যাও শব্দ করে জানিয়ে দিল, মদন, ঠিক ঠিক।

কাজ যখন শেষ হল, ঘড়িতে তখন তিনটে। পুব আকাশে আলো ফুটছে। সূর্যদেব আসছেন। বিরাট একটা রুপোর থালা চাঁদ পশ্চিমে গঙ্গার জল ছুঁয়েছে। শেষ রাতে চাঁদের চান। ঝিলিমিলি আলোর পথ এপারে চলে এসেছে।

মদনদা ভারা থেকে নেমে এল থুপুস করে। গঙ্গার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। নিজের মনেই বলছে, 'বাপরে! পৃথিবীটা কী সুন্দর! জানাই ছিল না শেষ রাতে এত সব কাণ্ড হয়। চাঁদটাকে আকাশ থেকে পেড়ে এনে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিলেই হয়।'

'ভালো একটা দেয়াল চাই', জ্যাঠামশাই বলছেন, 'যে-দেয়ালে চাঁদ ঝুলবে। আজই তোমাকে আমি গঙ্গার ধারে তিনকাঠা জমি রেজিস্ট্রি করে দোবো, বাড়িটা তুমি করে নেবে। রাজমিস্ত্রি! অন্যের বাসস্থান করে দিয়ে জীবন কাটালে, নিজের জন্যে কিছুই করা হল না।'

মদনদা জ্যাঠামশায়ের পায়ে সাষ্টাঙ্গ। ওপরে পায়রারা ডানার তালি বাজাচ্ছে।

www.banglabooks.in

সামাজিক গল্প

তিনটি ছবির রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

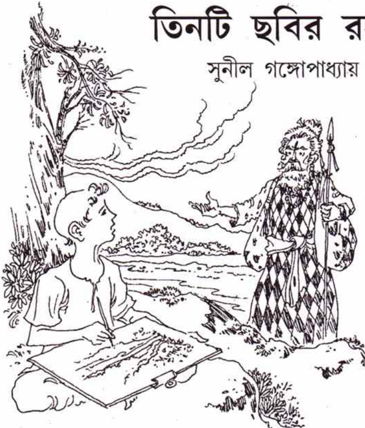

মধুপুরে আমার মামাবাড়ির পাশেই ছিল একটা শুকনো নদী। আমি কোনওদিন সে নদীতে এক ফোঁটাও জল দেখিনি। কিন্তু একসময় নাকি সে নদীতে সারা বছরই জল থাকত, কুলুকুলু করে স্রোতের শব্দও হত।

এখন নদীটা একেবারে মজে গেছে।

শুধু দু'দিকের উঁচু পাড়ের মাঝখানে খাতটা বোঝা যায়।

যখন এ নদী জ্যান্ত ছিল, তখন এর নাম ছিল মধুবংশী। নামটা শুনতে সুন্দর, কিন্তু কেন এরকম নাম তা এখন আর কেউ জানে না।

ছোটবেলায় আমরা ওই শুকনো নদীর খাতে নেমে লুকোচুরি খেলতাম। একটু বড় হবার পর আমি ওখানে একটা শিমুল গাছের তলায় বসে ছবি আঁকতাম রোজ।

আর্ট কলেজে ভর্তি হবার পর আমাদের মাস্টারমশাই অশোকদা বলে দিয়েছিলেন, যখনই সময় পাবে একটা বড়ো খাতায় স্কেচ করবে। চোখের সামনে যা দেখবে, তাই-ই এঁকে ফেলবে। যা চোখের সামনে নেই, এমন কিছুও মন থেকে আঁকতে পারো। ভালো হোক, খারাপ হোক, এঁকে যাবে। ভালো আঁকা শেখার এই একমাত্র উপায়।

অশোকদার সেই কথা শুনে আমার নেশা ধরে গিয়েছিল। বড় খাতাটা নিয়ে ঘুরতাম সব সময়, যেখানে-সেখানে বসে শুরু করতাম আঁকা। হাওড়া স্টেশনে এসে একদিন জানা গেল, ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট, অপেক্ষা করতে হবে। অমনি আমি প্ল্যাটফর্মে বসে পড়ে স্কেচবুকটা খুলে শুরু করে দিয়েছি আঁকতে।

বছরে দু'বার আমরা যেতাম মধুপুর। গরমের ছুটিতে, আর পুজোর সময়।

আমার দাদু খুব শখ করে এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন। বাড়িটা তেমন বড় নয়, কিন্তু অনেকখানি বাগান। আর একপাশে তো একটা নদী ছিলই।

এখন দুই মামাই থাকেন বিদেশে। একমাত্র বড়মামা যান মধুপুরে। কিন্তু তাঁর শরীর ভালো নয়, তিনি ভাবছেন বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন। সেটা শুনলে আমাদের খারাপ লাগে, কিন্তু কী আর করা যাবে। বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাবার আগে আমার বারবার যেতে ইচ্ছে হয়। কলকাতা থেকে আর কেউ না গেলে আমি একাই চলে যাই।

সে বাড়িটা পাহারা দেয় মঙ্গল সিং, বাগানের একধারে

তার কোয়ার্টার। তার বউ, দুই ছেলে, এক ছেলের বউও থাকে সেখানে। বড়মামা অবশ্য বলে রেখেছেন, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলেও তিনি মঙ্গল সিংকে বাগানের খানিকটা অংশের জমি লিখে দেবেন।

আমি একা মধুপুরে হাজির হলে মঙ্গল সিং-এর বাড়ি থেকেই আমার জন্য খাবার-টাবার আসে। ওরাই আমার দেখাশুনো করে।

শিমুল গাছতলায় ওরা আমার জন্য চেয়ার-টেবিল পেতে দেয়। আমি বসে বসে ছবি আঁকি সারা দিন।

আগে মামাতো ভাই-বোনেরা অনেকে আসতো, সব সময় হাসি, মজা, গল্পে সরগরম থাকতো জায়গাটা। এখন প্রায় নিঝুম। কাছাকাছি আর বাড়ি নেই। অন্য লোকজনও এদিকে বিশেষ আসে না।

আমার খাতাখানা ছবিতে প্রায় ভরে গেছে। অবশ্য আরও একটা খাতাও আছে, সেটা বেশ বড়। দশ দিন থাকবো, দুটো খাতাই ভর্তি করে নিয়ে যেতে পারলে বেশ হয়।

দু'জনের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা আছে। আর্ট কলেজে আমার ঠিক পাশেই বসে অতীশ আর সঙ্ঘমিত্রা। যদিও বসে একেবারে সামনের দিকে, তবু মাঝে মাঝেই আমরা মিলিয়ে দেখি, কে কতটা স্কেচ করেছে। অতীশ সব সময়েই আমার থেকে এগিয়ে থাকে, যে-কোনও জিনিস দেখেই ও স্কেচ করে ফেলতে পারে ঝটাপট। আর সঙ্ঘমিত্রা অত তাড়াতাড়ি আঁকতে পারে না, সে ধরে ধরে আঁকে, সংখ্যায় কম হলেও তার ছবিগুলোই বেশি ভালো হয়।

আমি বেশির ভাগ ছবিই দেখে দেখে আঁকি। অতীশ সবই আঁকে মন থেকে। ও গাছপালার ছবি একেবারে পছন্দ করে না। নানা রকমের মানুষ আর জীবজন্তুর ছবিই বেশি আঁকে।

আমাদের মাস্টারমশাই অশোকদা অবশ্য বলেছেন, কিছু একটা দেখে দেখে আঁকাও দরকার। একটা গাছকেও ঠিক মতন আঁকা মোটেই সহজ নয়।

শিমুল গাছতলায় বসে, চতুর্দিকে যা দেখা যায়, তা প্রায় সবই আমার আঁকা হয়ে গেছে। একই জিনিস বারবারও আঁকা যায়। এখান থেকে দেখা যায় মাঠের শেষ প্রান্তে দুটো ছোট ছোট পাহাড়ের রেখা। বৃষ্টির সময় কিংবা মেঘলা দিনে সেই পাহাড় অন্যরকম দেখায়। তিন-চারখানা ছবি এঁকেছি সেই পাহাড়ের।

সঙ্ঘমিত্রা পাহাড় আঁকতে ভালোবাসে। আমার কাছে মধুপুরের এই বাড়িটার গল্প শুনে ও আমাকে অনেকবার বলেছে, একবার আমাকে নিয়ে চল না, আমিও তোর পাশে বসে ছবি আঁকব।

আমি বলেছি, যখন ইচ্ছে যেতে পারিস। অনেক ঘর খালি পড়ে আছে। খাওয়া-দাওয়ারও কোনো অসুবিধে নেই।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর ওর আসা হয় না। একটা না একটা কারণে আটকে যায়। এইবারই তো আমার সঙ্গে আসবে বলে সব ঠিকঠাক, হঠাৎ ওর জামাইবাবুর সঙ্গে চলে গেল দেরাদুন। সেখানে অবশ্য অনেক বড় বড় পাহাড় দেখতে পাবে।

অতীশ কলকাতার বাইরে বিশেষ যেতে পারে না। ও একটা টিউশানি করে।

সেদিন বিকেলে আমি হঠাৎ একটা বাঘ আঁকতে শুরু করলাম। কেন হঠাৎ বাঘ আঁকার কথা মনে এলো, তা জানি না। চিড়িয়াখানার বাইরে আমি কখনও বাঘ দেখিনি। মনে যখন এসেছে, তখন আঁকতে ক্ষতি কী? সত্যিকারের বাঘ কিংবা বাঘের ছবিও না দেখে মন থেকে ঠিকঠাক আঁকা মোটেই সহজ নয়।

আঁকতে আঁকতে সন্ধে হয়ে গেল।

কিন্তু আঁকার নেশা একবার ধরে গেলে আর ছাড়া যায় না। এখানে আলো নেই, তাই বাড়ির মধ্যে ঢুকে ছবিটা শেষ করতে বসলাম। মনে হল, ভালোই হয়েছে, ঠিক বাঘ বাঘ দেখাচ্ছে।

তারপর মনে হল, শুধু স্কেচ করার বদলে এটার গায়ে রং দিলে আরও বিশ্বাসযোগ্য হবে।

হলদে, কালো, আরও সব রঙই আছে। রং দেওয়া যখন শেষ হল, তখন আমি হঠাৎ একটা তীব্র গন্ধ পেলাম। এটা কিসের গন্ধ? ইঁদুর মরে পচে গেছে নাকি? না তো, এ গন্ধ অন্যরকম। মনে পড়লো, চিড়িয়াখানায় গিয়ে এই গন্ধ পেয়েছি। বাঘের খাঁচার সামনে!

প্রথমে একটু ভয় পেলেও একটু পরে মজাই লাগল। এখানে তো বাঘ আসার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আমি বাঘের ছবি আঁকছি, অমনি বাঘের গন্ধ পেলাম, এ তো সবই মনের ব্যাপার।

আসল মজাটা হল পরদিন সকালে।

ঘুম ভাঙল মঙ্গল সিং আর তার ছেলেদের চ্যাঁচামেচিতে। তারা উত্তেজিত ভাবে কী যেন বলাবলি করছে।

বাইরে এসে দেখি, মঙ্গল সিংয়ের দু'হাতে ধরা রয়েছে একটা বেশ বড় সাইজের বেড়াল। সেটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করছে।

মঙ্গল সিং বলল, দেখো খোকাবাবু, একঠো শের আয়া। শের!

মঙ্গল সিং আমার জন্মের আগে থেকেই এ বাড়িতে আছে। সেই জন্য আমাকে খোকাবাবু বলে।

শের, মানে বাঘ? যাঃ, তা কখনও হয়? মধুপুরে বাঘ আসবে কোথা থেকে? কাছাকাছি জঙ্গল-টঙ্গল কিছু নেই। নিশ্চয়ই একটা বিড়ালকে ধরে মজা করছে আমার সঙ্গে।

কাছে গিয়ে দেখি, বেড়াল তো নয়। গায়ে গোল গোল ছাপ। মুখটাও একটু অন্যরকম একটা চিতাবাঘের বাচ্চা! এগুলোকে বলে লেপার্ড।

কিন্তু আমি কাল রাত্তিরে একটা বাঘ আঁকলাম, আর অমনি আজ সকালে একটা বাঘ এসে গেল? একেই বলে কাকতালীয়!

মঙ্গল সিং বলল, এই বাচ্চা শেরটা শুকনো নদীর খাতে খেলা করছিল।

কী করে যে বাঘের বাচ্চাটা এলো সেখানে, তার কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি বাঘের ছবি এঁকেছি বলেই একটা জ্যান্ত বাঘ এসেছে, একথা বললে সবাই হাসতো নিশ্চয়ই।

একজন রিকশাওয়ালা বলল, বাচ্চাটাকে আমায় দিয়ে দাও, আমি পুষবো!

হৈ হৈ করে আপত্তি জানালো মঙ্গল সিং-এর দুই ছেলে।

কারুকে দেওয়া হবে না, তারাই বাঘটা পুষবে!

একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হল বাচ্চাটাকে।

কী করে যে রটে গেল খবর, দুপুরের দিকে অনেকেই এসে পড়ল বাঘ দেখতে।

বাঘ অতি হিংস্র প্রাণী, কিন্তু বাচ্চা বয়েসে ভারি সুন্দর দেখায়। এর গায়ের চামড়াটা যেন মলমলের মতন। চোখ দুটো দারুণ ধারালো।

পরদিন দুপুরবেলা আমি আবার শিমুল গাছতলায় আঁকতে বসেছি, হঠাৎ একসময় চোখ তুলে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। খুব মন দিয়ে আঁকছিলাম, তাই লোকটির পায়ের আওয়াজ শুনতে পাইনি।

লোকটির যেমন বিচিত্র পোশাক, তেমনই অদ্ভুত চেহারা।

মাথার চুলে সন্ন্যাসীদের মতন জটা, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, একটা চশমা পরা, তার একটা ডাঁটি ভাঙা। তার গায়ের লম্বা আলখাল্লাটাও অনেক রঙের। তার মানে নানারকম টুকরো টুকরো কাপড় সেলাই করা। তার কাঁধ থেকে ঝুলছে তিন-চারটে থলে, সেগুলোও নানা রঙের। তার মধ্যে একটা থলের মধ্যে জ্যান্ত কিছু আছে, সেটা নড়ছে।

তার ডান হাতে একটা বর্শা।

লোকটিকে দেখে আমার বুকটা একবার কেঁপে উঠল। অবশ্য, দুপুরবেলা একজন জলজ্যান্ত মানুষকে দেখে ভয় পাবার কী আছে? তবু, দু'একজন মানুষকে দেখলে এমনিই একটু ভয় ভয় করে।

লোকটি হঠাৎ এলো কোথা থেকে?

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে গম্ভীরভাবে বলল, জয় মহাদেব! মেরা বাচ্চা কিধার হায়?

আমি বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, আপনার ছেলে? এখানে কোনও বাচ্চা ছেলেকে তো কোথাও দেখিনি।

লোকটি হিন্দিতে বলল, বাচ্চা ছেলে নয়। বাঘের বাচ্চা। সেটা আমার। সেটা এখানে এসেছে আমি জানি। আমি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এখানে এসেছি।

আমি বললাম, একটা বাঘের বাচ্চা এখানে এসেছে ঠিকই। কিন্তু সেটা আপনার কী করে হল?

লোকটি বলল, আমি বাঘ পুষি। আমার ঝোলায় সব সময় সাপ থাকে, বেজি থাকে, শিয়াল থাকে। আমি এদের নিয়ে ঘুরে বেড়াই।

আমি জিগ্যেস করলাম, কোথায় ঘুরে বেড়ান?

লোকটি বলল, কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে। সে তুমি বুঝবে না। আমার বাচ্চা ফেরত দাও।

মঙ্গল সিংদের বাড়ির সামনে দড়ি দিয়ে বাঁধা লেপার্ডের বাচ্চাটা খুব জোরে জোরে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শুরু করেছে।

সেখানে মঙ্গল সিং-এর এক ছেলেকে দেখে আমি জোরে বললাম, বুধন সিং, বাচ্চাটাকে এখানে নিয়ে এসো তো?

বুধন সিং বাচ্চাটাকে নিয়ে এলো।

সেই লোকটির কাছে আসতেই বাচ্চাটা জোরাজুরি করে এক লাফ দিয়ে বুধন সিং-এর কোল থেকে নেমে সেই লোকটির পায়ে মাথা ঘষতে লাগল। ঠিক পোষা কুকুরের মতন।

লোকটি বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে বলল, আহা হা, এর গলা কে বেঁধেছে? এর দুখ্ লাগছে। আহা হা! ঠিক হ্যায়, বাচ্চু, তোর আর দুখ্ লাগবে না।

সে বাচ্চাটার গলা থেকে দড়িটা খুলে দিল।

এ বাচ্চাটা যে ওই লোকটিরই পোষা, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। সুতরাং ওকে ফেরত দিতেই হবে।

লোকটি বুধনের দিকে তাকিয়ে বলল, এক গিলাস পানি পিলাওগে?

বুধন দৌড়ে গেল জল আনতে।

আমি আমাদের বাড়িতে দেখেছি, বাইরের কোনও লোক জল চাইলে, তাকে শুধু জল দিতে নেই। মা-মাসিরা জলের সঙ্গে কিছু না কিছু মিষ্টিও দিতেন। এখানে এখন মিষ্টি কোথায় পাবো?

তাই জিগ্যেস করলাম, আমাদের এই বাগানে ভালো আম হয়েছে, আপনি আম খাবেন?

লোকটি এক হাত নেড়ে বলল, আমি কারুর বাড়িতে জল ছাড়া অন্য কিছু খাই না।

এবারে আমি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম, তা হলে আপনি খিদের সময় খাবার পান কোথায়?

লোকটি বর্শাটা ওপরের দিকে তুলে বলল, ওইখান থেকে খসে খসে পড়ে!

এমন অদ্ভুত লোকও আমি দেখিনি। এমন অদ্ভুত কথাও আগে শুনিনি। আকাশ থেকে খসে খসে পড়ে খাবার?

লোকটি চলে গেল জল খেয়েই। বাঘের বাচ্চাটা দৌড়োতে লাগল তার পায়ে পায়ে।

বুধনের বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। সে বাচ্চাটা পুষবে ঠিক করেছিল। তবে সে নিজেই বলল, জানো তো নীলুবাবু, এই সব মুসাফিররা খুব রাগী হয়। ওদের কথা না শুনলে এমন অভিশাপ দেয় যে পাথরে আগুন জ্বলে যায়।

এরপর আমি সেই লোকটির ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম। দু'তিন বার চেষ্টাতেও ঠিক হল না। ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে আঁকতে পারলে তবু হয়তো কিছু হত।

আমি ফিরে আসার ঠিক আগের দিন একটা সত্যিকারের আনন্দের ঘটনা ঘটলো। অনেকটা অবিশ্বাস্যও বটে।

সকালবেলা বসে আছি শিমুল গাছের তলায়। এখনো ছবি আঁকতে শুরু করিনি। এখানে বসে চা-জলখাবার খেতেও ভালো লাগে।

একটু পরে শুনতে পেলাম অনেক দূরে একটা হৈ হৈ শব্দ হচ্ছে। একসঙ্গে অনেক লোক চ্যাঁচাচ্ছে, কিন্তু কোনও কথা বোঝা যাচ্ছে না।

এরকম গণ্ডগোল শুনলে প্রথমেই মনে হয়, কোথাও মারামারি শুরু হয়েছে বুঝি!

আমাকে খাবার দিতে এসে মঙ্গল সিং বলল, খোকাবাবু, তুমি কোঠির ভিতরে গিয়ে বসো। দিনকাল ভালো নয়।

আমি বললাম, গণ্ডগোল তো হচ্ছে অনেক দূরে। এখানে ভয় পাবার কী আছে?

মঙ্গল সিং বলল, বুধনকে সাইকেল নিয়ে দেখে আসতে বলছি। কিন্তু তুমি সাবধানে থাকবে।

আমি বসে রইলাম সেখানেই। দূরে হৈচৈ চলতেই থাকল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মনে হল, লোকজনের চিৎকার কিছুটা কাছে চলে আসছে। এখন আর শুধু চিৎকার নয়, তার মধ্যে শাঁখ বাজছে, মেয়েরা উলু দিচ্ছে।

শুকনো নদীটার দু'ধার দিয়ে কিছু লোক ছুটে আসছে এদিকেই।

তারপরই দেখলাম, সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য।

শুধু মানুষ নয়, নদীর খাত দিয়ে ধেয়ে আসছে জল। ঘোলা জল, যেন টগবগ করে ফুটছে।

নদীর পাড়ে কিছু কিছু ছোট গাছ গজিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ডুবে যাচ্ছে। ওদিক থেকে কিছু কিছু মাছ ভেসে আসছে, তাও দেখা যাচ্ছে। জল যেন আনন্দে লাফাচ্ছে। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই বালি জমে জমে খাতটা একেবারে বুজে গিয়েছিল, সেখানে এসে থমকে গেল জলের স্রোত।

কিছু লোক কোদাল আর শাবল নিয়ে লাফিয়ে পড়ল। সেই বালির বাঁধ ভেঙে দিতে বেশি সময় লাগল না। আবার জলের তোড় চলে এলো এদিকে। দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ির পাশটায় জেগে উঠল সেই পুরানো নদী।

এত জল আসছে কোথা থেকে? এখন তো বর্ষাকালও নয়। বর্ষা আসতে আরও দু'সপ্তাহ দেরি আছে। তা হলে একটা মরা নদী বেঁচে উঠল কোন মন্ত্রে?

বুধন ফিরে আসার আগেই আমরা উত্তরটা জেনে গেলাম দৌড়ে আসা লোকজনদের কাছ থেকে।

এখান থেকে এগারো মাইল দূরে একটা বড় নদী আছে। অনেক বছর আগে সেই নদীর একদিকে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল বন্যা আটকাবার জন্য। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। প্রত্যেক বছর সেই নদীর উল্টোদিক বন্যায় ডুবে যায়। আর এদিকের নদীগুলো গেল একেবারে শুকিয়ে।

এরকমই চলছিল বছরের পর বছর। এ বছর আর মানুষ বন্যায় ডুবতে রাজি নয়। কাল সারাদিন ধরে কয়েক শো মানুষ সেই বাঁধটা কেটে দিয়েছে। বড় নদীর জল ঢুকে পড়েছে ছোট নদীতে। প্রাণ ফিরে পেয়েছে মধুবংশী নদী।

বাড়ির ঠিক পাশেই একটা জ্যান্ত নদী থাকলে সে বাড়ির চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। এতদিন ওই নদীর খাতে গরু চরতো, এখন আবার নৌকো ভাসছে। ডুব দিচ্ছে মাছরাঙা পাখি। পাড়ে বসে আছে বক। সব দৃশ্যটাই অন্যরকম।

আমার কলেজ খুলে যাবে, তাই আর বেশিদিন থাকা গেল না। এখন ওখানে ছবি আঁকার অনেক নতুন বিষয় এসে গেছে।

ফিরে আসার পর নদীটার কথা শুনে সবচেয়ে বেশি খুশি হলেন বড়মামা। তিনি বললেন, তা হলে ভাবছি, বাড়িটা বিক্রি না করলেও হয়। শেষ জীবনে ওখানেই গিয়ে থাকব।

বাঘের বাচ্চার কথাটা অবশ্য বাড়ির কেউই বিশ্বাস করল না। সকলেরই ধারণা, ওটা আমার বানানো গল্প।

আসল দুটো চমক কিন্তু এর পরেও বাকি ছিল।

আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবি নিয়ে একটা প্রদর্শনী হবে, তা আগেই ঠিক ছিল। প্রত্যেকের একটা করে ছবি। বড় বড় শিল্পীরা এসে দেখে বিচার করবেন, কোন ছবিতে কী দোষ আছে বা গুণ আছে।

আমি ঠিক করলাম, আমার ওই বাঘের ছবিটাই দেব। রংটা ঠিক করতে হবে, আর ভালো করে ফ্রেমে বাঁধাতে হবে।

অতীশ কী ছবি দিচ্ছে, জানবার জন্য গেলাম ওর বাড়িতে।

অতীশের নিজস্ব কোনো আঁকার জায়গা নেই, দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে থাকে সাতজন। ছাদে ওঠার সিঁড়িতে ও আঁকার জিনিসপত্র রাখে, ওখানেই বসে কাজ করে। একবার বৃষ্টিতে ওর অনেক ছবি ভিজে গিয়েছিল।

অতীশ তিন-চারখানা ছবি বেছে রেখেছে। সবই মানুষের ছবি। তার মধ্যে থেকে একটা ছবি তুলে ধরে বলল, ভাবছি, এটাই দেব।

ছবিটা দেখে আমার চোখ দুটো গোল হয়ে গেল।

এ তো সেই মধুপুরের মুসাফির, যে বাঘের বাচ্চা পোষে! অবিকল সেই চেহারা, সেই পোশাক, কাঁধে ঝুলছে কয়েকটা থলে, এমনকি চোখে ডাঁটিভাঙা চশমা।

আমি জিগ্যেস করলাম, এই লোকটির সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল?

অতীশ একটু অবাক হয়ে বলল, কোথায় মানে? কোনও জায়গাতেই দেখা হয়নি। মন থেকে এঁকেছি।

আমি বললাম, একদম মন থেকে? এরকম একটা অদ্ভুত চেহারার লোকের চেহারা তোর মনে এল কী করে?

অতীশ বলল, আমি ভাবলুম, ঠিক সাধুও নয়, সাধারণ পথিকও নয়, এমন একজনকে আঁকবো, যে শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, এই থলেগুলোর মধ্যেই যার পুরো সংসার।

আমি জিগ্যেস করলাম, অতীশ, তুই চশমা পরা মুসাফিরও দেখিসনি কখনও?

অতীশ হেসে বলল, না, দেখিনি। চশমাটা আগে ছিলও

না। আজই সকালে ফাইনাল টাচ দেবার সময় কী খেয়াল হল, চশমাটা বসিয়ে দিলাম।

অতীশ কি মিথ্যে কথা বলছে? একবারও না দেখলে হুবহু একরকম একটা মানুষ আঁকা কী করে সম্ভব?

শুধু শুধু মিথ্যে কথাই বা বলবে কেন? ওর স্বভাব সেরকম নয়। বরং মুখের ওপর অনেক সত্যি কথা বলে দেবার সাহস ওর আছে।

এখন যদি আমি বলি, ওই ছবির মানুষটিকে আমি জলজ্যান্ত দেখেছি, তা কি অতীশ বিশ্বাস করবে?

বলা হল না।

অতীশই বলল, চল, সঙ্ঘমিত্রার বাড়িতে যাই। ও দেরাদুন থেকে আজই ফিরেছে। ওর বাড়িতে গেলে সিঙ্গাড়া-সন্দেশ সাঁটানো যাবে, আর ওর নতুন ছবিও দেখা হবে।

সঙ্ঘমিত্রারা বেশ বড় বাড়িতে থাকে। ওর বাবা ওকে আঁকার জন্য দোতলায় একটা স্টুডিও বানিয়ে দিয়েছেন। সেই ছবির ঘরেই সে রাত্তিরে ঘুমোয়।

সে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অতীশ বলল, কী রে সঙ্ঘমিত্রা, বাইরে বসে কী সব ছবি-টবি আঁকলি দেখাবি না? আমরা তাই দেখতে এলাম।

সঙ্ঘমিত্রা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, চায়ের সময় হয়ে গেছে, তাই না? চা খেতে এসেছিস, না ছবি দেখতে?

আমি বললাম, চা তো খাবোই। শুধু চা নয়। আর কী খাওয়াবি?

সঙ্ঘমিত্রা বলল, আগে কিছুই খাওয়াবো না। যদি ছবি দেখতে চাস, আগে দেখতে হবে। খাওয়ার পর ছবি দেখার মুড থাকে না।

অতীশ বলল, তা হলে আজ ভালোই খাওয়া হবে মনে হচ্ছে। দেখি, আগেই ছবি দেখি।

সঙ্ঘমিত্রা পাঁচখানা ছবি দেখালো। সবই ক্যানভাসে তেল রঙে আঁকা। চারখানা ছবিই পাহাড়ের। আর পাঁচ নং ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ধরে বলল, এটাই এবার একজিবিশানে দেব ভাবছি। এটাই আমার বেশি পছন্দ।

সে ছবিটার তলায় নাম লেখা, বার্থ অফ আ রিভার। একটি নদীর জন্ম।

আমি নিঃশব্দে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দূরে অস্পষ্ট পাহাড়ের রেখা, সামনের দিকে একটা ছোট নদী। ক্যানভাসের অর্ধেকটায় সে নদী জলে ভরা, অর্ধেকটা শুকনো। শুকনো দিকটায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে।

অতীশ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, হ্যাঁ, বেশ ভালো হয়েছে। অর্ধেকটা জল বলে মনে হচ্ছে, নদীটা যেন একটু বাদেই ভরে যাবে। বেশ গতি আছে। বাঁশি বাজাচ্ছে, এই ছেলেটা কে রে? কেষ্ট ঠাকুর নাকি?

সঙ্ঘমিত্রা বলল, যাঃ, দেখছিস না, হাফপ্যান্ট পরা। শ্রীকৃষ্ণ কখনও হাফপ্যান্ট পরে নাকি? যাতে ভুল না হয়, তাই হাফপ্যান্ট পরিয়েছি।

অতীশ বলল, ওর মাথায় একটা গামছা বেঁধে দিলে পারিস।

সঙ্ঘমিত্রা আমাকে জিগ্যেস করল, কী রে, নীলু, তুই কিছু বলছিস না যে!

আমি বললাম, খুবই ভালো হয়েছে। তবে এই নদীটা আমি চিনি। এর নাম মধুবংশী। মধু নামে একজন লোক এই নদীর ধারে বসে একসময় বাঁশি বাজাতো!

সঙ্ঘমিত্রা জিগ্যেস করল, এই নদীটা তুই চিনিস? কোথায় দেখেছিস?

আমি বললাম, মধুপুরে।

সঙ্ঘমিত্রা একটু অবাক হয়ে বলল, তোর সেই মামার বাড়ির কাছে? সেখানে তো আমার যাওয়াই হল না এ পর্যন্ত। সে নদী তো আমি দেখিনি।

আমি বললাম, না গিয়েও অনেক কিছু দেখা যায়। এই নদীটা তুই কবে এঁকেছিস রে? ঠিক কত তারিখ?

সঙ্ঘমিত্রা হিসেব করে বলল, জুন মাসের দু'তারিখে।

আমার মনে পড়ল, মধুপুরের সেই নদীতে জল আসতে শুরু করে তিন তারিখ সকালে। নদীটা প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠার আগেই সঙ্ঘমিত্রা ওকে এঁকেছে। শিমুল গাছটা পর্যন্ত রয়েছে ঠিক জায়গায়।

সেবারে আমাদের প্রদর্শনীতে পাশাপাশি ছবি ছিল তিনটে। একটা বাঘ, একজন অদ্ভুত মুসাফির আর একটি নদীর পুনর্জীবন। এই তিনটে ছবির পেছনে যে কী রহস্য আছে, তা অন্য কেউ কোনওদিন জানতে পারবে না।

প্রদর্শনীর অন্য ছবিগুলোর পেছনেও এরকম রহস্য আছে কি না, তা তো আমিও জানি না!

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

রহস্য গল্প

কে ডাকে অমাবস্যার রাতে

ডা: অরুণ দত্ত

গড়িয়ার অ্যাডভেঞ্চারার্স ক্লাবের শনিবারের মজলিশে বেশ সোরগোল লেগে গিয়েছে। সেদিনকার খবরের কাগজে এক প্রতিবেদনে বেরিয়েছে, নদীয়ার কোনো এক পলাশপুর গ্রামের ডাকবাংলোয়, অশরীরী আত্মার আবির্ভাব ঘটছে। অমাবস্যার রাত্তিরে, মাঝে মাঝে এক অশরীরী নারীমূর্তি দেখা দেয়। ডাকবাংলোর বিশেষ এক ঘরের বাসিন্দাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। খবরে আরও প্রকাশ ; সব অমাবস্যার রাতে ওই অশরীরী দেখা দেয় না। শুধু তাই নয় ; ওই ডাক বাংলোর শুধু এক নির্দিষ্ট ঘরের রাতের বাসিন্দাকে সে ডাক দেয়।

ওই ডাকবাংলোর এক আকর্ষণ আছে। শুধু চৌহদ্দির গাছপালা, জলাশয় নয়, চারপাশের বাহ্যিক সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। ডাকবাংলোর ওই বিশেষ ঘরে, কোনও আবাসিক সাধারণত থাকতে চান না। সব জেনেশুনে জেদ করে, কলকাতার এক যুবক, গত অমাবস্যার রাত্তিরে ওই ঘরে ছিলেন, পরদিন সকালে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। যুবকের এক স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা চলছে।

শেষকালে ঠিক হল, গড়িয়ার বল্মীক রায়চৌধুরী পরের অমাবস্যার রাত্তিরে পলাশপুরের ওই ডাকবাংলোয় গিয়ে থাকবেন। ক্লাবের সভাপতি, সুস্মিত সাহা বললেন, এই ক্লাবের নাম অ্যাডভেঞ্চারার্স ক্লাব কেন রাখা হয়েছে?

যেখানে যা কিছু রহস্য, যা কিছু ভয় সব কিছুর মোকাবিলা করার জন্য। গড়িয়ার প্রণবানন্দ রোডের বল্মীককে কেন মনোনীত করা হল? তার কারণ, বল্মীক শুধু অল্পবয়সী যুবকই নয়। তাঁর বাড়ি খাস গড়িয়ায়। তার ওপর তার আছে দুর্জয় সাহস।

মধ্যাহ্নের বেশ কিছু আগে, ক্লাবের গাড়ি বল্মীককে ডাকবাংলায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। বাংলোর বাড়িটা বেশ সুন্দর। চারপাশ মনোরম, ফাগুন মাসের ফুরফুরে হাওয়ায়, বল্মীকের মন আনন্দে ভরে গেল। ডাক বাংলোর অদূরে চৌকিদার রামবরণের বাসস্থান। রামবরণ সিং বল্মীকের সাহস ও স্পর্ধা দেখে, কিছুক্ষণ হাঁ করে রইল। তারপর ঢোক গিলে বলল,—আগামী পরশু রাত্তির হচ্ছে অমাবস্যা। গত অমাবস্যার রাত্তিরে ডাকবাংলোর ওই ঘরে এক ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। আপনার মতো এক যুবক কোথাও জায়গা না পেয়ে ওই ঘরেতে ছিলেন। রাত্তিরে কোনো কিছু দেখে তিনি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। এখন অবশ্য সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

বল্মীক জানত, কিভাবে এ ধরনের নিম্নশ্রেণির লোকেদের হাত করতে হয়। একটা লম্বা নোট রামবরণের হাতে গুঁজে দিয়ে বল্মীক বলল, ওই বিশেষ ঘরেতে কি ভয়, আর কিসের রহস্য লুকিয়ে আছে ; সেটা জানতে আমি এখানে এসেছি। —আচ্ছা চৌকিদারজী...আপনি কি কখনও ভয়ের বা অদ্ভুত কিছু এই ডাকবাংলোয় দেখেছেন? কিছুক্ষণ চুপ করে রামবরণ বলে, দেখুন বাবু...ওই ঘরে আর এই বাংলোয় বিশেষ একটা কিছু আছে। তবে আমাকে কেউ ভয় দেখায়নি বা ক্ষতি করেনি। আপনি সাবধানে থাকবেন।

বল্মীক দোতলার ডাকবাংলোর ওই বিশেষ ঘরটায় তালা দিয়ে দিল, ওই ঘরটা বাড়ির অন্যান্য ঘর থেকে একটা লম্বা করিডোরের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন। ডাকবাংলোর অন্য কোনো আবাসিকের সঙ্গে বল্মীক দেখাও করল না। বাংলোর বাগানে সে ঘুরতে থাকল। চারপাশের কোকিলের কুহু ডাক, আর লাল রংয়ের পলাশগাছগুলোর মাথা ; বল্মীককে মনে করিয়ে দিল,—এটা বসন্তকাল। আর জায়গাটার নাম কেন পলাশপুর হয়েছে। যদিও আম, জাম, বট, পেয়ারা, বাতাবিলেবু গাছের অভাব নেই এখানে। দূরের জলাশয়ে শ্যাওলা জমে রয়েছে।

চৌকিদার বলেছিল, এখানে বৈদ্যুতিক আলো থাকলেও ; প্রায়ই লোডশেডিং হয়। সে জন্যে একটা লণ্ঠনও রেখে গিয়েছিল। রাত্তিরে তাড়াতাড়ি খেয়ে বল্মীক শুয়ে পড়ল। সারাদিনের জার্নি ও ধকলে সে চট্ করে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ খুট করে এক শব্দ হতে বল্মীকের ঘুম ভেঙে গেল। আরে একি! ঘরের আলো কে জ্বালল? খিল খিল করা এক হাসির শব্দে সচকিত হয়ে বল্মীক দেখল, দরজার বাইরে এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে লাল রংয়ের এক শাড়ি। নারীমূর্তি দেখে, বল্মীক কিন্তু ভয় পেল না।

পকেট টর্চ বার করে তড়াক করে বল্মীক খাট থেকে নামল। পায়ে পায়ে সে দরজার বাইরে চওড়া করিডরে এসে দাঁড়াল। আবছা আলোয় দেখতে পেল, সেই চলমান নারীমূর্তি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বল্মীক পায়ে পায়ে সেই মূর্তিকে অনুসরণ করতে লাগল। দোতলার করিডর থেকে সিঁড়ি দিয়ে মূর্তি নীচে নেমে গেল। ডাকবাংলোর বাইরের বাগানে গিয়ে মূর্তি আবার থামল। বাইরের অন্ধকারে ঝিঁঝি ডাকছে ; জোনাকিরা জ্বলছে আর নিভছে।

বল্মীক পকেট থেকে টর্চ বার করে জ্বালল। সেই আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল, নারীমূর্তিটি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বল্মীক কিন্তু ভয় পেল না। তার মনে হল, মূর্তিটি যেন তাকে কিছু বলতে চায় ; কিছু তাকে দেখাতে চায়। চলমান মূর্তিটি মাঝে মাঝে থেমে যায়। দেখতে না পেয়ে বল্মীক ফের টর্চ জ্বালে। দেখে নারীমূর্তি তাকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে অবশেষে নারীমূর্তি এক জায়গায় এসে থেমে গেল। কাউকে দেখতে না পেয়ে বল্মীক টর্চের আলো চারদিকে ঘোরাল। চারপাশে ফণী মনসার গাছ। হঠাৎ এক আয়তকার পাথরে বল্মীক হোঁচট খেল। টর্চের আলো ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। সে ঘরে ফিরে গেল।

পরদিন বল্মীক প্রাতরাশ সেরে বাংলোর বাগানে ঘুরতে বেরোল। সেই ফণীমনসার ঝোপের ভেতরে গিয়ে বল্মীক ঢুকল। চারপাশে কাঁটাগাছের জঙ্গল। চোর কাঁটায় ভর্তি। মাঝখানের পাথরে ধুলো জমে থাকায় কিছু বোঝা যায় না। নিরাশ হয়ে বল্মীক চৌকিদারের ঘরে গেল। রামবরণ তখন রামাহে...গান ভাঁজছিল। বল্মীক লক্ষ করল, রামবরণের কাছে মোবাইল ফোন আছে। মোটা টাকার নোট দিয়ে বল্মীক সেখান থেকে অ্যাডভেঞ্চারার্স ক্লাবের

প্রেসিডেন্টকে ফোন করল।

সুস্মিত সব শুনে বললেন, রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। তুমি লেগে থাক, আমরাও খবর নিচ্ছি। গড়িয়ার বাড়িতে ফোন করাতে তার অকৃতদার জ্যাঠামশাই পরশপতি ফোন ধরে বললেন, বল্মীক...সবসময় সৎপথে থাকবে। পরোপকার করলে, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পরের রাত্তিরে আবার সেই নারীমূর্তি দেখা দিল। তার পায়ের মলের শব্দ শুনে, অনুসরণ করে, বল্মীক আবার সেই ফণীমনসার ঝোপের ভেতরে ঢুকল, প্রথম রাতের মতো নারীমূর্তি ফের অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত। চৌকিদারকে কিছু না জানালেও, রামবরণ কিন্তু বল্মীককে সাবধান করে দিয়েছিল। এ যাবৎ বল্মীক কিন্তু একেবারেই ভয় পায়নি। অমাবস্যার রাত। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে। রাতজাগা কাক মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। বল্মীক ঘুমিয়ে পড়েছিল। বল্মীক স্বপ্ন দেখছিল। সেই নারীমূর্তিটি সাকার হয়ে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। পরমা সুন্দরী ঘোমটা টানা এক অল্পবয়সী বউ সিঁথিতে সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে।

আশ্চর্য বল্মীক জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? আমার ঘরে এত রাত্তিরে কেন এসেছেন? মিষ্টি হেসে বউটি উত্তর দিল, আমার নাম দিগাঙ্গনা ভদ্র। আমি খুব কষ্টের মধ্যে আছি। আপনার সাহস আর শৌর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন। বিস্মিত বল্মীক মন্তব্য করল, বলে যান। দিগাঙ্গনা বলতে থাকে।

এই ডাক বাংলো থেকে প্রায় এক কি.মি. দূরের লোচনপুরে সুজয় ভদ্রের সঙ্গে আমার দশ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর আমার এক ছেলেও হয়। তার নাম সঞ্জয়। অজয় বিজয় আর সুজয় এই তিন সহোদরের মধ্যে আমার স্বামী সর্বকনিষ্ঠ। লোচনপুরে ওদের

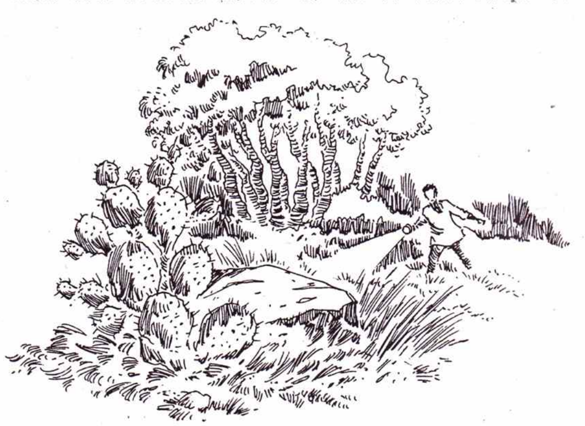

www.banglabooks.in

স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবসা আছে। ব্যবসা ভালোই চলে। বিয়ের পর আমি জানতে পারি, ওরা তিনভাই চুরির কাজে পোক্ত। চুরি করা মালের টাকা, ভাইয়েরা, তাল তাল সোনা করে জমিয়ে রাখত। একদিন শহরের জমিদার বাড়ি থেকে ভাইয়েরা বেশ বড় রকমের চুরি করল।

চুরি করা মাল বিক্রি করে ওরা সোনারপাত করে জমিয়ে রাখল। কারুর পক্ষে সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। আমি কিন্তু এ ধরনের চুরির ব্যাপার আর সহ্য করতে পারলাম না। ঘৃণার সঙ্গে আমি বললাম, শেষকালে এক চোরের পরিবারে আমার বিয়ে হল? তোমাদের এই চুরির কথা আমি কিন্তু সবাইকে বলে দেব। আমার কথা শুনে ভাইয়েরা গুম হয়ে গেল। আড়ালে তিন ভাইয়েরা মিলে কি সব শলা-পরামর্শ করল। পরে আমাকে, আমার স্বামী জানাল, কাছের ডাকবাংলো ভাড়া করে তারা একদিন তাদের গয়নার দোকানের রজতজয়ন্তী উৎসব করবে।

সত্যি সত্যি এক অমাবস্যার রাত্তিরে, পুরো ডাকবাংলো আমার স্বামীরা ভাড়া নিল। খানাপিনার ব্যবস্থা করল। আমি আর আমার স্বামী, সে রাত্তিরে এই ঘরটাতে শুয়েছিলাম। আমার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে, সে রাতে আমাকে হত্যা করা হল। বল্মীক আর্তনাদ করে বলে উঠল, —সেকি! ...চৌকিদার কিচ্ছু জানতে পারল না?

দিগাঙ্গনার চোখ দিয়ে জল ঝরছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলে চলল। চৌকিদারকেও ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। অঘোরে সেই চৌকিদার অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিল। তারপর! ...অধীর আগ্রহে বল্মীক প্রশ্ন করল।

—তারপর...পূর্ব পরিকল্পনা মতো একটা লোহার বাক্সের নীচে সোনার পাতগুলো রাখা হয়েছিল। সেই পাতগুলোর ওপর আমার মৃতদেহ শোয়ানো হয়েছিল। তারপর আমার মৃতদেহ সমেত সেই কফিন বাক্সটা ওই ফণী মনসার ঝোপের ভেতর পুঁতে দেওয়া হল। মাটি চাপা দিয়ে, তার ওপর সেই কফিনের মাপের এক পাথর বসিয়ে দেওয়া হল। সেই থেকে আমি এই ডাকবাংলোর বাগানের, ওই ফণীমনসার ঝোপে আটকা পড়ে আছি।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে উত্তেজিত কণ্ঠে বল্মীক জিজ্ঞেস করল, সেকি! ...আপনার অনুপস্থিতিতে, কারুর মনে কোনো সন্দেহ হল না? আপনার বাপের বাড়ির লোকেরা অন্তত, খোঁজখবর নিলেন না? অশ্রুসজল কণ্ঠে দিগাঙ্গনা বলে চলল। আমার বাবা অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন। আমার পিতৃপক্ষ থেকে খোঁজখবর নেবার আর কেউ ছিল না। আমার স্বামীর বাড়ির লোকেরা চারদিকে রটিয়ে দিয়েছিল, কাউকে না বলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছি ইত্যাদি।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দিগাঙ্গনা তার শেষ অনুরোধ জানাল। এ ঘরে আরও কত লোক এসে থেকেছে, আমার উপস্থিতির কথা জেনে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। একমাত্র আপনি শুধু ভয় পাননি। ফণী মনসার ঝোপে আমার কবরস্থান পর্যন্ত দেখে এসেছেন। আপনি শুধু সাহসীই নন ; আপনার মনে যথেষ্ট উদারতা রয়েছে। একমাত্র আপনিই আমাকে এই গুপ্ত গুহা থেকে উদ্ধার করে মুক্তি দিতে পারেন। দয়া করে আমার অস্থি জ্বালিয়ে দিয়ে, অবশিষ্ট ছাইভস্ম গঙ্গার জলে ফেলে দেবেন। তাহলে মুক্তি পাব।

হঠাৎ খুট্ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হতে, বল্মীকের স্বপ্ন ভেঙে গেল। বল্মীকের সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল। আরে!...একি স্বপ্ন না সত্য? আচমকা এবং আর্তকণ্ঠস্বর শুনে বল্মীক দরজার দিকে তাকাল। দরজা খোলা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সেই অল্পবয়সী বউটি, হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তড়াক করে লাফ দিয়ে বল্মীক বিছানা থেকে নামল। পকেটে টর্চ নিয়ে বল্মীক বউটিকে অনুসরণ করে চলল। অন্ধকারের ভেতর টর্চ জ্বেলে বল্মীক সেই ফণীমনসার ঝোপের ভেতর ঢুকল। সেই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বউটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

একি বিভ্রান্তি! চারদিকে টর্চ ঘুরিয়ে বল্মীক কাউকে দেখতে পেল না। টর্চ নিভিয়ে বল্মীক ফিরে যাচ্ছিল। আচমকা কেউ যেন বল্মীকের জামার হাতা ধরে টানল। সঙ্গে সঙ্গে হাতের চামড়ায় বেদনাদায়ক তীক্ষ্ণ কিছু ফুটে গেল। একই সঙ্গে ওপরের গাছের ডাল থেকে, ভুতভুতুম শব্দে কেউ হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠল। দূর থেকে অন্ধকারের বুক চিরে কেয়া হুয়া শব্দে আওয়াজ ভেসে এল। টর্চ জ্বালিয়ে বল্মীক দেখল, ফণীমনসার গাছে তার জামার হাতা আটকে গিয়েছে। এও বুঝল, গাছের ওপর থেকে প্যাঁচা ডেকে উঠেছে। আর দূরের শিবা ডাক স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

জামার হাতা ছাড়িয়ে বল্মীক ঘরে ফিরে এল। বিস্ময় আর উত্তেজনায় তার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল। তাহলে

এই হচ্ছে, পলাশপুর ডাক বাংলোর আসল রহস্য! বল্মীক দ্রুত পরের করণীয় কর্তব্যগুলো সম্পর্কে চিন্তা করছিল। ভোরের আলো তখন ফুটতে শুরু করেছে। জ্যাঠামশাই পরশপতির কথা তার মনে পড়ল। পরোপকার করা মানুষের ধর্ম। যারা ন্যায়ের পথ ধরে চলে, কেউ তাদের কখনো ক্ষতি করতে পারে না।

বল্মীক চৌকিদারের ঘরে গিয়ে তাকে ডেকে তুলল। রামবরণ বল্মীকের মুখ চোখ দেখে বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, বাবু সাব...কি হয়েছে? সবকথা খুলে বলুন। কোন কথা গোপন না করে গত তিন রাত্তিরের কথা বল্মীক রামবরণকে বলল। তারপর প্রশ্ন করে, রামবরণ তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু জান? ঘড়ঘড়ে গলায় রামবরণ উত্তর দেয়। বাবুসাব...ওই মহিলাকে আমিও হাতছানি দিয়ে ডাকতে দেখেছি। আমি কিন্তু কোনোদিন তার পেছন পেছন যাইনি। আমি ভালোভাবে জানি, এই বাংলোতে এক গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে।

আর একটা লম্বা নোট চৌকিদারের পকেটে বল্মীক গুঁজে দেয়। তারপর তার মোবাইল থেকে বল্মীক গড়িয়ায় তার বাবা অভীককে ফোন করে সব জানায়। সব শুনে অভীক বলে, ভয় পেয়ো না। আমরা দলবল নিয়ে এখনই ওই ডাকবাংলোয় যাচ্ছি। অ্যাডভেঞ্চারার্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সুস্মিত সাহা বিস্মিত হলেও, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলেন ; বল্মীক তুমি আমাদের ক্লাবের মুখোজ্জ্বল করেছ। তুমি বিচলিত হয়ো না। আমার পুলিশের বড়কর্তাদের সঙ্গে ভালো পরিচয় আছে। ফোনে সব কিছুর ব্যবস্থা করে, তাদের সঙ্গে নিয়ে আমি ওই ডাক বাংলোয় আসছি। তুমি ওখানে স্থির হয়ে বসে থাক।

সকাল দশটার মধ্যে গণ্যমান্য লোকেদের আগমনে ডাকবাংলো জমজমাট হয়ে গেল। স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন। ফণীমনসার ঝোপের ভেতর ঘুরে সব কিছু দেখে, তারা তখনই পাথর তুলে খোঁড়ার ব্যবস্থা করলেন। হাতদশেক খোঁড়ার পরে খননকারীদের শাবল হঠাৎ ঠন করে শব্দ করল। লোহার বাক্স বার করে, তার ভেতর থেকে এক কঙ্কাল ও তার নীচে থেকে কয়েকটা মোটা সোনার পাতও উদ্ধার করা হল। পুলিশ ডাকবাংলো ঘিরে ফেলল।

লোচনপুরের ভদ্রদের তিনভাইকে ধরা হল। তারা অম্লানবদনে সবকথা অস্বীকার করে বলল, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। আমরা কেস করব। পুলিশের সঙ্গে ভদ্র পরিবারের মামলা চলল। সোনার পাতগুলোর নীচে থেকে ভদ্রদের দোকানের এক ক্যাশমেমো পাওয়া গিয়েছিল। ভদ্ররা বলল, এটা কিছুই প্রমাণ করে না। যে কোনো দুষ্ট লোক চক্রান্ত করে এধরনের কাজ করতে পারে।

কলকাতা থেকে ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ডাকা হল। তাঁরা বললেন, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে। ডি. এন. এ পরীক্ষা করে সব কিছু প্রমাণ করা সম্ভব। সেই কঙ্কাল থেকে ডি.এন.এ পরীক্ষার রসদ নিয়ে তাঁরা পরীক্ষার জন্য কলকাতায় ফিরে গেলেন। একই সঙ্গে দিগাঙ্গনার পুত্র সঞ্জয় ভদ্রর শরীর থেকেও রক্ত টানা হল। ডাক্তাররা কঙ্কাল পরীক্ষা করে বললেন, এটি বছর কুড়ির এক নারীদেহ। ঠিক যে বয়সে দিগাঙ্গনা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সোনার পাতগুলো যে ভদ্রদের গয়নার দোকানের ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সেকথা প্রমাণ করলেন।

মামলায় ভদ্রপরিবাররা হেরে গেল। বিচারক তিনভাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। এরপর প্রশ্ন উঠল, লক্ষ লক্ষ টাকা দামের সেই সোনার পাতগুলোর কি হবে? আর বল্মীককে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেবার দরকার। সব শুনে বল্মীক বলল, আমার প্রথম কাজ হচ্ছে, এই কঙ্কালকে দাহ করা। তারপর তার ছাই গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, গয়ায় পিণ্ড দেওয়া।

আর এই বহুমূল্যের সোনার পাতের মালিক হচ্ছেন মিসেস দিগাঙ্গনা ভদ্র। নিজের জন্য আমি এক পয়সাও চাই না। এই সোনার পাতের টাকা থেকে দিগাঙ্গনার নামে বালিকা বিদ্যালয় ও হাসপাতাল গড়ে তোলা হোক। বাকি টাকা তার ছেলে সঞ্জয়ের পড়াশুনো আর ভবিষ্যতের জন্য রাখা থাক। বল্মীকের কথা শুনে সবাই তাকে সাধুবাদ দিল। অ্যাডভেঞ্চারার্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করলেন, বল্মীক তুমি আমাদের অ্যাডভেঞ্চারার্স ক্লাবের নাম রেখেছো। তুমি প্রমাণ করেছে—আমাদের ক্লাবের সদস্যরা শুধু নির্ভীক নয়, সৎ আর পরিশ্রমীও বটে।

ছবি ঃ পিন্টু মণ্ডল

হাসির গল্প

হোঁৎকার কোঁৎকা

শক্তিপদ রাজগুরু

আমাদের স্কুলের নতুন হেড মাস্টারের চেহারাটা বেশ লম্বা-চওড়া। গুরু-গম্ভীর ধরনের মানুষ। গলার স্বরটাও বেশ কঠিন ও ওজনদার তার চেহারার মতোই। একজোড়া পুরুষ্ঠ গোঁফ আর চোখদুটো যেন বাঘের মতো—যেন চারদিকে সব সময় ঘুরছে।

নতুন স্কুলে জয়েন করেই—আমাদের স্কুলে নতুন হেড মাস্টার বিক্রম সরখেল বেশ কিছু নিয়ম জারি করলেন—পাঁচ মিনিটের লেটে কেউ ক্লাসে ঢুকলে তাকে ক্লাসে কল দেওয়া হবে না।

স্কুল চলাকালীন পাঁচিল টপকে কোনও ছাত্র পালাবার চেষ্টা করলে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

ক্লাসে বদমাইশি-মারপিট করলে গার্জেন কল করা হবে ইত্যাদি।

ফলে হোঁৎকা এবং তার দলবলের খুবই অসুবিধা হয়ে গেল। কারণ স্কুলের বেশিরভাগ বেনিয়মই তারা করে। ফলে এইরকম বেনিয়ম করতে গিয়ে এরমধ্যেই হোঁৎকা ধরা পড়া গেছে—সেদিন পাড়ার ফুটবল ম্যাচের ফাইনাল খেলা, হোঁৎকা নিজে খেলছে—হোঁৎকা আর গোবর্দ্ধন ওরফে গোবরা দুজন দলের ব্যাক। তাই ফোর্থ পিরিয়ডের

ক্লাশ না করেই পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়বি তো পড় একেবারে হেড স্যারের চোখে পড়েছে।

বিক্রমবাবু সেদিন স্কুলের পিছনদিকে বিল্ডিং-এর কাজ দেখে ফিরছিল আর সেই মুহূর্তে হোঁৎকা পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে তার ঘাড়েই পড়েছে। হোঁৎকা-গোবরা ভাবতেই পারেনি যে হেড মাস্টার এভাবে এদিকে এসে পড়বে। হেড স্যার তাদের দুটোকে ধরে নিয়ে এসে সেদিন স্কুলের অফিসের সামনে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখেন স্কুল ছুটির পর অবধি।

ওদিকে গোবরা আর হোঁৎকাকে ছাড়াই তার ফুটবল টিম ফাইনাল খেলায় নেমেছে—শেষ পর্যন্ত তাদের টিম ছ-খানা গোল খেয়ে গো-হারান হয়েছে।

স্কুল থেকে ছাড়া পাবার পর ক্লাবে এসে দেখে দলে জয়জয়কার নয়—হাহাকার চলছে। টিম ছয় গোল খেয়ে বসে আছে। হোঁৎকার এবার রাগ গিয়ে পড়ে স্যারের উপর। হোঁৎকা বলে, ওই হেডুরে আমিও দেইখা লইমু। অর জন্যে জেতা খেলা হাইরা গেলাম। ছ-ছয় খান গোল খাইলাম।

গোবরা বলে—কি করবি?

হোঁৎকা বলে—কি আর করবো? যা হবার তো হইয়া গেছে।

চ্যালেঞ্জ কাপ খানা হাত থেকে চলে গেল।

গোবরা—ছেড়ে দে যা হবার হেয়ে গেছে।

হোঁৎকা বলে—যা লজ্জাজনকভাবে আমাদের হারতে হইল তাতে আমাগো সুইসাইড ছাড়া কোনও পথ নাই।

আমি বলি—হ্যাঁরে। সুইসাইড মানে তো আত্মহত্যা। তুই কি তাই করবি ভাবছিস।

গোবরা ভরসা দেয়—থাম তুই। উঃ বুকখানা ফেটে যাচ্ছে রে হোঁৎকা। ওই হেডু স্যারই আমাদেরকে মার্ডার করল।

ক্লাসে আমরা সকলেই সন্ত্রস্ত। পান থেকে চুন খসলেই হেড স্যারের তলব। স্কুলে কেউ গোলমাল পাকালে-কেউ মারপিট করলে অমনি বিক্রম স্যারের তৎপরতা শুরু হল।

সেবার পলাস ক্লাসে যেভাবে নিত্যকে সামান্য কি কারণে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে—তার বুকের ওপর চেপে বসে স্কুলের নাটকের দুঃসাসনের মতো গর্জন করে বলছিল,—রক্তপান করে তৃষ্ণা মেটাইবো মোর।

হেডস্যারের নজরেই পড়ে যায় সেই রক্তপানের দৃশ্যটা। তিনি দুঃশাসনরূপী নেত্যর কান ধরে টেনে তুলে বেশ করে মুলে দিয়ে গার্জেন কল করে গার্জেনকে ডেকে নিত্যর মহাভারত কাহিনি ব্যাখ্যা করে তাঁদেরকে হুঁশিয়ারী দেয়।

ক্লাশে নাইনের দোল গোবিন্দ ভালো হিন্দি গান গায়। আমরা ওকে ক্লাস কুমার বলি। তার গান শুনে সেবার স্যার ক্লাসে ঢুকে দোল গোবিন্দের গলাটাই টিপে ধরে—তাতে করে বেচারার দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। এমনকি পাঁচ পিরিয়ড পর্যন্ত বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। এ যেন আমাদের সকলেরই অপমান।

এভাবেই যতদিন যায় বিক্রম স্যারের বিক্রম ক্রমাগত বেড়ে যেতে লাগল আর আমাদের লাইফও হেল হয়ে উঠলো।

এদিকে হোঁৎকাও নীরব রাগে ফুঁসছে—তার টিম ছ-গোলে গোহারান হেরেছিল। হোঁৎকার মাথায় মাঝে মধ্যেই নানা উদ্ভট্ বুদ্ধি খেলে। আমাদের ক্লাসে সেই বিশেষ পরামর্শদাতা। যতিন-অর্করাও বলে—একটা কিছু কর হোঁৎকা। এতো স্কুল নয় রে—যেন জেলখানা হয়ে গেছে রে।

হোঁৎকা বলে—ভাবতাছি এই স্কুলই ছাইরা দিমু-তয় মোকা খুইজ্জা হেডুরে এমন গোঁৎতা দিয়া যাইবো। হোঁৎকা তার দেশজ ভাষাতেই কথা বলে।

আমি বলি—যাবার আগে কিছু একটা কর। একটা ফিনিসিং টাচ্ দিয়ে যা।

কদিন পরেই আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠা উৎসব। এবারে বৈশাখের শেষদিকে পড়েছে উৎসবটা। এতদিন স্কুলের মাঠেই মঞ্চবেঁধে উৎসব পালন করা হতো—সেখানে কিছু নেতা-শিক্ষকরা ভাষণ দেন। তারপর আমাদের নাচগান-নাটক করা হত।

এইবারে বিক্রম সরখেল এই উৎসব আরও ঘটা করে করতে চান—যাতে স্কুলের প্রচার বেশি করে হয়। এবার সব ছাত্রদের নিয়ে বিক্রমবাবু বলেন—বেলা নয়টার স্কুল থেকে পদযাত্রা শুরু হবে প্রসেসান করে। সব ছেলেকে সেই শোভাযাত্রায় অংশ নিতে হবে। শহর পরিক্রমা করে দুপুরে এই পদযাত্রা ফিরে আসবে স্কুলে।

বিকালে আবার সন্ধে পর্যন্ত ভাষণ-নাচগান অন্যান্য অনুষ্ঠান হবে।

বিক্রমবাবু অর্ডার দেন—সব ছাত্রকেই উপস্থিত থাকতে হবে পদযাত্রায়।

বৈশাখ মাস—অনেকদিন বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। সকাল থেকেই রোদ, সঙ্গে ভ্যাপসা গরমে জেরবার হতে হচ্ছে।

আমাদের শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে। রোদের তাপও বাড়ছে। সমবেত গান গাইতে গাইতে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। রোদের তাপটা ক্রমশ বাড়ছে। বোতলে জলও শেষ। এদিকে আবার গান থামালেই বিক্রমবাবু গাড়ি থেকে চিৎকার করবে—থামলে কেন? গান গেয়ে যাও—

আর গান। গলা শুকিয়ে কাঠ। ঘামছি-রোদের তাপে চোখে সরষের ফুল দেখছি—পথ চলতে চলতে মনে হয় মাথা ঘুরেই এবার ছিট্‌কে পড়তে হবে। তবু গলা তেড়ে গাইতে হচ্ছে।

পথের দুদিকে উৎসাহী দর্শকের ভিড়—ঠা ঠা রোদে আমাদের করুণ অবস্থা তারাও দেখছে। জনতার মধ্যে থেকে গুঞ্জন ওঠে—এই ঠা ঠা রোদে ছেলেগুলোকে নিয়ে পথে পথে ঘুরছে?

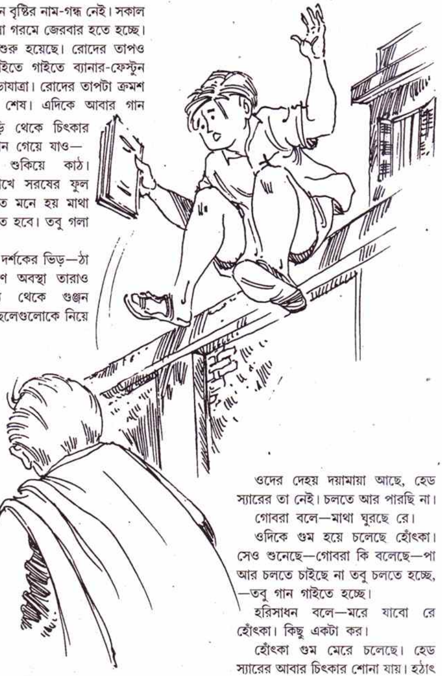

কে বলে—বেচারারা আধমরা হয়ে গেছে। সান স্ট্রোক না হয়ে যায়।

ওদের দেহয় দয়ামায়া আছে, হেড স্যারের তা নেই। চলতে আর পারছি না।

গোবরা বলে—মাথা ঘুরছে রে।

ওদিকে গুম হয়ে চলেছে হোঁৎকা। সেও শুনেছে—গোবরা কি বলেছে—পা আর চলতে চাইছে না তবু চলতে হচ্ছে, —তবু গান গাইতে হচ্ছে।

হরিসাধন বলে—মরে যাবো রে হোঁৎকা। কিছু একটা কর।

হোঁৎকা গুম মেরে চলেছে। হেড স্যারের আবার চিৎকার শোনা যায়। হঠাৎ কলরব ওঠে—হোঁৎকা রোদের মধ্যে হঠাৎ ছিট্‌কে পড়েছে রাস্তায়।

হোঁৎকা রাস্তায় ছিট্‌কে পড়ে ছটফট করছে—চোখ কপালে উঠে গেছে—মুখ দিয়ে গ্যাজলা বেরুচ্ছে। শোভাযাত্রা থমকে যায়। পথচারিদের ভিড় জমে যায় মুহূর্তে। এরমধ্যে পথের ধারে দোকান থেকে জল এনে চোখে-মুখে দেওয়া হয়েছে। হোঁৎকা তবু ছটফট্ করেই চলেছে সঙ্গে গোঙানির শব্দ ওঠে।

লোকজন এবার ফুঁসে ওঠে—এই রোদে ছেলেগুলোকে পদযাত্রা করাচ্ছেন মশাই। আপনারা মানুষ না অন্যকিছু। বিক্রম স্যারও গাড়ি থেকে নেমে এসেছে—পথচারীরা এবার হেডস্যারকেই আক্রমণ করে।—মারবেন নাকি মশাই, এই বাচ্চা ছেলেগুলোকে। এ রোদে কেউ ছেলেদের নিয়ে এইভাবে বাইরে বেড়ায়। আপনি মাস্টার না মার্ডারার। বন্ধ করুন আপনাদের এই পদযাত্রা। নাহলে আমরাই প্রতিবাদ করব।

এরমধ্যে কে যেন অ্যাম্বুলেন্সেও খবর দিয়েছে—ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সও এসে পড়ে। চোখে-মুখে জল দিতে হোঁৎকা এবার একটু সাড়া দেয়।

হেড স্যারও ঘাবড়ে গেছে—বাবা হোঁৎকা। এখন কেমন লাগছে?

—অ্যাঁ। হোঁৎকা একটা শব্দ করেই আবার লেপটে পড়ে। এরমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় হোঁৎকাকে।

হেড়ু-র পদযাত্রা এখানেই ভেস্তে যায়। হেড স্যার বাধ্য হয় তার সাধের পদযাত্রার ইতি টানতে।

আমরা হোঁৎকাকে হাসপাতালে রেখে বাড়ি ফিরে গেলাম। মনটা ভালো নেই। বিকালে তবু স্কুলে আসতে হয়েছে। আমাদের অনুষ্ঠান আছে—তাছাড়া হেড স্যারের হুকুম।

পরের দিন দেখি যথারীতি ক্লাবে এসেছে হোঁৎকা। সঙ্গে গোবরাও আছে।

আমি বলি—কি রে? হাসপাতাল থেকে এত তাড়াতাড়ি তোকে ছুটি দিয়ে দিল?

হোঁৎকা বলে—ধুস। ওসব আমার কিছুই হয়নি। তোরা রোদে আর হাঁটতে পারছিলি না আর হঠাৎ লোকজনের মুখে সান স্ট্রোকের কথাটা শুনে হেড়ুকে একটা শিক্ষা দেবার মোকা হাতছাড়া করতে পারলাম না আর তাই রাস্তায় ছিট্‌কে পড়ে একটা নাটক করলাম। আমার কিছুই হয়নি। ডাক্তারাও তাই আমাকে ছাইরা দিল।

পরেরদিন থেকে হেড স্যারের ব্যবহারটা কেমন যেন একটু নরম হয়ে গেছে। শুধু হোঁৎকা কেন অনেককেই একটু ছাড়পত্র দিয়েছেন। হোঁৎকাও তাই এই স্কুলেই রয়ে গেছে আগের মতোই।

ছবি : পিণ্টু মণ্ডল

মানবিকতার গল্প

কইমাছ চুরি

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেবার আমি পুরুলিয়া জেলার কুইলাপালের কাছে একটা আমবাগানে তাঁবু খাটিয়েছি সরকারি কাজে। কাজটা হল খনিজ অনুসন্ধানের জন্য পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো। রোজ সকালে জলখাবার খেয়ে গাইড কুলি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আশপাশের সব তল্লাটে ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় পাথর খুঁজে বেড়াই সারাদিন ধরে। বেলা আড়াইটে-তিনটে নাগাদ ফিরে আসি কুইলাপালের ক্যাম্পে। নানা পাথরের নমুনা নিয়ে। তারপর স্নান খাওয়া-দাওয়া ঘুম। সন্ধেবেলা রেডিয়োয় গান নাটক শোনা। তারই ফাঁকে পাহাড়-জঙ্গল থেকে নিয়ে আসা পাথরের স্যাম্পালগুলো পরীক্ষা করে দেখা, তার মধ্যে দামি ধাতু আছে কিনা। থাকলে কতটা আছে।

এভাবেই আমার দিন কাটে। কেবল রবিবার ছাড়া। রবিবার আমার ছুটি। সেদিন আর খনিজ অনুসন্ধানের কাজে বেরোই না। প্রায় সারাদিন কাটাই ডাকে আসা পত্রপত্রিকা পড়ে, গান শুনে। কিংবা মাঝে মাঝে রান্নাবান্না করে, যদিও আমার রান্নাবান্না করার জন্য একজন লোক আছে। তার নাম হরি।

প্রতি রবিবার বিকেলে যাই কুইলাপালের হাটে। সারা সপ্তাহের জন্য বাজার করে রাখতে। কারণ এখানে সপ্তাহে একদিনই হাট বসে। আর সেই একদিনই যা একটু-আধটু

মাছ-টাছ পাওয়া যায়। অন্যদিন সেই সুযোগ নেই। মাছ বলতে অবশ্য সেই ছোট ছোট রুই, কাতলা, মৃগেল। অন্য মাছ বিশেষ পাওয়া যায় না। আমার সঙ্গে হরিও হাটে যায়। সে মাছ রান্না করতে পারে বটে, কিন্তু ঠিকমতো মাছ কাটতে পারে না। তাই হাটে যার কাছ থেকে মাছ কিনি, তাকে দিয়েই কাটিয়ে নিই।

হাটে অবশ্য দু-তিনজন দোকানিই মাছ বিক্রি করে। তবে বেশির ভাগ দিনই মাছ কিনি একটি কিশোরী মেয়ের কাছ থেকে। মেয়েটির বয়েস চোদ্দ-পনেরো। নাম ছিটকিনি। সঙ্গে ওর ছোট ভাইও থাকে, সে মাছ কাটার কাজে দিদিকে সাহায্য করে। বছর দশেকের ভাইটির নাম পেরেক।

দু ভাইবোনের এমন অদ্ভুত নাম কেন? খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম, বাবা কাঠের মিস্তিরি। তাই ছেলেমেয়েদের এরকম নাম। হয়তো এভাবেই নিজের পেশার কথা গ্রামের সবাইকে জানাতে চেয়েছে। হাটের দিন একটা দশ পয়সার কয়েন দিয়ে পেরেক খদ্দেরদের মাছের আঁশ ছাড়ায় আর ছিটকিনি দিদি বটি দিয়ে আঁশ ছাড়ানো মাছগুলির নাড়িভুড়ি বের করে টুকরো টুকরো করে।

এক রবিবারের কথা বলি। অন্যান্য রবিবারের মতো সেদিন বিকেলেও কুইলাপালের হাটে গিয়েছি। বেশ বড় হাট। হাটের মধ্যে আটচালা আছে কয়েকটা। তাতে দোকান সাজিয়ে বসেছে ব্যাপারিরা। একপাশে প্রচুর তরিতরকারি কিংবা মাছ নিয়ে বসেছে দেহাতি মেয়েপুরুষরা। অন্যপাশে মশলাপাতি আর তেলেভাজার দোকান। চুলকাটার নাপিত, ঝালাই করার মিস্তিরি—কী নেই! অন্যদিনের মতোই হাটে বেশ ভিড়। এক সপ্তাহের জন্য তরিতরকারি কিনে আমি আর হরি পৌঁছলাম ছিটকিনির মাছের দোকানে।

দেখলাম, আজ ছিটকিনির দোকানে বেশ কয়েক রকমের মাছ। অবাক কাণ্ড, রুই-কাতলা-মৃগেলের সঙ্গে কইমাছও রয়েছে। কইমাছগুলো জ্যান্ত, মাটির হাঁড়িতে জলের মধ্যে লাফাচ্ছে। এই হাটে আগে কখনো জ্যান্ত কইমাছ দেখিনি।

জিজ্ঞেস করলাম,—কী রে, ছিটকিনি, কইমাছ কোত্থেকে পেলি?

—কাল বাবা মিস্তিরি খাটতে খাতড়া গেইছিল। সিখানে সস্তায় কইমাছ পাইছে। আপনার জন্যি মাছ রাইখে দিছি—

—আমার জন্য?

—হ্যাঁ বাবু—।

—ঠিক আছে। সবকটা কইমাছ আমাকে দিয়ে দে। কিন্তু দেখিস দাম যেন বেশি না হয়।

—না বাবু, দাম সস্তা। দশটা কইমাছ কুড়ি টাকা। আর মাছ কাইটবার জন্যি বাবু দুই টাকা দিবেন—

—ঠিক আছে। এই নে, দশটা মাছের বাইশ টাকা। এই থলেতে মাছগুলো কেটে রাখিস। দুয়েকটা জিনিস কেনা বাকি আছে। সেগুলি কিনে ফিরে আসছি। মুদি দোকানের কয়েকটা জিনিস কিনে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলাম মাছের দোকানে।

আমাকে দেখে ছিটকিনি বলে উঠল,—এই যে আপনার ব্যাগ। পেরেক আর আমি দুজনা মিলি মাছ কাটি দিছি—

তাঁবুতে ফেরার তাড়া ছিল। তাই মাছের ব্যাগ নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম ক্যাম্পে। আমার ক্যাম্পে তো রেফ্রিজারেটর নেই, তাই কইমাছগুলোকে আজ নয়তো কাল সকালের মধ্যেই খেয়ে ফেলতে হবে।

হরিকে ডেকে বললাম,—খুব ভালো করে মশলা-টশলা দিয়ে কইমাছ রান্না করো।

বাজারের ব্যাগ নিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে চলে গেল হরি। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধে হয়ে আসছে। ক্যাম্পের চৌকিদার মঙ্গলরাম হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। চিকে ঢাকা বারান্দায় ফোলডিং ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ট্রানজিস্টারের গান শুনছিলাম। গান শুনতে শুনতে তাকিয়ে ছিলাম দূরের শাল জঙ্গলের দিকে।

খানিকক্ষণ পরে চিকের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল হরি। ও যেন কিছুটা উত্তেজিত।

বললাম,—কী ব্যাপার হরি। কিছু বলবে?

—বাবু, আপনি তো ঐ ছিটকিনি আর পেরেককে খুব বিশ্বাস করেন। কিন্তু ওরা আজ আপনাকে কম মাছ দিয়েছে।

—কী করে বুঝলে? তোমার কাছে তো দাঁড়িপাল্লা নেই।

—তা নেই। কিন্তু ছিটকিনি আপনাকে বলেছিল, দশটা কইমাছ আছে। কিন্তু এখন থলেয় দেখছি আটটা মাছ। তার মানে দুটো মাছ চুরি করেছে।

—না, না। ছিটকিনি কক্ষনো মাছ চুরি করবে না। দেখো, তোমার বোধহয় গুনতে ভুল হয়েছে। হয়তো

তাঁবুর ভেতরে এদিক-ওদিক কোথাও পড়ে আছে। ভালো করে খুঁজে দেখো—

—না বাবু, তাঁবুর ভেতরে ভালো করে খুঁজে দেখেছি। কোথাও মাছ নেই। মনে হয় নিজেরা খাওয়ার জন্য দুটো মাছ সরিয়ে রেখেছে।

তাই নাকি!—আর কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। আমার যদিও বিশ্বাস ছিল, ছিটকিনি কখনো মাছ চুরি করবে না, তবু মনে মনে ভাবলাম, যদি সত্যিই ওরা নিজেদের খাওয়ার জন্য দুটো মাছ সরিয়ে রেখে থাকে, তবে আমার কাছে চাইলেই পারত। আমি দুটো মাছ ওদের এমনিই দিয়ে দিতাম। আমাদের ক্যাম্পে কইমাছ খাওয়ার লোক কোথায়!

গজগজ করতে করতে হরি নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলে ফোলডিং ইজিচেয়ারে নিজেকে আবার এলিয়ে দিলাম।

কিন্তু মনের মধ্যে বারবার একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল। ছিটকিনি ও পেরেক কি সত্যিই কইমাছ দুটো সুযোগ বুঝে সরিয়েছে? এসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঝিমুনি এসে গিয়েছিল আমার।

সেই ঝিমুনিটা হঠাৎ ভেঙে গেল মঙ্গলরামের ডাকে। তাঁবুর চিকের বাইরে দাঁড়িয়ে মঙ্গলরাম ডাকছিল,—বাবু বাবু। দুটা ছোট ছেলেমেয়ে আপনাকে ডাকতিছে। বাবু বাবু—

চোখ মেলে হ্যাজাকের আলোয় দেখলাম, মঙ্গলরামের পাশে সংকুচিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ছিটকিনি ও পেরেক। ছিটকিনির হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা।

—আরে ছিটকিনি! আয় আয়, ভেতরে আয়। তোদের কথাই ভাবছিলাম। মঙ্গলরাম, ওদের ভেতরে নিয়ে এসো—

মঙ্গলরামকে ওদের ভেতরে নিয়ে আসতে হল না। নিজেরাই গুটি গুটি পায়ে চিকের পর্দা সরিয়ে তাঁবুর ভেতরের বারান্দায় ঢুকল ছিটকিনি আর পেরেক।

ওদিকে আমাদের কথাবার্তার আওয়াজে হরি ছুটে এল নিজের তাঁবু থেকে। দুই ভাইবোনকে দেখে হরি রেগেমেগে কী যেন বলতে গেল। হাত দিয়ে ইশারা করে হরিকে থামিয়ে দিয়ে ছিটকিনির দিকে তাকাই আমি।

কাঁদো কাঁদো গলায় বলে ছিটকিনি,—আমার ভুল হয়ে গেছে বাবু। মাটির হাঁড়ির মধ্যে দশটা মাছ ছিল। কিন্তু মাছগুলি কাটবার সময় দুটা মাছ পলাই গেছিল। খুব জীয়ন্ত মাছ তো! আপনার থলিতে কাটা মাছগুলি ভরবার সময় গোনা হয় নাই। অনেক খদ্দের ছিল। তাই না পেরেক?

দিদির কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দেয় পেরেক,—হ্যাঁ বাবু, অনেক খদ্দের ছিল।

ছিটকিনি আবার বলতে শুরু করে, বাবু, দোকান বন্ধ করে চলে আসবার সময় হঠাৎ দেখলাম, দুটা কইমাছ ঘাসের উপর ছটফট করছে। অনেক কষ্টে মাছদুটাকে ধরেছি বাবু। এ দুটা আপনাদেরই মাছ বটে!

হরি বলে ওঠে,—তাই নাকি!

ছিটকিনি বলে চলে,—এই দেখুন, কইমাছ দুটা ধরতে গিয়ে আমার আর পেরেকের হাত কীরকম কাটি গেছে—

ছিটকিনি আর পেরেকের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওদের দুজনের হাতই বেশ কেটে ছড়ে গেছে। এরই মধ্যে ছিটকিনি হাতের শালপাতার ঠোঙাটা এগিয়ে দেয় হরির দিকে।

মুচকি হেসে হরির দিকে তাকিয়ে বললাম,—এবার তাহলে তোমার কইমাছের হিসেব মিলে গেল।

এবার আমি তাঁবুর ভেতরে গিয়ে ফার্স্ট এইড-এর বাক্সটা নিয়ে এসে ছিটকিনি ও পেরেকের হাতে মলম লাগিয়ে দিলাম।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে সংকুচিত গলায় বলল ছিটকিনি ;—আমরা তবে যাই বাবু।

আমি বলে উঠি,—সে কী! তোমরা এখন যাবে কেন? খেয়েদেয়ে তারপর যাবে। আজ আমাদের এখানে তোমাদের নেমন্তন্ন। যাও হরি, রান্নাঘরে গিয়ে ওদের জন্য ভালো করে রান্না করো—

আমার কথা শুনে ছিটকিনি ও পেরেকের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে হাসির দাম অনেক।

ছবি ঃ পার্থসারথি মণ্ডল

www.banglabooks.in

মজার গল্প

ওড়গ্রামের মুংলি

কার্তিক ঘোষ

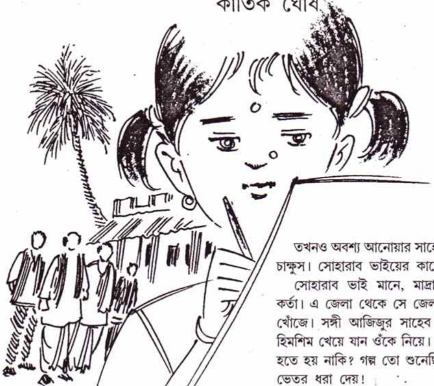

ওড়গ্রামটা ঠিক কোথায়, আমিও তো জানতুম না প্রথম। পরে যখন সব শুনলুম, তখনও অবশ্য ভালো করে বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। কারণ, কোথায় সেই 'নওদার ঢাল' ইস্টিশন, আর কোথায় সেই ওড়গ্রামের আনোয়ার সাহেবদের ইস্কুল—তখনও ঠিক স্পষ্ট হয়নি রাস্তাটা। তবে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন যাবার পথে বর্ধমান, খানা জংশন পেরিয়ে 'নওদার ঢাল' স্টেশনটা মনে পড়ে। সত্যিই ইস্টিশন থেকে বেশ ঢালুতে নেমে গেছে রাস্তাটা। মোরাম ঢালা রাস্তায় গোরুরগাড়িতে গ্রামের মানুষকে যেতে আসতেও দেখেছি কখনও কখনও। সেখান থেকেই নাকি দেড় কিলোমিটার দূরে ওড়গ্রাম।

তখনও অবশ্য আনোয়ার সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়নি চাক্ষুস। সোহারাব ভাইয়ের কাছেই সব শোনা।

সোহারাব ভাই মানে, মাদ্রাসা ইস্কুলগুলোর বড়ো কর্তা। এ জেলা থেকে সে জেলায় ঘুরপাক খান গল্পের খোঁজে। সঙ্গী আজিজুর সাহেব আর হাবিবভাইরা তো হিমশিম খেয়ে যান ওঁকে নিয়ে। গল্প আবার খুঁজতে বের হতে হয় নাকি? গল্প তো শুনেছি চুপিসাড়ে এসে মনের ভেতর ধরা দেয়!

কিন্তু সোহারাব ভাই অন্য কথা বলেন সব সময়। ছোটরাই নাকি খবর রাখে আসল গল্পের। সেই ছোটদের কাছে গেলেই হদিশ মেলে অনেক গল্পের!

তাছাড়া—

ওড়গ্রামে আনোয়ার সাহেবদের যে ইস্কুল, সে ইস্কুলে যারা পড়ে—তাদের অনেকের সঙ্গেই না কি নিজের অনেক মিল খুঁজে পান সোহারাব সাহেব। সেই বোতাম ছেঁড়া জামা আর দড়ি বাঁধা পকেট ফুটো প্যান্ট। কী নাম যেন ছেলেটার? ছোট্টু মুর্মু। স্যার বলেই সোহারাবের সামনে এগিয়ে আসে।

চমকে ওঠেন কলকাতা থেকে আসা স্যার!

তাড়াতাড়ি বলেন, কিসে পড়িস?

ছোট্টু মুখটা একটু নীচু করে বলে, সেভেনে।

অমনি পঞ্চাশ বছর আগের বসিরহাটের মাটিগোড়ার সেই ছেলেটাও সামনে এসে দাঁড়ায় সোহারাব স্যারের। যার একটাই জামা প্যান্ট ছিল সেদিন। খাওয়া জুটত না সব দিন। কাঠের একটা লাল-নীল পেনসিল কারও হাতে দেখলে চেয়ে থাকত হ্যাংলার মতন।

হ্যাঁ। সেই সোহারাব ভাইয়ের সঙ্গেই একদিন তো গিয়ে পড়লুম ওড়গ্রামে।

আনোয়ার সাহেবের খুশি তো আর ধরে না!

ইস্কুলটাও বেশ বড়ো।

সোহারাব স্যার গল্প খুঁজতে এসেছেন শুনে ছোটরা তো সব হাঁ।

স্যার বলেন, কার কী নাম তোমাদের?

ছোট্টুই বলে গেল এক এক করে।

—ও হচ্ছে নাসিরা খাতুন, ও মামমি টুডু, ও হলো

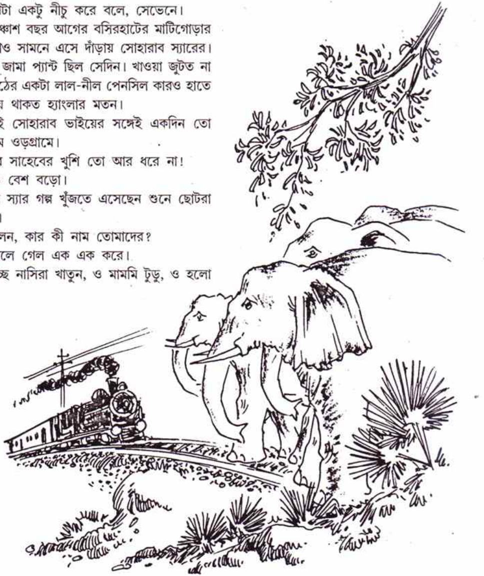

মঞ্জুলি হাঁসদা। আর ওর পাশে নাসিরা খাতুন। পিছনে আসমিনা।

স্যার বললেন, আচ্ছা বেশ। এখন বলো তো—তোমাদের মধ্যে কে আছো—যে গল্প বানাতে পারবে মন থেকে। একবারে নতুন।

নাসিরা বললে, স্যার আমাদের ক্লাসে মুংলি আছে—কত কী গল্প বানায় যখন তখন। সব মিছি মিছি গল্প স্যার। একটাও সত্যি নয়।

স্যার বললেন, তা হোক। তাকে ডাকো।

ছোট্টু অমনি ছুটল মুংলিকে ডাকতে। কিন্তু মুংলি তখন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছে স্যার ডাকছেন শুনে। মিছিমিছির একটা গল্প বলতে বড়োদের কাছে ওর লজ্জা করবে না বুঝি?

তবু এলো মুংলি। দাঁড়াল মাথা হেঁট করে।

সোহারাব স্যার তখন ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি খুব গল্প বানাতে পারো শুনছি।

মুংলি শুনে আরও যেন কেমন কুঁকড়ে গেল লজ্জায়।

বাধ্য হয়ে আমি একটু এগিয়ে গিয়ে বললুম, ভয় নেই। আমাদের সামনে কিচ্ছু বলতে হবে না তোমাকে। তুমি বরং চুপি চুপি একটা গল্প লিখে দাও না তোমার খাতায়। আমরা কলকাতা যেতে যেতে পড়ব।

কথাটা শুনে এবার যেন কেমন একটু সাহস পেল মুংলি।

নরম গলায় বললে, সবাই আমাকে মিথ্যুক বলে স্যার—

সোহারাব স্যার এবার সত্যি সত্যিই হেসে উঠলেন গলা ছেড়ে। তারপর বললেন, বলুক। গল্পে অমন একটু আধটু মিথ্যে না থাকলে হয়?

মুংলিও তখন ফিক করে হেসে উঠল একটু।

ওদের হেডস্যার আনোয়ার সাহেবও তখন উৎসাহ দিলেন মুংলিকে।

তারপর অবশ্য গ্রামটা আমরা দেখতে বেরিয়ে পড়লুম সবাই মিলে।

বিকেলে ফিরব। হঠাৎ শুনি কলকাতা যাবার রাস্তা অবরোধ করেছে একদল হাতি। আটকে দিয়েছে ট্রেন। আমরা বললুম, কেন? কেন?

ছোট্টু ছুটে এসে বললে, স্যার—বাঁকুড়ার দিক থেকে একদল হাতি আসছিল বর্ধমানের দিকে। তাদের সঙ্গে ছিল একটা ছুটকি?

আমরা বললুম,—ছুটকি আবার কে?

ছোট্টু বললে, ওদের ছোট্ট একটা মেয়ে স্যার। দামোদর নদীতে চান টান করে ছুটকি হঠাৎ বায়না ধরল, ও কিনা সীতাভোগ আর মিহিদানা খাবে বর্ধমানের।

বড়ো হাতিরা তো শুনেই খুব করে বকা দিলে ছুটকিকে।

ইস! হাতিরা আবার ওসব খাবার খায় না কি? মানুষের খাবার মানেই তো বিষ! খেলেই এমন অসুখ করবে যে বলার নয়!

কিন্তু ছুটকির তো কান্না থামানো যায়নি সহজে!

শেষ পর্যন্ত দলের যে গোদা শুঁড় বাড়িয়ে দিয়েছে সে একটা কান মলে। সেই রাগে ছুটকি যে কোথায় গেছে দুদিন, তার কোনও খবর নেই।

হাতিরা গেছে খেপে। নিশ্চয় কোনও মানুষ ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে ধরে নিয়ে গেছে বাড়িতে। বড়ো হলেই বিক্রি করে দেবে কোথাও। খেলা দেখাবে হয় তো সার্কাসে।

পুলিশও কিছু বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা।

হাতিদের রাগের কথা মানুষ কী করে বুঝবে? তাই, বেলা গড়িয়ে গেল দেখতে দেখতে।

হঠাৎ একটা ফোন এলো থানায়। ছোট্ট একটা মেয়ের গলা মনে হচ্ছে!

পুলিশের বড়োবাবু বললেন, কে বলছ তুমি?

—আমি ছুটকির বন্ধু।

—ছুটকি আবার কে?

—ছুটকি হলো হাতিদের মেয়ে। যাকে ওরা খুঁজে পাচ্ছে না বলে খেপে গেছে।

পুলিশের বড়োবাবু তো হাঁ। বললেন, ছুটকি এখন ঠিক কোথায়?

—ওড়গ্রামের মাদ্রাসা ইস্কুলটার মাঠে আমাদের সঙ্গে খেলা করছে।

—বলো কী?

বড়োবাবু বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে। ভাগ্যিস তুমি খবরটা দিলে। তোমরা কিন্তু সবাই থাকো। আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি ওকে আনতে।...

তারপর?

তারপর ঠিক কী হলো আমিও জানি না। কারণ, ওড়গ্রামের সেই মুংলি টুডু এই গল্পের শেষে আর কিছুই লেখেনি তার খাতায়! বিশ্বাস করো।

ছবি ঃ পার্থসারথি মণ্ডল

রূপকথার গল্প

জলপরী

দেবব্রত মল্লিক

একটা বিরাট তাল গাছ। এখানেই মাঠের শেষ। এরপরই সেই নদীটা। ডুলুং নদী। কে নাম রেখেছিল কেউ জানে না। তবে কেউ কেউ এ নদী নিয়ে অনেক গল্প করে। সেসব মজার মজার কথা। শুনতে খুব ভালো লাগে।

টুবাই এখনো সময় পেলে দাদুর কাছে বসে যায়।

তারপর কি হল?

কি আর হবে?

যা যা হওয়ার ছিল তাই হল?

কি হওয়ার ছিল বলো না দাদাজি?

দাদাজি চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। গল্পের কাহিনি যোগায় না যেন। সব সময় সব কথা কি মনে থাকে আমার? বয়স হচ্ছে না?

টুবাই আকাশ থেকে পড়ে? বয়স বাড়লে আমিও কি সব ভুলে যাবো?

হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

দাদাজি তুমি না আজকাল খুব হেঁয়ালি করে কথা বলো।

নাতির কথা শুনে দাদাজি কিছুটা থমকে যায়। মনে মনে ভাবে, এভাবে বলাটা ঠিক হয়নি। তাই ঘুরিয়ে উত্তর দেয়, দেখলে না এই মাত্র আমি দোকানে জিনিস আনতে গিয়েছিলাম। একটু জিরিয়ে নি?

অফকোর্স তুমি জিরিয়ে নেবে? হাতপাখা এনে তোমায় হাওয়া করি দাদাজি?

না না তোমায় ওসব কিছু করতে হবে না।

প্লিজ!

হেসে দেয় দাদাজি।

টুবাই জলের নীচে তাকিয়ে ভাবছিল কথাগুলো। স্কুল খুলতে দশ দিন বাকি নতুন ক্লাসের বই কেনা হয়নি এখনো। অতএব কারো কিছু বলার নেই। তবু মা সেসব কথা মানতে চায় না।

দাদাজি মা'র ওপর রেগে যেয়ে বলে, কয়েকটা দিন ওর মতো ওকে থাকতে দাও না?

মা হাসে। এখন সমস্ত দিন ওর মতেই'ত থাকে। ফাঁকে একটু ঝালিয়ে নিলে ওরই'ত ভালো হবে?

মা'র কাছে তবু রেহাই নেই। টুবাই মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মাকে কিছু বলতে পারে না।

একটা মাটির ঢেলা তুলে নিল টুবাই। তারপর ছুঁড়ে মারলো নদীর জলে। শব্দ হল ঠিকই। কিন্তু যেভাবে ঢিল ছোড়া জায়গাটা থেকে বৃত্তাকারে ঢেউগুলো ছড়িয়ে পড়ার কথা ছিল, তা হল না। ও ভালো করে, তাকিয়ে দেখে জলের দিকে। অসম্ভব টান জলে। এমনিতে ঠিক অনুমান করা যায় না। ভেসে আসা কোনও কাঠের টুকরো কিংবা অন্য কোনো জিনিস, যা চোখে দেখা যায়, তর তর করে এগিয়ে চলে যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে। এটা কি জোয়ারের টান?

দাদাজির কাছে শুনেছিল টুবাই পাহাড়ি নদীতে জোয়া-ভাটা হয় না। তাহলে ডুলুং নদীতে হঠাৎ এ কিসের টান? কিছুতেই ও হিসেব মেলাতে পারে না। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে ঠিক করে দাদাজির কাছ থেকে এর উত্তর জেনে নেবে।

এ কদিন রোজই দুপুরে টুবাই চলে আসছে এখানে। মা শোয়ার সময় রোজ ডেকে নেয়। কিছুক্ষণ মা'র পাশে শোয়ও। কিছুক্ষণ মাত্র। মা ঘুমিয়ে পড়লেই ব্যাস। চুপি চুপি পা টিপে বাইরে আসা। প্রথম দু'একদিন মা বকেছিল। এখন আর কিছু বলে না।

টুবাই মাকে যুক্তি দেখিয়েছে, কয়েকদিন পর যখন স্কুল খুলে যাবে, তখন কি ভাবে আমাকে শোয়াবে?

তখন এর কথা তখন?

না, একদিনের শোয়ার জন্য, আমার অভ্যাস হয়ে যেতে পারে।

তুমি ঘুমনোর ছেলে!

সত্যি কথা বলতে কি, দুপুরে আমার একদম ঘুম পায় না। ইচ্ছেও করে না। তবু মা জোর করবে। এক‌েক দিন মা'র ওপর ভীষণ রাগ হয়। কিছুতেই বুঝতে চায় না আমার কি ভালো লাগে আর ভালো লাগে না।

টুবাই আর একটা ঢিল ছুঁড়লো নদীতে। আগের বার জলে যেমন কোনও কিছুই দেখতে পায়নি, এবার কিন্তু তা হল না। হঠাৎ করে জলে ঢিল পড়া জায়গাটা দুমড়ে মুচড়ে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো উথাল পাথাল।

টুবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। জলের ওপর ঠিক ওই জায়গাতেই কেবলই বুদ বুদ উঠছে। এক নাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ বুদ বুদ উঠেই চলেছে। তাহলে ওই জায়গায় নিশ্চয়ই কেউ রয়েছে? কই কাউকে'ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। টুবাই অপলক তাকিয়ে থাকে।

নদীর ওপারে টুবাইয়ের বরাবর একটা সবুজে হলুদে মেশানো পাখি একটা বড় পাথরের ওপর বসে আছে। মাঝে মাঝে ওর লম্বা লেজটা নাচাচ্ছে আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। দূর থেকেও টুবাই বুঝতে পারছে পাখিটা বেশ সুন্দর। এমন ধরনের পাখি এর আগে দেখেনি কখনো। এবার পাখিটা শিস দিয়ে গান ধরলো। টুবাই এর মনে হচ্ছে খুব চেনা সুর। একদম ঠিক ধরতে পারছে কোন্ গান।

ঠিক এই সময় বুদ বুদ ওঠা জায়গা থেকে পাখির গায়ের সঙ্গে মেশানো শাড়ি পরে জলের ওপর উঠে দাঁড়ালো একটা মেয়ে। টুবাই কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না ও স্বপ্ন দেখছে না কী অন্য কিছু। মেয়েটা টুবাইয়ের দিকে তাকিয়ে, হাসি হাসি মুখ।

কি ভাবছো? আমি কে জানো?

মেয়েটির গলার আওয়াজ পাখির শিস দিয়ে গান করা আওয়াজের সঙ্গে মেলানো।

টুবাই একদম হতভম্ব। মুখ দিয়ে তাই রা সরে না।

আমি জলপরী গো, জলপরী! মুখে খিল খিলে হাসি।

তুমি কোথায় থাকো?

জলপরী হাসিতে ভেঙে পড়ে। কেন?

না, জানতে চাইছি।

জলপরীর হাসি থামতেই চায় না। যেখান থেকে আমি উঠলাম।

তার মানে জলে? টুবাইয়ের বিস্ময় আরও বাড়ে।

হ্যাঁ জলেই'ত থাকি।

তোমার সেখানে বাড়ি আছে আমাদের মতো?

সব আছে।

রাস্তাঘাট। আমাদের মতো গাছপালা?

আমার সঙ্গে চল না একবার। জলপরী জানায়, আমাদের ওখানে কী কী আছে সব দেখিয়ে দেবো তোমায়।

আমি যেতে পারবো তোমার সঙ্গে? টুবাই বিশ্বাস করতে চায় না।

কেন পারবে না? আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। কোনও

অসুবিধে হলে দেখবো।

টুবাই'রা তবু কেন যেন জলপরীর কথা বিশ্বাস হয় না। মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোয় না ওর। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ করে টুবাই-এর নজর চলে যায় নদীর ওপারের বড় পাথরটার দিকে। ওমা! সেই পাখিটা নেই'ত ওখানে? কোথায় চলে গেল! এপাশ ওপাশ চারদিকে তাকাতে থাকে টুবাই।

কি খুঁজছো? জলপরী হাসি হাসি মুখ করে বলে। ওই বড় পাথরে ওপর একটা পাখি বসেছিল। কোথায় যেন ফুড়ুৎ করে চলে গেল। বিশ্বাস করো কর ওর গায়ের রঙ তোমার শাড়ির রঙের সঙ্গে মেলানো।

তা'ত হবেই?

কেন?

ওটা'ত আমিই ছিলাম।

ধ্যাৎ! টুবাই মানতে চায় না।

বিশ্বাস হয় না? এবার তাকাও পাথরের দিকে।

টুবাই তাকায়।

সত্যি সত্যি পাথরের ওপর সেই পাখিটা। তারপর চোখ ঘুরিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে দেখে টুবাই জলপরী নেই সেখানে। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারে না ও। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় টুবাই। মনে মনে বলে, এও কি সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়? মুহূর্তেই জলপরী আবার জলের ওপর।

টুবাই একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ে, তুমি নিশ্চয়ই যাদু জানো? কিছুটা ভয় পেয়ে যায় টুবাই।

আমি মোটেও যাদুকর নই। যখন আমি ডাঙায় থাকি আমায় পাখি হয়েই থাকতে হয়। আসলে জলই আমার থাকার জায়গা।

তোমার বেশ মজা? টুবাই অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে বলে।

তোমার মজা মনে হতে পারে। আমরা এই ভাবেই অভ্যস্ত।

আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হচ্ছে।

এবার জলপরী খিল খিল করে হেসে দেয়। জান টুবাই, অসম্ভব বলে কিছু নেই। সব কিছু নির্ভর করে তোমার নিজের ওপর।

আমার ওপর?

নিশ্চয়ই! যদি একটা কিছু করবো ভেবে চুপ করে বসে থাকো, তাহলে কি হবে?

টুবাই মুখে কথা না বলে মাথা নাড়ে।

নিজেকে সচেষ্ট হতে হবে। জলপরী বোঝাতে থাকে, সব চেষ্টারই কিছু না কিছু সুফল আছে। অবশ্যই সেটা মন থেকে এবং আগ্রহ থাকা চাই।

বা বা! তুমি দারুণ কথা বলতে পারো। টুবাই খুশি।

কথা বলতে পারি বলেই'ত তোমার কাছে এসেছি।

টুবাই আনন্দে কী করবে ভেবে পায় না। খুশিতে হাততালি দিতে থাকে। শেষে হাত তুলে নাচতে শুরু করে।

এতক্ষণ জলপরী দূরে দাঁড়িয়েছিল। এরপর সামনে এসে দাঁড়ালো। একদম টুবাই'র কাছে। হাত ধরে নেচে দেখিয়ে দিল টুবাইকে।

এভাবে নাচতে হয়।

তালে তালে পা ফেলার ঢঙ। নানাভাবে হাত ঘোরানোর কায়দা। টুবাই যেন একটা পুতুলের মতো। ওকে যেভাবে চালনা করা হচ্ছিল, ও সেভাবেই চালিত হচ্ছিল।

একটা সুন্দর গন্ধ টুবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এতক্ষণ। জলপরীদের শরীরে এমন সুন্দর গন্ধ হয়। এ গন্ধটা ঠিক কার মতো? মেলাতে পারে না ও। আর তোমার হাত দুটো কী নরম! আমার মনে হচ্ছিল তুলোর মতো। টুবাই এই কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ করেই বলে বসে, তোমার হাতদুটো এত ঠান্ডা কেন?

জলপরী একথার কোনও উত্তর না দিয়ে হাসতে

থাকে।

সত্যি কি ভীষণ ঠাণ্ডা তোমার হাত। টুবাই আবার বলে। আমার মনে হচ্ছিল যেন বরফ।

জলপরী এবারও কোনও উত্তর করে না। মুখে শুধু হাসি।

তুমি ওভাবে শুধু হাসছো কেন? টুবাই জানতে চায়।

তোমার ব্যাপার স্যাপার দেখে হাসি পাচ্ছিল। জলপরী হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে।

এরপর অনেকক্ষণ টুবাই-এর সঙ্গে থেকেছিল জলপরী। অনেক কথা হয়েছে দু-জনের মধ্যে। জলের নীচের নানা মজার মজার ঘটনা শুনেছে। বহু তথ্য। ভিন্ন ভিন্ন জায়গার ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি।

টুবাই এ সমস্ত ব্যাপারে কোনও কল্পনার কথা ভাবতে পারেনি। তবে নিজের চোখে না দেখলে হয়? তবে যতই যা হোক শোনা কথা এবং নিজের চোখে দেখার মধ্যে অনেক তফাৎ থেকে যায়।

জলপরী'র মনটা বেশ সহজ সরল। টুবাই এর সন্দিগ্ধ মনকে নিরসন করার জন্য ও জানিয়েছে, তোমায় এত ভাবনা করতে কে বলেছে? নিজের চোখে সবকিছু দেখে নিলেই পারো?

তাহলে'ত খুব মজা।

আনন্দে লাফিয়ে ওঠে টুবাই। আমায় কিন্তু ঘুরে ঘুরে সব দেখাতে হবে। সবকিছু মানে সবকিছু।

খিল খিল করে হেসে ওঠে জলপরী। তুমি বেশ মজার কথা বলো। এটা কি মজার কথা হল? একটা নতুন জায়গায় সবকিছু ভালো করো দেখবো না?

নিশ্চয়ই দেখবে।

নির্দিষ্ট দিনে টুবাই সকাল সকাল এসে হাজির। ডুলুং নদীর জল তর তর করে বয়ে চলেছে। বাতাসে তেমন বেগ নেই। প্রকৃতিও বেশ শান্ত। কয়েকটা দোয়েল আর ময়না মাঝে মাঝে উড়ে এসে বসছে ঝোপের পাশে। একদল ঘুঘু পাখি ছোট্ট খোলা মাঠটায় বসে পাখা ঝাপটা ঝাপটি করছে। নদীর ওপারে সেই বড় পাথরের টুকরোটা একইভাবে আছে।

ভালো করে নজর করে টুবাই। ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। চারদিকটা কেমন যেন থমথমে। মাথার ওপর দিয়ে একটা টিয়া পাখি উড়ে চলে গেল। কোনওদিক থেকে টিয়াটা এল টুবাই বুঝতে পারেনি। একটু পরে আরও একটা। শেষে এক ঝাঁক। ডুলুং-এর জলে ওদের ছায়া পড়েছিল। ও স্পষ্ট দেখতে পেল।

টুবাই অন্য কোনও দিকে মন দিতে চায় না এখন। শুধুই অপেক্ষা। হয়তো জলপরী এক্ষুনি চলে আসবে।

ছবি : পার্থ মৈত্র

অলৌকিক গল্প

রুদ্রসেনের রুদ্রাক্ষ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

রুদ্রকে এখানে এ অবস্থায় দেখবো কোনোদিন ভাবিনি।

আমার একদা সহকর্মী রুদ্রসেন। কী অদ্ভুত পরিবর্তন। এখন ওর পরনে গেরুয়া বসন। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। গভীর দু-চোখের দৃষ্টি। প্রথমটা তো চিনতেই পারিনি—যদি না ও নিজে থেকে...!

হরিদ্বার বেড়াতে এসেছিলাম দিন কয়েক আগে। সেখান থেকে হৃষিকেশ। নদীর ধারে পাহাড়ের ওপর শান্ত সুশীতল স্থান। ঋষি ও দেবতাদের পুণ্য ভূমি। বলা হয় হৃষিকেশ স্বর্গলোকের তোরণদ্বার। তবে আমরা শহুরে মানুষ। এখানে আসি জীবনযাত্রার নানা ব্যস্ততার মধ্যে থেকে দিন কয়েকের জন্যে মনের শান্তি খুঁজতে।

আগের দিন হৃষিকেশ পৌঁছেছি। উঠেছি একটা ধর্মশালায়। ইতিউতি ঘুরছিলাম। অপূর্ব এ অঞ্চলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য। ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিলাম নদীর ধারে এক ছোট্ট আশ্রমের কাছাকাছি। ইতিমধ্যে দিনের আলো কমে এসেছে। ফেরার পথ ধরবো ভাবছি, হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ডাকলো,—স্বরাজ।

পেছন ফিরে তাকালাম। প্রথমটা ঠিক চিনতে পারিনি।

—আমায় চিনতে পারছিস না?

হ্যাঁ, ওই সন্ন্যাসী তো আমার উদ্দেশ্যেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

ইতিমধ্যে দিনের আলো কমে এসেছে। সূর্য পশ্চিম আকাশে শেষ আলো ছড়াতে শুরু করেছে। সে আলোয় দেখলাম সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে পরিচয়ের হাসি। চমকে

উঠলাম। —রুদ্র!

—পূর্বাশ্রমে সেটাই আমার নাম ছিল। এখন আমি রুদ্রানন্দ।

—রুদ্রানন্দ।

সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অনেকগুলো পৃষ্ঠা যেন দ্রুত উল্টে গেল।

দশ বছর আগের সেই দিনগুলি।

তখন একটা সরকারি দপ্তরে চাকরি করতাম। রুদ্র ছিল আমার সহকর্মী। রুদ্র সেন। যেমন বলিষ্ঠ শারীরিক গঠন, তেমনি মনের তেজ। ও ছিল আমাদের অফিস ইউনিয়ানের অন্যতম নেতা। মিটিং মিছিল করতো। জ্বালাময়ী ভাষায় ভাষণ দিতে পারতো। আর ছিল ঘোরতর নাস্তিক। তার এ বিশ্বাসে কোন খাদ ছিল না। কখনও কোন মন্দিরে যাওয়া দূরের কথা, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্যন্ত আলোচনা করত না। বলত, ধর্ম ঈশ্বর এসব হলো আফিমের নেশার মতো। আসলে দুর্বলের ওপর সবলের শোষণের হাতিয়ার রূপে এগুলো ব্যবহার করা হয়। এনিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক হতো। কিন্তু রুদ্র তার বিশ্বাসে অটল ছিল।

তারপর একদিন সেই ঘটনাটা ঘটলো। আমাদের কাছে তখন কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হয়নি। বরং এটা আমরা একটা মজা হিসাবেই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ ঘটনার এক অদ্ভুত বিস্তার ঘটলো।

সেবার জানুয়ারী মাসে গঙ্গাসাগর ফেরত এক সাধুজী এসে কী ভাবে যেন ঢুকে পড়েছিলেন আমাদের অফিস দপ্তরে।

আমার সহকর্মীদের মধ্যে রজত ছিল অত্যন্ত ধর্মভীরু আর জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী। ওর হাতের দশ আঙুলে সবসময়ই জ্বল জ্বল করতো অন্ততঃপক্ষে এগারটা আঙটি। অর্থাৎ নবগ্রহ তো বটেই, সেই সঙ্গে আরও কোন কোন অজানা গ্রহকেও তুষ্ট করার জন্যে যে যা বলতো তাই করতো রজত।

গঙ্গাসাগর ফেরত সাধুজী এসে তাকেই পাকড়ালেন অথবা সেই সাধুজীকে পাকড়ে নিয়ে এসেছিল, তা আজ আর মনে নেই, তবে এটা মনে আছে সেদিন সেই সাধুজীকে ঘিরে আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে বেশ একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। যথারীতি রজত সাধুজীর কাছে নিজের ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নতুন করে আর একবার নিজের ভূত ভবিষ্যৎটা জেনে নেবার চেষ্টায় ছিল। সাধুজীকে দেখলে অবশ্য বিশ্বাসী লোকেদের ভক্তি হবারই কথা। পরনে গেরুয়া পোষাক। এক মাথা বাবরি চুল। কাঁধে ঝোলা। ভরাট কণ্ঠস্বর। তবে সাধুজী হিন্দিভাষী। হিন্দিতেই সকলের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

এ সময়ে রুদ্র দপ্তরে এসে ঢুকলো। বোধহয় ইউনিয়ান রুমে কোন জরুরী মিটিং করছিল।

ওকে দেখে আমরা মজা করার জন্যে বললাম,—এই রুদ্র, একজন সাধুবাবা এসেছেন। মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ সব ঠিকঠিক বলে দিচ্ছেন। তোর হাতটা দেখা না।

শুনে রুদ্র রাগত চোখে তাকাল, বললো,—এটা অফিস না আড্ডাখানা? যত ফালতু লোককে তোরা কী বলে ঢুকতে দিস?

কথাটা রজতের কানে যেতে ও প্রতিবাদ করলো—রুদ্র, যা জানিস না, তা নিয়ে তোর কিছু বলা উচিত নয়। সাধুজীর গণনা শক্তি সত্যিই অদ্ভুত। আমায় তো যা যা বলেছেন সব মিলে যাচ্ছে। এমনকি আমার পাঁচ বছর বয়সে একবার হুপিং কাশি হয়েছিল, তাও নির্ভুল বলে দিলেন।

—ওসব চালাকি। রুদ্র বললো, দেখ, প্রায় প্রতিটি ছেলে মেয়েই পাঁচবছর বয়সের মধ্যে একটা না একটা কোন ভারী রোগে ভুগে ওঠে। আর এই সব ব্যবসাদার জ্যোতিষীরা সেটাই তার গণনা বলে চালিয়ে দেয়। দেখ রজত তুই নিজেই হয়তো আগে এক সময়ে ওই বুড়োটাকে নিজের রোগের কথা বলে দিয়েছিস, আর সেটাই...

—লেকিন বৎস, তুমহারা ইয়ে বিশওয়াস অটল নেহি রহেগী।

আমরা দেখলাম আমাদের কথার মধ্যে সেই সাধুজী এসে দাঁড়িয়েছেন রুদ্রর পাশে। অদ্ভুত ওঁর চোখের দৃষ্টি। লক্ষ করলাম রুদ্র নিজের কথার মধ্যে সাধুজীর কথাটা শুনে হঠাৎ থমকে গেল।

—বৎস, আজ সে এক বরষকা অন্দর তুম হামারা পাশ আওগে।

কী যেন আছে সেই সাধুর কণ্ঠস্বরে। আমরা সবাই চুপ করে ওঁর কথা শুনতে থাকি। কিন্তু একি অবাস্তব কথা বলছেন সাধুজী। সবচেয়ে আশ্চর্য। রুদ্র ওঁর কথায় কোন

প্রতিবাদ করছে না।

হঠাৎ সাধু তাঁর ঝোলা থেকে একটা রুদ্রাক্ষ বার করেন। এত বড় উজ্জ্বল রুদ্রাক্ষ আমি অন্ততঃ জীবনে কোনোদিন দেখিনি।

—ইয়ে রুদ্রাক্ষ তুমহারে লিয়ে বৎস। হাম তো তুমকো ঢুরনে কে লিয়েই ইধার আয়া হ্যায়। বলতে বলতে সাধুজী তাঁর হাতের সেই রুদ্রাক্ষটা বাড়িয়ে দেন রুদ্রর দিকে।

আর ঠিক তক্ষুনি যেন সম্মোহন ভেঙে স্বাভাবিক হয় রুদ্র। বলে,—এই, এসব কী হচ্ছে এখানে? অফিসটা তো তোমরা একটা তামাসার জায়গা বানিয়ে ফেলেছ। এই কমল, এই ভণ্ড বুড়োটাকে এখান থেকে বার করে দে। এক্ষুনি। না গেলে কিন্তু আমি রিপোর্ট করতে বাধ্য হব।

এরপর কিছুটা তর্কাতর্কি হৈ চৈ।

এর মধ্যে হঠাৎ সবাই লক্ষ্য করলো সেই সাধুজী কখন এক সময়ে নিঃশব্দে আমাদের দপ্তর ছেড়ে চলে গেছেন।

যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তামাসা শেষ। তবে সাধুজী এত তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে অনেকেই কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হলো, কারণ ওদের ইচ্ছেটা ছিল সাধুজীকে দিয়ে হাত দেখিয়ে নিজের নিজের ভূত ভবিষ্যৎটা একবার গনিয়ে নেয়া।

এবার যে যার সীটে বসার পালা।

কিন্তু রুদ্র তার চেয়ারে বসেই চেঁচিয়ে উঠলো, একি! এটা আমার টেবিলে কে রেখে গেল?

আমরা সবাই ফিরে তাকিয়ে দেখলাম—সেই রুদ্রাক্ষটা, যেটা সাধুজী রুদ্রকে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রুদ্র নিতে চায়নি। সেটাই সাধুজী যাবার আগে কোন এক সময়ে রুদ্রর টেবিলে রেখে গেছেন।

কিন্তু তিনি জানলেন কি করে ওটাই রুদ্রর টেবিল? কারণ এ পর্যন্ত দপ্তরে ঢুকে রুদ্রতো তার চেয়ারে বসেনি—নাকি, সাধুজী না ভেবেই কোন একটা টেবিলে রুদ্রাক্ষটা রেখে গেছেন, আর কাকতলীয় ভাবে...

তাই বা তিনি করবেন কেন? রজত এসে রুদ্রাক্ষটা দেখে বললো—এটা খুব বিরল জাতের রুদ্রাক্ষ রুদ্র।

—বেশ তো, এটা তুমিই নিয়ে যাও, তোমার যখন এত পছন্দ হয়েছে।

—না না, আমার মনে হয় সাধুজী কোনো কারণে ওটা তোমাকেই দিয়ে গেছে বলতে বলতে রজত একটু থেমে ভ্রু-দুটো কুঁচকে বলে, কিন্তু সাধুজীর একটা কথার মানে ঠিক বুঝলাম না।

—কী? পাশ থেকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম।

—সাধুজী বললেন, উনি নাকি রুদ্রকে খুঁজতেই এ দপ্তরে এসেছিলেন। আরও একটা কথা বললেন, খেয়াল

করেছিস স্বরাজ?

—কী?

—সাধুজী বললেন, রুদ্রর এখনকার বিশ্বাস অটল. থাকবে না আর আগামী এক বছরের মধ্যে—ও সাধুজীর কাছে চলে যাবে।

—এই, যাও তো তোমরা এখান থেকে। যতসব ফালতু কথা। এবার রুদ্র ধমকে ওঠে, অফিসের কাজ কাম কি কিছু নেই? বলতে বলতে রুদ্রাক্ষটা ছুঁড়ে ফেলার জন্য হাত উঠিয়েও ওটার দিকে একবার তাকিয়ে থমকে যায় রুদ্র, তারপর হাতটা টেবিলে নামিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে বলে,—এটা আমার কাছেই থাক। আর যাই হোক, জিনিষটা দেখতে ভালো। এটা একটা শো-পিস হিসেবে ঘরে রেখে দেব।

আমাদের জীবনে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখার মতো ঘটনা আরও কত ঘটে। আমরাও ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! রুদ্রর জীবনে এরপর থেকে একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে শুরু করলো।

মাস খানেকের মধ্যেই অফিস ইউনিয়ানের কার্যকরী সমিতি থেকে পদত্যাগ করলো রুদ্র। আসলে বরাবরই ও খুব সৎ এবং প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষ। আর কিছুদিন যাবৎই ও ইউনিয়ানের কয়েকজন ওপর মহলের কিছু নেতার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। সেবার ইলেকশানের আগে ব্যাপারটা চরমে পৌঁছলো। রুদ্র পদত্যাগ করে বেরিয়ে এল কার্যকরী সমিতির বাইরে। রুদ্র বললো—শুধু মুখে আদর্শের বুলি কপচালেই চলে না, সে আদর্শকে নিজের জীবনে অনুসরণ করতে না পারলে সবটাই ভণ্ডামী।

রুদ্র যে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে তা টের পাচ্ছিলাম। অফিসে আমাকেই ও সবচেয়ে কাছের বন্ধু ভাবতো। একদিন টিফিনের ঘণ্টায় ক্যান্টিনে দাঁড়িয়ে রুদ্র বললো, —স্বরাজ, তুই যোগ বিশ্বাস করিস?

—যোগ?

—হ্যাঁ, যোগ হলো ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সাক্ষাৎ যোগাযোগ।

শুনে স্তম্ভিত হলাম। রুদ্রর কণ্ঠে ঈশ্বরের কথা! আজ পর্যন্ত তো কোনোদিন শুনিনি। বললাম,—তুই কি যোগাভ্যাস করিস?

—দিন কয়েক হলো শুরু করেছি, ভোর বেলায় কিছু সময়। প্রাণায়াম, ধ্যান...জানিস স্বরাজ, আজকাল মাঝে মধ্যেই রাতের বেলায় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি।

—কী স্বপ্ন?

—আমি যেন কোথায় ভেসে চলেছি...চারদিকে আলোর সমুদ্র...এর মানে কী বলতে পারিস?

জবাব দিতে পারিনি। কিন্তু লক্ষ করেছি এরপর থেকে আরও দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে রুদ্র।

একদিন লক্ষ্য করলাম রুদ্রর কণ্ঠে একটা মালা ঝুলছে। আর লকেটের মতো রুদ্রাক্ষটা রয়েছে সেই মালার ঠিক মধ্যমণি হয়ে।

জিগ্যেস না করে পারলাম না,—কী ব্যাপার রুদ্র? তবে যে বললি রুদ্রাক্ষটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে 'শো-পিস' করে রাখবি?

রুদ্র লজ্জা পেল না। ওর চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন বদলে গেছে। বললো,—জানিস স্বরাজ, এই রুদ্রাক্ষটা কণ্ঠে ধারণ করার পর থেকে আমার শরীরটা কেমন যেন হালকা হয়ে গেছে, মনের শান্তিও বেড়ে গেছে। আমি যা ইচ্ছে করছি তাই যেন ঘটে যাচ্ছে।

এসব কী শুনছি! যে রুদ্র কিছুদিন আগেও ছিল ঘোরতর নাস্তিক, কোন অলৌকিকতা বিশ্বাস দূরের কথা‐ রীতিমতো এসবের বিরুদ্ধে প্রচার চালাত, আজ সে হঠাৎ...! তবে কি এসবই সেই গঙ্গাসাগর ফেরৎ সাধুজীর মহিমা?

এর কদিন পর হঠাৎ খবর পেলাম রুদ্র সংসার ত্যাগ করে চলে গেছে। রীতিমতো চিঠি লিখে অফিস এবং পরিবার পরিজনের কাছে বিদায় নিয়ে কোন অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে রুদ্র।

আমি মিলিয়ে দেখেছিলাম ঘটনাটা ঘটলো সাধুজী আমাদের অফিসে আসার ঠিক এক বছরের মাথায়। সেই সঙ্গে সাধুজীর কণ্ঠস্বরটাই কানে বেজে উঠলো, 'আজ সে এক বরষকা বাদ তুম হামারা পাশ আওগে।'

তবে কি...! কিন্তু একথা কাকে বলবো? শুনে হয়তো সবাই হাসবে। বলবে, কাকতালীয়! তারা জল্পনা কল্পনা করবে অন্য কোন কারণে ঘর ছেড়েছে রুদ্র সেন।

অতএব কাউকে আর কিছু বললাম না।

এরপর কালের নিয়মে সবাই ধীরে ধীরে রুদ্রর কথা ভুলে গেল।

দশটা বছর তো কম নয়...!

—কীরে স্বরাজ, খুব ভাবনায় পড়ে গেছিস তো? চমক ভাঙলো।

দেখলাম আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি হৃষীকেশের গঙ্গার ধারে এক আশ্রমের সামনে। আর আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রুদ্র সেন—না, সন্ন্যাসী রুদ্রানন্দ।

ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে। শেষ সূর্যের আলোটুকু এখনও ধরা আছে রুদ্রানন্দের মুখে। কী অদ্ভুত প্রশান্তি ওই চোখ দুটিতে।

—গুরুজী দু বছর হলো দেহরক্ষা করেছেন। তার আগেই উনি অসহায় বৃদ্ধদের জন্য নিজের হাতে গড়া এই আশ্রমটির দায়িত্ব আমার হাতেই সমর্পণ করে গেছেন।

—তোমার গুরুজী?

—হ্যাঁ, তুই তাকে দেখেছিস, মৃদু হাসি খেলে গেল রুদ্রর মুখে, থুড়ি রুদ্রানন্দের ঠোঁটের ফাঁকে,—সেই যে গঙ্গা সাগর ফেরত সন্ন্যাসী বছর দশেক আগে...বলতে বলতে প্রসঙ্গ বদলে বললো, যে সব অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধার ভরণ পোষণ করার কেউ কোথাও নেই তাঁদের এখানে রেখে জীবনের শেষ দিনগুলিতে একটু সেবা যত্ন করা হয়। ভেবে দেখ স্বরাজ, এই সব মানুষদের মধ্যে অনেকেরই একদিন এ সমাজে বেশ কিছু অবদান ছিল। আজ তারা পরিত্যক্ত অসহায়। এ আশ্রমে আমরা কজন সন্ন্যাসী তাঁদেরই শিবজ্ঞানে সেবা করি আমাদের গুরুজীর আদর্শে।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম আমার একদা এই সহকর্মীর দিকে। এই জন্যেই কি সেদিন গঙ্গাসাগর ফেরৎ সাধুজী খুঁজে বার করেছিলেন রুদ্রকে এবং কোন অলৌকিক ক্ষমতায় টেনে এনেছেন তাঁর এই আশ্রমে? জানি না এর কী ব্যাখ্যা হতে পারে!

সেদিন ফেরার মুহূর্তে রুদ্র তার পকেট থেকে একটা রুদ্রাক্ষ বার করে আমার হাতে দিয়ে বললো,—এটা সঙ্গে রাখ। জীবনের সঠিক পথ খুঁজে পাবি।

ওটা হাতে নিয়ে কী জানি কেন বুকের ভেতরে একটা ভয়ের কম্পন অনুভব করেছিলাম, কিন্তু ফিরত দিতেও পারিনি।

ট্রেনে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাপার হয়ে আসার পথে একবার ভেবেছিলাম রুদ্রাক্ষটা গঙ্গাবক্ষেই বিসর্জন দিয়ে আসবো—কিন্তু চেষ্টা করেও তো পারিনি। এই মুহূর্তে সেটা আমার কাছে। জানি না আমার ভাগ্যে কী লেখা আছে...!

ছবি : শংকর বসাক

www.banglabooks.in

www.banglabooks.in

জীমূতবাহন ও পক্ষীরাজ গরুড়

সলিল মিত্র

অনেককাল আগেকার কথা, উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে পুষ্পপুর নামে সুন্দর এক রাজ্য ছিল, রাজার নাম জীমূতকেতু। গন্ধর্বরাজ নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁর এক পুত্র সন্তান ছিলেন নাম জীমূত বাহন। দেখতে ছিলেন যেমন সুপুরুষ, তেমনি গুণবানিও ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে তাঁর এমনই পাণ্ডিত্য ছিল যে, সারা রাজ্য জুড়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজা জীমূতকেতুর সুখ ঐশ্বর্য থাকলেও, দেশের প্রজাদের অস্বচ্ছল অবস্থার কথা ভেবে শান্তি ছিল না মনে!

রাজার রাজউদ্যানে এক কল্পবৃক্ষ ছিল। রাজা সেই বৃক্ষের তলদেশে দাঁড়িয়ে কোনও কিছু প্রার্থনা করলে তা সফল হত। দেশের অভাব অনটন দিন দিন তাঁকে বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছিল। কিন্তু সঠিক সমাধানের পথ খুঁজে না পেয়ে তিনি বাধ্য হয়ে এক দিন কল্পবৃক্ষের নীচে এসে করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন, আমার প্রজারা আর্থিক সংকটে বড়ো কষ্ট পাচ্ছে ; আমি তাই তাদের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করছি!...

আশ্চর্য ঘটনা, রাজা জীমূতকেতুর প্রার্থনা মতো তাই-ই হল! রাজ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি ঘটতে লাগল। কৃষি সম্পদে গোলা ভরে উঠল! দেখতে দেখতে প্রজাদের অবস্থা ফিরলো, কিন্তু হলে কি হবে, রাজার প্রিয় প্রজারা ধনগর্বে গর্বিত হয় স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ল। তারা একজোট হয়ে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

রাজা জীমূতকেতু তো হতবাক! এ-কী কাণ্ড প্রজাদের? যাদের মঙ্গলের জন্যে তিনি কল্পবৃক্ষের কাছে নত

মাথায় প্রার্থনা জানালেন, এখন সেই প্রজারাই তাঁর সেই মস্তক ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চাইছে! এ-বড়ো মর্মান্তিক ঘটনা! এ অবস্থায় তিনি পণ্ডিত-পুত্র জীমূতবাহনের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। জীমূতবাহন বললেন, বাবা, আপনি যদি আদেশ করেন তো আমি রাজ্যের সেনাবাহিনী নিয়ে দুর্বিনীত প্রজাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দিই। রাজা যে দুর্বল নন, সেটা ওদের জানানো দরকার।

রাজা জীমূতকেতু মাথা নেড়ে 'না' বললেন। বললেন, 'আমি রাজ্য ও নিজের ক্ষমতা রক্ষার জন্য রক্তপাত চাইছি না! বাবা জীমূতবাহন, রাজ্য ক'দিনের, ঐশ্বর্য সম্পদ ক্ষণস্থায়ী জীবনেরও একদিন পরিসমাপ্তি আছে! কাজেই আমি সন্তানতুল্য প্রজাদের আঘাত না করে রাজ্য থেকে অন্যত্র কোথাও চলে যাই! সেখানে তপস্যা করে আমরা দিন অতিবাহিত করবো চলো!'

জীমূতবাহন গভীর চিন্তায় দু'টো দিন কাটিয়ে পিতাকে বললেন—তাই হোক পিতা, আমরা অন্যত্র গিয়ে ধ্যান-ধারণাতেই কালক্ষেপ করি।

আদর্শ পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী একসময় পিতার সঙ্গে রাজ্য ত্যাগ করে জীমূতবাহন চলে এলেন মলয়পর্বত নামে এক নির্জন পাহাড়ি এলাকায়। ঐ নির্জনতার মধ্যেই ছিল একটি সুদৃশ্য মন্দির। মন্দিরটি কাত্যায়নী দেবীর মন্দির। জীমূতবাহন একদিন এক ঋষিকুমারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এসে পৌঁছুলেন সেই মন্দির চত্বরে। সেখানে এসে জীমূতবাহন দেখলেন যে এক সুন্দরী কন্যা বীণা বাজিয়ে স্তব গান করছে। কে এই কন্যা জীমূতবাহনের তা জানা ছিল না। স্তবগান শেষে কন্যা উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেল জীমূতবাহনকে। জীমূতবাহন বললেন, —আপনার স্তবগান শুনে আমি মুগ্ধ! এই মন্দিরে কোথা থেকে কী ভাবে আপনি এলেন?

কন্যা তার পরিচয় দিল—আমি এখানকার রাজা মলয়কেতুর কন্যা মলয়বতী।

একদিন রাজা মলয়কেতু জীমূতবাহনের সঙ্গে আলাপ করে বড়ো আনন্দ পেলেন। রাজা জীমূতকেতুর সঙ্গেও পরে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল। সেই মিত্রতার সূত্র ধরে রাজা মলয়কেতু জীমূতকেতুকে প্রস্তাব দিলেন,—আপনি আমার কন্যা মলয়বতীকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করুন।

রাজা জীমূতকেতুর সঙ্গে মলয়বতীর পরিচয় হল। তিনি তার গুণে মুগ্ধ হয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করার জন্যে রাজা মলয়কেতুকে অনুরোধ করলেন। বিবাহ উৎসব কাত্যায়নীর মন্দির সংলগ্ন স্থানে সমাধা হল। সবাই সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন।

একদিন জীমূতবাহন তাঁর শ্যালক মিত্রাবসুকে নিয়ে নির্জন পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেড়াতে বেড়াতে পাহাড়ের একস্থানে কঙ্কালের স্তূপ দেখে জীমূতবাহন সবিস্ময়ে বললেন—মিত্রা বসু ওই ওখানে অমন কঙ্কালের স্তূপ কেন? কাদেরই-বা ওই কঙ্কাল?

মিত্রাবসু বললেন—বলি তবে শুনুন, আপনি তো জানেন যে, পক্ষিসমাজের অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা হলেন গরুড়। একবার নাগদের সঙ্গে তাঁর খুব যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে নাগেদের পরাজয় ঘটে। তখন গরুড়ের সঙ্গে নাগকুলের এক সন্ধি হয়। সন্ধিতে স্থির হয় যে, প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে দুপুরের খাদ্য হিসেবে একটা করে নাগকে গরুড়ের কাছে পাঠাতে হবে। তাই সেই সন্ধি অনুযায়ী রোজ দুপুরে একটা করে নাগ ঐস্থানে আসে, গরুড় যথাসময়ে এসে তাকে ভক্ষণ করে। সেই কারণেই মৃতনাগদের হাড় জমে জমে ওখানে কঙ্কালের স্তূপ হয়েছে!

এই দুঃখের কথা শুনে জীমূতবাহন অত্যন্ত মানসিক আঘাত পেলেন! তিনি মিত্রাবসুকে বললেন, তুমি প্রাসাদে যাও ; আমি এখানে খানিকক্ষণ বসবো! মিত্রাবসু জীমূতবাহনের অনুরোধে প্রাসাদে ফিরে গেল ; আর এখানে দাঁড়িয়ে জীমূতবাহন মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, আজ দুপুরে যে নাগ গরুড়ের খাদ্য হিসেবে আসবে, নিজের জীবন দিয়েও জীমূতবাহন তাকে রক্ষা করবেন!—এই সিদ্ধান্ত নিয়ে জীমূতবাহন কঙ্কালের স্তূপের কাছাকাছি এসে দেখতে পেলেন—খানিক দূরে এক শিলাখণ্ডের উপর বসে এক প্রৌঢ়া নাগিনী চোখের জল ফেলছেন। জীবমূতবাহন তাঁকে বললেন,—মা, আপনি কাঁদছেন কেন? কি আপনার দুঃখ?

প্রৌঢ়া নাগিনী তখন নাগকুলের সঙ্গে গরুড়ের সন্ধির কথা সবিস্তারে বলে গেলেন, যা জীমূতবাহন আগেই মিত্রাবসুর কাছে শুনেছিলেন। নাগিনী বললে—বাবা, আজ আমার একমাত্র পুত্র শঙ্খচূড়ের পালা। পক্ষিদের রাজা গরুড় আর খানিক পরেই এসে তাকে দুপুরের খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করবে! আমি সেই শোকেই কাঁদছি, —এ-কথা বলে প্রৌঢ়া নাগিনী বিলাপ করতে লাগল।

জীমূতবাহন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—মা, আপনি কাঁদবেন না! আজ আমি আমার জীবন দিয়েও আপনার পুত্রকে রক্ষা করবো।

প্রৌঢ়া বললেন, তা হয় না বাবা, হতে পারে না! তুমি কেন নিজের জীবন বিপন্ন করতে যাবে? আমি নিজের চোখে তা দেখতেও পারবো না! প্রৌঢ়া আর জীমূত বাহনের মধ্যে যখন এই বিষয়ে কথাবর্তা চলছে, শঙ্খচূড় সেখানে এসে হাজির। জীমূতবাহনের সঙ্গে শঙ্খচূড়ের পরিচয় হয় এবং যখন শঙ্খচূড় শুনল, জীমূতবাহন তাকে জীবন দিয়ে বাঁচাতে চাইছেন, তখনই আপত্তি করল শঙ্খচূড়, বললে—না-না, তা হয় না! আপনি প্রজা হিতৈষী যুবরাজ। আমার জন্য আপনার জীবনদান করা চলে না! আপনার জীবনের মূল্য আমার জীবনের থেকেও অনেক বেশি!

জীমূতবাহন বললেন—বন্ধু, আমি ক্ষত্রিয়, যা প্রতিজ্ঞা

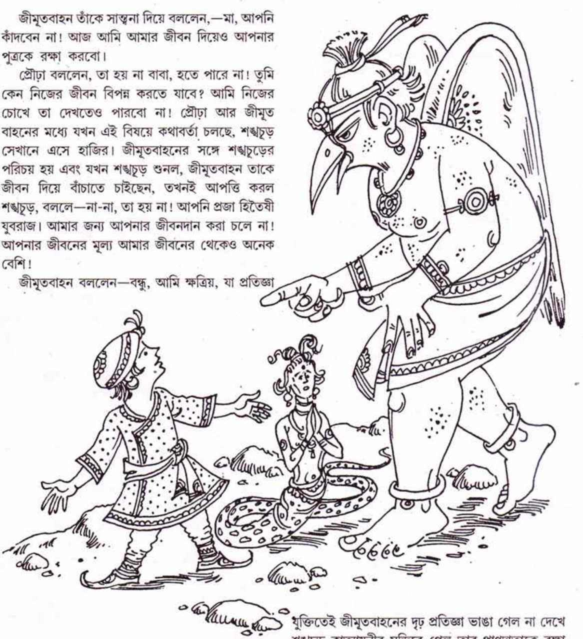

করি, তা পালন-ও করি। প্রতিজ্ঞা-পালন করাই আমার ধর্ম! কাজেই আমার জীবন দিয়ে আপনাকে আমি রক্ষা করবো। আপনি এ-স্থান থেকে অন্যত্র চলে যান! পরস্পরের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি হল, কিন্তু কোন যুক্তিতেই জীমূতবাহনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভাঙা গেল না দেখে শঙ্খচূড় কাত্যায়নীর মন্দিরে গেল তার প্রাণদাতাকে রক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা করতে।

যথা সময়ে খগরাজ গরুড়—নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়েই মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে জীমূতবাহনের উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল! তার দুই তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে আঘাত করতে

লাগল জীমূতবাহনকে! আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শঙ্খচূড় সেখানে এসে রক্তাক্ত যুবরাজকে দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। সভয়ে বললে,—এ কী করছেন রাজা? আপনি কাকে দুপুরের আহার্য ভেবে আক্রমণ করেছেন? আমিই শঙ্খচূড়। আমাকেই আজ দুপুরের খাদ্য হিসেবে খাওয়ার কথা।

গরুড় তীব্রকণ্ঠে বললে,—তুমি শঙ্খচূড়? তাহলে এ কে?

শঙ্খচূড় বললে—উনি পুষ্পপুর রাজ্যের যুবরাজ, পরম ধার্মিক জীমূতবাহন! ওঁর পরিচয় না জেনে ওঁকে আঘাত করার জন্য আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।

গরুড় জীমূতবাহনের পরিচয় পেয়ে বললেন,—হে সাধু, আপনি নিজের জীবন দিয়ে শঙ্খচূড়কে বাঁচাতে চাইছেন কেন?

জীমূতবাহন মৃদু হাসলেন, বললেন—কেন? তবে শুনুন—অপরের জন্য জীবনদান করার মতো মহৎ কাজ আর কিছুই নেই! এতে পবিত্র আনন্দ আছে! সেই কারণেই শঙ্খচূড়কে বাঁচাতে আমি জীবন দিতে চাইছি। আপনি আর দ্বিধা না করে আমায় ভক্ষণ করুন!

জীমূতবাহনের কথায় গরুড় বিস্মিত ও মুগ্ধ! বললেন, —আপনি যে কতো মহৎ ও গুণী তা এখন বুঝতে পারছি। হে মহাপ্রাণ যুবরাজ, আপনি এখন আমার কাছে যা চাইবেন, তাই আপনাকে দিতে পারি!

জীমূতবাহন বললেন, তা যদি হয়, তাহলে হে খগরাজ, আমি যা অনুরোধ করছি, তা আপনি রক্ষা করুন! আপনি বলুন যে আপনি আর নাগকুলের কোনো ক্ষতি করবেন না, দ্বিপ্রহরে নাগকুলের কারোকে আহার না করে তাদের স্বাধীনভাবে শান্তিতে বাঁচতে দেবেন?

গরুড় সবিনয়ে বললেন—বেশ যুবরাজ, আপনার কথা আমি মেনে নিলাম। নাগকুল আজ থেকে স্বাধীনভাবে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বসবাস করতে পারবে। আমার দ্বারা তাদের কখনও কোনও ক্ষতি হবে না!

তারপর—গরুড়ের সহযোগিতায় জীমূতবাহন তাঁদের হারানো পুষ্পপুর রাজ্য আবার ফিরে পেলেন! তাঁর বৃদ্ধ পিতা রাজা জীমূতকেতু আবার সুখে শান্তিতে প্রজাপালন করায় মন দিলেন।

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প অবলম্বনে]

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

www.banglabooks.in

রহস্য গল্প

জম্পেসদার খেঁচিপেরি অভিযান

সোহারাব হোসেন

নয়-নয় করে ন'মাস বাদে জম্পেসদা'র বৈঠকখানায় আড্ডা বসেছে। ওর খাস-বেহারা কেতকীকান্ত কর্মকার আজ সকালে বাড়ি বয়ে গিয়েই সকলকে নেমন্তন্ন দিয়ে এসেছে। সেই মতো আমি টিটু মুখুজ্জে, আমার প্রিয় দুই সাগরেদ সমর ও অমর কুণ্ডু, দখিনপাড়ার অভি সাউ, নতুন পাড়ার নরেন ঘোষ, রেল-কলোনির নয়ন-কাজল- অমল সহ জনা পনেরো বালক-কিশোরের দল কাঁটায়- কাঁটায় সন্ধ্যে ছ'টা বেজে তেত্রিশ মিনিটে এসে হাজির। ছ'টা বেজে তেত্রিশ কেন, কেন বত্রিশ বা চৌত্রিশ নয়? এটা জম্পেসদা'র লাকি সময়। তার ডিটেকটিভগিরিতেও জম্পেশ'দা যত সাফল্য পেয়েছে তার সব কটাই নাকি ঐ ছ'টা তেত্রিশে। সে সকালই হোক আর সন্ধ্যেতেই হোক। এই সমীকরণে আমরা আজ মুখিয়ে আছি জবরদস্ত কোনও অভিযানের গল্প শুনবো বলে। তবে আরও একটা কারণেও আমরা কৌতূহলী। ছ'টা তেত্রিশে আড্ডা শুরু মানে জুতসই নাস্তারও বন্দোবস্ত থাকবে। যে যার আসনে বসতে বসতে যেমনি আমি চা-পানির কথা পাড়তে যাব অমনি ভেসে এলো জম্পেসদা'র গমগমে গলা— 'কেতকীকান্ত বাবা প্রথমে পাইন ফলের জেলি সহযোগে পালং-রুটি-পরিবেশন করো।'

—পাইন ফলের জেলি?—আমি মুখ ফসকে বলে উঠি—আগে তো কখনও শুনিনি। কমলালেবু, আনারস বা আপেলের জেলি হয় শুনেছি! কিন্তু ঐ কাটখোট্টা পাইন ফলের জেলি...! খাওয়া যাবে তো জম্পেসদা?

—যাবে! আলবোৎ যাবে!—জম্পেশদা তার দুই

উরুতে থাপ্পড় মেরে জানায়—শুধু পাইন জেলির চমক নয় আজ আরও একটা নতুন খাবার খাওয়াব সবাইকে!

—কী সেটা, জম্পেসদা?

—মাকাল ফলের রোস্ট!

—মাকালের রোস্ট?—আমাদের নাকমুখ কুঁচকে ওঠে—ও আবার খাওয়া যায় নাকি?

—যায় খুব যায়!—জিবের ডগায় চটাস-করে শব্দ তুলে যেন মাকাল-রোস্টের টেস্ট নিতে নিতে জম্পেসদা বলে—দারুণ ফুডভ্যালু! ফার্স্ট-ক্লাশ স্বাদ!

—কেউ খায় ওসব? এই সভ্য পৃথিবীতে?

—খায় না মানে? খেঁচিপেরি লেকের ভূতনীরা সব্বাই খায়।

—কারা?—আমরা ভূত-পেত্নির গন্ধ পেয়ে একযোগে জানতে চাই!

—ভূতনীরা। সিকিমের খেঁচিপেরি লেকের ভূতনীরা!

—তুমি স্বচক্ষে দেখেছো, ওদের খেতে?

—দেখেছি কী খেয়েওছি! শোন তবে...।

জম্পেসদা এতক্ষণে ফর্মে ফেরে। বৈঠকখানার নির্দিষ্ট আসনে বেশ জমিয়ে বসে। একবার আমাদের উপস্থিতির বহর দেশে নেয়। তারপর চোখ গোলগোল করে জমিয়ে শুরু করে তার ডিটেকটিভগিরির নতুন সাফল্যের কথা।

বুঝলি টিটু, আমার এবারের অভিযান ছিল খেঁচিপেরি লেকে। ওখানেই ছিলাম গত ন'মাস। কী সমস্যা? কৃষ্ণনগরের হীরেন পাল মশাই সপরিবারে গিয়েছিলেন সিকিম। সঙ্গে ছিল তার বারাসাতের বন্ধু অমিয় কুণ্ডুরা। অমিয় বাবুরা তিনজন ও হীরেন বাবুরা চারজন মোট সাতজনের দল। হীরেনবাবুর দুই মেয়ে ক্লাস সিক্সের শিউলি আর অষ্টম শ্রেণির চামেলি। আর অমিয় বাবুর একপুত্র ক্লাস ফাইভের দেবদারু। তো ছাঙ্গু-নাথুলা-পেলিং, বেড়িয়ে এসে ফেরার পথে ওরা গিয়েছিলেন খেঁচিপেরি লেকে...!

—একটা কথা বলব জম্পেসদা?—রহস্য-গল্প শুরু হবার আগেই আমি থামিয়ে দিই জম্পেসদা'কে?—বলছি এবারের অভিযানে মনে হচ্ছে উদ্ভিদের বেশ বড়োসড়ো ভূমিকা রয়েছে, তাই না?

—গুড!—জম্পেসদা খুশি হয়—কী করে বুঝলি?

—না-বোঝার কী আছে! পাইন ফলের জেলি, মাকাল ফলের রোস্ট, তারপর এদিকে শিউলি-চামেলি দেবদারু গাছের ছড়াছড়ি! তাই...!

—তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার যোগ্য হয়েছিস টিটু! পরের অভিযানে তোকে সঙ্গে নেব! এখন শোন...!

জম্পেসদা পুনরায় খেঁচিপেরির গল্পে প্রবেশ করে—আসলে বেশ আনন্দেই বেড়াচ্ছিল হীরেন ও অমিয় পরিবার। এমনিতেই খেঁচিপেরি লোক খুব নির্জন। মাঝখানে লেকটাকে রেখে চাদ্দিকে গাঢ় অরণ্য। হরেক-কিসিমের গাছ-গাছালি আর হাজার-রকমের পাখ-পাখালিতে ভরা এই লেক। না চারপাশে কোনও বসতি নেই। মাঝেমধ্যে কিছু টুরিস্ট-পার্টি আসে মাত্র। যারা আসে তাদেরও বলে দেওয়া হয়, যেন নীরবেই চারপাশ ঘুরে ফিরে দেখে সবাই। হ্যাঁ ফিসফাস কথা ছাড়া উচ্চরোলে কথা বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এখানে। মানুষে কথা বললে গাছপালা পাখ-পাখালি থেমে যায়। ভয় পায় ওরা। পাখির কূজন, গাছের ভাব-বিনিময় দেখতে শুনতে হলে নীরব থাকাই ভালো।

নিয়ম-কানুন মেনেই দুই-পরিবার ঘুরছিল-ফিরছিল। নির্জনতার সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। বিশেষ করে পরিযায়ী পাখিতে ভরা লেকটাকে দেখে ওরা সাতজন তো আনন্দে আত্মহারা। জলে নানা ধরনের রঙিন মাছও ছিল। পর্যটকদের উপভোগ চূড়ান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ লেকের মাঝখান পর্যন্ত সাঁকো করে রেখেছে। সাঁকো মানে বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি ফুট-তিনেক চওড়া পথ। ঐ পথ-বরাবর তরতর নেমে গেল ওরা। ওরা মানে ওরা পাঁচজন। হীরেনবাবুর দুই কন্যা শিউলি-চামেলি যায়নি। ওরা লেকের পাড়ে বসেছিল। তা দেখে দেবদারু আহ্বান জানিয়ে ডেকেছিল—'দিদি, তোমরাও এসো। খুব মজা পাবে।'

—না আমরা যাব না!—শিউলি-চামেলি উত্তর দিয়েছিল—ভয় করছে।

—কীসের ভয়?—দেবদারু সগর্বে বলেছিল—এই তো আমি দৌড়াচ্ছি দেখ!—দেবদারু চার পা ছুটেই থেমেছিল—এসো, দেখ কত মাছ আর পাখি!

—তুই দেখ! আমরা গাছ দেখব!

বলেই দুই বোনে লেকের পাড় ছেড়ে গাছগাছালির ভিতর ঢুকে পড়েছিল। নির্জন অরণ্যে গাছপালা দেখার

মজাও আলাদা। দুই বোন সেই মজায় ডুবে গিয়েছিল। এদিকে আরও মিনিট-পনেরো লেকের মাঝখানে কাটিয়ে হীরেনবাবু-অমিয়বাবুরা পাড়ে এলো। এসেই চমকে গেল। শিউলি-চামেলিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পাঁচজনে বেশ করে আশপাশ দেখল। না কোথাও নেই। গভীর অরণ্যে ঢুকেছে ভেবে তাদের নাম ধরে ওরা ডাকতে শুরু করল। না, সাড়া দিল না দুইবোনে। পাঁচজনে এবার একটু উচ্চস্বরে ডাকাডাকি শুরু করল। না তবুও সাড়া এলো না। ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে হীরেনবাবু ও তার স্ত্রীর মুখ। তা দেখে অমিয়বাবু ছুটল কেয়ারটেকারদের কোয়ার্টারের দিকে। লেকের কেয়ারটেকার বিমল তামাং বৃদ্ধ হয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এলো। কাউকে কিছু না বলে হন হন এগিয়ে গেল অরণ্যের মধ্যে। গলা তুলে শিউলি-চামেলি নাম ধরে ডাকল। সেই আহ্বান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে হীরেনবাবু অমিয়-বাবুদের কানে বাজতে লাগল। কিন্তু না শিউলি-চামেলির প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না।

অমনভাবে আধঘণ্টাটাক অনুসন্ধান চালাল বিমল তামাং তারপর ব্যর্থ ও শুকনো চাউনি নিয়ে ফিরে এলো—'দোনোকো নেই মিলা বাবুসাব!"

—তালে কী হবে?

—নেহি জানি!

—কোথায় গেল ওরা? কিডন্যাপড্ হলো নাকিন?

—নেই!

—তবে?

বিমল তামাং জোরে জোরে শ্বাস টানছিল। চোখদুটোতে যেন কীসের একটা আতঙ্ক। সে ফিস ফিস করে বলছিল—'মিলেগা নেহি সাব, মিলেগা নেহি!'

মিসেস হীরেন পাল ততক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছেন। হীরেনবাবুর অবস্থাও তথৈবচ। বিমল তামাংয়ের সঙ্গে অমিয় কুণ্ডুই কথা চালাচ্ছিলেন। হাজার রকমের প্রশ্ন পাল্টা প্রশ্নকরে তিনি জানলেন যে, বছর-কুড়ি আগেও ঠিক এমনই ঘটনা ঘটেছিল। সেবারও এমন একই পরিবারের দুই বোন ঠিক একইরকমভাবে হারিয়ে গেছিল। না-হাজার তত্ত্ব-তল্লাস করেও তাদের হদিস মেলেনি। এখনও নাকি বছর-বছর সেই দুই কন্যার মা-বাপ খেঁচিপেরিতে আসে। কান্নাকাটি করে। ফিরেও যায়।

শিউলি-চামেলির বেলায়ও তাই হলো। হীরেনবাবুরা দিন-পনেরো ওখানে থেকে সবরকম প্রচেষ্টা চালাল। থানা-পুলিশ করল। কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষতক ভাঙা মন নিয়ে ফিরে এলো।

—বলছ কী জম্পেসদা—আমি ফটাস-করে জিজ্ঞাসা করলাম—জলজ্যান্ত মেয়েদুটোকে ফেলে রেখেই ফিরে এলো ওরা?

—তা ছাড়া করবেটা কী শুনি?—জম্পেসদা মিচমিচ হাসল!

—করা মানে আরও নিবিড় খোঁজ খবর করতে তো পারত সবাই!

—তাতে কিছু লাভ হতো না।

—কেন?

—ওরা তো ততক্ষণে খেঁচিপেরির ভূতনীদের হাতে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে!

—মানে? ভূতনীরাও পুলিশের মতো অ্যারেস্ট করে নাকি? ওদেরও থানাটানা আছে নাকি আমাদের মতো?

—আছে কী নেই তা পরে বলছি। এখন শোননা মন দিয়ে!

—বেশ বলো, শুনছি।

হীরেনবাবু অমিয়বাবুরা তো ফিরে এলো'—জম্পেসদা পুনরায় প্রবেশ করল অভিযানের কাহিনিতে—মুখে মুখে চারদিকে রটে গেল ঘটনাটা। দু'-একটা কাগজে খবরও বেরুল। কাগজের কাটিংটা সযত্নে কেটে নিয়ে বাক্স-গুছিয়ে আমি গিয়ে হাজির হলুম খেঁচিপেরিতে। তার আগে অবশ্য হীরেনবাবুর কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছিলাম। ফের কেয়ারটেকার বিমল তামাংকে নিয়ে পড়েছিলাম। একবার-দুবার হাজারবার করে দুই-মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা শুনলাম।

বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে জম্পেসদা প্রশ্ন রাখল—'দুই মেয়ে মানে কারা বলতো টিটু?' আমি খপ করে উত্তর দিলাম—'বিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া দুই মেয়ে, তাই তো?' জম্পেসদা হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল—'একদম ঠিক।' তারপর বলতে লাগল—শুনে আমার মনে এই প্রত্যয় জাগল যে, এসব লেকের পাড়ের ওই গাছগুলোরই কারসাজি।

—গাছরা আবার মানুষকে কিডন্যাপড় করতে পারে নাকি, হ্যাঁ!—অমর কুণ্ডু জানতে চাইল।

—পারে।—জম্পেসদা উদাসীন গলায় বলল।

—একটু আগে যে বললে ওসব ভূতনীদের কাজ!

—তাও ঠিক!

—কী রকম?

—ভূতনীগুলো গাছগুলোর সাহায্য নিয়েই তো সব ঘটাল। শোন না মন দিয়ে...!

খেঁচিপেরি লেকের পাড়ে পাড়ে তখন আমি দিনরাত্তির ঘুরে বেড়াচ্ছি। খুঁজে বেড়াচ্ছি নিশানা। কোথাও কোনও ক্লু পড়ে আছে কিনা দেখতে চাইছি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চালাচ্ছি এই অনুসন্ধান। আর রাত্রে বিমল তামাংকে খুঁচিয়ে জানার চেষ্টা করছি ওখানে কোনও নারী পাচার চক্র জাঁকিয়ে বসেছে কিনা। কিংবা পাহাড়ী কোন অপদেবতার উপদ্রব লেগেছে কিনা। এত সব অনুসন্ধান করতে করতে প্রায় তিনমাস কাটিয়ে দিয়েছি। না শিউলি-চামেলির কোনও সন্ধান তখনও পাইনি। হতাশ হয়ে ফিরে আসবার কথা যখন ভাবছি তখনই নজরে এলো নিশানা। খেঁচিপেরি লেকের মাঝখানে যাওয়ার সাঁকোটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে হাত-বিশেক দূরে হঠাৎ করে দেখি নরম মাটিতে কী যেন লেখা রয়েছে। ঝাপসা হয়ে গেলেও আমি পড়তে পারলাম।

বেঁটে গাছ
ভূতের নাচ।
লম্ফঝম্প
ভূমিকম্প।
সীতার দেশ
সর্ব শেষ।

লেখাটা পড়েই আমি ইউরেকা বলে চীৎকার করে উঠি। অনেকক্ষণ ধরে সেই লেখা পর্যবেক্ষণ করি। এক-দু'দিন নয় মাসদুয়েক। বুঝি উধাও হওয়ার আগে শিউলি-চামেলির কেউ একজন পায়ের আঙুলে দাগিয়ে নিশানা দিয়ে গেছে। তারপর আমি গবেষণা শুরু করি। প্রথম দু'লাইনের অর্থ উদ্ধার করি খুব সহজেই। অরণ্য ঢুড়ে বেঁটেগাছ আবিষ্কার করি। নিশানা লেখা ছিল যেখানে তার থেকে হাত দশের দূরেই ছিল বেঁটে-বেঁটে দু'টো গাছ। দেখতে অনেকটা মানুষের আদল রয়েছে গাছে। কেউ যেন দু'হাত প্রসারিত করে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। সিদ্ধান্ত করি গাছদুটিই খুলে দেবে রহস্য-দুয়ার। গাছদুটোর কাছে যাই। হাত বুলাই, নাড়াচাড়া দিই। না কোনও ফল হয় না। মনে মনে আওড়াই—'বেঁটে গাছ। ভূতের নাচ।' তার মানে এই গাছে ভূত-ভূতনীরা এসে নাচলেই কেল্লাফতে। আবার ভাবি না তাতেও হবে না। নিশানা বলছে 'লম্পঝম্প।' 'ভূমিকম্প।' তার মানে কি যেদিন লম্ফঝম্প করে ভূমিকম্প হবে সেদিনই শিউলি-চামেলিকে উদ্ধার করা যাবে? কখনও ভাবি ওদের কি গাছে রূপান্তরিত করে আটকে রাখা হয়েছে? বেঁটে গাছ দুটো কি শিউলি-চামেলি দুই বোন?

নিশানা-শোলকের অর্থ-মতো ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষা করি। কেটে যায় আরও তিনমাস। হ্যাঁ, আটমাস ওভাবে কাটিয়ে দেওয়ার পর ফিরে আসি হীরেবাবুর কাছে। সাগ্রহে জানতে চাই—তাঁর দুই মেয়ে বেঁটে ছিল কিনা। উত্তর শুনে হতাশ হই। হতাশ হই তবে দমে যাই না। ওখান থেকে ছুটে যাই বিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া শেফালি-মালতীর বাবার কাছে। তারা দুই বোন বেঁটে ছিল জেনে দ্বিতীয়বার ইউরেকা বলে লাফিয়ে উঠি। বুঝতে বাঁকি থাকে না। বেঁটে গাছদুটো ওরাই। তবে শেফালি-মালতীর বাবার সামনে উল্লাস দেখাই না। ছুটতে-ছুটতে ফিরে যাই খেঁচিপেরি লেকে। তখন আমার ধ্যানজ্ঞান নিশানা—শোলক। শেষ দু'লাইনের মানে অবশ্য ফিরতি-পথেই উদ্ধার করে ফেলি—'সীতার দেশ সব শেষ'—অর্থাৎ সীতা কেমন মাটির ফাঁক দিয়ে পাতাল প্রবেশ করেছিল এক্ষেত্রেও তেমনই ঘটেছে।

কিন্তু মাটি ফাঁক হবে কী করে? শোলক বলছে—'লম্ফ ঝম্প। ভূমিকম্প।' লাইন-দুটোকে আমি মন্ত্রের মতো জপ করতে লাগলুম। এবং তৃতীয়বার ইউরেকা—ঘড়িতে তখন সন্ধে ছ'টা বেজে তেত্রিশ মিনিট। আমি বুঝে নিলাম ভূমিকম্পের লম্ফঝম্ফ নয়—আমাকেই লাফাতে হবে বেঁটেগাছ দুটোর গোড়ায়। নাচতে হবে ভূতের মতো। যেমন ভাবা তেমন কাজ। এবং হাতে হাতে ফল প্রাপ্তি। মিনিট পাঁচেক লাফালাফি-করার পরই দেখলুম বেঁটে গাছদুটো যেন সামান্য সরে-সরে যাচ্ছে। একে অপরের কাছাকাছি আসছে গাছ দুটো। সরতে-সরতে যেই না তারা কাছাকাছি এলো অমনি চিচিং-ফাঁক। মাটি ফাঁকা হলো। আর আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই দুটো গাছসুদ্ধ মাটির নীচে পড়ে গেলাম। ভয়ে আতঙ্কে আমি চীৎকার করে উঠলাম—'বাঁচাও বাঁচাও।' তবে চীৎকার করেই নিজেকে সামলে নিলাম। আমি ডিটেকটিভ জম্পেস'দা। ভয় পাওয়া আমাকে মানায় না। মনের বল বুকে ফিরিয়ে চোখ খুলেই অবাক হই। দেখি আমি ভূত রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। থুড়ি ভূত না ভূতনী রাজ্যে।

আমাকে ততক্ষণে গোটা পনেরো ভূতনী ঘিরে ধরেছে। আমি ভিতরে-ভিতরে কাঁপছিলাম। তবে বাইরে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে হুঙ্কার দিলাম—'সব কটাকে ধরে নিয়ে বার্ণপুরের ইস্পাত ফ্যাক্টরির ফার্নেসে ফেলব হুম্।' ভূত শাস্ত্র ঘেঁটে জানা ছিল ওরা আগুনকে ভয় করে। সেই আন্দাজে ইস্পাত-ফার্নেসের তম্বি-ছাড়তেই কাজ হলো। ভূতনীরা আমার সামনে নীলডাউন করে বসে পড়ল—'ক্ষমা করে দেন স্যার।'

—দেব। তবে একটা শর্ত!—আমি ত্বরিত উদ্দেশ্যে ফিরলাম—আমাদের চারজনকে আগে ফেরত দাও।

—তা সম্ভব নয় স্যার!—ভূতনীরা জানাল।

—কেন?

—ওদের নিয়ে আমরা গবেষণা করছি। আপনি অন্য শর্ত দিন।

—মোটেও না। আমার একটাই শর্ত। নয়তো চলো সবাই ফার্নেসে।

আমার হম্বি-তম্বি আমি বহুগুণ বাড়িয়ে দিলাম। তাতে কাজও হলো। চারজনকে ওরা আমার সঙ্গে ফিরিয়ে দিল। শুধু ফিরিয়ে দেয়নি ওরাই আগবাড়িয়ে পাতাল থেকে আমাদের ওপরে তুলেও দিল।

ঝপ করে অভিযানের গল্প থামিয়ে দিয়ে মুচকে হাসতে লাগলো জম্পেসদা। আমরা তখনও ভূতনীদের ঘোরে। বললাম—'তারপর?'

আমাদের প্রশ্নে জম্পেসদার ধ্যান ভাঙল। বলল—'বুঝলি টিটু। আমার ডিটেকটিভ জীবনের সব থেকে বড়ো সাফল্য বোধ হয় এটাই।'

—তাই?—আমি জানতে চাইলাম!

—কেন?

—আন্দাজ কর!

—বলছি মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। ভূতনীরা ওদের ধরল কেন?

—ধরল গবেষণার জন্য!

—গবেষণা? কীসের?

ওটাই তো আসল রহস্য।

—মানে?

—মানেটা বেশ ঘোরালো।

—জম্পেসদা আবার শুরু করে—ভূতনী-পুরীতে আমি দিন-পাঁচেক ছিলাম ওদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম, ঐ পুরীর ভূতনীরা সবাই, মানুষ জীবনে মেধাবী ছাত্রী ছিল। তবে কোনও পরীক্ষায় মনোমতো ফল না করতে পারায় আত্মহত্যা করে। বেশির ভাগই গাছে ঝুলে মরেছিল। তো ভূতপুরী ভূতনী জীবনেও তারা পড়াশুনা ভুলতে পারেনি। ওরা খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, ওদের রাজা বিজ্ঞানের আবিষ্কারে সাফল্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেবে। আবিষ্কার মানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার আবিষ্কার। কেননা ভূতপুরীতে খাদ্য সঙ্কট চলছে এখন। তো পেঁচিপেরির ভূতনীরা ঠিক করেছিল, উদ্ভিদের মতোন মানুষের দেহতে সালোক-সংশ্লেষ ঘটিতে খাদ্য তৈরি করে ওরা তাক লাগিয়ে দেবে। সেই জন্য শেফালি-চামেলিকে প্রথমে চুরি করে। এবং গাছের ছাল-পাতা থেকে কোষ নিয়ে ওদের চামড়ার ওপর রোপণ করে দেয়। তারপর চলে নিরন্তর চর্চা। দিনের বেলা ওদের লেকের ওপরে ওরা রেখে যেত রোদ খাওয়ানোর জন্য। কারণ সূর্যালোক না-হলে তো রান্নাই হবে না। অতঃপর বিশ-বছরের চেষ্টায় ওরা সফল হলো। শেফালি-মালতীদের ত্বক গাছের মতো হলো। খাদ্যও তৈরি করতে লাগল।

সেই সাফল্যে ভূতনীরা ওদের রাজার কাছে গেল। রাজ-বিজ্ঞানীরা ওদের তারিফ করল। তবে একটা শর্ত দিল তারা—দু'জনকে নিয়ে সাফল্য পেলে হবে না। আরো দু'জনের দেহে যদি ঐ ক্রিয়া ফলে তবেই মিলবে নোবেল! তাই ওরা শিউলি-চামেলীকে চুরি করে। বুঝলি?

—হুঁ!—আমি টিটু মুখুয্যে ঘাড় নাড়লাম—শেফালি-মালতী-শিউলি-চামেলীরা এখন কোথায়?

—বাড়িতে!

—ওদের চামড়া?

—খানিকটা গাছের ছালপাতার মতো, কিছুটা মানুষের মতো!

—আমরা গেলে দেখতে পাবো?

—পাবি।

—নিয়ে যাবে আমাদের?

—যাবো। তবে একটা শর্ত!

—কী শর্ত?

—আগে পাইন-জেলি ও মাকাল রোস্ট খেতে হবে। ভূতনীদের মাঝে যে কদিন ছিলাম ওই-ই খেতাম আমি! খেয়ে দেখ-না একবার!

—বেশ দাও।

'কেতকীকান্ত কাকা পরিবেশন করো'—জম্পেসদা নির্দেশ দিল। আর আমরা অধীর অপেক্ষা করতে লাগলাম। কেবল সমর জানতে চাইল—'ওসব খেলে আমাদের গায়েও ছাল জন্মাবে না তো!' সমরের কথায়—আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম!

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

নানারঙের গল্প

পটলের পৃথিবী

দীপ মুখোপাধ্যায়

হলধরবাবুকে এই অঞ্চলে ভালোমানুষ বলেই মনে করা হয়। শিক্ষিত মার্জিত লোক। লোকের বিপদের দিনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গরিব-গুর্বোদের দানখয়রাতি করতেও কার্পণ্য নেই। বাড়িতে স্ত্রী আর একটা ফুটফুটে ছেলে নিয়ে মধ্যবিত্ত সুখি চাষি পরিবার। তা সত্ত্বেও আনাচেকানাচে ওদের নিয়ে অনেক ফিসফাস।

মাতব্বর পরান মণ্ডল একদিন বলল, হলধরের নিশ্চয়

কোনও তুকতাক জানা আছে। নয়তো এত বড়ো বড়ো পেয়ারা, জামরুল ফলায় কি করে? আমরা হাইব্রিড করেও ধারে কাছে পৌঁছতে পারি না। দুচোখে ধন্দ লাগে গো। সায় দিল জামাল• মোল্লা।-পেল্লায় কাঁঠালগুলো দেখেছ? গ্যাস বেলুনের মতো যেন ফুলে ফেঁপে।

তাই গ্রামের অনেকে হলধর বাবুর ওপর হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক। ফল আর সব্জির কারবারিরা চড়া দাম দিয়ে ওদের ফলন ভ্যান রিকশা বোঝাই করে পাইকারদের জন্য। পড়শিরা শুধু ঠুঁটো জগন্নাথের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। ওদের কিচ্ছু করার নেই। বুঝতে পারে এর পেছনে কোনও জটিল রহস্য লুকিয়ে। অবশ্য ঠাওর মেলে না।

কেউ কেউ আবার রাগে গরগর করতে করতে বেনো জল ঢুকিয়ে দেয় ওদের আবাদে। কিন্তু তাতেও ফলপাকুড়ের ক্ষতির নাম গন্ধ নেই। হলধর বাবুর খামারবাড়িতে সকাল থেকেই একটা ধোঁয়াটে হাবভাব। কাঁঠাল পাতায় ছোপ ছোপ দাগ। পুকুরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মতো কুয়াশা গলে পড়ে। তবু অফুরন্ত রোদ নিয়ে একটা

গোটা সকাল এসে দাঁড়ায়। লেপে থাকে পেঁপে পাতার ফাঁকে। আড়াল থেকে আড়মোড়া ভেঙে ডেকে ওঠে একটা পাখি।

হলধরবাবুর গর্ব ছেলে পটলকে নিয়ে। দেখতে রোগাপটকা হলেও মাথায় ঝেঁপে আছে একগাদা এলোমেলো লাল চুল। গায়ের রং গমবর্ণ। ফোলা ফোলা গাল আর সামান্য ঢেউ খেলানো চিবুক। সবে ইস্কুলে ঢুকেছে অন্য সব বাচ্চাদের মতো। শুধু একটা ব্যাপারে হলধরবাবুর মনটা খচখচ করে। ইদানিং ইস্কুলের বাচ্চারা পটলকে নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের রসিকতায় মেতে উঠেছে। পটল নাকি অদ্ভুত। সাধারণ ছেলেরা যেমন দেখতে ও তো তেমনই।

কিন্তু সহপাঠীরা লক্ষ্য করেছে রেগে গেলে ওর লাল চুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে ওঠে। সারা শরীর কাঁপতে থাকে থরথর করে। চোখ দুটো পাকা টমেটোর মতো টলটল করে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। কানদুটো হাওয়ায় নড়ে পতপত করে। ঠোঁট দুটো প্রসারিত হয়। চর্মচক্ষে পটলকে কিছুতেই মানুষ বলে মেনে নেওয়া যায় না। একথা সবাই বহুবার মাস্টার-মশাইদের জানিয়েছে। ব্যাপারটা হেডস্যারও জানেন। তবু কারুর হেলদোল নেই। হলধরবাবু বেশ কয়েকবার হেডস্যারের সঙ্গে দেখা করেছেন। কখনও প্রসঙ্গ ওঠেনি। একদিন হেডস্যারের কথায় তাকে হকচকিয়ে যেতে হল। দেখুন আপনার ছেলে পটলকে আর এই ইস্কুলে রাখা যাচ্ছে না। ওর কোনও বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। আপনি সজ্জন লোক। সহজেই বুঝবেন। অপ্রিয় হলেও সত্যিটা আর না বলে থাকা গেল না। হলধর বাবু কথা বাড়ালেন না। গেলেন না কোনও অনুনয় বিনয়ের ভেতর। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে তার অবস্থা অনেকটা পটলের সেই অবস্থার মতো। বললেন বই খাতা গুছিয়ে নে। তোকে আর এই ইস্কুলে পড়তে হবে না। হতবাক হয়ে পটল তাকাল বাবার চোখে। বেশ বোঝা যায় পাতাগুলো ভারী হয়ে উঠেছে। মুখে জমাট হয়ে আছে একরাশ দুঃখ। মাথা জুড়ে তারের কুণ্ডলীর মতো চিন্তার জাল। এই সবের কারণ কি পটল নিজে? ভেতরে ভেতরে বেশ অস্থির সে। যেন মাটির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পায়ের তলা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোয় তার। কিছু বলতে যাওয়ার আগে বাবার হাতের স্পর্শ পেল কাঁধের ওপর। খুব নিশ্চিন্ত বোধ করল এবার। তার ভেতরে একটু পুলক যেন ঝটপটিয়ে উঠল। অনুভব করল একটা খুশির গন্ধ। তার চোখের তারা রবার বলের মতো চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাবা গোরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে। দৃশ্যটায় খুব কৌতূহলী পটল চেয়ে দেখল হোগলার ছাউনির ভেতর মা বসে আছে রীতিমতো আরামের ভঙ্গিতে। অনেক গভীর থেকে একটা ভালোলাগা উথলে আসে তার। ছই-এর ভেতর ঢুকে বুঝল গাড়ি চলতে শুরু করে দিয়েছে। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো। চাকারাও অনেক দ্রুতগতি তখন। একি তাদের খামারবাড়ির রাস্তা? সেটা তো অনেক চওড়া। দুদিকে বড়ো বড়ো গাছ। সেসব পেরিয়ে বাড়ির সামনে একটা সাজানো বাগান। ম ম করে ফুলের গন্ধে। গড়াগড়ি খায় একরাশ আলোর ঢেউ। ঠিক পথে যাচ্ছে তো ওরা?

পটলের বাইরে চেয়ে থাকা বেশ পছন্দের। গাছগাছালিরা কি সুন্দর সরে সরে যায়। কিন্তু একি কাণ্ড? তারা আর রাস্তায় নেই কেন? গোরু সমেত গাড়িটা যে উড়ছে। সে শুধু বিহ্বল নয় বেশ হতচকিত। আকস্মিক এই ঘটনা খুব অস্বাভাবিক লাগে। তখন হাওয়া আর হু হু শব্দ একসঙ্গে আসছিল। স্নায়ুর ভেতরে ঢুকে পড়ছিল আরামের ছোঁওয়া। অসহায়ের মতো কাতর গলায় সে বলল, বাবা আমরা কোথায় উড়ে চলেছি? কিছুই বুঝতে পারছিনা যে।

বাবা মা কেউ কোনও উত্তর দিল না। পটল ওপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চেনা গাছপালা গোরু ছাগল এমনকী তাদের ঘরবাড়ি অবধি। দৃশ্যগুলো ছোটো থেকে আরও ছোটো হচ্ছে। এখন তারা একটা ঘন অরণ্যের ওপর দিয়ে উড়ছে। সে শুনতে পাচ্ছে পাতার শব্দ, নানা জীবজন্তুর ডাক, জানা পাখির কলরব।

ওরা উড়ে চলেছে গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে। জানা ছিল না কাছেই এমন অরণ্যের খোঁজ পাবে। এবার চোখের সামনে শুধু আকাশ আর আকাশ। ঝড়ের মতো হাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে সবকিছু। টের পায় ঝরনার ঝরঝর প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে গোরুর গাড়িটায়। তারপর ঝুপ করে সন্ধ্যা নামল। অনেকটা ধোঁওয়ার মতো। হঠাৎ নীল হয়ে মিলিয়ে গেল। একটা শিরশিরানি রয়ে গেল তার শরীরে। সামনেই থালার মতো বিশাল চাঁদ। এক লাফে রক্ত চলকে উঠল হৃৎপিণ্ডে। গলা থেকে বেরিয়ে এল খানিকটা বাষ্প।

জিব নড়ল। ঠোঁট নড়ল। মুখে কথা এলনা কিছুতেই।

তার ব্যাকুল ভাব দেখে হলধরবাবু বললেন, সব মিলিয়ে তোর নিশ্চয় খুব অবাক লাগছে? আসল ব্যাপার জানলে বুঝবি তুই কেন সকলের থেকে আলাদা। আমি, তোর মা আর তুই প্রচলিত নিয়মের অনেক বাইরে।

পটলের বোধগম্য হয়না বাবার কথা। গোরুর গাড়িতে কুপি জ্বলছে। আলো আঁধারিতে ইতস্তত করছে চারধার। ভেতরটা তোলপাড় করে পটলের। তাই চিন্তা থামিয়ে রেখে কৌতূহল বাড়িয়ে বলল, রহস্য না করে সার কথাটা বলে ফেল না? আর তর সইছে না যে। কয়েকটা স্থির মুহূর্ত ছুঁয়ে থাকে বাবা আর ছেলের দূরত্বে।

—বুঝলি পটল, সাধারণ মানুষের মতো দেখতে হলেও আমরা কিন্তু মানুষ নই। ওদের থেকে অনেক বুদ্ধিমান প্রজন্ম। নিয়মকানুনও আলাদা। মগজের ধারটাও বেশি। তাই খাপ খাওয়াতে সবার বেগ পেতে হয়। খটাখটি বাধে। পটল ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করল। বাবার কথায় সে মোটেও সন্তুষ্ট নয়। মানুষ নয় তো তবে ওরা কি? বেশ অসহিষ্ণু বোধ করে সে। ওরা ভূত নয় তো? কিন্তু ভূত হলে সবার ভয় করার কথা। বরং ইস্কুলের ছেলেরা ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। সে হাত দুটো সামনে তুলল। না ঠিকই আছে। দশটা আঙুল হাতের রেখা সব। পা দুটো মেলে ধরল। সেখানেও গোলমাল নেই। তাকিয়ে দেখল চোখদুটোও ঠিকই দেখছে। নিশ্চিত হলো আর যা কিছু হোক না কেন ওরা কিছুতেই ভূত নয়। ফের বাবার মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত করল নিজেকে।

আমাদের অস্বাভাবিক ফলমূল ফলানো, গোরুর গাড়ি করে উড়ে যাওয়ার পেছনে কোনও রহস্য নেই?

আছে রে পটল আছে। আমরা এই গ্রহের লোকই নই। অবশ্য কিছু বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে আনা হয়েছে। যেমন তোর মার রয়েছে সবুজ আঙুল। যে গাছপালায় ছোঁয়াবে ফলফলন্ত হয়ে উঠবে। আর আমার কাজ নির্দিষ্ট গতিপ্রবাহে সবদিক ঠিকঠাক রাখা। জানিস আমাদের গ্রহ এই পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে। একমাত্র মনের ভেলায় ভেসে ভেসে সেই গন্তব্যে যাওয়া যায়। হলধরবাবুকে বেশ সপ্রতিভ লাগে।

—আমাদের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা আগে বলনি কেন? এবার বুঝতে পারছি স্কুলের ছেলেদের কোনও দোষ নেই।

তোকে না বলার কারণ তো ছিলই। এত ছোটো বয়সে ক্ষমতার কথা জানলে তুই যদি অপব্যবহার করিস? আসলে সব ক্ষমতা সতর্ক হয়ে প্রয়োগ করা উচিত। বেশি ঢাক পেটালে গোলমাল হতেই পারে।

—জানো বাবা আমারও একটা ক্ষমতা আমি টের পেয়েছি। অন্যদের মনের কথা আগেভাগে বুঝতে পারি। যেমন এই মুহূর্তে মা ব্যাকুল হয়ে আছে বাড়ি ফেরার জন্য। সরু নদী পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে। ঘরের সামনে থাকবে ডাঁই করা খড়-বিচালি। সরু আল রাস্তা দিয়ে গামছা মাথায় তুমি হেঁটে যাবে। সবার মতো একটা শান্ত সংসার। কাজের শেষে তুমি আবার ফিরে আসবে। মার কাছ থেকে কাঁসার ঘটিতে জল চেয়ে নিয়ে খাবে। ঠিক বলছি তো মা?

পটলের মা এমনিতে কম কথা বলে। নিবিষ্ট শ্রোতার ভূমিকায় দেখা যায় তাকে। তার মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। হলধরবাবু বলল, সত্যিই এবার বাড়ি ফেরা উচিত। রাত ফিকে হয়ে আসছে। একটু পরেই আকাশের সর্বাঙ্গে রোদ্দুর মাখামাখি করবে। এই নির্জনতা কেটে যাবে আস্তে ধীরে। বিস্তীর্ণ মাঠের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে যাচ্ছি।

সাতসকালে চাষের কাজে আসা লোকটা আকাশের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো ভড়কে গেল। একি কাণ্ড রে বাবা! গোরুর গাড়ি উড়ে যাচ্ছে? এমনিতেই লোকে তার কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনেনা তার ওপর এই ঘটনা চাউর করলে পিঠে কয়েক ঘা পড়া আশ্চর্যের নয়। তবু সাহসে ভর করে চেঁচিয়ে উঠল, সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এস। দেখে যাও এই অলৌকিক দৃশ্য। বিনি পয়সার মজাদার জাদু। হকচকিয়ে ওঠা কণ্ঠস্বরে মাঠ মাতায় সে।

কাঁচাঘুম ভেঙে যাবার অস্বস্তিতে কেউ এল না। ততক্ষণে পটলদের গোরুর গাড়ি মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গেছে।

নিস্তব্ধ রহস্যময় জংলা ডাঙায় ওদের গোরুর গাড়ি নামল। সামনেই সবুজ গাছের সারি। ভোরের বাতাসে ঝিরঝির করে পাতা কাঁপছে। লাল রোদের সকালে চারধারে একটা বনজ গন্ধ ছড়িয়ে। কয়েকটা হলুদ পাখি ডানায় রোদ মেখে হঠাৎ উড়াল দিল। দীঘল শন ঘাস ছমছম করে নড়ছে। পটল একটু আনমনা হয়ে যায়। ভাবে কত অদৃশ্য ছবি তাদের কাছাকাছি মিশে আছে। সে আদুরে গলায় বলল, বাবা আমরা এখানে এলাম কেন?—তোর ভালোলাগছে না? তাকিয়ে দ্যাখ্ পলাশ ফুলের মতো রোদে মাঠচড়াইরা কেমন হুটোপুটি করছে। এবার পটলেরও মন উতল করে। পাশের গাছ থেকে কয়েকটা বাদামি রঙের শুকনো পাতা খসে পড়ল। একটা গাছ তাকে দেখে পাতা দুলিয়ে বলল, কি গো পটল? কেমন আছ? কোথায় ছিলে এতদিন? আগে দেখিনি কেন? উলুঝুলু দুলতে থাকা ঝোপ থেকে মুখ বাড়িয়ে সোনালি গিরগিটিটা ডেকে উঠল কট্ কট্ করে। তারও কিছু বলার ছিল। উত্তর না পেয়ে চকিতে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে গেল সে। তখন একটা ছায়া এসে থামলো পটলের সামনে। হলধরবাবু পটলের আকুল চোখ দেখে বলল, এটা তোর নিজের ছায়া। এখানে নিশ্চল থাকলে তোর ছায়া কিন্তু আয়েস করে কাটাবে না। এটা আমাদের প্রজাতির একটা মুক্ত অঞ্চল। সাধারণ মানুষজনের প্রবেশ নিষেধ। দেখছিস না, এখানে বুনো সৌন্দর্য কত উদার। গাছপালা কত বুনোট। বুক ভরে শ্বাস নিতে মন চায়।

পটল আলতো নরম রোদে চোখ দুটো মেলে দেয়। সেই চোখের ভাষায় যেন নতুন কিছুর সংকেত। সে কি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে? উত্তেজনার ভাবটাও অনেক থিতিয়ে গেছে। নিজেকে ঝরঝরে লাগছে অনেক।

—এই দ্যাখ্ পটল। এই বীজগুলো আমাদের গ্রহের অগ্রজরা রেখে গেছেন। এগুলো রোপণ করেই ফসলের বাড়বাড়ন্ত। এসব গোপন কথা কাউকে বলবি না কিন্তু। হলধর বাবু কোঁচড়ে রাখা বটুয়াটা খুলে দেখালেন।

—আচ্ছা বাবা, আমরা যদি ফের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাই খুব হৈচৈ বাধবে না গ্রাম জুড়ে?

—কোন বাড়িতে ফিরতে চাস? নিজস্ব গ্রহে না এই পৃথিবীর সেই বাসায় যেটা অন্ধকারের মতো অপেক্ষা করছে।

—আমরা তো ইচ্ছে করলেই সেই অন্ধকারে আলো জ্বালতে পারি আবার। সেই ক্ষমতা আমাদের আছে।

ছেলের প্রত্যয় দেখে মনে হলো আঁধারের ভেতর একটা ম্লান আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ছে। মনে মনে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সত্যিই তো। নিজের হাতে সততা দিয়ে গড়া নতুন গ্রহকে ছারখার করার অধিকার তার নেই। এত সহজে কি সব শেষ হয়ে যায়? হলধরবাবুর বুকের ভেতরটা কেমন যেন রিনরিন করে ওঠে।

পটল চোখ দুটোকে উদাস করে বলল, শোনো বাবা। তোমার ক্ষমতা শুধু তোমার কাছেই লুকিয়ে রেখেছিলে। ফলন ফলিয়েছো শুধুমাত্র নিজের জন্য। গ্রামের আর পাঁচজনের কি হলো সেদিকে মন দিয়েছ কখনও? তোমার ক্ষমতার কিছুটা যদি বিলিয়ে দিতে, তবে সবার মুখে হাসি ফুটতো। এভাবেই টিকে থাকা যায়। তাছাড়া কি করে আমাদের গ্রামকে ভুলবো বলো? বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে মাঠের পর মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছি। পেয়ারা গাছে কেটেছে কত নিঝুম দুপুর। পদ্মদিঘির টলটলে জলে সাঁতার কেটেছি। আমাদের গ্রামের আকাশটা কি ঘন নীল। যেন ঝকঝক করে।—তোর ভাবনা চিন্তাগুলো বেশ বড়োদের মতো লাগছে। বাক্যগুলো যুক্তি দিয়ে ঠাসা। যদি বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে ওদের রক্ষা করিস সেটা ভালোই হবে। অনেক অভাব দূর হবে গ্রামবাসীর। প্রবল বিপদকেও বাধা দিতে পারবি। আমার অগাধ বিশ্বাস আছে তোর ওপর। সবুজ দেশ আর সবুজ ভবিষ্যতের জন্য এগিয়ে যা। বাবার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল পটল। কোনও বাক্য ব্যয় না করে সে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। খসে যাওয়া কয়েকটা পাখির পালক তখন হাওয়ায় ভাসছে। সে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে। নতুন যৌথ খামার বাড়ির স্বপ্ন। নতুন ফল চাষের স্বপ্ন। আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে তাদের গ্রাম। একটানা সুপুরি গাছের ছিপছিপে সারি। সবুজ পাতায় লেপে আছে আলোর ঝলক। ঝোপঝাড়ের ডগা কাঁপিয়ে উড়াল দিচ্ছে মাঠবাবুই। ছবির মতো ধানের জমি আর কুঁড়েঘর। মানুষজনের কলকলানি। জমাট বাঁধা নীরবতা উবে গেছে অজানা ফুসমন্তরে।

সে আর এখন পটল নয়। পটল বাবু। গণ্যমান্য হিসেবে সকলে সমীহ করছে। সবার সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে। গ্রামের মোড়ল মাতব্বররাও আসছে পরামর্শ নিতে। এখন বিরাট এলাকা জুড়ে চাষবাস। গাছে গাছে সোনালী ফল। পুকুর ভরা পেল্লায় রুপোলি মাছ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সেসব শহরে চালান যায় ট্রাক ভর্তি হয়ে।

সবাই গদগদ হয়ে বলে, এটা হলধরবাবুর ছেলে পটল বাবুর হাতযশ। তিনিই আমাদের নতুন পৃথিবীর খোঁজ দিয়েছেন। অন্য গ্রামের লোকজনের দৃঢ় বিশ্বাস এটা পটলবাবুর তুকতাক। ভদ্রলোক পাথরেও ফুল ফোটাতে জানে।

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

www.banglabooks.in

হাসির গল্প

হোমগার্ড বনাম

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

চেহারা বটে একখানা! রাত-বিরেতে চোখে পড়লে দাঁতকপাটি লেগে যাবে, হলফ করে বলা যায়। এমন একখানা স্যাম্পল বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন জানলে বড়মামার বাড়ি থোড়াই আসতাম আমি! রক্ষে কর।

এমনিতেই আসার বিশেষ উৎসাহ ছিল না আমার। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে লোকে হিল্লি-দিল্লি কত জায়গায় বেড়াতে যায়, আর আমি কিনা যাব মালদা, তাও আবার মামার বাড়ি! না, এমনিতে মামার বাড়ি খারাপ নয়। খাইয়ে মানুষ বড়মামা—নিত্যি নতুন খাওয়া-দাওয়া, আর সেইসঙ্গে কবে কী খেয়েছেন জমিয়ে তার গল্প। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মামার সঙ্গে গল্প করার জন্যে তো আর কেউ মামার বাড়ি আসে না। মামাতো ভাই বোন দুটিই বয়সে আমার চেয়ে ঢের বড়, তার চেয়েও বড় কথা, তারা দুজনেই থাকে হোস্টেলে। গল্পটা আমি করব কার সঙ্গে শুনি। সেইজন্যেই বোধহয় উঁকিঝুঁকি মেরেছিলাম ওদিকে। পড়বি তো পড় একেবারে সামনাসামনি।

কালকেই এসেছি। গৌড় এক্সপ্রেসে স্লিপার পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু রাতে ভালো ঘুম হয়নি, দুপুরে টেনে ঘুম মেরেছিলাম একটা। বিকেলে মালদার স্পেশাল পোস্ত-

ছড়ানো লাড্ডু সহযোগে জলখাবার, রাতে ইয়া বড় গলদাচিংড়ির মালাইকারি। আমার অনারে লুচি বানিয়েছিল মামিমা। সেই বিশাল ভূরিভোজের মাঝেই বোধহয় মামা একবার বলেছিল,—ওদিকের ঘরটা একজনকে থাকতে দিয়েছি, সকালবেলা দেখতে পাবি।

সেটা বলেছিল, কিন্তু দেখলে যে পিলে চমকে যাবে, সে কথা তো বলেনি। সেইজন্যেই বোধহয় সকালে খান সাত-আট কড়াইশুঁটির কচুরি পেটে চালান করে দিয়ে একটু পায়চারি করার জন্যেই বাইরে এসেছিলাম। তখনই ঘটে গেল আমার সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার।

সিনেমায় ডাকাত-টাকাত দেখেছি অনেক, মা দুর্গার পায়ের তলায় অসুর যুদ্ধ করছে, সে মূর্তিও দেখেছি, কিন্তু ওইরকম একটা মানুষ জলজ্যান্ত বসে আছে সামনে, বিশ্বাস করা যায়! তাও ওইরকম তাগড়াই চেহারা হলে তবু ব্যায়াম বীর-টির মনে করা যেত, সেরকম তো নয়। থলথলে চেহারা, তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা চোখে পড়বার মতো সেটি হল জালার মতো একটি বিশাল ভুঁড়ি। এই গরমের দিনেও উদোম গায়ে তিনি বসে-বসে সেই ভুঁড়িতে তৈল মর্দন করছেন।

তা করুন, নিজের ভুঁড়িতে তিনি নিজে তেল মাখাচ্ছেন, এতে আর কার কী বলার থাকতে পারে। কিন্তু হাড়-পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল আমার ওঁর ডাক শুনে—কী খোকা, কবে এলে।

খোকা! মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে এসেছে যে ছেলেটা, সে কিনা খোকা! নাম না জানতে পার, শোনো ভাই, কি এসো না এদিকে—এইভাবেও কি ডাকা যেত না। কোনোরকমে রাগ সামলে বলেছিলাম,—কালকে এসেছি।

—মামা হন, তাই না? অবিনাশবাবু? ধ্যাবড়া আঙুলের ডগায় বেশ খানিকটা তেল থ্যাবড়া নাকের গহ্বরে চালান করে দিয়ে বলেছিলেন—তা ভালো তা ভালো, মামার বাড়ি ভারি মজা কিল-চড় নাই!

চলে যাওয়ার তাল করছিলাম। সেটাই স্বাভাবিক। উনিই ডাকলেন আবার, বললেন,—আরে যাচ্ছ কোথায়, এসো না একটু আলাপ করি—অবিনাশবাবুর ভাগ্নে বলে কথা। কথায় আছে শোনোনি, নরানাং মাতুলক্রম।

—আমার স্যাঙস্‌কৃট্‌ ছিল না! রাগ-মাগ করে বলে দিয়েছি আমি।

—অ্যাঁ! ছিল না! বলেই খ্যাঁকশেয়ালের মতো এক বিদিকিচ্ছিরি হাসি। খানিক পরে হাসি থামিয়ে বললেন—তার মানে হচ্ছে, লোকে মামার মতোই হয়। ঠিক আছে, আছ তো ক'দিন—ধীরেসুস্থে আলাপ করে বুঝে নেবখন, তুমি মাতুলক্রম হয়েছ কিনা।

বয়ে গেছে আমার তোমাকে বোঝাতে—মনে-মনেই বলেছিলাম আমি। তোমার সামনাসামনি আমি আর হলে তো!

কিন্তু ঠিক এক ঘণ্টা পরেই যে আবার সামনাসামনি হতে হবে, সেটা কি আর ছাই তখন জানতুম! দরজায় কে কড়া নাড়ছিল, মামিমা বললেন—যা তো গুটলু, কাজের লোক এসেছে, দরজাটা খুলে দিয়ে আয় তো।

দরজাটা খুলে এদিক ফিরেছি, আবার সেই মাতুলক্রমের মুখোমুখি।

এবার আর উদোম নন, পুলিসের মতো খাঁকি পোশাক পরে কেড্‌সের ফিতে বাঁধছেন ঘরের সামনেটিতে বসে। ডাকাতের মতো ঝাঁকড়া চুল চিরুনি দিয়ে বাগাবার চেষ্টা করেছেন। পোশাকে-আশাকে খানিকটা ভদ্রসাজার চেষ্টাও করেছেন, তবে ওই বিশাল ভুঁড়ি কি আর কোনো পোশাকের সাধ্যি আছে ঢেকে রাখে—সমুদ্রের নীচে ডুবো পাহাড়ের মতো ধাক্কা মারছে তা নীচে থেকে।

যাক, এতক্ষণে অন্তত বোঝা গেল উনি পুলিশের লোক। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে মামা যে কেন একটা পুলিশের লোককে বাড়িতে থাকতে দিয়েছে কে জানে।

চলেই আসছিলাম, বাজখাঁই গলায় আওয়াজ ছাড়লেন, —এসো, এসো, তোমার নামটাই তো জানা হয়নি এখনও, কী বলে ডাকব তোমায়?

—শ্রীরজতশুভ্র রায়চৌধুরী।

—ইরিব্বাস, বল কী! আবার সেই বিদঘুটে হাসি। বললেন—ওই অত বড় নাম ধরে ডাকতে গেলে তো আমি ভিরমি খাব। ছোটখাট নাম নেই কোনো? ডাকনাম! মানে পুটকে, ছোটকু, বিলটু এইরকম?

থাকবে না কেন, আমার ডাকনামটা তোমায় বলে দিই আর তুমি ওই নিয়ে আবার একঘণ্টা ভাষণ দাও! মনে-মনেই বলছিলাম,—মুখে বললাম,—ডাকুন না যা খুশি বলে, তাতে আর কী হল।

—কী হল মানে, অনেক কিছু হল! এই ধরো আমার নাম তো জনার্দন চট্টরাজ, আমায় যদি তুমি জগন্নাথবাবু বলে ডাকো—

তোমাকে আমার যমদূত চট্টরাজ বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে! ওঁর কথাটা সম্পূর্ণ না শুনেই মনে হল আমার। ততক্ষণে উনি বলে চলেছেন,—ঠিক আছে, তোমায় আমি ভাগ্নে বলেই ডাকব।

তবু ভালো। খোকার চেয়ে ভাগ্নে ভালো। ভাবছিলাম, এমন সময় দাঁড়কাকের মতো গলায় চিৎকার করে কাউকে বললেন,—আমার বন্দুকটা দিয়ে যাও তো—

কোনোরকমে ছাড়া পেলে বাঁচি আমি। বন্দুকের জন্যে হাঁক মারার সময় শরীরটা একটু ঘুরিয়েও ছিলেন ডানদিকে। চলে যাওয়ার দুর্দান্ত সুযোগ ছিল, কিন্তু—

হঠাৎই লেখাটা নজরে পড়ে গিয়েছে আমার, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি আমি।

নেহাত কপালের গেরোই বলতে হবে, নইলে ওটা নজরেই বা পড়বে কেন আমার, আর ভদ্রলোকের ওপর এক কাঠি টেক্কা দেওয়ার জন্যে সেটা বলতেই বা যাব কেন আমি ওঁকে। কিন্তু ওই যে বললাম, কপালে দুঃখ থাকলে তা খণ্ডাবে কে। কথাটা বলেও ফেলেছি আমি ততক্ষণে ওঁকে,—আপনার পোশাকে ওটা ওরকম উলটো করে লেখা আছে কেন?

—অ্যাঁ, কিছু বললে?

—বলছি, ওই আপনার জামায় কাঁধের ওপর লেখাটার কথা। ততক্ষণে আমি ধরে ফেলেছি, যমদূত চট্টরাজ পুলিশ নয়, হোমগার্ড, ইউনিফর্মে সেটাই সেলাই করে লেখা আছে। বললাম,—ওটা তো হবে এইচ-জি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জি-টা আগে এসেছে। আপনি লক্ষ করেননি?

—বটে। জব্বর চোখ তো তোমার ভাগ্নে! একটু গম্ভীর হওয়ার ভান করেই আবার সেই পিত্তি পোড়ানো হাসি। বললেন,—কী লেখা আছে বলো তো জামায়?

—জি-এইচ! আপনি দেখেননি?

—হাজারবার দেখেছি। তাতে হলটা কী?

—না, মানে ওটা তো হবে—

—এইচ-জি, তাই তো! কাঁচা-পাকা গোঁফে একবার হাতবুলিয়ে নিয়ে বললেন,—ইস্কুল-টিস্কুলে পড় তো তুমি ভাগ্নে!

রীতিমতো আঁতে ঘা দিয়ে কথা। স্কুলে আমি স্ট্যান্ড করি নিয়মিত। স্যারেরা বেশ কয়েকটা বিষয়ে লেটার আশা করছেন আমার কাছ থেকে। একটু রুক্ষভাবেই বললাম,—কেন বলুন তো! মাধ্যমিক দিয়েছি আমি এবার।

—ভেরি গুড। তা মাধ্যমিক দিয়েছ অথচ এটা জানো না যে জি-এর পরেই এইচ হয়! অবাক কাণ্ড!

কী মুশকিল। ইনি আবার মস্করা করছেন নাকি আমার সঙ্গে! ভুরু কুঁচকে বললাম,—আপনি হোমগার্ড তো, নাকি?

—হোমগার্ড! এই জনার্দন চট্টরাজ! মুখে এতক্ষণে একটা রাগ-রাগ ভাব ফুটে উঠল। বললেন,—হোমগার্ড তুমি দেখনি?

—কেন দেখব না, ভোট-টোটের সময় কত সব ছেলে হোমগার্ডের কাজ করে—

—হ্যাঁ, ছেলে! চ্যাংড়া! হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন উনি, —আমার মতো জোয়ান মদ্দকে তুমি কখনও হোমগার্ডের কাজ করতে দেখেছ।

—কেন অনেক বয়স্ক লোকও তো দেখেছি আমি—লাঠি দিয়ে পুলিশের কাজে সাহায্য করেন।

—লাঠি নিয়ে, তাই তো! রাইফেল শুটিংয়ে ট্রেনিং থাকে তাদের? হাতে নিশানা কীরকম অব্যর্থ, সে পরীক্ষা দিতে হয় তাদের? রাইফেল হাতে কোনো হোমগার্ড তুমি দেখছে আজ পর্যন্ত।

বন্দুক এসে গেছে ততক্ষণে। টেবিলের ওপরেই রেখে গেছে কেউ। রাইফেল সম্বন্ধে আমার ধারণা অবশ্যই খুব পাকা নয়, কিন্তু এটার চেহারা দেখেই মনে হয় সিপাহি বিদ্রোহের পরে এমন বন্দুক নিশ্চয়ই কেউ ব্যবহার করেনি। আমার এক বন্ধুর বাবা মাঝে-মাঝে পাখি-টাখি মারতে যান, তাঁর কাছে যেন দেখেছিলাম এরকম একটা জিনিস, ছররা বন্দুক না কী যেন বলে। সে যাই হোক, বোঝা গেল ইনি বন্দুক-টন্দুক হয়তো চালাতে পারেন এবং হোমগার্ড বলায় নিজেকে বেশ অপমানিত বোধ করছেন। পদমর্যাদায় তিনি সম্ভবত একটু ওপরের দিকে, কিন্তু সেটা কী! বাপের জন্মে তো জি-এইচ বলে কোনো পদের কথা শুনিনি।

শোনার যে খুব একটা ইচ্ছে আমার ছিল, তাও নয়। কিন্তু কপালদোষে কথাটা যখন পেড়েই ফেলেছি, আমি ছাড়লেও উনি ছাড়বেন কেন! তাই নিজে থেকেই এবার সারেন্ডার করে বললাম,—ভেরি সরি জনার্দন কাকু, মানে হোমগার্ড দেখেছি অনেক, কিন্তু জি-এইচ, তো আজ পর্যন্ত দেখিনি কোথাও—সেইজন্যেই ঠিক বুঝতে পারিনি আর কী।

—দেখবে কী করে! জি-এইচ কি তোমার ওই এইচ-জি-র মতো কাঁদি-কাঁদি ফলে রয়েছে! না দেখাটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি জানবে না এটা আমি আশা করিনি।

—সত্যিই জানি না, আপনি কাইন্ডলি যদি বলে দেন—

—নো-নো! নেভার! জনার্দন চট্টরাজ উনিশ শতকের লকড়ি-বন্দুকের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, —মাধ্যমিক দিয়েছ বলছ, জি-কে তে এত উইক তুমি!

—জেনারেল নলেজ কিন্তু আমার মোটামুটি ভালোই, মানে বাবা তো তাই বলেন।

—কিন্তু আমি তো তা বলি না! এই যে আমি বললাম, জি-কে, তুমি বুঝে গেলে জেনারেল নলেজ, তাহলে জি-এইচটা তুমি বুঝতে পারলে না কেন?

—কখনও শুনিনি বলে! এই গোঁয়ার গোবিন্দ অসুর মার্কা লোকটার কাছে হেরে যেতেও অবশ্য মোটেই ভালো লাগছিল না। তাই বললাম,—চেষ্টা করতে পারি যদি আপনি দু-একটা ক্লু দেন।

—কীরকম ক্লু চাও বল।

—মানে আপনার অফিসটা কোথায়? কোথায় যেতে হয় আপনাকে?

—যেতে আবার কোথায় হবে! আমায় কি গিয়ে হাজতে খাতায় সই মারতে হবে!

—মানে আপনার একটা বস তো আছে! সেই বসের নামটা বললেই আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারব।

—কিস্সু আন্দাজ করতে পারবে না। কোনো বস-টসকে, আমি কেয়ার করি না।

—সে না হয় আপনি করেন না, কিন্তু আপনার মতো জি-এইচ তো আরও আছেন এখানে, তাঁদের অফিসটা কোথায়?

—আমার মতো জি-এইচ? আরও অনেক? এখানে! আমার মূঢ়তায় তিনি হাসবেন না কাঁদবেন বুঝতে না পেরে পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ফেললেন। তারপর উলটো করে ধরে সেটাতে বেশ কয়েকটা ফুঁ মেরে

বললেন,—তোমার দেখছি কোনো ধারণাই নেই এই চাকরি সম্বন্ধে।

—নেই যে সেটা তো বললামই আমি আপনাকে। কথাটা আমতা-আমতা করেই বলতে হল আমাকে।

—বুঝতে পারছি। বিড়িটা জুত করে ধরিয়ে বললেন, —এস-ডি-ও কাকে বলে জানো?

—কেন জানব না? সাব ডিভিশনাল অফিসার!

—অ্যাই! এটা কিন্তু তোমাকে বলে দিতে হল না, তুমি জানো এস-ডি-ও মানে মহকুমাধিপতি। আচ্ছা বল তো ডি-এম মানে কী?

—দূর, এটা তো একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। আমি বললাম,—ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

—হ্যাঁ, জেলাশাসক। ভেরি গুড।

—না-না, এটা এমনকিছু বাহবা পাওয়ার মতো কথা নয়। আসলে বললামই তো, জি-এইচ আমি কখনও দেখিনি তো, তাই—

—না দেখাটাই তো স্বাভাবিক। তাই বলে নামটা জানবে না! ডি-এমকে তুমি ক'বার দেখেছ? শুনি?

—এটা কিন্তু আপনি একটু ইয়ে করছেন। আমি না বলে আর পারলাম না,—একটা জেলায় ডি-এম তো একজনই থাকেন।

—আর জি-এইচ! ক'জন থাকেন?

—মানে?

—মানে আবার কী? এস-ডি-ও একজন থাকে, ডি-এম একজন থাকে, জি-এইচও একজনই থাকে। একি তোমার ওই হোমগার্ডের মতো হাজার গণ্ডা লুটোপুটি খাচ্ছে নাকি!

—বলেন কী? গোটা ডিস্ট্রিক্টে জি-এইচ ওই—

কথাটা শেষ করার আগেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক দশাসই মহিলা। মুখচোখের চেহারা দেখেই বোঝা যায় জনার্দন চট্টরাজের ওপর খুব প্রসন্ন নন তিনি। গোল-গোল চোখ প্রায় আগুনের গোলার মতো নাচিয়ে বললেন,—কী, এবার বেরুনো হবে, নাকি! ওই বাচ্চা ছেলেটাকে ধরে গাদাগুচ্ছের বাজে বকলেই চলবে! বেরোও বলছি শিগগির!

জোঁকের মুখে নুন পড়া, না কি একটা কথা চালু আছে না বাংলায়! প্রায় সেইরকমই হয়ে গেল ব্যাপারটা। প্রবল প্রতাপান্বিত জনার্দন চট্টরাজ, শ্রীল শ্রীযুক্ত জি-এইচ এক মুহূর্তে কেন্নোর মতো গুটিয়ে গিয়ে আর একটি কথাও উচ্চারণ না করে সটান সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো কতক্ষণ যে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। খেয়াল হতে দেখি, মামা হাত দিয়েছে গায়ে, বলছে,—এখেনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী করছিস! আয়, ভেতরে আয়।

—না, মানে ওই ভদ্রলোক কী করেন সেটা জিজ্ঞেস করছিলাম, তা উনি এমন উলটোপালটা বকতে শুরু করলেন—

—দূর-দূর, ও আবার করবে কী, ও তো জি-এইচ।

—মানে?

—গভমেন্ট হান্টার। ওই একটা করেই পোস্ট আছে জেলায়-জেলায়।

—কাজটা কী?

—কাজ না কচু! কোথাও হনুমানটানের উৎপাত হলে খবর আসে, দু-চারটে আওয়াজ-টাওয়াজ করে দিয়ে আসে। তাই নিয়ে তুই একেবারে—। মামা হ্যাঁচকা টানে ভেতরে টেনে নিয়ে বললে,—বহরমপুরের ছানাবড়া। বলে রেখেছিলাম, এই মাত্তর দিয়ে গেল গরম-গরম। আয় দেখি ব্যাটা কীরকম পাল্লা দিতে পারিস আমার সঙ্গে, —আয় আয়—

বহরমপুরের ছানাবড়া এখন আমার নিজের চোখদুটোই। আয়নাতে না দেখেও বুঝতে পারছি।

ছবি : শংকর বসাক

ভূতের গল্প

নাড়ুবাবুর ভূত বিতাড়ন

অশোককুমার সেনগুপ্ত

নাড়ুবাবু লোকটা বড়ই ঘরকুনো। ঘর থেকে বেরুনোর নাম শুনলেই তাঁর মুখ ব্যাজার। কিছু না কিছু কারণ দেখিয়ে ঠিক বই খুলে বসে পড়বেন। রোগা, ফরসা চেহারা, মাথায় মস্ত টাক, শনের মত পিছনের দিকে কিছু চুল আছে বটে, তবে দেখলে মনে হয়, চুন লাগিয়েছেন ছড়িয়ে। বয়স বাষট্টি। বাহাত্তর বললেও মানিয়ে যায়। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। পেনসেন পান। বিয়ে করেননি। ঘরে বিধবা দিদি। দিদিরও বয়স হয়েছে। তবে শরীরস্বাস্থ্য ভাল, গোল মুখ, মাথার পাকা চুলের ভাগ খুব কম। এক মায়ের পেটের ভাই বোন। কিন্তু দিদির চুল যে কেন এমন কে জানে!

সকালবেলা। নাড়ুবাবু সবে খবরের কাগজের খবরগুলোয় প্রাথমিক চোখ বুলিয়েছেন। দুপুরে প্রতিটি সংবাদের প্রতি শব্দ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন। তার আগে বইয়ের আলমারিতে হাত দিতেই 'আজব ভূতের আপদবিপদ' বইখানা হাতে উঠে এল। অনেকদিন

আগে পড়েছেন, আজ পড়লে হয় ভাবছেন। এমন সময় দিদির গলা, 'ওরে নাড়ু, বাজার যা।'

দিদির সঙ্গে কাল রাত্রি ন'টা পর্যন্ত বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। এটা অবশ্য প্রায় ঘটে। ঝগড়া দু'দিনও থেকে যেতে পারে। এবারটা যায়নি। দিদির সঙ্গে তার যত মিল তত অমিল। তুচ্ছ কারণে কথা বন্ধ। কেউ কারও মুখ পর্যন্ত দেখে না। তখন চিরকুট মাধ্যমে সংসারের কাজ কর্ম চলে। তাও সবই ভাববাচ্যে। দিদি চিরকুটে লিখল, 'এবার চান করা হোক।' নাড়ুবাবুর নিজস্ব চিরকুটে উত্তর হল, 'পনের মিনিট অপেক্ষা করলে ভাল হয়।' কিংবা দিদি লিখল, 'তেল ফুরিয়েছে।' নাড়ুবাবু লিখলেন, 'আনা হবে।' তবে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বড়ই ঝামেলা হয়। নাড়ুবাবু লিখলেন, 'মুড়ি খেলে ভাল হত!' দিদির চিরকুট, 'বাদাম, চানাচুর, আলুভাজা একটার নাম জানা গেলে সুবিধা হয়।' তবে ভাত খাওয়ার সময়ই গোলমাল। ডান হাতে খাওয়া, লেখা হবে কী করে। তার জন্যে অগ্রিম লিখে রাখা চিরকুট পাশে রাখতে হয়, ডাল চাই, ভাত চাই, আলুভাজা চাই, পটলের তরকারি চাই ইত্যাদি। একগোছা চিরকুট নিয়ে বসতে হয়। এ সময় দিদির চিরকুট লাগে।

ঝগড়ার পরিসমাপ্তিও চিরকুট মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সেটা দিদির তরফের হোক, কী তাঁর তরফেই হোক। গত বারেরটা হয়েছিল, তাঁর তরফেই। তিনি চিরকুটে রাত্রি আটটা আটান্ন মিনিটে লিখেছিলেন, 'ঝগড়া বোকারাই দীর্ঘস্থায়ী করে।' দিদির লেখা এসেছিল, 'আমরা বোকা নই, সেটা এক্ষুণি প্রমাণ করা দরকার।' তারপরই কথা। কোনবার অবশ্য লেখা হয়, রাগ প্রশমিত হয়েছে কিংবা বাক্যালাপ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না কিংবা আমরা দু'জনকে যদি দু'জনে না দেখি, কে দেখবে। তবে, দিদি ক্ষমা কর, একবার লিখতে হয়েছিল নাড়ুবাবুর। চিরকুটে কোন কাজ হচ্ছিল না, দেখে শেষ অস্ত্র। চিরকুট দিদি ফেলে দিতে হাতে নিয়ে পড়েও দিতে হয়েছিল।

গত ঝগড়ার বিষয় ছিল বেগুন! কালো বেগুনে পোকা থাকবে, যাকে বলে কানা বেগুন, জানবে কী করে নাড়ুবাবু। তাতেই কীনা দিদি বলল, 'তুই কানা নাকি রে? চশমাটা চোখে যে রেখেছিস্ সেটা স্টাইলে দেখানোর জন্যে?'

'আমাকে কানা বলছ? দিদি হয়ে ভাইকে কানা বলা! বেগুনের ভেতর ঢুকব নাকি?'

'কেউ বেগুনের ভেতর ঢোকে না। ঢোকে বেগুন বাড়িতে। যেখানে বেগুনের চাষ হয়, সেই খেতকে বলে বেগুনবাড়ি।'

'তুমি আমাকে বেগুনবাড়িতে যেতে বলছ। চারিদিকে এত বাড়ি। কিন্তু বেগুনবাড়ি পাব কোথায়?'

'মুখ্যুর মত কথা বলিস্ না নেড়ো।'

'তুমি আমাকে মুখ্যু বলছ?'

'দিনরাত বই পড়িস্ বলে, তোকে পণ্ডিত বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, বলবে।'

'না, বলব না। কেন বলব? দিনরাত বই নিয়ে থাকে গ্রন্থকীট। মানে বইয়ের পোকা। তুই সেই পোকার বেহদ্দ।'

ব্যস্, ঝগড়া তারপর প্রসারিত হয়ে যায়। কথার পর কথা। তবে মুখের কথা ঝগড়া হলেও ঘরের কাজকর্ম কিন্তু বন্ধ হয় না, খাওয়া বন্ধ হয় না।

আজকের ব্যাপারটা অন্যরকম। কাল রাত ন'টায় ভাব হয়েছে। মন বেশ প্রফুল্ল নাড়ুবাবুর। থলে নিয়ে দিদির কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কী আনব দিদি?'

'শোন, কাঁচালঙ্কা আনবি। বেগুন আনবি। সাদা বেগুনে পোকা লাগা বোঝা যায়। কালো বেগুন দেখে শুনে আনবি। তোকে ভেজে দেব। তোর তো বেগুন ভাজা খেতে ভাল লাগে।'

'ঠিক আছে। আলু তো কালই এনেছি। নটে শাক আনব। তুমি খেতে ভালবাস।'

'মাছ আনবি।'

নাড়ুবাবু বাচ্চা ছেলের মত আদুরে গলায় বললেন, 'না দিদি মাছ আনব না। তুমি মাছ খাও না।'

'না। না। মাছ আনবি। আমি না খেলাম তো কী হল! তুই তো ভালবাসিস।'

বেশ আনন্দের সঙ্গেই নাড়ুবাবু বাজার যাচ্ছিলেন। রোদ উঠেছে। রাস্তায় রিক্সা, গাড়ি, মানুষের হাঁটাহাঁটি। দু'দিকের দোকানপাট খোলা। খানিকটা হাঁটতেই দেখলেন, রায়দের বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে। দোতলা বাড়ি। পরিত্যক্ত হয়ে আছে অনেক বছর। মামলা মোকদ্দমা চলছে। ঝোপঝাড়, নারকেলগাছ, ওদিকে আবার বাগান, আর একটা ডোবা আছে। নাড়ুবাবু ভাবলেন, নিশ্চয় ভেঙে প্রমোটার বড় বিল্ডিং বানাবে। এই রায়বাড়িতে কত খেলা করেছেন ছেলেবেলায়। লম্বা একটা শ্বাস পড়ল। এখন

তো ইট খসছিল। মানুষ ঢুকতে ভয় করছিল। কিন্তু রায়দের মামলা মোকদ্দমা চলাকালীনও তো বাড়িটা ভালই ছিল। লোক থাকত না ঠিকই কথা, তবে প্রয়োজনে ব্যবহার করত অনেকেই। সামনেকার জায়গায় বিয়ের প্যান্ডেল হত।

দিদির কাছে রায়বাড়ির ভাঙার গল্প বলবে, ছেলেবেলার কথা হবে, এ সব ভেবেই বাজার নিয়ে বারান্দা ভেঙে পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াতেই বিপত্তি। দিদির চিৎকার, 'কী করেছিস্! এ কী করলি। ছিঃ ছিঃ! নীচে যা, নীচে যা।'

নাড়ু বুঝতে পারলেন না। তবে দিদির কথামত নীচে নেমেই শুনলেন, 'জুতো খোল্। জুতো খোল।'

সর্বনাশ! বেখেয়ালে জুতো পরে রান্নাঘরে। নাড়ুবাবু ভুল বুঝেই বললেন, 'সত্যি দিদি, খেয়াল ছিল না।'

'খেয়াল ছিল না? কবে তোর আক্কেল হবে। বুড়ো বয়সেও যার আক্কেল হল না।'

'জুতো পরে তো রান্নাঘরে ঢুকিনি।'

'আবার তর্ক। এখন আমাকে গোটা বারান্দা আবার ধুতে হবে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ছিলিস্?'

'জানি না।'

'তা কেন জানবে? চোখের মাথাও তো খেয়েছো।'

নাড়ুবাবু এরপর না রাগ করে পারেন না, ঝগড়া করে পারেন, বাক্যালাপ না বন্ধ হয়। গোটা কাগজ ছিঁড়ে ছোট ছোট চিরকুট না বানালে কী চলে! ফলে, চায়ের জন্যে তাঁকে চিরকুট বানাতে হয়। রায়বাড়ির গল্প মুলতুবি থাকে। তিনি শুধু ভাবেন, গত ঝগড়াটার সময়সীমা এইরকম ছিল। সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাত্রি ন'টা। সাড়ে বারো ঘণ্টা মাত্র। আর একটু দীর্ঘ হলে ভাল হত। তাহলে চিরকুট পর্ব এত তাড়াতাড়ি শুরু হত না।

খবরের কাগজ দুপুরে পড়া শেষ হল। ভূতের গল্পের বইটা শুরু করলেন! সারাদিন এভাবেই চলল। চিরকুটের আদানপ্রদান রাত্রি অবধি। শোবার আগে ভূতের গল্পের বইটা আবার হাতে নিলেন। অনেকবার পড়া। তা হোক।

কিন্তু বই পড়বেন কী! হাত থেকে কে যেন বইটা কেড়ে নিল। ঘরের আলোও নিবে গেল। তারপরই শোনা গেল একটা গলা, 'ভূতের গল্পের বই পড়বেন কেন? জ্যান্ত ভূত আপনার সামনে থাকতে!'

নাড়ুবাবু ভয় পাবার পাত্র নয়। বললেন, 'আপনি তাহলে ভূত।'

'হ্যাঁ। রায়বাড়ির ভূত।'

'কিন্তু আপনার আসার উদ্দেশ্যটা কী জানতে পারলে ভাল হত না।'

'জানবেন বৈকী! আবেদন নিয়ে তো আমি নিবেদন করতে এসেছি। আমার বেদন আপনার বেদন একাকার হয়ে গেল দেখেই। আমি বেদনাকে বেদন করে নিলাম।'

'কথার প্যাঁচ রাখুন। ওসব আমিও করতে জানি।'

'প্যাঁচ কষার কথা বলছেন। কোন প্যাঁচ নেই। বরঙ প্যাঁচে পড়েছি আমি। উৎখাত হয়েছি। আস্তানা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তখনই আপনার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বুঝলাম, আপনিও বেদনাহত। তখনই আপনার খবর নিয়ে নিলাম।'

নাড়ুবাবু অবাক হলেন। ভূতে তাঁর খবর রাখছে। হল কী। বললেন, 'শুনি কী খবর জানলেন।'

'আপনি আর আপনার দিদি এ বাড়িতে থাকেন। নিজেদের দোতালা বাড়ি। উপর নিচ করে ছ'খানা ঘর। ভাড়া দেন না। আপনার এক ভাইপো আছে। মাঝে মধ্যে আসে। দোতলার ঘরে থাকে। আপনারা মারা গেল ওই মালিক হবে কী না তাই অধিকার বজায় রাখা আর কী। নইলে, খবর ও নিত না। থাকে ব্যান্ডেলে। আপনি পেনসেন পান। বই পড়তে ভালবাসেন। ঠিক বলছি তো?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। সবই ঠিক। কিন্তু প্রয়োজনটা আপনার জানতে পারলে ভাল হত।'

'আপনার ঘরে, মানে আমি থাকতে চাই। দোতলায় আস্তানা গাড়ব। ফাঁকা ঘর তো রয়েছে। ভাড়া দিতে পারব না। তবে উপকার করে পুষিয়ে দেব। আপনার দিদি—।'

'ওর কথা বলবেন না। সব সময় ঝগড়া। থাক্ গে, ছাড়ুন ওসব। উপকার কী করবেন?'

'ছাড়ব কেন স্যার। ওটাই তো ধরব। ওই ঝগড়া। আপনার দিদির ঝগড়া করা স্বভাব একেবারে বদলে দেব। কেমন চুপচাপ হয়ে যাবে। যা বলবেন, শুনবে।'

নাড়ুবাবু উৎসাহিত হল। বলেন, 'বলেন কী? কী করে সেটা সম্ভব।'

'কেন, আপনার দিদির মাথায় এক বালতি জল ঢেলে দেব কিংবা সামনে আরশোলা ছেড়ে দেব।'

'তাতে তো আরও চেঁচাবে।'

'আমি মুখ চেপে ধরব।'

নাড়ুবাবু মাথা নাড়া দিলেন, 'তাতে আরও বিপত্তি ঘটবে।'

'বিপত্তিতে আপত্তি থাকলে আপনার প্রতিপত্তি বজায় থাকবে কী করে স্যার? নিষ্পত্তির অন্য কোন পন্থা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। উৎপত্তির—।'

'রাখুন আপনার পত্তির হাঁক ডাক এরপর সম্পত্তিকেও টেনে আনবেন।'

'না স্যার, সম্পত্তি আপনারই থাকবে। আপনি কিছু ভাববেন না।'

নাড়ুবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। আমি এখন ঘুমোব।'

ভূত বলল, 'তাহলে আমি ফাঁকা ঘরে আশ্রয় নিই। আস্তানা গাড়ি।'

নাড়ুবাবু বিরক্ত হয়েই বলেন, 'গাড়ুন।'

কিন্তু ভূত যে পরদিনই দিদির মাথায় জল ঢালবে কে জানত! দিদির তো ঘরের মেঝেয় একেবারে স্নান। চমক কাটতেই চেঁচানি, 'ওরে নেড়ো দেখরে, কোথা থেকে জল পড়ল গায়ে। কোথাও তো কিছু দেখছি না।'

নাড়ুবাবু ছুটে এলেন। বললেন, 'সত্যিই তো। তুমি বাথরুমে জল ঢেলে ঘরে ঢোকনি তো!'

'কী যে বলিস্। এখন চান করতেই যাইনি।'

'যাক্‌গে। ছেড়ে দাও কাপড়টা। তারপর স্নান করে এসো।'

দিদি হাউমাউ করেই যায়, 'এত বড় কাণ্ড! তুই এমন নিশ্চিন্তগলায় কথা বলছিস্।'

'চুপ কর তো।'

'না, চুপ করব না।' ব্যস্ ওই পর্যন্ত। তারপর দিদি ছটফট করে। কে মুখ চেপে ধরেছে। কথা বলার জো নেই। মাথা দোলায় শুধু। ছাড়ানোর চেষ্টা আর কী।

www.banglabooks.in

নাড়ুবাবু দাবড়ে ওঠেন, 'ছাড়, দিদির মুখ ছাড়।'

দিদি মুখ ছাড়া পেতেই চেঁচাতে থাকে, 'ওরে কী অলক্ষুণে কাণ্ড রে। ওরে, তুই কাকে ছেড়ে দিতে বললি রে। তুই কাকে এনেছিস রে।'

নাড়ুবাবু বললেন, 'দিদি, চেঁচিয়ো না। কোন ভয় নেই। বাথরুমে গিয়ে ফ্রেস হয়ে এসো।'

দিদি বাথরুমে যেতে নাড়ুবাবু ঘরে এসে ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'এ কী কাণ্ড!'

'সরি স্যার, ভুল হয়ে গিয়েছে। ঠিক আছে, অন্য প্রসেস নেব।'

সে প্রসেসও বেশই গোলমেলে। দিদির সামনে একটা কোলাব্যাঙ থপ থপ করে, ঘরের জানলা আপনা থেকে খোলে, বন্ধ হয়। তারপর সুইচ দেওয়া নেই, পাখাটা ঘুরতে থাকে। নাড়ুবাবু সামলাতে হিমসিম খান। তবে এটাও ঠিক, দিদি আর ঝগড়ার ধার দিয়েও যায় না।

কিন্তু ওদিকে আর এক কাণ্ড! দিদির ঘরে রাত্রিবেলায় হাজির একজন। বলে, 'ও মিঠুদি, ভাল আছ? উঃ কতদিন পরে দেখা হল! রায়বাড়িতে তো আসতাম, জানতাম না তুমি এখানে!' ছেলেবেলার নাম ধরে কে ডাকে! দিদি অবাক। ঘরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'দেখতে পাবে কী দিদি! শরীর ধরতে পারি না। তবে অন্য অসুবিধা নেই। আমি হলাম গিয়ে তোমার সুবোধ। এখন অবশ্য নাম হল। ধবোসু। ভূত হলে নাম উল্টে যায় তো!'

দিদি বলল, 'সুবোধ। মালতীর ভাই? বাস অ্যাকসিডেন্টে—।'

'এই তো মনে পড়েছে।' ধবোসু খুসি হয়। বলে,'রায় বাড়ি তো গিয়েছে, মরাবুবার কাছে এসেছিলাম। রায়বাড়ি ভাঙছে। শুনলাম, তোমাদের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে।'

'মরাবুবা। তার মানে উল্টে দিলে হয় বা—।'

'বলো না। এক্ষুনি উবে যাব। ও নাম করতে নেই। করতে নেই।'

দিদি বলল, 'বুঝেছি, ভাই আমার পিছনে ভূত লাগিয়েছে। কী নাম যেন বললি!'

'মরাবুবা। আমি ওর কাছে গল্প গুজব করতে আসি। এমনি তো ভালই।'

'ভাল না ছাই। আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।'

'কিচ্ছু ভেবো না। তোমরা ভাই নাড়ুবাবুকে কেমন জব্দ করে দিই দেখো। আমার মিঠু দিদিকে ভয় দেখাস? মিঠুদিদির কথা না শোনা, এ কী আমি সহ্য করতে পারি।'

'আহারে, তুই কত ভাল সুবোধ।'

'এখন ধবোসু।'

'কেন যে ধবোসু হলি। রাস্তায় গাড়ি দেখে চললে সুবোধই থাকতিস্। চোখ কান খোলা রেখে রাস্তা হাঁটতে হয়।' দিদির দীর্ঘশ্বাস পড়ে, 'থাক্‌গে, যা হবার তা হয়েছে। শোন্, তাহলে মরাবুবাকে সমঝে দে তো।'

'কিছু চিন্তা করো না। ব্যবস্থা হচ্ছে।'

ব্যবস্থা বলে ব্যবস্থা। ঘরে ধুন্ধুমার কাণ্ড। নাড়ুবাবুর হাত থেকে খবরের কাগজ উড়ে যায়, আলমারির বই নামে, ওঠে, শূন্যে ভাসে, টেবিলের কলম উঠে কালি ছিটোয়, চশমাটা নাক থেকে উপরের সিলিংপাখায় দোলা খায়। নাড়ুবাবু ভাসেন, এ কী কাণ্ড। এই উপকারের নমুনা। তাকেই ভয় দেখান, তাকে নিয়েই মজা।

নাড়ুবাবু চেঁচান, 'হচ্ছেটা কী!'

'কেন, ভাল লাগছে না?'

নাড়ুবাবু টে' পান, গলাটা যেন অন্যরকম। বলেন, 'তুই আবার কে রে?'

'তুই নয়, আপনি না হোক তুমি বলুন। ভদ্রতা জানেন না? আমি হলাম ধবোসু। দিদিকে জব্দ করবেন ভেবেছিলেন, আমি এসেছি। অত সোজা নয়।'

'কিন্তু ওটা গেল কোথায়? যে আস্তানা গেড়েছে।'

'মরাবুবা? ও তো, নিমগাছে বসে পা দুলিয়ে গান করছে।'

'ওর নাম বুঝি মরাবুবা?'

'হ্যাঁ, আস্তানা গাড়তে দিলেন, নামটাও জানলেন না? আপনাদের দিদিভাইয়ের সংসারে আমরা দু'জনে এসেছি। আমাদের যা কথা, তাই কাজ।'

নাড়ুবাবু ভয় পেলেন। দু'ভূতের কাণ্ডকারখানায় ঘরে একেবারে যাকে বলে কুরুক্ষেত্র। দু'ভাইবোনে যে কথা বলবে তাও জো নেই। কাছাকাছি হলেই কেউ না কেউ সরিয়ে নেয়। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। তবে নাড়ুবাবু দিদির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেন।

নাড়ুবাবুর মরাবুবা বলল, 'স্যার, কালকে থাকছি না। কালকের দিনটা উপকার পাবেন না।'

উপকারে কাহিল নাড়ুবাবু। চাই না উপকার, না বলে বললেন, 'কেন?'

'কাল আমাদের জেলা সম্মেলন আছে নিশ্চিন্তিপুরের বাঁশবাগানে। বহু বিষয়ের আলোচনা হবে। ভূতেদের স্থানাভাবটাই মুখ্য। তার সঙ্গে আছে ভূতে অবিশ্বাস কেন, তার পর্যালোচনা। বিশ্বাস বাড়ানোর উদ্যোগ। তবে 'ভূত সংরক্ষণ সমিতি'র প্রেসিডেন্ট শুনছি, বিরাট একটা জায়গা জোগাড় করেছে। যেখানে ভূতেদের নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। সেটা আজই ঘোষণা করবেন। কেউ বলছে, বহু পুরোন বাড়ি নাকি পাওয়া গিয়েছে। কেউ বলছে, নতুন তেপান্তরের মাঠ নাকি আবিষ্কৃত হয়েছে। কেউ বলছে, সাহিত্যের উঠোনের চারপাশে অজস্র ঝোপজঙ্গলে জায়গার পাকা বন্দোবস্ত হয়েছে। যাইহোক, না, যাওয়া পর্যন্ত তো বোঝা যাচ্ছে না।'

নাড়ুবাবু বললেন, 'তাহলে ধবোসুও যাচ্ছে?'

'নিশ্চয়।'

'যাইহোক পরদিন নাড়ুবাবু সুযোগ পেলেন দিদির সঙ্গে কথা বলার। ওরা নেই, ফলে দিদির ঘরে গিয়ে বললেন, 'ও দিদি কী হবে। আমরা যে জোড়া ভূতের পাল্লায় পড়েছি।'

'হ্যাঁ, ওরা কী একটা মিটিংয়ে গিয়েছে।'

'যাক্ মিটিঙে। ওদের কিন্তু আর ঘরে আসতে দেওয়া হবে না।'

'আটকাবি কেমন করে নাড়ু! আমাদের যে ওরা শেষ করে দেবে। কী কাণ্ডই না করছে।'

'দাঁড়াও। ভাবতে দাও। পথ একটা বেরুবেই।'

তবে নাড়ুবাবু পথের সন্ধানই করে চললেন। কিন্তু দিদির মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। রাম নামে ওদের বড়ই ভয়। 'রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, করবি আমার কী'—এ তো জানা কথা।

দিদি চেঁচাল, 'ওরে নাড়ু, পেয়েছি। পেয়েছি। চারদিকে রাম রাম লিখে রাখ।'

'ওতে কী কাজ হবে দিদি। নাড়ুবাবু টাক চুলকান।'

রাম লিখে ঘর ভরিয়ে দেওয়া হল। তার সঙ্গে সিদ্ধান্তও নেওয়া হল, মাঝে মাঝে অদরকারেও রাম বলতে হবে। ব্যস্।

আর ভূতেদের দেখা নেই। না ধবোসু না মরাবুবা।

দিদি বলল, 'দেখলি! দেখলি, আমার বুদ্ধি!'

নাড়ুবাবু বললেন, 'ওতে কাজ হয়েছে কী না সন্দেহ আছে। ওরা মানে ওই ভূত সংরক্ষণ সমিতি জায়গার সন্ধান করছিল। প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে, আর ওরা দখল নিতে গিয়েছে। এটাই হতে পারে।'

'না, এটা নয়। ওই রাম নামেই গিয়েছে।'

'না, যায়নি। আমি যেটা বলছি—।'

ব্যস্, দিদি ভাইয়ে এরপর কথার পিঠে কথা, ঝগড়া। বাক্যালাপ বন্ধ। আবার নাড়ুবাবু চিরকুটের আশ্রয় নিয়েছে। হাতে চিরকুট পেলেন, বাজারে গেলে ভাল হয়।

নাড়ুবাবু থলি হাতে বাজারে গেলেন।

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

কল্পবিজ্ঞানের গল্প

মহাশূন্যে এক রাত্রি

সিদ্ধার্থ সিংহ

পাশ ফিরতে গিয়েই তনুর মনে হল ও আর বিছানায় নেই। মহাশূন্য ভেদ করে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো আকর্ষণই ওকে আর ধরে রাখতে পারছে না। সব কিছুর বাইরে চলে যাচ্ছে ও। আরও অবাক হল, যখন বুঝতে পারল, তার এই আধ-শোয়া শরীরের নীচে ঠেকনা দেওয়া কিচ্ছু নেই। তবু যেন কেউ তাকে নীচ থেকে ঠেলে প্রচণ্ড গতিতে তুলে দিচ্ছে উপরে। নীচের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, দুধ-সাদা উজ্জ্বল রাশি রাশি পেঁজা তুলো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। স্বচ্ছ নীল আকাশ। ধীরে-ধীরে কমে আসছে তার উজ্জ্বলতা। চারদিকে নীলাভ অন্ধকার। জোনাকির ক্ষুদ্র প্রজাতির মতো অসংখ্য গ্রহ-তারা-নক্ষত্র চিক্‌চিক করে জ্বলছে। সরে সরে যাচ্ছে নিমেষে।

গা গুলিয়ে উঠল তনুর। গলার কাছে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে রয়েছে। অথচ বমি-বমি ভাব নেই। ট্রামে-বাসে করে কোথাও যেতে হলে মা তার হাতে একটা লেবু গুঁজে দেন। নাকের কাছে ধরে থাকতে হয় সর্বক্ষণ।

এই তো কিছু দিন আগে মামার বাড়ি গিয়েছিল প্লেনে চড়ে। শিলচরে। ওঠার সময় এই রকমই লেগেছিল। কিন্তু নামার সময় মনে হয়েছিল নাগরদোলার একটা দোলনা। খালি নীচে নামছে আর নামছে। সেই অনুভূতি এখন নেই। তার মানে সে এখন শুধু উঠছেই।

মহাকাশের রোমহর্ষক নানান অভিযানের কথা এত দিন বইতে পড়ে সে শিহরিত হয়েছে। কত দিন ভেবেছে, এ ভাবে সে যদি নিজেই পাড়ি জমাতে পারত। ভিন-গ্রহের স্বপ্ন দেখতে দেখতে চমকে উঠে কত দিন যে মাকে জাপটে ধরে রাত কাবার করেছে, তার হিসেব নেই।

আজ সত্যি সত্যিই সে মহাশূন্যের এক ক্ষুদে যাত্রী। বুকটা বারকতক কেঁপে উঠল। তার পর নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিল। আজ পর্যন্ত ভিন-গ্রহ সম্পর্কে সে যত লেখা পড়েছে, যত সিনেমা দেখেছে, তাতে যত বাধা-বিপত্তিই আসুক না কেন, সব সময় কিন্তু জয় হয়েছে মানুষের। পৃথিবীর। সুতরাং ভয় পাবার কিছু নেই।

তনু আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগল পৃথিবী থেকে সে এখন কত দূরে! একটা নির্দিষ্ট সীমানা পেরোনোর পরই তো তার শ্বাসকষ্ট হবার কথা। তাহলে কি সে এখনও অত উঁচুতে ওঠেনি! আর এত দ্রুত গতিতে তাকে টেনেই বা নিয়ে যাচ্ছে কে! অন্য কোনও গ্রহের অতি বুদ্ধিমান জীব কি! তারাই কি তার চার পাশ ঘিরে ছড়িয়ে রেখেছে অক্সিজেন! তনু তার দু'হাত দিয়ে নিজের সারা শরীরটা তন্নতন্ন করে হাতড়ালো। না, তার শরীরে কোথাও কোনও বাঁধন বা অন্য কোনও কিছু আটকানো নেই। হঠাৎ চমক ভাঙল তার। দেখল, ছোট্ট একটা সবুজ উজ্জ্বল কুণ্ডলী ক্রমশ তার চোখের সামনে বিশাল, বিশালাকায় হয়ে উঠছে। হয়ে উঠছে স্পষ্ট।

গেঞ্জির তলা দিয়ে হাত গলিয়ে নিজের হৃৎস্পন্দনটা এক বার দেখে নিল তনু। টিপটিপ করছে। সেটা আরও বেড়ে গেল সামনে তাকিয়ে, সবুজ কুণ্ডলীটা আসলে বাড়ছে না, সে নিজেই ছুটে যাচ্ছে ওটার দিকে। সিঁটিয়ে পড়ল তনু। গিয়ে আছড়ে পড়লে চ্যাপটা তো নয়, একেবারে বেশ কিছুটা ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যাবে সে। জীবন্ত সমাধি হবে তার। তনু এ বার চমকে উঠল, লক্ষ করল, সুতোর চেয়েও সরু নীলাভ একটা রশ্মি, ওই সবুজ পিণ্ডটা থেকে তার নাভি ছুঁয়ে আছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পৌঁছে গেল ওই গ্রহটার আরও কাছে। তাকিয়ে দেখল অদ্ভুত দৃশ্য। নীচ থেকে খাড়া উঠে গেছে এক একটা গম্বুজ। সেগুলোর গায়ে গোল-গোল খোপ। হাইড্রেনের মুখের মতো। মুহূর্তে তার গতি ধীর হতে-হতে স্থির হয়ে গেল। কোনও জেলে যেন জলের উপর জাল ছড়িয়ে দিল। শরীরে এসে লেপ্টে গেল বেলুন-জাতীয় নরম একটা জিনিস। নিজেকে ভীষণ হাল্কা-হাল্কা মনে হল তনুর। শরীরে হঠাৎ শিহরণ খেলে গেল। দেখল, অজস্র আলোর ছটা তার শরীর ভেদ করে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তনু ভাবল, তা হলে কি চেক-আপ করা হচ্ছে তাকে! কিংবা নষ্ট করা হচ্ছে পৃথিবী থেকে বয়ে আনা জীবাণু! গ্রহ-গ্রহান্তরের গল্প নিয়ে বানানো বেশ কিছু ইংরেজি সিনেমাতে তো সে এ রকমই ব্যাপার-স্যাপার দেখেছে!

এ বার গ্রহটার একদম কাছে এসে পড়ল তনু। গ্রহটার পিঠের ওপর পা রাখল। বড় শীতল। পা রাখা যাচ্ছে না একটানা। একটা রাখলে অন্য পা-টা তুলে নিতে হচ্ছে। দূর থেকে দেখলে, লোকে ভাববে, যেন লেফট রাইট করছে। ফিজিক্যাল এডুকেশনের মাস্টার ওদের প্রায়ই মাঠে নিয়ে গিয়ে এ রকম লেফট রাইট করান।

লেফট রাইট করতে করতে এক সময় দুটো পা-ই একসঙ্গে রাখতে না-রাখতেই তনু চমকে উঠল। দেখল, রাস্তাটা এগিয়ে চলেছে। টাল সামলাতে সামলাতে ও জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। কী হচ্ছে বুঝতে পারল না। আশপাশে ধরার মতো কোনো হাতল-টাতলও নেই। ভীষণ দুলছে এটা। টাল সামলাতে গিয়ে একটা পা তুলতেই পথটা থেমে গেল। সামনে একটা গম্বুজ। চারটে বড় বড় গোলাকার সুড়ঙ্গ-পথ। এটা কোন গ্রহ! তনু ভাবতে থাকে। সে জানে, পৃথিবীর যে কোনো জিনিসই চাঁদে গেলে তার ওজনের ছ'ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। পা বাড়ালে পৃথিবীর তুলনায় ছ'গুণ দূরে গিয়ে পড়ে। লাফালেও তা-ই। এখানেও কি তেমন হবে? তনুর হঠাৎ কেন জানি একটা লাফ দিতে ইচ্ছে করল। লাফাতেই উঠে পড়ল বেশ খানিকটা। আর পড়ল না। ঝুলে রইল শূন্যে। সামনেই তিন তলার খোপ। ঢুকে পড়ল তনু। সুড়ঙ্গের আঁকাবাঁকা পথ ধরে খানিকটা গিয়ে ও পড়ল গ্লোবের মতো গোলাকার একটা বিশাল ঘরে। গোটা ঘরের দেয়াল জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট কাঁটা। ছুঁচলো মুখগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। তার এক একটা একেক রকম রং। এক এক রকম মাপ। তনু ঘরের মাঝখানটায় গিয়ে দাঁড়াতেই উপর থেকে একটা হেলমেটের মতো টুপি তার মাথায় এঁটে জেঁকে বসল। চমকে উঠল তনু। এই গ্রহে মাতৃভাষা! সে স্পষ্ট শুনল—তোমার নাম কী?

—তনু। এটা আমার ডাক নাম। ভালো নাম তন্ময় সান্যাল। কিন্তু আমার ভাবতে অবাক লাগছে যে, পৃথিবী থেকে এত দূরে এই গ্রহে, আমাদের মাতৃভাষা আপনারা জানলেন কী করে?

—কী করে? টুপির মতো যে যন্ত্রটা তোমার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাকে পৃথিবীর ভাষায় বলা যায় 'ট্রান্সলেটর'। তোমাদের ভাষায় এটার নাম দেওয়া যেতে পারে 'ভাষান্তর'। যন্ত্রটা মহাশূন্যের যে কোনো গ্রহের যে কোনো ভাষা সরাসরি অনুবাদ করে দেয়। যে পরে, যন্ত্রটা তারই দাস হয়ে যায়। তাই তুমি যে কোনো ভাষাতেই কথা বলো না কেন, তা আমরা শুনতে পাব আমাদের ভাষায়। আর মহাশূন্যের যে কোনো গ্রহের, যে কেউ

তোমাকে কোনো ভাষাতে যা-ই বলুক না কেন, তা তোমার কাছে পৌঁছবে তোমার মাতৃভাষা হয়ে।

—কিন্তু আমাকে ধরে আনলেন কেন?

—ভয় পেয়ো না। তোমাকে আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছে দেব। শুধু তার আগে একটু পরীক্ষা করে দেখে নেব বর্তমান পৃথিবীর আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিকতা এবং বুদ্ধাঙ্ক।

—বুদ্ধাঙ্ক!

—হ্যাঁ, বুদ্ধাঙ্ক। বুদ্ধাঙ্ক মানে বুদ্ধির পরিমাপ। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব চেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীর বুদ্ধি ঠিক কতটা, আর কত হাজার বছর পরে তারা আমাদের এখনকার বুদ্ধির কাছাকাছি এসে পৌঁছুবে, সেটা এক বার দেখে নেওয়া। না না, বেশিক্ষণ লাগবে না।

—বুদ্ধাঙ্ক মাপার জন্য আমাকে! এত বড় বড় স্কলার, সায়েনটিস্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার থাকতে শেষ পর্যন্ত আমি?

—তুমি যে নতুন প্রজন্ম। তাই তো তোমাকে আনলাম।

—কিন্তু আমার বুদ্ধি আর কতটুকু!

—পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের বুদ্ধাঙ্কই মোটামুটি সমান। উন্নত হয়ে ওঠে শুধু জেনারেশন গ্যাপে। যেমন লোহা। প্রাথমিক অবস্থায় সে শুধু একতাল লোহা। তার পর যে যেমন চায়, সে তার নিজের মতো করে আকার দিয়ে নেয়। কেউ হাতুড়ি করে, কেউ খুনতি, কেউ বা ইস্ত্রি বানায়। কেউ আবার দা, কোদাল, তালা। মানুষও তেমনি। সবার ব্রেনই সমান। যে যেমন ভাবে নিজেকে তৈরি করে কিংবা চাপে পড়ে তৈরি হয়, সে সে-রকমই হয়। সুতরাং কী তৈরি হচ্ছে, সেটা আমরা মাপি না। কী পর্যায়ে আছে, আমরা কেবল তা-ই পরিমাপ করি। সর্বশেষ প্রজন্ম তোমরা, তাই তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাকেই আমরা নির্বাচন করেছি।

—লাগবে নাকি? মানে পরীক্ষা কি কাটাছেঁড়া করে করবেন?

—না না। ও সবের বালাই নেই। দেখতে পাচ্ছ,

সামনে যে পিঁড়ির মতো পাটাতনটা রয়েছে, সেটায় দাঁড়ালেই পিছনের ওই কম্পাসের কাঁটাটা নির্দেশ করে দেবে তোমার বুদ্ধাঙ্কের পরিমাণ।

—মহাশূন্যে কাদের বুদ্ধাঙ্ক এখন সব চেয়ে বেশি?

—কোল্ড স্টারের।

—ওদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক আপনাদের?

—কোনো সম্পর্ক রাখি না। আমরা শান্তির পূজারি। কিন্তু ওদের মানসিকতায় রয়েছে দখলি মতলব। এখন পর্যন্ত প্রমাণিত, ওটাই সব চেয়ে পুরনো নক্ষত্র। এই মহাশূন্যে সম্ভবত ওদের ওখানেই প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু ওটা এখন হিমশীতল হয়ে গেছে।

—ওই গ্রহবাসীরা কি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে নতুন আবহাওয়ায়?

—পারবে না কেন? এক দিনে তো আর হয়নি। ধীরে-ধীরে হিম হয়েছে। অবশ্য কৃত্রিম কয়েকটা সূর্য বানিয়ে ওরা এখন দারুণ সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছে নক্ষত্রটা। ওরা এখন পার্শ্ববর্তী পড়ে থাকা প্রাণহীন গ্রহ-নক্ষত্রগুলিতেও ঘাঁটি গেড়েছে। অফিস-কাছারি সবই ওই সব জায়গায়। দূষণ থেকে বাঁচতে বসতিগ্রহের শিল্প-টিল্পগুলিও সরিয়ে নিয়েছে অন্যত্র।

—আপনারা কি সব গ্রহ-নক্ষত্রেরই বুদ্ধাঙ্ক মাপেন?

—সব নয়, যতগুলো কভার করতে পারি, মাপি। হিসেব রাখি, কারা কত দ্রুত উন্নত হচ্ছে।

—কিন্তু যাদের তুলে এনে বুদ্ধাঙ্ক মাপেন, মাপার পর তাদের কী করেন?

—আবার যথাস্থানে ফেরত পাঠিয়ে দিই।

সে কী! তারা যদি নিজেদের গ্রহে ফিরে গিয়ে এ সব বলে দেয়?

—না, বলবে না। বলতে পারবে না। কারণ, ছাড়ার আগেই আমরা তাদের স্মৃতি অমিট করে দিই। ইরেজার দিয়ে মুছে দেওয়ার মতো এই ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সবটাই আমরা তাদের মস্তিষ্কের স্মরণ বিভাগ থেকে বাদ দিয়ে দিই। ফলে, তাদের আর কিছুই মনে থাকে না বা মনে পড়ে না।

—অমিট করতে যদি বাধা দেয়?

—কী করে দেবে? যদি দেয়ও, আমরা তার ইচ্ছেটাকে কৃত্রিম উপায়ে সরিয়ে আমাদের ইচ্ছেটা বসিয়ে দিই। আর কোনো ঝঞ্ঝাট থাকে না।

আলাপটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। এমন সময় একটা রশ্মি ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। তনু চোখ তুলতেই শুনতে পেল, 'এখন আমরা কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। তুমি ওই পাটাতনে গিয়ে দাঁড়াও।' যাবার জন্য পা বাড়াতেই মেঝেটাই ওকে বয়ে নিয়ে দাঁড় করাল পাটাতনটার একদম সামনে। তনু একটা পা বাড়িয়ে পাটাতনটায় উঠে পড়ল।—ভারী অদ্ভুত তো! এখানকার পথ-ঘাট-মেঝে নিজে থেকেই এগিয়ে সামনে এনে দেয় গন্তব্য।

—না না। নিজে থেকে যায় না। এগুলো সবই কৃত্রিম। বিনাশ্রমে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছনোর জন্য সমস্ত গ্রহ জুড়েই রয়েছে এমন ব্যবস্থা। খানিকটা তোমাদের চলমান সিঁড়ির মতো। তবে, নিয়ম-কানুন আলাদা। একটু চাপ দিলেই রাস্তা চলতে শুরু করে। যাত্রীর মুখ যে দিকে, সেই দিকে। একটা পা সামান্য তুললেই বা হাল্কা করলেই পথ থেমে যায়।

তনু পিছন ফিরে কম্পাসটার দিকে তাকাল। কাঁটাটা অনেকটা ঘুরে তিরতির করে কাঁপছে। তনু বুঝল, তার বুদ্ধাঙ্ক মাপা হচ্ছে। কিন্তু পরিমাণটা যে কত, তা বুঝতে পারল না। কম্পাসটার গায়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ক্ষত আর হিজিবিজি রেখাচিত্র।

—আমার বুদ্ধাঙ্ক কত হল? প্রশ্ন করল তনু।

হালকা উষ্ণ একটা বাতাস তার কাছে এসে যেন থমকে দাঁড়াল। চশমার মতো একটা যন্ত্র পরিয়ে দিল তাকে। বলল, 'এ বার দ্যাখো'।

তনু চমকে উঠল। এ তো তার একেবারে পরিচিত অক্ষর, পরিচিত সংখ্যা। জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী করে হল?'

—চশমাটা সে ভাবেই তৈরি। এটা চোখে দিয়ে মহাশূন্যের যে কোনো জিনিসের দিকে তাকালে, সে যত অপরিচিতই হোক না কেন, পরিচিত আকার নিয়ে ধরা দেয়। যেমন এগুলো আমাদের হরফ, আমাদের সংখ্যা। তোমার বোঝার কথা নয়। কিন্তু এই চশমাটা যেই চোখে দিয়েছ, অমনি এগুলোই তোমার পরিচিত সংখ্যা আর পরিচিত হরফের সমতুল্য হয়ে তোমার চোখে ধরা দিচ্ছে।

তনু জানে, পৃথিবীর বহু পুরনো লিপির এখনও পাঠোদ্ধার হয়নি। ও মনে-মনে ভাবল, এ রকম একটা যন্ত্র যদি পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া যেত, তা হলে কেমন হত!

হঠাৎ তনু দেখল, আচমকা সমস্ত ঘর অন্ধকার করে অজস্র রঙের অসংখ্য আলোর তীক্ষ্ণ ছটা তার শরীরময় ছুটোছুটি করছে। সামনে একটা প্লেট। তাতে কয়েকটা মিছরির দানা।

—মিছরি কেন?

—ওগুলো মিছরি নয়। ওষুধ। আমাদের কাজ শেষ। তোমাকে এখন পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এখানকার কোনো জীবাণু তোমার সঙ্গে যাতে পৃথিবীতে যেতে না পারে, গিয়ে রোগ ছড়াতে না পারে, সেই জন্যই এই ওষুধ। এটা খেলে এ গ্রহ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার শরীর-মন-হৃদয়-স্মরণ-স্মৃতি থেকে একেবারে উবে যাবে এখানকার যাবতীয় ঘটনা। পৃথিবী ছাড়ার ঠিক আগে তুমি যে অবস্থায় ছিলে, পৃথিবীর মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই অবস্থাতেই ফিরে যাবে।

তনু প্লেট থেকে মিছরির দানার মতো ওষুধগুলো টপাটপ মুখে পুরতে লাগল। প্রশ্ন করল—'যাব কী করে?'

—চিন্তা নেই। আমাদের দ্রুত গতি রশ্মিযান তোমাকে পৌঁছে দেবে। তার একটা ছটা তোমার নাভি ছুঁয়ে থাকবে। আর বাকিগুলো মায়ের কোলের মতো তোমাকে আগলে নিরাপদে রেখে আসবে, যে বিছানায় তুমি শুয়েছিলে সেই বিছানায়।

—কতক্ষণ লাগবে?

—সূর্যের রশ্মি পৃথিবীতে যত দ্রুত পৌঁছয়, আমাদের এই রশ্মিযানও প্রায় সেই গতিতেই ছোটে। সুতরাং, বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

—আপনাদের এক বার চোখের দেখাও দেখে যাব না?

—আমরা তোমাকে ঘিরেই বসে আছি। কিন্তু দেখা দেবার ব্যাপারে একটু অসুবিধে আছে। আমরা আড়ালেই থাকতে চাই।

তনু হঠাৎ নাভিতে একটা রশ্মির স্পর্শ অনুভব করল। মুহূর্তে কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা ভাব তাকে পেয়ে বসল। জেগে থাকার চেষ্টা করেও পারল না। চোখ বুজে এল। শরীর এলিয়ে পড়ল। তনু শুধু বুঝতে পারল, তার মাথার গভীরে সামান্য কিছুর পরশ। ভুলতে শুরু করল এই ঘটনার গোড়া থেকে শেষ, এই শেষ মুহূর্তটাও।

তনুর শরীর আলতো ভাবে কোলে তুলে নিল কিছু নরম আলোর রশ্মি।

ছবি : পলাশকান্তি বিশ্বাস

www.banglabooks.in

জীবজন্তুর গল্প

নতুন মা

সিরাজুল ইসলাম

পিকলুর মা রান্না করছিল। ধপ্ করে উঠোনে কী যেন পড়ল। তাকিয়ে দেখে একটা হনুমানের বাচ্চা। খুব ছোটো। ছুটে কাছে গেল। হ্যাঁ, বেঁচে আছে। উঠোনের বড়ো আমগাছটার ডালে দুটো হনুমানের লড়াই চলছে। পিকলুর মা দেখল প্রাণের দায়ে মা হনুমানটা আমগাছ থেকে লাফিয়ে সাহেবদের বাগানের দিকে ছুটছে। তার পেছনে দাঁত খিচিয়ে আর একটা বড়ো হনুমান।

এই তো সুযোগ। পিকলুর মা হনুমানের বাচ্চাটাকে ঘরে নিয়ে এল। মাথায় মুখে জল দিল। বাচ্চাটা তখন হাঁপাচ্ছে আর থরথর করে কাঁপছে। কয়েকদিন হল চোখ ফুটেছে। কানের কাছে একটু রক্ত ঝরছে। মনে হয় ওই দানো হনুমানটা কামড়েছে। পিকলুর মা জানত পশু-পাখিদের কাটা ঘায়ে হলুদ-বাটা খুব কাজ দেয়। একটু হলুদ-বাঁটা লাগিয়ে দিল কানের পাশটায়।

ইতিমধ্যে পাশের বাড়ি থেকে কয়েকজন এসে জড়ো হয়েছে। কেউ বলছে—'ও কে উঠোনেই রেখে দাও। ওর মা এসে নিয়ে যাবে।' কেউ বলছে—'না, না, ছেড়ো না। ওই দানো হনুটা ওকে মেরে ফেলবে।' গদাইয়ের মা এসব ব্যাপারে পাড়ার প্রধানমন্ত্রী। গলা চড়িয়ে সে বলল— 'হনুমানের বাচ্চা বাড়িতে রাখা কি সহজ কথা। ওর মা এল বলে। কামড়তো খাও নি কেউ! আমাদের কেষ্টকে ধরেছিল সেদিন। বাইশ জায়গায় আঁচড়

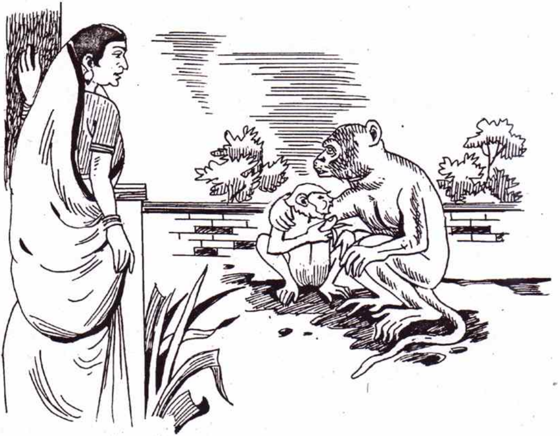

দিয়েছিল। একমাস হাসপাতালে ভর্তি ছিল।' তার কথা শুনে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। পাড়ার ফজর আলি ফিরছিল বাজার থেকে। ভিড় দেখে পিকলুদের বাড়ি ঢুকল সেও। পিকলুর মা তাকে দেখে বলল—'মিয়া ভাই, হনুমানের বাচ্চাটা এই মাত্র পড়ল গাছের ডাল থেকে। বাঁচবে কিনা দেখো তো ভালো করে।'

ফজর বলল—'দুধের বাচ্চা তো। মা ছাড়া একে বাঁচানো মুশকিল। আচ্ছা দেখছি কী করা যায়।' বলেই সে বাড়ির দিকে চলে গেল।

পিকলুর মা তখন বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়েছে। বাচ্চাটাও একটু একটু করে চোখ খুলছে। গদাইয়ের মায়ের আর যাই হোক মনটা খুব নরম। সে বাটি করে দুধ এনে বাচ্চাটার মুখে একটু একটু করে দিল। বাচ্চাটাও বেশ খেল। এদিকে পিকলুর মা সমানে পাখার বাতাস করে চলেছে।

হন হন করে ফজর আলি ফিরে এল। তার হাতে একটা গাছের শেকড়। বলল—'এটাকে মিহি করে বেটে দাও তো।' গদাইয়ের মা শেকড় বেটে আনল। ফজর আলি জলে গুলে দু-চামচ খাইয়ে দিল। এ পাড়ায় তুক্‌তাক্ ব্যাপারে ফজর আলির বেশ নাম আছে। গোরু-ছাগলের অসুখ হলে সবাই তার কাছেই যায়।

বিকেলে বাচ্চাটা একটু সুস্থ হল। পিকলু ইস্কুল থেকে ফিরে বাচ্চাটাকে দেখে তো অবাক। কী আনন্দ তার! হনুমানের বাচ্চা বলে কথা। কাছে গিয়ে যেই গায়ে হাত দিয়েছে, অমনি বাচ্চাটা উঠে দাঁড়িয়ে পিকলুর কোলে উঠতে যাচ্ছে। পিকলু যত সরে আসে, বাচ্চাটাও তার দিকে এগোতে থাকে। শেষমেশ পিকলু ওকে কোলে তুলে নিল। বাচ্চাটা মায়ের কোল ভেবে চুপ করে রইল। পিকলু তার মায়ের কাছে এসে বলল—'দেখো, মা। কী সুন্দর জাপটে ধরে আছে আমাকে। একে আমরা পুষব। আর ছাড়ব না।'

গদাইয়ের মা সন্ধেবেলা আর একবাটি দুধ দিয়ে গেল। তাদের গাই গোরুটার গত সপ্তাহে বাছুর হয়েছে। বাচ্চাটাকে নিয়ে সেও আদর করতে করতে বলল—'বড়ো বউ, আমি এর নাম রেখে যাচ্ছি রাজা। হনুমান তো দেব্‌তা গো। আমরা তো আগে হনুমানই ছিলাম।'

সেই থেকে বাচ্চাটাকে পাড়ায় সবাই 'রাজা' বলেই ডাকে।

বাচ্চাটাও সবার আদর খেয়ে খেয়ে বেশ ফুটফুটে হয়ে উঠেছে। এ ঘর ও ঘর খেলে বেড়ায়। পিকলু ওর বন্ধু। সারাদিন দুজনে খুনসুটি করে। পিকলু যদি কখনও মায়ের কোলে গিয়ে বসেছে, তো রাজার আর তর সয় না। একলাফ দিয়ে সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। পিকলুকে ওর মা চুমু খেলে রাজার মন খারাপ হয়ে যায়। মা তখন রাজার গালেও চুমু দিয়ে বলে—'তুইও আমার ছেলে।' তখন রাজার সে কী তিড়িং-বিড়িং নাচ।

রাতে রাজা পিকলুর মায়ের কোলেই ঘুমায়। স্নান করানোর সময় সেকী আনন্দ তার। বড়ো গামলায় জল নিয়ে পিকলুর মা যেই বারান্দায় এসে বলে—'রাজা, আয় স্নান করবি।' তখন রাজাকে আর দেখে কে। একবার পিকলুর মায়ের কাঁধে ওঠে, একবার মাথায়—কী না করে সে। বাচ্চা ছেলেরা যেমন জল দেখলে হাত দিয়ে থই থই করতে চায়, রাজাও গামলায় বসে থাবা মারে।

পিকলু ইস্কুলে চলে গেলে রাজার খুব মন খারাপ করে। সে চুপ করে বসে থাকে চৌকির নীচে। খেতেও চায় না। সেদিন তো মহামুশকিলে পড়েছিল পিকলুর মা! পিকলু যখন ব্যাগ কাঁধে ইস্কুলে বেরিয়েছে, রাজাও তার পিছু পিছু একেবারে রাস্তায় চলে এসেছে। সেও যাবে পিকলুর সঙ্গে। ধরতে গেলে দৌড়ে পালায়। কামড়াতে যায়। পিকলুর মা কত আদর করে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। একদিন তো রাস্তার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এসে কামড় দেয় আর কী! ভাগ্যিস রাজা একলাফে কোলে উঠে পড়েছিল।

একদিন দুপুরবেলা রাজাকে চৌকির নীচে দেখতে না পেয়ে পিকলুর মা তো শশব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর যেই ডেকেছে—'রাজা।' অমনি উঠোনের পেয়ারা গাছ থেকে দুটো পেয়ারা নিয়ে রাজা লাফ দিয়ে ঘরে এসে হাজির। রাজা এখন গাছে উঠতে শিখেছে। তবে এই পেয়ারা গাছ ছাড়া অন্য কোথাও যায় না সে। কচি কচি দাঁত দিয়ে কুটকুট করে পেয়ারা খায়। আর একটা করে নিয়ে আসে পিকলুর জন্যে। পিকলু খেলে ওর কী আনন্দ!

দেখতে দেখতে তিনমাস কেটে গেছে। রাজা এখন অনেকটাই স্বাধীন।

ক'দিন ধরেই পিকলুর মা দেখছে একটা মা-হনুমান রোজ একবার করে উঠোনে এসে রাজার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। রাজাও একবার তার দিকে আর একবার পিকলুর মায়ের দিকে তাকায়। ভেবে পায় না কী করবে।

সেদিন সত্যি সত্যি একটা পাকা কলা এনে মা হনুমানটা যেই উঠোনে এসে বসেছে, রাজা একলাফে তার কাছে চলে এল। মা হনুমান তখন কলাটা রাজাকে দিল। রাজা মনের আনন্দে খেতে লাগল। মা হনুমান তার গা শুঁকতে লাগল। খাওয়া হলে রাজা আবার ফিরে এল সেই চৌকির নীচে।

একদিন দুপুরে পিকলুর দুধের কৌটোটা খুঁজে না পেয়ে মা তো নাজেহাল। কালই কেনা হয়েছে। ভর্তি-দুধ আছে। গেলই বা কোথায়! রাজাও বুঝতে পেরেছে মা কী যেন একটা জিনিস খুঁজছে। জানলার ধারেই ছিল কৌটোটা। কেউ আবার হাত বাড়িয়ে নিয়ে গেল না তো! পিকলুর মা এ ঘর সে ঘর খোঁজে। রাজাও তার পিছু পিছু ঘুর ঘুর করে। এমন সময় রাজা দেখল মা হনুমানটা একটা দুধের কৌটো বগলে চেপে উঠোনে এসে বসল। রাজা তড়াক করে এক লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে এল। মা হনুমানের কাছ থেকে দুধের কৌটোটা নিয়েই ফিরে এল ঘরে। রান্নাঘরে পিকলুর মায়ের কাছে কৌটোটা রেখে দিয়ে নাচতে শুরু করল।

রাজা তার পরদিন থেকে আর মা হনুমানের কাছে যায়নি।

ছবি : পলাশকান্তি বিশ্বাস

রূপকথার গল্প

রাজকন্যার বিয়ে

অমর মিত্র

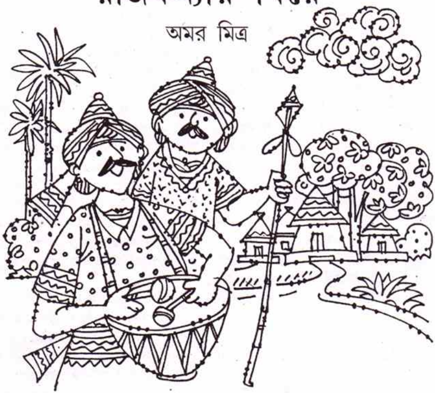

রাজকন্যার বিয়ে। ঢাকিরা খালে বিলে হাটে মাঠে পথে ঘাটে ঢাক বাজিয়ে রাজকন্যার বিয়ে রাজকন্যার বিয়ে—এই ঘোষণা করে ফিরে যাওয়ার পর রাজ্যজুড়ে হইহই লেগেছে। লাগবে না! বিয়ে বলে কথা। তাও আবার রাজকন্যার। রাজবাড়িতে কত বছর বিয়ে হয়নি। শেষ হয়েছিল রাজারানির। তারপর এই রাজকন্যার। ঢাকির সঙ্গে কাঁসিও বেজেছে, কাই না না কাই না না—রাজকন্ না রাজকন্ না, কী লেগেছে কী লেগেছে বিয়ে লেগেছে কাই না না কাই না না—রাজ কন্ না রাজ কন্ না।

এখন যে যাকে বলতে যাচ্ছে কিছু, ওই বিয়ে নিয়েই কথা হচ্ছে। কী বলে গেল রে রাজার ঢাকি—বিয়ের আর ক'দিন বাকি?

এখনো গোনা আরম্ভ করিনি। টিকিবুড়ো বলল।

গুনলেই হয়। ঢ্যাঙা পরামানিক বলল।

হবে, হবে সব হবে, রাজকনিয়ার বিয়ে হবে। বলে পাগলা জগাই হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল, আঙা শুক্কুরবারে বিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে।

কী বলে জগাই? আঙা শুক্কুরবার মানে রাঙা শুক্কুরবার? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলে গেছে ঢাকি। রাঙা শুক্কুরবার এক ত্রিংশ তাং গতে। এর মানে কী? টিকিবুড়ো টিকি নাড়িয়ে বলল, একত্রিশ তারিখ গতে।

তার মানে? মানে তো সোজা বত্রিশ তাং। তাং মানে তারিখ। পরামানিক হেসে হেসে বলল, আমি এক বিয়ের ছাট ভেবে ভেবে বের করেছি, রাজার বাড়ি বিয়ে, চুল না ছেঁটে যেতে পারবে কেউ?

হুঁ, টিকিবুড়ো তার টাকে হাত বুলোতে লাগল। টিকি বাদে মাথার সব চুল মরে গেছে কবে! কী করে যে ওটি রয়ে গেছে তা ঢাকিরাও ঢাক বাজিয়ে বলতে পারবে না।

রাঙা শুক্কুরবারটা কবে হল?

যেদিন একত্রিংশ তাং গত হবে। টিকিবুড়ো হাতের পঞ্জিকা নেড়েচেড়ে বলল, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রোহিণী নক্ষত্র উদিত হবে, কী বুঝলে?

কেউ কিছু বুঝল না। কী করে বুঝবে? আকাশের অত তারা, কোনটার নাম রোহিণী তা কে জানে? এমনিতে টিকিবুড়োর চোখে কত মোটা কাচের চশমা, হাতের বই-ই পড়তে পারে না ঠিকমতো, অত উঁচু আকাশের তারা দ্যাখে কী করে? পরামানিক বলল, সময় পাওয়া যাবে তো, এত লোকের চুল ছাটতে হবে, গোঁফ সাইজ করতে হবে।

তোমার তো ওই, এত লোকের চোগা চাপকান ঘাগরা শাড়ি আমাকে ক্ষারে কেচে মাড় দিতে হবে, তারপর ইস্ত্রি করতে হবে। রাজবাড়ির হুকুম কেউ যেন ময়লা পোশাক, কোঁচকানো পোশাক না পরে যায়। ধোপা বলল কোমরে হাত দিয়ে, একটা বড় দিঘি লাগবে রাজ্যবাসীর ময়লা ধুতি ময়লা জামা কাচতে।

হুঁ। ধোপার বউ খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বলল, এক দিঘি জল লাগবে, এক মণ ক্ষার লাগবে আর এক মাঠ রোদ্দুর লাগবে।

তবে! রাজার মেয়ের বিয়ে বলে কথা। পাগলা জগাই হাটে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ধোপা-ধোপানির কথা শুনে বলল, কত রোদ্দুর লাগবে, আমি সাপলাই দেব। এক গজ বাই এক গজ চারি আনা পয়সা।

এই যা, যা তো। ধোপা বলল, ইস্ত্রি গরম করতে পাঁচ মণ কয়লা লাগবে, ভেবেছ কী, রাজার মেয়ের বিয়ে বলে কথা।

তা বটে। টিকিবুড়ো পণ্ডিত বলল, আমার ধুতি ফতুয়াটা ক্ষারে কেচে একটু শিউলির রঙে ছুপিয়ে দিও, রাজার মেয়ের বিয়েতে কি সাদা পরে যেতে মন চায়?

হুঁ দেব। কিন্তু বল রাঙা শুক্কুরবারটা কবে? ধোপানি জিজ্ঞেস করে আঁচল থেকে চার আনি বের করে পাগলা জগাই-এর হাতে দিতে। চার আনি পেয়েই পাগলা জগাই ছুটে গেল মুড়িমুড়কির দোকানের দিকে। তা দেখে পরামানিক বলল, আমার কাজ ওকে সাফসুতরো করা, চুল দাড়ি কেটে গায়ে সাবাং মাখিয়ে ভালো করে তো নিয়ে যেতে হবে রাজার বাড়ি। টিকিবুড়ো জিজ্ঞেস করে, জগাই-ও নেমতন্ন পেয়েছে?

নেমতন্ন তো সবার, ঢাকের বোল শোননি তুমি? পরামানিক জিজ্ঞেস করে।

না, কানে আঙুল দিয়েছিলাম, অত শব্দ সহ্য হয় না।

পরামানিক বলল, বোল তুলল জগাই যাবে মাধাই যাবে, গদাই যাবে গদাই যাবে, যাববে যাববে সববাই যাবে।

হুঁ, হুঁ বলছিল বটে। টিকিবুড়ো মাথা নাড়ে।

তবে রাঙা শুক্কুরবারের আর কদ্দিন? হালুইকর জিজ্ঞেস করল।

তোমার জেনে কী হবে?

হালুইকর বেঁটেখাটো মানুষ, কিন্তু ঝাঁজরি হাতা খুন্তি কড়াই খুব চেনে। বলল, আমি তো ডাক পেয়েছি।

সে তো সব্বাই পেয়েছে। ধোপা বলল।

উঁহু, এত যে সব নেমতন্নে যাবে, লুচি পুরি তরকারি হালুয়া মণ্ডা মেঠাই মুরগি মাটন কে রাঁধবে।

রাঁধবে কেন কিনে আনবে।

কিনবে কোথা থেকে?

কেন হালুয়ারাম মিঠাইওয়ালার দোকান থেকে।

সে লোকটা কে? হালুইকর জিজ্ঞেস করল।

তা জেনে কী হবে?

হালুইকর লালুরাম বলল, জানতে হবে, সে তো আমি।

পরামানিক, টিকিবুড়ো, ধোপা-ধোপানি আর যারা ছিল সবাই অবাক। এই এতদিন তো তারা জানত না হালুয়ারাম মিঠাইওয়ালা হল হালুইকর লালুরাম। ধোপা জিজ্ঞেস করল, তুমি কী কী রাঁধবে?

বলছি তো কচুরি পুরি ফিস্‌ফ্রাই ফিসপাঞ্জাবি মটনকষা মুর্গিপোড়া গুলাবজামুন আর কাঁচাগোল্লা।

বাহ্ বাহ্! টিকিবুড়ো নিজের মনেই গুনগুন করল।

কিন্তু রাঙা শুক্কুরবারটা কবে? বল, আমাকে তো দুদিন আগে থেকে তৈরি হতে হবে। সকাল থেকে খাওয়া চলবে, রাজার বাড়ি ভোজ, এ তো ডাল আলুভাতে খাওয়া নয়, বুঝলে?

হুঁ। পরামানিক বলল, আমার তো জানা দরকারই, শুধু কি চুলকাটা, মুখে দই শশা রাবড়ি মাখিয়ে তিনঘণ্টা ফেলে রেখে বরফ জলে ধুয়ে গরম জলে মুছে তবে না থামতে

হবে, রাজকন্যার ফেসিয়াল হবে।

কী শিয়াল? টিকি বুড়ো অবাক।

শিয়াল না ফেসিয়াল। পরামানিক গিন্নি বলল, তার নখ কাটতে হবে, হাতে মেহেন্দি লাগাতে হবে, কম কাজ!

টিকিবুড়ো বলল, কাজ কম হবে কেন, আমাকে তো লগ্ন বের করতে হবে, বিয়ের সময় বসে দেখতে হবে ভুল মন্তর বলছে কিনা পুরুতঠাকুর।

কিন্তু কবে? ধোপা জিজ্ঞেস করল।

হুঁ, কবে? বাগানের মালি জিজ্ঞেস করল, তাকে তো ফুল পাঠাতে হবে, মালা পাঠাতে হবে, তার জন্য গাছে ফুল ফোটাতে হবে, তার জন্য গাছ পরিচর্যা করতে হবে। রাঙা শুক্কুরবার কবে?

ধোপানি জিজ্ঞেস করল, তুমি জান না টিকিঠাকুর।

টিকিবুড়োর মানে লাগল, তাই তো! এখন সে কী করে? কবে হবে রাঙা শুক্কুরবার? সে তো ঢাকির বোল শুনেছে শুধু। তার বেশি কিছু না। রাঙা শুক্কুরবার কবে হতে পারে? সে বলল, যে হপ্তায় দুটো শুক্কুরবার পড়বে।

তাই কি কখনো হয়? পরামানিক অবাক।

হয়। কেন হবে না, হওয়ালি হয়। টিকিবুড়ো বলল।

একত্রিংশ গতে? ধোপা জিজ্ঞেস করে।

বত্রিশ তাং। টিকিবুড়ো বলে।

তা কী করে হবে?

হবে, হবে, রাজার মেয়ের বিয়ে, ঠিক হবে। হালুইকর লালুরামের দিকে তাকিয়ে টিকিবুড়ো মাথা দোলাতে লাগল।

লালুরাম জিজ্ঞেস করল, কতদিন বাকি রাঙা শুক্কুরবার বত্রিংশ তাং-এর?

টিকিবুড়ো বলল, যতদিন বাকি বিয়ের?

কতদিন বাকি? বাগানের মালি জিজ্ঞেস করে?

প্রত্যেক দিন ফুল ফোটাও, যেদিন দরকার চেয়ে নেবে।

উহুঁ, গায়ে হলুদ কবে?

যেদিন বিয়ে। টিকিবুড়ো বলল।

কবে বিয়ে?

ওফ্! কত বার শুনবে, রাঙা রাঙা রাঙা...বত্রিংশ ...একত্রিংশ গতে।

বলে টিকিবুড়ো তার পাঁজিপুঁথি নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

পরামানিক, ধোপা-ধোপানি, লালুরাম হালুয়াওয়ালা, বাগানের মালি—সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। ঢাকি তো ঢাক বাজিয়ে খালাস, কাঁসারি কাঁসি বাজাতে বাজাতে কাঁই না না কাঁই না না করতে করতে হাওয়া, এখন নেমতন্নটা কবে তা যদি না জানা যায় ভীষণ

সমস্যা। কবে থেকে চুলছাঁটা হবে, কবে থেকে কাপড় ধোয়া হবে তা ঠিক করবে কে?

কিন্তু রাজ্যজুড়ে হই-হল্লা তো লেগেই গেছে। রাজমিস্ত্রি তার লোকজন নিয়ে হাজির। রাজকন্যার বিয়ে, রাজার বাড়ি রং হবে, যেখানে ফাটাফুটো সব সারাতে হবে। ঘোড়াশালের ঘোড়াদের দানাপানি খাইয়ে তাগড়া করে তুলতে ঘোড়াওয়ালারা তো হাঁটাচলা করতে লাগল। সাত ঘোড়ার রথে করে বর আনতে যাওয়া হবে, সামনে থাকবে সানাইওয়ালা, বাজনদারেরা—সে যে কী হবে! সানাইওয়ালা বাজনদারেরা সানাই বাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে ঘুরেও গেল একবার পথে পথে। তাদের সঙ্গে পাগলা জগাইও হাঁটতে লাগল। তাকে অনুসরণ করতে লাগল পরামানিক তার ক্ষুর কাঁচি নিয়ে। সে ঠিক করে নিয়েছে আগে জগাইকে সাফসুতরো করবে। ভিনদেশের রাজপুত্তুর বিয়ে করতে আসবে, এসে যদি পথে দ্যাখে ধুলো ময়লায় ভরা মস্ত চুল, মস্ত দাড়ি নিয়ে জগাই ঘুরছে, রাগ করে ফিরে না যায়। কুটুম বলে কথা। রাজার কুটুম মানে সবার কুটুম। পরামানিক ধোপা-ধোপানির মান থাকবে তখন? পরামানিক চুল ছেঁটে নখ কেটে দিলেই জগাইকে ক্ষারে কাচা জামাকাপড় পরিয়ে দেবে ধোপা-ধোপানি।

রাজ্যের লোক সব মুখিয়ে আছে রাঙা শুক্কুরবারের জন্য। তারা টিকিবুড়োর কাছে গিয়ে বসে থেকে ঠিকঠাক খবর না পেয়ে শেষে টিভি খুলে বসে থাকল বাড়ি গিয়ে। টিভিতে তো খবর দেবে। না দিলে হবে কী করে? কিন্তু টিভির লোকও জানে ওই কথা। রাঙা শুক্কুরবার বত্রিংশ তাং কবে হবে তা নিয়ে তারা নানা আসর বসাল। কিন্তু কেউ কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে পরের দিন হবে বলে আসর ছেড়ে সরে গেল।

এদিকে দিন এগিয়ে আসতে লাগল। ঢাকিরা আর এক প্রস্থ ঢাক বাজিয়ে গেল। তাদের কাছেও জানা গেল না কিছু। রাজার বাড়ি মেয়ের বিয়ে—মেয়ের বিয়ে বলে ঢাক বাজিয়ে চলে গেল তারা। তাদের সঙ্গে হাততালি দিয়ে ঘুরতে লাগল পাগলা জগাই।

এসে গেল প্রায়। রাজার বাড়ি রং হতে লাগল। পরামানিক আর ধোপা-ধোপানি কী করবে কী করবে না ভেবে উঠে কুলকিনারা খুঁজে পায় না। ইস! কী যে হবে? তখন একদিন সক্কাল বেলায়, পাগলা জগাই এসে পরামানিকের বাড়ির দরজা ধাক্কা দিল। ধোপা-ধোপানির ঘরের সামনে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল, বর আসবে এক্ষুনি নিয়ে যাবে তক্ষুনি!

কী হল রে জগাই, কবে বিয়ে? ধোপানি এসে জিজ্ঞেস করল।

আঙা শুক্কুরবার। আঙা গো আঙা।

সে কবে রে কবে হবে?

একত্রিংশ গতে।

সেই বা কবে?

হিহি করে হাসল জগাই। বলল, একত্রিংশ গতে কী হয়?

পরামানিক বলে, বত্রিংশ মানে বত্রিশ। পরামানিক বলল।

ধুর! তুমি আর টিকিবুড়ো যেমন ভাইপো তেমন খুড়ো।

তুই জানিস তো তুই বল।

জগাই বলল, পরের শুক্কুরবার রাঙা, ক্যালেন্ডার দ্যাখো।

তাই নাকি? তাই তো! ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে রাজার বাড়ি থেকে ঘরে ঘরে দেওয়া হয়েছে। তাতে ১লা আষাঢ় শুক্কুরবার রাঙানো রয়েছে ছুটির দিন বলে, যেমন থাকে সব রোববার সব ছুটির দিন।

পাগলা জগাই নাচতে নাচতে বলল, রাঙা শুক্কুরবারে সবার ছুটি, সবাই যাবে রাজার বাড়ি। সে দিন হল একত্রিংশ গতে ১লা আষাঢ়।

তাই তো! ধোপা-ধোপানি থেকে হালুইকর লালুরাম, বাগানের মালি, বাজনদার সবাই অবাক। সোজা কথাটা বোঝেনি কেউ! ইস্! কী লজ্জা কী লজ্জা!

তারপর! তার আর পর কী? পাগলা জগাই চুল কেটে দাড়ি কেটে নখ কেটে সাবং মেখে সিনান করে হলুদ রঙে ছোপানো জামা পরে চলল রাজার বাড়ি। হালুইকর গুলাবজামুন আর কাঁচাগোল্লা সন্দেশ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সে আসবে। আর হ্যাঁ, রাজকন্যাও। এই ধাঁধার জবাব যে দেবে তার গলাতেই যে মালা দেবে রাজকন্যা, তেমনই তো কথা ছিল রাজার বাড়িতে।

ছবি : শংকর বসাক

ভূতের গল্প

সেই অলৌকিক ট্রেনযাত্রা ও ছোটদাদু

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

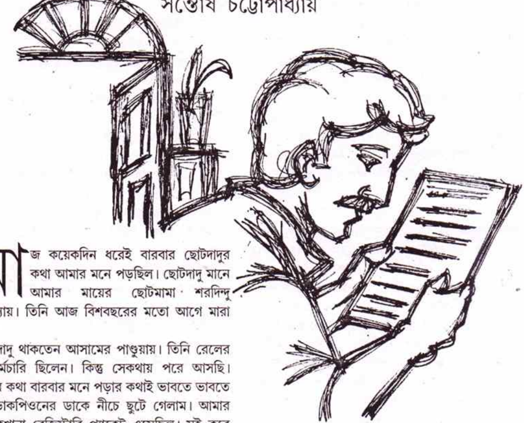

আজ কয়েকদিন ধরেই বারবার ছোটদাদুর কথা আমার মনে পড়ছিল। ছোটদাদু মানে আমার মায়ের ছোটমামা শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি আজ বিশবছরের মতো আগে মারা গেছেন।

ছোটদাদু থাকতেন আসামের পাণ্ডুয়ায়। তিনি রেলের বড়ো কর্মচারি ছিলেন। কিন্তু সেকথায় পরে আসছি। ছোটদাদুর কথা বারবার মনে পড়ার কথাই ভাবতে ভাবতে হঠাৎই ডাকপিওনের ডাকে নীচে ছুটে গেলাম। আমার নামে একখানা রেজিস্টারি প্যাকেট এসেছিল। সই করে প্যাকেটটা নিয়েই দেখলাম সেটা এসেছে গৌহাটি থেকে। প্যাকেটটা মোটা খাতার মতো আর সেটা আমাকে পাঠিয়েছে আমারই মামাতো ভাই ছোটদাদুর ছেলে সমরেশ।

টেলিপ্যাথি সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না। যতদূর জানি কোনও ব্যাপার নিয়ে ভাবনার মাঝখানে সেটা অনেক সময় বাস্তবে সত্যি হয়ে ওঠে। কদিন ধরে যে ছোটদাদুর কথা ভাবছিলাম আর তারপরেই তার ছেলের পাঠানো রেজিস্টার্ড প্যাকেট এসে পৌঁছল এটাই আমাকে নিদারুণ আশ্চর্য করে দিয়েছে তাতে সন্দেহ ছিল না।

তাড়াতাড়ি প্যাকেটটা খুলতেই পেলাম একখানা চিঠি আর একটা ডায়রী। চিঠিটা খুলতেই ছোটদাদুর কথাটা আরও বেশি করে আমাকে উতলা করে তুলল। সমরেশ যা লিখেছিল তা এই রকম :

প্রিয় সন্তু,

অনেক দিন হয় তোদের কোনও চিঠি পাইনি। আমারও কলকাতা যাওয়া হয়ে ওঠেনি। যেমনই হোক সকলে ভালো আছিস নিশ্চয়ই। চিঠির সঙ্গে বাবার একটা ডায়েরী পাঠালাম। বাবার জীবনে কত কিছু যে ঘটেছিল সে সব

তো তোর জানা আছে। এই ডায়েরীটা বাবা তোকে দেবার কথা আমাকে বলেছিলেন কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এটার খোঁজ আগে পাইনি। একটা পুরনো সুটকেশ ঘাঁটতে গিয়ে হাতে পেয়েছি। তোকে ডায়েরীটা পাঠালাম এটা পড়ে কোনওভাবে প্রকাশ করা যায় কিনা তুই একটু ভেবে ব্যবস্থা করিস। আশ্চর্য এই কাহিনি—অলৌকিক, সহজে বিশ্বাস করা শক্ত। তবে বাবার অ্যাডভেঞ্চারে ভরা জীবনের এও এক উদাহরণ তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তোর চিঠির আশায় রইলাম।-ভালোবাসা নিস,

ইতি—

তোর সমরেশদা।

চিঠিটা পড়ে অবাক হইনি কারণ ছোটদাদুর জীবনে আশ্চর্য সব ঘটনা বারবার ঘটেছে। ছোটদাদুর মুখে সে সব কাহিনি শুনে আশ্চর্য হয়েছি আমরা।

এবার ছোটদাদুর কথা একটু বলা দরকার।

ছোটদাদু ছিলেন চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী। দুর্জয় সাহসী আর অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। ভয়ডর যেমন ছিল না তার তেমনই ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা। সবারই প্রিয় ছিলেন তিনি। চমৎকার হকি খেলতেন। বেটন কাপেও আসামের হয়ে খেলেছেন।

এ কাহিনি ছোটদাদুর জীবন কাহিনিরই অংশ। তাই আসল কাহিনি প্রকাশের আগে ছোটদাদুর সম্পর্কে সামান্য আরও কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ছোটদাদু প্রথমে রেলের ইঞ্জিন ড্রাইভার হয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ তখন, মানে, স্বাধীনতালাভের কয়েকবছর আগে আসাম মেলের ড্রাইভারের চাকরি পাওয়া বেশ কঠিনই ছিল। তখন এ চাকরি বাঁধা ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের। গার্ডের চাকরিও তাই বাঙালি ছেলেরা বড়ো একটা সুযোগ পেত না। ছোটদাদুর চমৎকার স্বাস্থ্য আর সাহস তাকে সুযোগ দিয়েছিল।

ছোটদাদু আসাম মেলের ড্রাইভার হিসেবে সারা আসাম চষে বেড়িয়েছিলেন। নানা আশ্চর্যজনক ঘটনা তার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে গিয়েছিল।

আসাম মেল ছিল সেই আমলের বিখ্যাত ট্রেন। তখন বাংলাদেশের জন্ম হয়নি। আসাম মেল চলত অবিভক্ত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। বিখ্যাত স্টেশন ছিল এই লাইনের পার্বতীপুর জংশন আর রংপুর। এছাড়া আসাম গৌহাটি, ডেমপুর আর ডিব্রুগড়। পদ্মানদীর বুকে ঈশ্বরদীর কাছে ছিল সারা সেতু।

ছোটদাদু শিকারেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন আর একবার বাঘও মেরেছিলেন। যেমনই হোক ছোটদাদুকে নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ ছিল না। অনেক গল্পই তার কাছে শুনেছিলাম।

এবার তার পাঠানো ডায়েরির কথায় আসা দরকার। ডায়েরিটা আগা গোড়া পড়তে দেরি করিনি। এ এক আশ্চর্য কাহিনি। ছোটদাদুর জীবনেরই কাহিনি।

এখানে ছোটদাদুর জবানীতেই কাহিনিটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম।

"ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে আর পড়ার ইচ্ছে ছিল না। দেশে চলেছিল জোরদার স্বাধীনতার লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও তখন প্রচণ্ড উত্তাপ।

বাবা বললেন একদিন : কিরে বিণু, চাকরি করতে ইচ্ছে আছে?'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। চাকরি!

'হ্যাঁ, রেলে চাকরি। আসাম মেলের ড্রাইভার। ইচ্ছে থাকলে এখনই আমার সঙ্গে সাহেবের কাছে চল।'

কি জানি কেন বাবার উৎসাহ দেখে আমিও রাজি হয়ে গেলাম।

বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন আসাম মেলের গার্ড জনস্টন সাহেবের কাছে। বাবাও রেলে চাকরি করতেন, সাহেবের সঙ্গে তার খুবই হৃদ্যতা।

জনসন সাহেব নাম হলেও তিনি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। আমাকে দেখে সাদরে হাতধরে ঝাঁকুনি দিলেন, 'হ্যাল্লো ইয়ংম্যান, ড্রাইভারের চাকরি পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই পারবো স্যার', বললাম।

সাহেব একজনকে ডেকে বললেন, 'গোমেজকে ডেকে আনো শিগ্গিরই।'

সে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখে চমকে গেলাম। প্রায় ছ'ফিট লম্বা বিশাল দেহী একজন মানুষ গায়ের রঙ প্রায় বাদামী। মুখে হাসি।

'গোমেজ, লুক অ্যাট দা ইয়ংম্যান,' সাহেব বললেন আমাকে দেখিয়ে। 'আজ থেকে এ হবে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। চলবে?'

গোমেজ হাসল, 'ইয়েস স্যার, গুড হেলথ।'

সেই শুরু। গোমেজ আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরে এল।

গোমেজকে দারুণ পছন্দ হয়ে গেল আমার। গোমেজও আমাকে স্নেহের চোখেই দেখা শুরু করেছিল। কাজটা দারুন খাটুনির। এ আজকালকার ইঞ্জিন নয়। কয়লার ইঞ্জিন। দারুন উত্তাপ ইঞ্জিনে।

কথায় কথায় জেনেছিলাম গোমেজ একজন গোয়ানিজ। তার একমাত্র নেশা মদ খাওয়া।

ক্রমে ক্রমে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। গোমেজের জীবনের নানা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা ক্রমে জানতে পেরেছিলাম। সে দুরন্ত সাহসী, কোন কিছুতেই তার কোন ভয় ছিল না। ইঞ্জিন যেন তার স্পর্শে নতুন জীবন লাভ করত। দুরন্ত গতিতেই সেই ইঞ্জিন বিরাট মেল ট্রেন টেনে নিত। রেল কর্তৃপক্ষের কাছে গোমেজ ছিল অত্যন্ত প্রিয়।

কিন্তু মানুষ কত তুচ্ছ তা টের পেলাম আচমকাই। গোমেজ হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল একদিন ট্রেন চালানোর সময়েই।

রেল কর্তৃপক্ষ অসহায় বোধ করতে শুরু করলেন। গোমেজের অভাব পূরণ হওয়ার নয়। আমারও ক্ষতি অপূরণীয়। মনটা ভেঙে গেল সকলেরই।

ক্রমে শোকের ধাক্কা সকলেই সামনে নিলাম। আশ্চর্য ঘঠনা হল গোমেজের জায়গায় আমাকেই বেছে নেয়া হল হেড ড্রাইভার হিসেবে।

এরপর এল একরাত। বেশ বৃষ্টি পড়ছিল। রাত প্রায় নটা। ট্রেন তেজপুরের দিকে ছুটে চলেছে। আমার সঙ্গে ইঞ্জিনে ছিল দুজন খালাসি আর ড্রাইভার। আমি ও অন্য একজন।

যে খালাসি কয়লা দিচ্ছিল সে হঠাৎ বলে উঠলে : স্যার, সামনে আর লাইন নেই!'

'সেকি!' চিৎকার করে সামনের দিকে তাকালাম। 'সত্যিই তাই হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখলাম কিছুটা দূরেই আর লাইনের চিহ্ন নেই! ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা অনিবার্য!

'সর্বনাশ কি হবে?' চিৎকার করে উঠতেই একজন বিরাট দেহী মানুষ আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ছিটকে দিয়ে চালকের দায়িত্ব নিতে চাইল।

'কে? কে?' আর্তনাদ করে উঠলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতেই আমার সঙ্গী ড্রাইভার বলল, 'স্যর তেজপুরে পৌঁছে গেছি।'

'তেজপুর?' বলে উঠে বসলাম। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব হল? লাইন তো সম্পূর্ণ অদৃশ্য ছিল। আর ওই বিশালদেহী মানুষটাই বা এল কোথা থেকে আর সে গেলই বা কোথায়?

তখনই বিদ্যুৎ চমকে মনে পড়ল লোকটা কি গোমেজ? নিশ্চয়ই তাই। ওই চেহারা তারই।

কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? গোমেজ তো মৃত।

তবে কি বিদেহী গোমেজ তার কর্তব্যরক্ষা করার জন্যই ট্রেনটিকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছে? বাঁচিয়েছে কয়েক'শ ট্রেন যাত্রীকে শূন্যে ট্রেন চালিয়ে?

কে দেবে একথার উত্তর।

এতবছর পরেও সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার স্বচ্ছতা এতটুকু ম্লান হয়নি।"

ছোটদাদুর কাহিনি এখানেই শেষ।

ছবি : শঙ্কর বসাক।

www.banglabooks.in

বিচিত্র গল্প

আজব খবর

বরুণ মজুমদার

বোতলবন্দী ভূত

ভূতের অনেক গল্পের কথা আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি। এইসব ভূতের কীর্তিকলাপের কাহিনি শুনে আমরা অনেক সময় ভয়ে জড়সড় হয়ে যাই। গা ছমছম করে। বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে ঘন অন্ধকারে ভূতেরা ঘুরে বেড়ায় পোড়ো বাড়িতে, শ্মশানে, কবরখানায়—এসব তো নতুন কথা নয়। বাস্তবে ভূত বলে কিছু আছে কিনা তা নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে। এই ভূতকে বোতলে বন্দী করে রাখার কথা শুনলে অনেকে নড়ে চড়ে বসবে। ভাববে এ আবার কেমন কথা। ভূতকে বোতলবন্দী করা যায় নাকি?

হ্যাঁ বোতলবন্দী ভূত! আবার এই বোতলে ভর্তি ভূত বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ভাবছো, এ আবার কেমন কথা?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় এই বোতলবন্দী ভূত নিয়ে রীতিমত ব্যবসা জুড়ে দিয়েছেন জন ডিজ নামে এক সাহসী ব্যক্তি। তিনি বোতলে ভূত ভরে তা বিক্রি করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের পেশাদারি ভূত ধরার লোকেদের সঙ্গে তার রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ওঝারা ভূত তাড়ায় আর ভূত ধরিয়েরা নানা জায়গা থেকে ভূত ধরে থাকে। ভূতুড়ে বাড়ি, কবরখানা, ভূতুড়ে অর্থাৎ ভূতের উপস্থিতি সম্পন্ন হোটেল জাহাজ প্রভৃতি থেকে ভূতগুলোকে ধরে তারা এক একটা কাঁচের বোতলে তাদের পুরে ফেলে। ভূত তার ভেতর থেকে যাতে পালাতে না পারে তার জন্য বোতলের মুখ মোম দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। ব্যাস ভূত এবার বোতলবন্দী। এসব কাজ কেমন করে করা হয় তার রহস্য ওই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক জানাতে চাননি। তাঁর সাফ কথা এটা আমাদের গোপন ব্যাপার, ব্যবসার খাতিরে এটা জানানো যাবে না।

ভূত ভর্তি বোতল কেউ কিনে এনে বাড়িতে খুললে কি হয়? যে খুলবে তার কোনও ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় না অর্থাৎ ভূত তাঁর ঘাড়ে চেপে বসে না। তবে নানা বিচিত্র ঘটনা ঘটতে পারে। বাড়ির চাবি হারিয়ে যায়, টেলিফোন হঠাৎ হঠাৎ বেজে ওঠে কিন্তু ধরলে অন্য প্রান্ত থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। ফ্রিজের দরজা হঠাৎ হঠাৎ খুলে যায়। সেখান থেকে খাবার উধাও, বাথরুম থেকে আসে গুমোট গন্ধ অথচ কেউ বাথরুমে ঢুকে থাকে না।

চামড়া দিয়ে শোনা

মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, চামড়া দিয়ে স্পর্শ করে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ যে চোখ দিয়ে শুনতে পারে এমন ঘটনার কথা বললে অনেকে হয়ত নড়েচড়ে বসবেন। তবে বিজ্ঞানীরা কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই এমন কথা বলে আসছেন। কেউ কানে কিছু শুনতে না পেলেও মুখ ও মুখমণ্ডলের পেশি নাড়াচাড়া দেখে তাঁরা কোনও বক্তৃতা বা ভাষণ বুঝতে পারেন। ১৯৭৬ সালে এই যুগান্তকারী সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এই গবেষণার সূত্র ধরে ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী স্পর্শবোধ ও শব্দের মধ্যে সমীক্ষা চালাচ্ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচার'-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে তাঁরা জানিয়েছেন যে, উচ্চারিত শব্দ চামড়ায় যে অনুভূতি সৃষ্টি করে তা বাক্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এক

একটি শব্দ উচ্চারণের সময় যে নির্দিষ্ট শ্বাসবায়ু বের হয় তা যদি চামড়ার ওপর ফেলা যায় তা হলে দৃষ্টিহীন, মূক-বধিররাও বুঝতে পারেন, কোন্ শব্দ বলা হচ্ছে। বাবা বললে শব্দের যে চাপ আর মা বললে শব্দের যে চাপ তা অনায়াসেই একটি নতুন প্রযুক্তি দিয়ে আলাদা করে অনুভব করা যায়। এ জন্যই এখন বলা হচ্ছে যে, আপনি আপনার চোখ বা চামড়া দিয়েও শুনতে পারেন।

এবার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে এক আশ্চর্য ঘটনার কথা জানাচ্ছি। দৃষ্টিশক্তি হারাবার ৩০ বছর পর সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন স্টেটফোর্ডের পিটার ডেথ।.৫৮ বছর বয়েসী পিটার ৩০ বছর আগে এক দুরারোগ্য জিন ঘটিত রোগে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। লন্ডনের একটি হাসপাতালে সম্প্রতি তাঁর অক্ষিকোটরে জৈব চক্ষু প্রতিস্থাপন করার পর তিনি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন। একটি মার্কিন কোম্পানি এই জৈব চক্ষু, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় বায়োনিক আই তা তৈরি করেছে। বলতে পারা যায় ওই কোম্পানিটি এই জৈব চক্ষু উদ্ভাবন করেছে।

কান দিয়ে দেখা

মানুষ সাধারণ চোখ দিয়ে কোনও জিনিস দেখে থাকে। কিন্তু কান দিয়ে দেখার কথা বললে অনেকে অবাক হবেন। সাত বছর বয়েসী একটি ছেলে সত্যিই কানে শব্দ শুনেই কোনও জিনিস দেখতে পারে। মানে তার অনুভূতি শক্তি এতটাই বেশি যে, সে শব্দ শুনে বলে দিতে পারছে একটা জিনিস কতটা কাছে বা দূরে আছে। দৃষ্টিহীন এই বালকটির নাম লুকান মারি। সে ব্রিটেনের প্রথম বালক যে, প্রতিধ্বনির মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক জিনিসের উপস্থিতি দেখতে পায়। মানে একেবারে ঠিকমতো বুঝতে পারে।

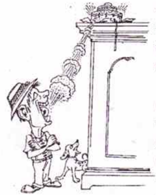

ছেলেটি তার মুখের ভেতরে টাকরায় জিভের আগা ঠেকিয়ে একটা প্রতিধ্বনির মাধ্যমে কোনও জিনিস কোথায় রাখা আছে তা বলে দিতে পারে অনায়াসে। এ ব্যাপারে তার কোনও ভুল হয় না। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'বাদুড় বালক'।

প্রতিধ্বনি প্রযুক্তিটা আসলে ঠিক বাদুড় ও ডলফিনদের মতো। বাদুড় ও ডলফিনরা প্রতিধ্বনির মাধ্যমে কোনও কিছু বোঝে। ছেলেটি মুখ দিয়ে শব্দ করে তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে কতটা সময় নেয় তা বুঝেই একটি জিনিস কতটা দূর আছে জানতে পারে।

ছেলেটিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এরকমভাবে তৈরি করেছেন ৪১ বছর বয়স্ক দৃষ্টিহীন ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষক ড্যানিয়েল কিশ। তিনি দৃষ্টিহীনদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন। সেখানেই সাত বছরের এই ছেলেটি তালিম নিয়েছে।

মারির পিতামাতা সারা ও ইয়ান থাকেন দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলন্ডে। একদিন টিভিতে প্রশিক্ষক ড্যানিয়েলের অনুষ্ঠান দেখে ছেলে নিয়ে তাঁর কাছে যান। তারপর তাঁরই কাছে ছেলেকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান। ছেলেটি এখন কারো সাহায্য ছাড়াই একা একা চলাফেরা করতে পারে এবং নিজের সব কাজও করতে পারে। ইচ্ছা থাকলে যে অনেক কিছু করা যায় লুকান তার প্রমাণ।

দাঁত দিয়ে চোখের দৃষ্টি

মানুষের জীবনে দাঁতের ভূমিকা যে কত বড়ো তা কাউকে বলে বোঝাতে হয় না। দাঁত দিয়ে মানুষকে চেনা যায় আর সুন্দর দাঁতের হাসি মানুষকে কত আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে তার কথা তো সকলেরই জানা।

এই বিচিত্র দাঁত নিয়ে এবার যে ঘটনার কথা জানাচ্ছি তা সত্যিই অবাক করা কাণ্ড। দাঁত দিয়ে মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফেরানোর ঘটনা সত্যিই অভিনব। মিসিসিপির শ্যারন ফর্টন দু হাজার সালে স্টিভেন জনসন নামে এক বিরলরোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁর চোখে নিজেরই একটা দাঁত বসানো হল।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, চোখে দাঁত বসিয়ে কি হবে? চোখ

বন্ধ করে একগাল হাসলেই কি সকলকে দেখতে পাওয়া যাবে? না, আদৌ তা নয়। তবে চোখের মধ্যে দাঁতটি এমনভাবে বসানো হয়েছে যাতে সেই দাঁত চোখের লেন্সকে ধরে রাখতে পারে। আর এভাবেই লেন্সের মাধ্যমে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের অস্ত্রোপচার এই প্রথম।

কথায় বলে, দাঁত থাকতে লোকে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। তবে দাঁত যে এভাবে কারো চোখ খুলে দিতে পারে এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করলো। অনেকেই এই ঘটনায় রীতিমতো হতবাক!

মেয়েদের পা বড়ো হচ্ছে

মেয়েদের পা বড়ো হচ্ছে এটা এখন সত্যিই একটা খবর। গত পাঁচ বছরে ব্রিটেনে মেয়েদের পায়ের আয়তন বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে। আগে যেখানে মেয়েদের জুতোর মাপ ছিল গড়পড়তা পাঁচ নম্বর এখন তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে গড়পড়তা ছ নম্বরে অর্থাৎ এক নম্বর বেড়ে গেছে।

মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে মেয়েদের এই পা বড়ো হবার অন্যতম কারণ হল তাঁরা ক্রমশ স্থূলকায় হয়ে যাচ্ছে। চলতি ভাষায় বলা যায় তাঁরা ক্রমশ বেশি মোটা হয়ে যাচ্ছেন। তাই পায়ের আয়তনও, বিশেষ করে পায়ের পাতার আয়তন বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করে জানিয়েছেন যে, পিজার মত অনেক ঘন ও সুস্বাদু খাবার খেয়ে তাঁরা মুটিয়ে যাচ্ছেন। এইসব খাবার তাঁদের বিকাশশীল হর্মোনগুলিকে উজ্জীবিত করছে। ফলে দেহের ওজন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ডেবেনহামে এক গবেষণার ফলাফলে জানা গেছে যে, ২০০৯ সালে ব্রিটেনে মেয়েদের পায়ের জুতোর নয় সাইজের বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে ২৩ শতাংশ। ৬ সাইজের জুতোর বিক্রি বেড়েছে ১৭ শতাংশ। এই গবেষণায় আরো জানা গেছে যে লীড্‌সের মেয়েদের পা সবচেয়ে বড়। তার পরে স্থানগুলিতে রয়েছে যথাক্রমে লন্ডন ও কার্ডিফের মেয়েদের পা।

ডেবেনহামের এক বিভাগীয় বিপনীর মালিক এডওয়াটসন জানিয়েছেন যে, মেয়েদের জন্য বড়ো সাইজের পাদুকা, বিশেষ করে উঁচু হিলওয়ালা পাদুকা এখন খুব মজবুতভাবে তৈরি করতে হচ্ছে। জুতো পরে আরামের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা একটু শক্তপোক্ত ও ভালো ডিজাইন চাইছেন। আগেকার জুতোর ডিজাইন পা বড়ো হওয়া মহিলারা আর পছন্দ করছেন না।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আধুনিক মহিলারাই নন পুরুষরাও সাধারণভাবে লম্বা ও মোটা হচ্ছেন খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার ধরন পাল্টে ফেলে। এক সময়ে ৬ বা ৭ নম্বর সাইজের পাদুকা ছিল বেশি। কিন্তু এখন সে জায়গায় উঠে এসেছে ৯, ১০ এবং ১১ নম্বর সাইজের পাদুকা। ব্রিটেনের জাতীয় সমীক্ষায় জানানো হয়েছে যে মহিলারা এখন বেশি লম্বা ও মোটা হচ্ছেন। ফলে তাদের পাদুকার মাপও পরিবর্তন হয়েছে।

ব্যর্থ চোরের আত্মসমর্পণ

চুরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে এক চোর শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে এক অভিনব কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাকে নিয়ে এখন রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে।

একদিনে একবার নয় দুবার নয়, চার চার বার চুরি করতে গিয়ে অভিনব এই চোর পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। জার্মানির রুর এর ঘটনা। র‍্যাম্প রটনবার্গ নামে বছর চব্বিশের যুবকটি প্রথমে দুটি হোটেলে ঢুকে চুরির চেষ্টা করে। সতর্ক ঘণ্টা বেজে ওঠায় উপায়ন্তর না দেখে তাকে পালাতে হয়। এরপর একটি শপিং মল-এ ঢুকে চুরির চেষ্টা করে কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। শেষে স্থানীয় পুরদপ্তরেও তার চুরির চেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। বারবার ব্যর্থ হয়ে চোর রটনবার্গ রীতিমত মনে কষ্ট পায়। শেষে নিজের ওপরই বিতৃষ্ণ হয়ে সে পুলিশের হাতে নিজে থেকেই ধরা দেয়। পুলিশকে সে জানিয়েছে যে, তাকে দিয়ে আর চুরি হবে না। সে পেশা পাল্টাতে চায়। ওই যে কথায় বলে না, চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা। সে যে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়বে তা নিজেই ভেবে নিয়েছে। পুলিশের কাছে তার স্বীকারোক্তি চুরির কাজে সে আর যাবে না, এখন সে তার পেশা পাল্টাতে চায়।

এবার সত্যিই হয়ত পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে অন্য কোনও পেশা বেছে নেবে। চোরের এমন দুর্ভাগ্য খুব কমই হয়ে থাকে।

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

নানারঙের গল্প

বদ্রি পাখি

সুনির্মল চক্রবর্তী

শিশু সাহিত্যিক ব্রজ কিশোর ভট্টাচার্যকে আজকাল দেখা যাচ্ছে সন্তোষপুরের এক ফ্ল্যাটে। এটা আসলে তার বোনের বাড়ি। বোন তার ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে গেছে দার্জিলিং। যা গরম পড়েছে কলকাতায়। কিছুদিন অন্তত বেড়িয়ে আসতে তো মানা নেই। যাবার আগে দাদাকে বলে গেছেন আমার ফ্ল্যাটে থাকিস। কেউ তোকে ডিসটার্ব করবে না।

ব্রজ কিশোর তা—ই চাইছিলেন। তার ছোট ঘরে একটা ছোট চেয়ার আর একটা টেবিল। সেখানে মাথা গুঁজে তাকে লিখতে হয়। পাশেই একটা খাটে বসে মেয়ে সায়নী তার পড়া করে। খুবই অসুবিধে হয় বাবা মেয়ের। ছোট্ট এক চিলতে ঘরের এক কোণায় তার বউ আবার মিনি রান্নাঘর বানিয়ে ফেলেছে। সেখানে বসেই বটিতে কাটছে আলু, পটল। লিখতে বসে তার শব্দও ব্রজকিশোরকে শুনতে হয়। ভালো লেখা তিনি লিখবেন কী করে! বোন এই সময়টা সত্যিই তার জন্য একটা উপকার করেছে। এবার গরমটাও শেষ হচ্ছে না। আজ জুনের কুড়ি তারিখ। অথচ বৃষ্টি কোথায়? আবহাওয়া দপ্তর বলেছে মৌসুমী বায়ু এসে থমকে দাঁড়িয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলে। নিম্নচাপ না এলে সে পশ্চিমবঙ্গ ঢুকবেই না। তার মানে বৃষ্টি শুরু হতে এখনও আরো দশদিন। এসবের চাইতেই এখন মস্ত বিপদ ব্রজ কিশোরের সামনে। তা হলে পনের জুলাইয়ের মধ্যে তাকে পুজোর যাবতীয় লেখা শেষ করতেই হবে। এক দিকে তাকে যেমন বেশ কিছু নামকরা পত্রিকার জন্য গল্প লিখতে হবে, তেমনি বেশ কিছু পত্রিকার জন্য ছড়া কবিতাও লিখতে হবে। এমনকী বড়দের কিছু পত্রিকা থেকেও এবারে তাকে কবিতা লিখতে বলেছে। সকলকেই তিনি বলেছেন ১৫ জুলাই।

একটা সরকারি অফিসে কাজ করেন তিনি। লেখালেখির জন্য এরই মধ্যে চারদিন সি. এল নিয়েছেন। ঠিক করেছেন এরপর সাত দিন এইচ. পি. এল মানে হাফ পে লিভ নেবেন। ছুটি না নিলে জমিয়ে লেখাটা হবে কি করে। আজকাল তার দৈনন্দিন রুটিন মোটামুটি এইরকম ঃ

সকালে নিজের বাড়ি থেকে চা বিস্কুট খেয়ে তিনি চলে আসছেন বোনের ফ্ল্যাটে। সেখানে দুপুর ১টা অবধি লেখালেখি করছেন। তারপর বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর চা খেয়ে ছাতা মাথায় চলে আসছেন ফ্ল্যাটে। একটা ফ্লাস্কে করে চা আনতেও ভুলছেন না। ফ্ল্যাটে বসে রাত এগারোটা অবধি লিখছেন। তারপর বাড়ি ফিরে বউ মেয়ের সঙ্গে কথা বলে রাতে ঘুমোতে যাচ্ছেন।

প্রথম দু'দিন লেখালেখি করলেও

একটা লেখাও জমল না বলে তার মনে হল। তৃতীয়দিন ফ্ল্যাটে এসেই ব্রজকিশোর হাতে হাতে কাজের ফল পেলেন। একদিনে তিনি তিন তিনটে গল্প লিখে ফেললেন। একদম মৌলিক। এতদিন তাকে নিয়ে বন্ধুরা কটূক্তি করত—আরে ব্রজবাবুর লেখা মানে তো সেই লোককথা আর বস্তাপচা রূপকথা এ ছাড়া কোনদিন কি লিখেছেন তিনি?—এ বছর তিনি তাদের দেখাবেন ইচ্ছে করলে ব্রজকিশোর অনায়াসেই মৌলিক লেখা লিখতে পারেন। আরে লেখার কী শেষ আছে? যাকে লিখতে হবে তাকে তো সব কিছুই লিখতে হবে। একটা বিষয়ে থেমে থাকলে চলবে?

চতুর্থ দিনও খারাপ গেল না। দুটো গল্প, তা বেশ বড়ো, লিখে ফেললেন। গল্প দুটো লিখে তার মনে একটা অহংকারও হল। অনেকদিন পর সত্যিই তিনি এইরকম গল্প লিখতে পারলেন। এই তো কিছুদিন আগে 'জল তরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক বন্ধন নাথ তাকে বেশ শুনিয়েই বললেন, ব্রজদা সেই যে 'পলাশপুরে ময়না' লিখেছেন তারপর আর তেমন গদ্য লিখছেন কোথায়'—সত্যিই কি? তিনি কি আর তেমন লেখা লিখতে পারছেন না? না কি যা লিখছেন তা গিয়ে পৌঁছোচ্ছে না এই বন্ধন বাবুদের হাতে? যেমন তিনি ছড়ায় 'রামায়ণ' লিখেছেন, দেশ বিদেশের লোককথাকে পাতায় পাতায় সাজাচ্ছেন, তা কি লেখা নয়? ছোটদের কি তা ভালো লাগছে না? না কি সম্পাদকদের এমন বলতেই হয়? ব্রজকিশোর সেদিন তাকে কিছু বলতে পারেননি তবু মনে মনে কষ্ট পেয়েছিলেন বৈ কি? এত বছর ধরে ছোটদের জন্য লিখছেন। ছোটদের ভালোমন্দ তিনি যে কম বোঝেন না, তা অনেকেই জানে। তবু তাকে অনেক সময়ে কথা শুনতে হয়। কারণ তিনি যে লেখক! তারপরে আবার শিশু সাহিত্যিক!

বোনের এই ৯৪০ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটটা বেশ ছিমছাম। বোন ওর ইচ্ছে অনুযায়ী ঘর সাজিয়েছে। ঘরের মধ্যেই টবে রয়েছে ফুলের গাছ। কাচের আলমারিগুলি পুতুলে ভরে আছে। মাটির জগন্নাথ সুভদ্রা। মাটির আপেল, কমলালেবু...। একটা তাকে রবীন্দ্রনাথের বই সারে সারে সাজানো। ড্রয়িং রুমের মেঝেয় কার্পেট বেছানো। কাচের টেবিলের এক কোণে ফুলদানিতে রাখা প্লাস্টিক ফুল, যেন মনে হয় আসল ফুল। এমনই তরতাজা।

ব্রজকিশোর সোফায় বসে সেন্টার টেবিলে খাতা খুলে লিখছেন গল্প। মাঝে মাঝে জানালায় উঁকি দিচ্ছেন, দু'একটা নাম না জানা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। দিগন্তে ওদের কে ডাকে কে জানে! সেইখানেই ছুটে যায় তারা। অজানার সন্ধানে।

পর দিন সকাল বেলা ব্রজকিশোর সবে এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে সোফায় বসেছেন, অমনি ডোর বেল—এ কার আঙুল পড়তেই বেজে উঠল গানের স্বর। ব্রজকিশোর বুঝলেন বাইরে থেকে কেউ কলিংবেল টিপছে। অমনি ছোট কনকেভ গ্লাস-এ চোখ দিতেই দেখলেন একটা মেয়ে আর একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। দরজা খুলতেই ভদ্রলোক খুব বিনয়ের সঙ্গে হাত জোড় করে বলল, আপনি কি শিশুসাহিত্যিক ব্রজকিশোর ভট্টাচার্য?

ব্রজকিশোরবাবু মাথা নাড়লেন। ভদ্রলোক তার মেয়েকে নিয়ে ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছে। বলল, বসতে পারি?

ব্রজকিশোর বাবু বললেন, নিশ্চয়ই। বসুন।

মেয়েকে দেখিয়ে ভদ্রলোক বলল, আমার মেয়ে। সার্বণী। ক্লাস ফাইভ-এ পড়ে। গল্ফগ্রীণের বেটার হাই স্কুলে। আরে মশাই ও তো আপনার ফ্যান।

ব্রজকিশোরবাবু অবাক হলেন। সভা সমিতিতে তাঁকে শুনতে হয় ছেলেমেয়েরা আজ কাল গল্প টল্প পড়ে না। তারা তাদের লেখাপড়া নিয়েই নাকি ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এটা যে সত্যি নয় তা এখন সার্বণীকে দেখেই বুঝতে পারছেন। সার্বণী বলল, কাকু আমি আপনার বেড়ালের বন্ধু পড়েছি। 'উয়েন জেলেমা' পড়ছি। তবে আমার ভালো লেগেছে 'আমার বন্ধু বাড়ি এলে ভালো লাগে না' গল্পটি।

ব্রজকিশোর বাবু এবারে স্মিত হেসে বললেন, বাঃ তুমি তো দেখছি আমার সব গল্পই পড়েছ। এসব পড় কখন? আর বইগুলি কে এনে দেয় তোমাকে?

সার্বণী বলল, সময় পেলেই যার বই হাতের কাছে পাই পড়ি। বিবেকনগর লাইব্রেরী থেকে বাবা বই এনে দেন। এখন কী লেক এ্যাটলে ক্লাব থেকেও আমার ছোটকাকু আমার জন্য বই আনেন।

ব্রজকিশোর মেয়েটির দিকে তাকিয়েই রইলেন। তার মুখ দিয়ে কথা যেন বের হতেই চায় না। লেখালেখির সার্থকতা বোধহয় এখানেই। যদি সত্যিকারের একজন

পাঠকও পাওয়া যায় তবেই লেখকের মন আনন্দে ভরে যায়।

সর্বাণীর বাবা বলল ও ওর বন্ধুর কাছে শুনেছে আপনি আজকাল এই ফ্ল্যাটে এসেছেন। কয়েকদিন থাকবেনও, নিশ্চয়ই লেখালেখি করতে এসেছেন? তাই ও সকাল থেকেই উশখুশ করছিল আপনার সঙ্গে সরাসরি দেখা করবে। একজন নামকরা লেখককে যখন চোখের সামনেই পাওয়া যাচ্ছে তখন তাড়াতাড়ি দেখা করাটাই তো ভালো, বলেই ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন।

ব্রজকিশোরবাবু না হেসে পারলেন না। সার্বণী বলল, বাবার সঙ্গে তিনতলায় আমাদের ফ্ল্যাটে বসে আবদার করতে থাকি। শিশু সাহিত্যিক ব্রজকিশোর ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করব। বাবা প্রথমটায় রাজি হননি। বললেন কে না কে আমি আবার অত লেখা টেখা পড়ি না, কী বলতে কী বলব...আমি। বললাম আমিই—কথা বলব, তুমি চুপ করে থেকো। তাই বাবাকে নিয়ে এসে দেখা করলাম আপনার সঙ্গে।

ব্রজকিশোর বাবু এবার হাতে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ঠিক করেছ। তুমি একা এসেও দেখা করতে পারতে। যাক তোমার পুরো নাম জানা হয়নি। তাছাড়া বাড়িতে কে কে আছে তাও। ওহো পড়ালেখা ছাড়া আর কী করো তুমি?

সার্বণী বলল, আমি সার্বণী মজুমদার। বাড়িতে মানে ফ্ল্যাটে আমার মা, বাবা, দুই কাকু আমার ঠাকুমা আর আমার এক পিসি আছে। পিসির ভীষণ অসুখ। পরিষ্কার কথা বলতে পারে না। মাঝে মাঝে হিজিবিজি কী বলে বোঝা যায় না। পড়ালেখা ছাড়া আমার শখ পাখি পোষা।

ব্রজবাবু বললেন, পাখি পোষ, সে কী! কী পাখি পোষ তুমি?

—জানো কাকু তোমাকে বলি ৪৮টা বদ্রি পাখি আছে আমার। কত তাদের নাম। এক এক নামে এক এক সময় ডাকি। পাখিরা অনর্গল কথা বলে। সারাক্ষণ ওদের বাসায় কিচিরমিচির লেগেই আছে। ব্রজকিশোর বাবু সার্বণীর মুখের দিকে তাকিয়ে। কৌতূহল ভরা গলায় বললেন, কী খায় ওরা?

—কী আর খাবে ওরা? কাবলি দানা আর তুলসী

পাতা। আর জানোতো ওদের খাবার আনতে গিয়ে বাবা আমাদের খাবার আনতেই ভুলে যান। আর জানো তো এইসব পাখিরা আমাদের চেয়েও কিন্তু বেশি খায়।

—তাই নাকি?

ব্রজকিশোর ভট্টাচার্য ছোটোদের জন্য লেখেন বটে, এখনও চেনেন না কোনটা বদ্রিপাখি। তাছাড়া একটা ছোট মেয়ে ৪৮ খানা বদ্রিপাখি একাই পোষে, এভাবেতেই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। কস্মিনকালেও তিনি পাখি পুষেছেন বলে মনে পড়ে না। আজকের এই ছোট মেয়ে সার্বণী তার কাছে এসে যেন এক নতুন সকাল উপহার দিয়েছে!

এরপরেই সার্বণী যা করল তাতেও তিনি অবাক। সর্বাণীর হাতে একটা অটোগ্রাফের খাতা। খাতাটা বাড়িয়ে দিতেই কাঁপা কাঁপা হাতে ব্রজকিশোরবাবু তাতে সই করে দিলেন একটা বাংলা ভাষায় আর একটা ইংরেজিতে। হেসে বললেন, বাংলা, ইংরেজী দুটো ভাষাতেই তোমাকে সই করে দিলাম। তোমার মতো মেয়ে আর দুটি হয় না।

ছবি : পার্থ মৈত্র

কিশোর উপন্যাস

নীললোহিত রহস্য

সঙ্কর্ষণ রায়

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে শিবরাত্রির দিন। আমাদের 'নগর' গ্রামে (পুববাংলায় ফরিদপুর জেলার ছোটো একটি গ্রাম) বুড়ো শিবের 'অতিকায়' আকারের (উচ্চতায় প্রায় পঁচিশ ফুট, প্রস্থে উচ্চতার অর্ধেকের বেশি) লিঙ্গের সামনে আমার ঐতিহাসিক (ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা) জ্যাঠামশাই যতীন্দ্রমোহন একজন বৃটিশ আর্মি অফিসারকে পাশে নিয়ে দাঁড়ালেন। আর্মি অফিসারটির উদ্দেশে ইংরেজিতে বললেন, সম্ভবতঃ এটাই 'পৃথিবীর বৃহত্তর শিবলিঙ্গ।' শিবরাত্রির বিশেষ পূজা উপলক্ষে হাজার-হাজার নরনারীর সমাবেশ ঘটেছে এই নগর গ্রামে, রীতিমত মেলা জমে উঠেছে শিবলিঙ্গকে ঘিরে...

পূজা, মেলা বা বিশাল শিবলিঙ্গ, হিদেনদের (heathen) এই সব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই।—রূঢ় কণ্ঠে বললেন লালমুখো আর্মি অফিসার : আমি এখানে এসেছি রেডিশ স্যাফায়ার (রক্তমুখী নীলা) দিয়ে তৈরি শিবলিঙ্গের খোঁজে। কাশ্মীরের পহেল গাঁওয়ের কাছে প্রাচীন মহাকালের মন্দিব থেকে মোগল বাদশা আওরংজেবের আমলে তাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। সরিয়ে ফেলে কোনও এক মন্দিরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কোথাও এই মন্দির জানা নেই, মহাকালের মন্দিরের এখনকার মোহান্তরাও জানে না। তাদের কাছে শুধু এইটুকু জানতে পেরেছি যে ভারতের অতি দুর্গম কোন একটি জায়গায় একটি মন্দিরে তাকে রাখা হয়েছে। যারা লিঙ্গটিকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা লিঙ্গটিকে কোথায় রেখেছে মহাকালের মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে তা জানায়নি তারা। ফিরেও আসেনি তারা, মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত লিঙ্গটিকে যেখানে

রেখেছিল সেখানেই থেকে গিয়ে পূজার্চনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছিল...

তারপর প্রায় তিনশ বছর কেটে গিয়েছে। —যতীন্দ্রমোহন বললেন : আমার প্রত্নতত্ত্ববিদ বন্ধু রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের পর ভারতময় প্রাচীন ও মধ্যযুগের মন্দিরগুলো পরিক্রমা করে বহুমূল্য রত্নশ্রেণীর পাথর দিয়ে তৈরি দেবদেবীর মূর্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। আপনি যে শিবলিঙ্গটির কথা বলছেন তা রক্তমুখী নীলা দিয়ে তৈরি নীললোহিতের মূর্তির, হিন্দুবিরোধী আওরংজেবের লুটেরা বাহিনীর দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার আশংকায় কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরের নিকটবর্তী মহাকালের মন্দির থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। সরিয়ে ফেলে কোন একটি অতি দুর্গম জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিল। তার অবস্থান যে মহাকাল মন্দিরের কর্তৃপক্ষেরও অজানা তা আপনি জানেন। ভারতময় খোঁজাখুঁজি ক'রেও তাকে খুঁজে পাননি রাখালদাস। আকস্মিক অকাল মৃত্যুর জন্য তাঁর খোঁজাখুঁজি অবশ্য অসম্পূর্ণ ছিল...

—আর্কিওলজিস্ট আর. ডি. ব্যানার্জির অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করুন আপনি মিস্টার রায়, বৃটিশ আর্মির তরফ থেকে এই ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতা পাবেন...

—আমার এই ছেষট্টি বছর বয়সে তা এখন সম্ভব নয়। রাখাল দাসের অনুরোধে পুববাংলায় নানা জায়গায় এ কাজ 'অবশ্য' আমি বিশ পঁচিশ বছর আগে করেছিলাম, অনেক প্রাচীন ও মধ্যযুগের মন্দির ও মসজিদ খুঁজে পেলেও নীললোহিতের লিঙ্গ খুঁজে পাই নি...

—আচ্ছা মিস্টার রায়, আপনাদের এই জায়েন্ট শিবলিঙ্গের মাটির তলায় পাতাল ঘরে মূর্তিটাকে লুকিয়ে রাখা হয়নি তো?

—না, এই বুড়ো শিবের তলায় কোন পাতালঘর নেই। পুববাংলার নরম মাটিতে পাতালঘর তৈরি করা অসম্ভব...

—কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টরদের ধারণায় ইস্টবেঙ্গলের দুর্গম কোন জলাভূমির মধ্যে ঐ রেডিশ স্যাফায়ারের মূর্তিটিকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব, তিনি মনে করেন যে যেখানেই লুকিয়ে রাখা হোক পাতালঘর তৈরি করে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল...

—ওঁকে নিয়ে এলেন না কেন? ওঁর সাহায্যে খুঁজে বের করুন ঐ পাতাল ঘর, যেখানে নীললোহিত সুরক্ষিত...

—উনি আমাকে বললেন যে আপনি ওই পাতালঘরের খবর রাখবেন...

—তাই নাকি! টেলিগ্রাম করে অবিলম্বে আসতে বলুন ওঁকে, আপনার উপস্থিতিতে মুখোমুখি মোকাবিলা করব ওঁর সঙ্গে...

—রাগ করবেন না মিস্টার রায়? আর এক বার না হয় করুণ সার্চ, যাকে বলে রি-সার্চ, হয়তো আপনার রি-সার্চ ফলপ্রসূ হবে...

—রি-সার্চ করার শারীরিক ক্ষমতা আমার নেই। ইয়ং আর্মি অফিসার আপনি, আপনিই করুন খোঁজাখুঁজি। এখানকার পুরোহিত মশাইকে বলে দিচ্ছি, তিনি সহযোগিতা করবেন আপনার সঙ্গে তাঁর পূজার্চনার ফাঁকে ফাঁকে।

মহোৎসব উপলক্ষে যে সব ভলান্টিয়ার্স এখানে কাজ করছে, তাদের বলে দিচ্ছি, তারাও সাহায্য করবে আপনাকে।

বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলেন আর্মি অফিসার কর্নেল গ্রিফিথ। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ব্যর্থ সন্ধানের পর ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন তিনি। যতীন্দ্রমোহনের নির্দেশমত পূজার প্রসাদ ও ভোগ খাওয়ানো হল তাঁকে।

খেয়ে খুশি হয়ে সাহেব বললেন যে এমন চমৎকার খাবার জীবনে খাননি তিনি। খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়ার দরুণ অসন্তোষ প্রকাশ করলেন আর্মি অফিসার কর্নেল গ্রিফিথ। যতীন্দ্রমোহনের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললেন, এখানে যা পেলাম না তা আর কোথাও পাবার আশা রাখি। আর কোথাও মানে ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়ার বাইরে কোথায় তা আপনার জানা আছে বলে আমার ধারণা...

মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে যতীন্দ্রমোহন বললেন, আগেই আপনাকে বলেছি যে নীললোহিতের লিঙ্গের সন্ধান রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ পাননি এবং এ কাজে তাঁকে আমি সাহায্য করতে পারিনি। এই প্রসঙ্গে, জানতে পারি কি এই রক্তমুখী নীলার শিবলিঙ্গের সন্ধান নিচ্ছেন কেন?

শুধু এই শিবলিঙ্গ নয় ; অন্যান্য সোনামণিরত্ন দিয়ে তৈরি প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীরও সন্ধান নিচ্ছি। —কর্নেল গ্রিফিথ বললেন ঃ তাদের বাঁধা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মহাযুদ্ধের ক্রমশ বেড়ে চলা ব্যয় নির্বাহ

করতে চান...

—সোনা মণিরত্ন দিয়ে তৈরি অলঙ্কার সংগ্রহ করতে পারলেও নিত্যপূজিত কোন মূর্তি স্পর্শ করতে পারবেন বলে মনে হয় না আমার...

—ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট্ অনুযায়ী ব্রিটিশ টেরিটোরির যে কোন জায়গা থেকে যে কোনও বস্তু নিয়ে নেওয়ার অধিকার ও ক্ষমতা গভর্নমেন্টের আছে...

—এই আইন গভর্নমেন্টকে যতই ক্ষমতা দিক মন্দির ও মসজিদগুলিতে তা প্রয়োগ না করাই উচিত। এদেশের মানুষদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোন আঘাত হানবেন না, এই আমার অনুরোধ...

চলে গেলেন কর্নেল গ্রিফিথ্। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে যতীন্দ্রমোহন জানতে পারলেন যে ভারতের নানা জায়গায় বিশেষ করে ছোটনাগপুর, পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দুর্গম সব অঞ্চলে অবস্থিত মন্দিরে মন্দিরে সন্ধান চালিয়েছিলেন কর্নেল গ্রিফিথ, কিন্তু খুঁজে পাননি নীললোহিতের লিঙ্গ। দামি রত্নশ্রেণির পাথর ; সোনা ও রুপো দিয়ে তৈরি অনেকগুলো দেবদেবীর মূর্তি তাঁর নজরে এলেও তাদের বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করেননি তিনি মন্দিরের রক্ষীদের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ভয়ে। পরে কয়েকটি মন্দিরে তাঁর সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শেষ হ'য়ে গিয়েছে...

দুই

১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল, তারপর বন্ধ হল ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের (ইন্ডিয়ান আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া) প্রসন্ধানমূলক ক্রিয়াকলাপের ওপরে ব্রিটিশ আর্মির নিয়ন্ত্রণ। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হল নীললোহিতের লিঙ্গ সন্ধানে খোঁজাখুঁজি।

নীললোহিতের লিঙ্গ খোঁজার কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পর একদিন (১৯৪৫ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বরের মাসের কোন এক দিন) জ্যাঠামশাই যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের তখনকার অধিকর্তা। যতীন্দ্রমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তার ধারণা যে রাখালদাস সংগৃহীত নীললোহিতের লিঙ্গ সংক্রান্ত অনেক তথ্য (যা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অ্যারকাইভসে নেই) যতীন্দ্রমোহনের কাছে আছে। অসুস্থতার জন্য অধ্যক্ষকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন, আমার মাধ্যমে তাঁকে জানিয়েছিলেন সুস্থ হয়ে উঠে তিনি নিজে তাঁর দপ্তরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করবেন।

সুস্থ তিনি হননি। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যুর পর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ আমাদের বাড়িতে এসে যতীন্দ্রমোহনের ছেলেদের অনুমতি নিয়ে তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতেন। কিন্তু খুঁজে পেলেন না নীললোহিতের লিঙ্গ সংক্রান্ত ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত তথ্যাদি। হতাশ হয়ে চলে গেলেন তিনি।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ পুরোনো তোরঙ্গে ভরা যতীন্দ্রমোহনের সংগ্রহ করা পুব ও পশ্চিম বাংলা এবং কাশ্মীরসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের উপকরণ সংবলিত শতাধিক কাগজ এবং পুঁথিপত্র ঘাঁটলেও স্পর্শ করেননি তাঁর গল্পের খাতা। কাশ্মীরের রাজাদের উপাখ্যান সঙ্কলন ক'রে কহ্লন লিখেছিলেন "রাজতরঙ্গিনী"। রাজতরঙ্গিনীর কয়েকটি কাহিনী অবলম্বনে যতীন্দ্রমোহন লিখেছিলেন রাজকাহিনী। রাজকাহিনীর কয়েকটি গল্প পর পর কয়েক বছর ধরে শিশু-সঙ্গীর পূজাবার্ষিকী বার্ষিক শিশুসঙ্গী-তে প্রকাশিত হয়েছিল। রাজকাহিনীর খাতার পাতাগুলি ওলটাতে ওলটাতে অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে গেলাম নীললোহিতের লিঙ্গের বৃত্তান্ত। এই প্রাপ্তি পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত, কারণ রাজতরঙ্গিনীর কাহিনীগুলোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই নীললোহিত সমাচারের।

জ্যাঠতুতো দাদাদের অনুমতি নিয়ে রাজকাহিনীর খাতাটি নিয়ে নিয়েছিলাম আমি, তারপর পড়েছিলাম নীললোহিতের লিঙ্গ নিয়ে অভিযানের বিবরণ।

তিন

সম্রাট ঔরংজেবের জিহাদি লুটেরা বাহিনী ভারতময় মন্দিরে মন্দিরে লুটপাট শুরু করলেই কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরের নিকটবর্তী মহাকাল মন্দিরে কালো কষ্টিপাথর দিয়ে তৈরি মূল শিবলিঙ্গের পাশে প্রতিষ্ঠিত রক্তমুখী নীলার লিঙ্গ নিয়ে ভারতের অরণ্যভূমির উদ্দেশে যাত্রা

করেছিল মন্দিরের একজন পুরোহিত মন্দিরের রক্ষী বাহিনীর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে। ভারতের বিভিন্ন আরণ্যক অঞ্চল পরিক্রমা ক'রে রক্তমুখী নীলা তথা নীললোহিতের লিঙ্গকে দুর্গম অরণ্য দিয়ে চাপা পড়া পর্বত শীর্ষে গুহারমধ্যে মন্দির তৈরি করে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। লিঙ্গটি স্বয়ংপ্রভ হওয়ার দরুণ গুহার মুখ এবং গুহা সন্নিহিত পাথরের ফাটলের ফাঁক দিয়ে আলো বেরিয়ে এসে রাতের অন্ধকারে পর্বতশীর্ষের চারদিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে আলোয় আলোকময় করে রাখছিল। স্থানীয় মানুষরা অন্ধকারে উৎসারিত আলোর জন্য এই পর্বতশীর্ষের নাম দিয়েছিল "জ্যোতি পর্বত।"

রাখালদাসের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন নীললোহিতের এই লিঙ্গের খোঁজে কোন অভিযান শুরু করতে পারেননি নানা কারণে। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলাম আমি। তাঁর ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান ও প্রসন্ধান সম্পর্কে অনেক গল্প করলেও নীললোহিতের লিঙ্গ সন্ধান সম্পর্কে কোন কথাই বলেননি। কর্নেল গ্রিফিথসের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনায় এ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছিল।

স্কটিশচার্চ স্কুলে আমার শিক্ষক ছিলেন ক্ষীরোদকুমার লাহিড়ী। তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি। স্কটিশচার্চ স্কুল ছেড়ে শান্তিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে তিনি যোগ দেওয়ার পরও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। নীললোহিতের লিঙ্গের কথা বলেছিলাম তাঁকে। তাঁর অনুরোধে নীললোহিত লিঙ্গের বৃত্তান্তের একটি কপি তাঁকে দিয়েছিলাম।

ক্ষীরোদকুমার বললেন, খুঁজে বের করতে হবে এই 'জ্যোতি পর্বত'। আমার শান্তিপুর হাইস্কুলের একজন ছাত্র ইতিহাসে এম-এ পাশ করে কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যোগ দিয়েছে, তাকে বলছি। তুমি জিওলজির ছাত্র, দেশময় বনে-পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করছ, তুমিও খোঁজ...

চার

কর্মজীবনে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং অজ্ঞাত খনিজ ভাণ্ডারের খোঁজার জন্য প্রসন্ধানমূলক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জ্যোতিপর্বতেরও সন্ধান নিয়েছি, খুঁজতে খুঁজতে উজ্জয়িনীর কাছে নর্মদার তীরে জ্যোতির্লিঙ্গের কাছে পৌঁছে গিয়েছি। নামেই জ্যোতির্লিঙ্গ, কোন জ্যোতি এই অতি প্রাচীন লিঙ্গ বা যে পাহাড়ের গুহার মধ্যে লিঙ্গটি বিরাজমান তার মধ্য থেকে কোন স্বতঃস্ফূর্ত আলো উৎসারিত হচ্ছে না। ভারত তথা বিশ্বময় পরিক্রমারও অভিযাত্রী দলগুলির কাছ থেকেও জ্যোতি-পর্বতের কোন

হদিস পাই না...

তথাপি নিরুদ্যম হই না। খোঁজা খুঁজি করতেই থাকি। বার্ষিক কর্মসূচি (য়্যানুয়েল প্রোগ্রাম) অনুযায়ী করণীয় কাজকর্মের সঙ্গে তা করার চেষ্টা করি...

তারপর হঠাৎ একদিন (১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি একদিন) জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর মিহিরকুমার রায়চৌধুরি আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর দপ্তরে। তাঁর কামরায় ঢুকতেই তাঁর আসনের সামনের আসনে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার আর্কিওলজিস্ট কুশনাভ করের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে মিহিরকুমার বললেন, আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমাদের একটি যুগ্ম সমীক্ষার কাজের দায়িত্ব তোমাকে দিতে চাই। আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেলের অনুরোধে আমাদের দুটি ডিপার্টমেন্টের এই যুগ্ম প্রয়াসের প্রস্তাবে আমি সম্মতি জানাতেই তিনি ডক্টর কুশনাথ করকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। ডক্টর কর, এই ব্যাপারে আলাপ করুন আপনি সঙ্কর্ষণের সঙ্গে...

কুশনাভ কর আমার পূর্ব পরিচিত। শান্তিপুর হাইস্কুলে ক্ষীরোদকুমার লাহিড়ীর ছাত্র ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর ক্ষীরোদকুমারে আমন্ত্রণে সবান্ধবে শান্তিপুর গিয়েছিলেন, সেখানে তার সঙ্গে আলাপ। তারপর প্রায় ত্রিশ বছর কেটে গেলেও আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারি।

আমাদের দুজনের পূর্ব পরিচিতি মিহিরকুমারকে খুশি করে, মৃদু হেসে তিনি বললেন দুজনে দুজনকে চেনো, ভালই হল, জি. এস. আই এবং এ. এস. আই. এ-র এই জয়েন্ট এন্টারপ্রাইজে তোমাদের দুজনের জয়েন্টলি কাজ করতে কোন অসুবিধে হবে না...

একটুও না। —কুশনাভ বললেন : কারণ উনি এ কাজ আগেভাগেই নিজের রেগুলার কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুরু করে দিয়েছেন, মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে নীললোহিতের লিঙ্গ বৃত্তান্ত জানার পর এই অনুসন্ধানে আগ্রহ শান্তিপুরের হাইস্কুলে ছাত্র থাকাকালীনই হয়েছিল আমার, এই আগ্রহের প্রেরণাতেই আমি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে চাকরি নিয়েছি...

নীললোহিতের লিঙ্গ খুঁজে বের করার ব্যাপারটি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দাও আমাকে তোমরা। —মিহিরকুমার বললেন : আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেলের প্রস্তাবে আমি সম্মতি জানালেও এই ব্যাপারে সব কিছু আমার জানা নেই...

সব কথাই বললাম আমি। শুনে মিহিরকুমার বললেন, যা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় করতে পারেননি তা করার চেষ্টা চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতা নয় কি!

হঠাৎ মারা যাওয়াতে এ কাজ করা সম্ভব হয়নি রাখালদাসের পক্ষে। আমি বললাম : তা ছাড়া কাজটার মধ্যে দুঃসাহসিকতার কিছু নেই। আমি তো কাজের ফাঁকে ফাঁকে খোঁজাখুঁজি চালিয়েই যাচ্ছি...

—এর পর পুরোপুরি এই খোঁজাখুঁজির কাজে আত্মনিয়োগ কর দুজনে মিলে...

পাঁচ

অফিসে আমার ঘরে কুশনাভ ও আমি মানচিত্র বিছিয়ে কোথায় কোথায় খোঁজাখুঁজি করব তা নিয়ে আলোচনা করি। কুশনাভ বললে, নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোতি পর্বত, অতএব দেশের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধান করতে হবে। আপনার মতো আমিও এ দেশের পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি জায়গা ঘোরাঘুরি করেছি, কিন্তু আপনার মতো আমিও তার সন্ধান পাইনি...

আমার কি মনে হয় জান? —আমি বললাম নীললোহিতের গুহামন্দির থেকে আলো বিকীরণ সম্ভব নয়, কারণ নীললোহিত বা রক্তমুখী নীলা স্বয়ংপ্রভ নয়। লিঙ্গটি গুহামন্দিরে প্রতিষ্ঠার সময় তার সঙ্গে আলো বিকীরণকারী স্বয়ংপ্রভ পাথর রাখা হয়েছিল বলে আমার ধারণা। আলো বিকীরণকারী স্বয়ংপ্রভ পাথরটি হয়তো মাটি চাপা পড়েছে। কাজেই গুহা থেকে কোনো আলো বের হচ্ছে না। আলোর সঙ্কেত পাওয়া যাবে না, গুহামন্দিরগুলোকে আইডেন্‌টিফাই করে তাদের মধ্যে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করতে হবে...

—আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার আর্কিও-লজিস্টরা বহু বছর ধরে ভারতের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে এ কাজ করেছেন, সম্ভবতঃ গুহামন্দিরগুলোর অবস্থান নির্দেশক মানচিত্র আছে, তার একটি কপি নিয়ে আসব...

মানচিত্রে অসংখ্য গুহামন্দির চিহ্নিত, তাদের মধ্যে অধিকাংশই শিব মন্দির। নীললোহিতের লিঙ্গ তাদের কোনটির মধ্যে আছে তা খুঁজে বের করতে হলে প্রতিটি

গুহামন্দিরের মধ্যে ঢুকে সন্ধান নিতে হবে।

ভারতময় বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই সব দুর্গম জায়গায় গিয়ে খোঁজাখুঁজি করা খুবই কঠিন কাজ। কুশনাভকে আমি বললাম যে সুস্পষ্ট হদিস না পেলে খোঁজাখুঁজি ফলপ্রসূ হবে না।

সুস্পষ্ট হদিস তো আপনার জ্যাঠামশাইয়ের রাজতরঙ্গিণীর খাতার মধ্যে যে নীললোহিতের লিঙ্গ সমাচার পেয়েছেন আপনি তার মধ্যেই দেওয়া হয়েছে। বহুমূল্য নীললোহিত পাথরের লিঙ্গ গুহামন্দিরের মধ্যে বিশেষভাবে সুরক্ষিত হওয়া উচিত। অতএব রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থাযুক্ত গুহামন্দিরগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা খুঁজে পাব নীললোহিতের লিঙ্গকে।

কোন্ কোন্ গুহামন্দিরে রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা আছে তা নির্ণয় করার জন্য ভারতময় গুহা পর্বত শৃঙ্গগুলি পরিক্রমা করা প্রয়োজন। একটি হেলিকপ্টারের সাহায্যেই আমাদের দুজনের পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে।

এই ব্যাপারে মিহিরকুমারের সঙ্গে আলাপ করব ভাবছি। এমন সময় কুশনাভ আমার সঙ্গে দেখা করে বললে, হেলিকপ্টারের দরকার নেই, গুহামন্দিরটির সন্ধান পেয়েছি...

কে দিল সন্ধান? —আমি প্রশ্ন করলাম, কোথায়?

—সন্ধান দিয়েছেন ভুটানের পারো জং (পারো শহরের বৌদ্ধ মঠ)—এর লামা গুরু (প্রধান লামা বা মোহান্ত)। সম্প্রতি অন্য একটা কাজের সূত্রে পারো গিয়েছিলাম। সেখানে পারো জং-এর লামা-গুরুর সঙ্গে আলাপ, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পর তাঁর কাছ থেকে জেনেছি যে ভুটানের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ চোমোলহরির পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায় একটি গুহামন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে বহুমূল্য রত্নশ্রেণির পাথরের শিবলিঙ্গ। তিনি নিজে তাকে চোখে দেখেননি, স্থানীয় বুদ্ধ মন্দিরের লামার কাছে শুনেছেন যে লিঙ্গ থেকে অপার্থিব জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। ভুটানের উচ্চতম পর্বত চোমোলহরি (উচ্চতা প্রায় আট হাজার মিটার) হিন্দু দেবীর স্থান কাজেই এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় ভুটানের বৌদ্ধ লামা সম্প্রদায় এবং রাজা কোন আপত্তি করেননি।

চোমোলহরির পর্বতশৃঙ্গ বারো মাস বরফে ঢাকা বলে দিনের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো ঝলমল করে। কিন্তু রাতের আঁধারেও পর্বতশীর্ষ আলোয় আলোকময় হয়ে থাকে। এই আলোর উৎস গুহামন্দিরে প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংপ্রভ শিবলিঙ্গের পাথর। রাখাল দাসের লেখা বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে শিবলিঙ্গটি রক্তমুখী নীলা বা নীললোহিত দিয়ে তৈরি। বহুমূল্য নীললোহিত যতই উজ্জ্বল জৌলুস যুক্ত হোক না কেন তা স্বয়ংপ্রভ নয়। আমার ধারণা শিবলিঙ্গে নীললোহিতের সঙ্গে স্বয়ংপ্রভ কোনো পাথর যুক্ত আছে। এ কথা আমি কুশনাভকে বলতে সে বললে, চলুন সরজমিনে তদন্ত করি, চোমোলহরির গুহামন্দিরে তো যাচ্ছিই আমরা...

ছয়

ভুটানের সামচিতে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার দপ্তর থেকে জিপে করে যাত্রা করলাম কুশনাভ ও আমি ১৯৭২ সালে মে মাসের মাঝামাঝি একদিন সকালে। অসমের জাতীয় সড়ক ধরে চলতে চলতে উত্তরে হিমালয়ের দক্ষিণের নীল পর্বতমালার পেছনে কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণাভ উজ্জ্বলতা দেখতে পাই। তোর্সা নদী পেরিয়ে কালেশ্বর পাহাড় বাঁয়ে রেখে পশ্চিমবাংলা ও ভুটানের সীমান্তের জলগাঁ শহর হয়ে দক্ষিণের সমতলভূমির মধ্যে ভুটানের সবচেয়ে বড় শহর ফুন্টশেলিং পৌঁছাই বেলা প্রায় বারোটায়। এখানকার একটি রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজ সেরে শুরু করলাম পর্বতারোহণ।

জিপের মধ্যে অচল হয়ে বসে থাকি কুশনভ ও আমি, আরোহণ করে জিপ। সারথি রবীন বিশ্বাসের দক্ষতায় পার্বত্য সড়কে পথ চলা দুঃখজনক হয় না। একটানা উত্তুঙ্গ চড়াইয়ের পথ ধরে দেড় হাজার মিটার আরোহণের পর প্রবেশ করি মেঘের স্তর, মেঘের কুয়াশার মধ্যে আমাদের জিপ যেন সাঁতার কাটতে থাকে। গাড়ির সামনের ফগলাইট জ্বালিয়ে ছিলেন বিশ্বাসবাবু। ফগলাইটের হলুদ আলো মেঘের স্তরকে কতটা ভেদ করে তা আমরা বুঝতে না পারলেও বিশ্বাসবাবু এই আলোকে অনুসরণ করে অনায়াস দক্ষতায় গাড়ি চালাতে থাকেন। চড়াই শেষ হল চাপচা গ্রামে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মিটার উচ্চতায়।

তারপর শুরু হল অবরোহন পারো নদী-উপত্যকার অভিমুখে। উপত্যকা প্রশস্ত হয়ে সমতলভূমির রূপ নিয়েছে। পারো নদীর ধারে বিমানবন্দর ও ভুটানের বৃহত্তম বৌদ্ধ মঠ 'পারো জং'। চোমোলহরি পর্বতের শীর্ষে

আরোহণের জন্য লামা-গুরুর অনুমতি প্রয়োজন।

লামা-গুরুর (ভুটানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রধান) সঙ্গে ছিলেন ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক। তিনি বললেন, দেবীদর্শনে আজ আমি যাব, আমার সঙ্গে আপনারা দুজন আমার হেলিকপটারে করে যেতে পারেন...

দেবী দর্শনে তো আমরা যাব না।—আমি বললাম ঃ আমরা নীললোহিতকে উদ্ধার করে যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাব...

—নীললোহিতের যথাস্থান এখানেই। এখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চোমোলহরি দেবীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজ করছেন, তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে দেবী রুষ্ট হয়ে অগ্নিবর্ষণ করবেন। উদ্ধার নয়, দর্শনের জন্য যেতে পারেন...

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই ইওর হাইনেস্!—কুশনাভ বললে : নীললোহিত পাথরকে খোদাই করে লিঙ্গে রূপান্তর কাশ্মীরের মহাকাল মন্দিরের শিল্পী করেছিলেন, ওই মন্দিরেই তিনি প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত ছিলেন। সম্রাট ঔরংজেবের আমলে লুটেরাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার আশংকায় নীললোহিতের লিঙ্গকে মহাকাল পর্বত থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। কোনো এক দুর্গম দুরারোহ পর্বতশৃঙ্গে তার সুরক্ষিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। স্বয়ংপ্রভ পাথর দিয়ে তৈরি লিঙ্গ থেকে আলো বিকীরণের জন্য পর্বতশৃঙ্গটির নাম দেওয়া হয়েছিল জ্যোতি-পর্বত। চোমোলহরিই যে জ্যোতিপর্বত তা বিমানবাহিনীর সমীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে। নীললোহিতের লিঙ্গ এখানে সুরক্ষিত হলেও মহাকাল মন্দিরের মোহান্তরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁদের দাবি আপনার মেনে নেওয়া উচিত...

আপনাদের দাবি আমি মেনে নিলেও চোমোলহরির দেবী মানবেন না।—রাজা বললেন : আমার হেলিকপ্টারে করে চলুন, সম্ভব হলে উদ্ধার করে আনবেন মহাকালের মন্দিরের নীললোহিতকে।

সাত

দিনে নয়, রাত্রে রাজার হেলিকপ্টারে করে গেলাম, কারণ রাতের আঁধারেই চেনা যাবে স্বয়ংপ্রভ নীললোহিতকে। পর্বতগুহায় পাথরে উৎকীর্ণ চোমোলহরি দেবীর পাশে খোদাই করা একটি গহ্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। দিনের আলোয় তাকে দেখা যায় না, রাতের আঁধারে উৎসারিত আলো দিয়ে তার অবস্থানকে চিহ্নিত করা যায়।

পর্বতশৃঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর অভিমুখে হেলিকপটার চালনা করেন স্বয়ং রাজা। চোমোলহরির আলোয় আলোকময় শীর্ষে একটি লম্বা-চওড়া পাথরের চাতালে হেলিকপটারটিকে দাঁড় করানো হলে রাজাকে অনুসরণ করে হেলিকপটার থেকে নামলাম আমি এবং কুশনাভ। রাজাকে দেখে এগিয়ে এলেন একজন ভুটানি লামা, আমরা দুজনে কি উদ্দেশে এখানে এসেছি তা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন রাজা। লামার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি বৌদ্ধ লামা, নিকটবর্তী একটি গুম্ফা থেকে এখানে এসে চোমোলহরি দেবীর পূজা করেন হিন্দু পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করে...

দেবীর সঙ্গে দেবতার পূজাও করছি।—লামা বললেন : মোগল সম্রাট ঔরংজেবের আমলে রক্তমুখী নীলার লিঙ্গটি কাশ্মীরের মহাকালের মন্দির থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী নানা জায়গা ঘুরে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। বহুমূল্য পাথরের লিঙ্গটি সুরক্ষিত রাখার জন্য চোমোলহরি দেবীর গুহামন্দিরকেই বেছে নেওয়া হল...

রাজা বললেন, আপনাদের দেবতার সুরক্ষার জন্য আমাদের দেবীর গুহামন্দিরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল প্রায় তিন শতাব্দী আগে। এখান থেকে যদি তাঁকে নিয়ে যেতে চান এখানকার গুম্ফার লামার অনুমোদন আবশ্যক...

আমি অনুমোদন করলেও আপনাদের দেবতাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন না!—লামা বললেন : গুহামন্দিরে তিনি বন্দী, আমার ধারণা চোমোলহরি দেবী তাঁকে বন্দী করে রেখেছেন...

ওকী বলছেন আপনি!—হতবুদ্ধির মতো লামার মুখের পানে তাকিয়ে কুশনাভ বললে : পাথরের দেবী পাথরের লিঙ্গকে বন্দী করে রেখেছে।

—স্বচক্ষে দেখবেন চলুন। আসুন আগের সঙ্গে...

লামাকে অনুসরণ করে চোখ ধাঁধানো আলোয় উজ্জ্বল গুহামন্দিরের প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। গুহার ভেতর থেকে অতি উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ হলেও একটুও তাপ বেরিয়ে আসছে না। তাপহীন আলোর উৎস দেবীমূর্তির পাশের গহ্বর। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই

গহ্বরের মধ্যে স্থাপিত নীললোহিতের লিঙ্গ থেকে এই তাপহীন আলো বেরিয়ে গুহার মুখের বিস্তীর্ণ পাথরের চাতালটিকে আলোয় আলোকময় করে তুলেছে।

এই আলোর উৎসের অভিমুখে চলতে গিয়ে বাধা পেলাম গুহার প্রবেশ পথে। প্রবেশ পথকে চাপা দিয়ে রেখেছে কাচের মতো স্বচ্ছ স্ফটিকের দেয়াল। পর্বতশীর্ষের গ্র্যানাইট পাথরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়েছে এই স্ফটিকের দেয়াল।

কে তৈরি করেছে এই দেয়াল? আমার ও কুশনাভের মনে স্বাভাবিকভাবে জাগে এই প্রশ্ন। বলা বাহুল্য এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই, শুধু এইটুকু বুঝতে পারি যে এটা প্রকৃতিকৃত। সম্ভবতঃ উল্কাপাতের ফলে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উল্কা বৃষ্টি অত্যধিক তাপ সৃষ্টি করে হয়তো গুহার পাথরের ভেতরকার কোয়ার্টজকে গলিয়ে এই স্ফটিকের আবরণ সৃষ্টি করেছিল।

লামা বললেন, উল্কাবৃষ্টি নয়, ভূগর্ভ থেকে অত্যধিক তাপ উঠে এসে পাথর গলিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের গুম্ফায় দিনলিপির পুঁথি আছে, যাতে প্রায় পাঁচশো বছরের বৃত্তান্ত লেখা আছে। ওই পুঁথি থেকে এই তথ্য পেয়েছি।

আমি বললাম, আপনাদের পুঁথিতে লেখা বৃত্তান্ত অনুযায়ী চোমোলহরি পর্বতের মধ্যে একটি আগ্নেয়গিরি আছে কি?

—না। নীললোহিতের শিবলিঙ্গ গুহামন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চোমোলহরি দেবী উত্তাপ সৃষ্টি করে গুহার মধ্যে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন...

—গুহামন্দিরের প্রবেশ পথ বন্ধ হওয়ার ফলে নীললোহিতের লিঙ্গের সঙ্গে দেবী নিজেও বন্দী হয়ে পড়েছেন গুহামন্দিরে...

—না, গুহামন্দিরে প্রবেশপথ বন্ধ হলেও আমাদের দেবী গুহামন্দিরে বন্দী হননি, তিনি পর্বতময় বিরাজ করছেন। তাঁর পাথরের মূর্তি গুহার মধ্যে বিরাজ করলেও সমস্ত চোমোলহরি পর্বত জুড়ে তাঁর উপস্থিতি আমরা অনুভব করি...

গুহামন্দিরে দেবীর মূর্তির পাশে নয়, গুহার মধ্যে একটি গহ্বরের মধ্যে নীললোহিতের লিঙ্গটির অবস্থান লিঙ্গ থেকে উৎসারিত চোখ-ধাঁধানো আলো থেকে বুঝে নিতে হয়। লামা বললেন, এই আলোর উৎস নীললোহিতের লিঙ্গ। গুম্ফার দিনলিপির পুঁথির মধ্যে নথিবদ্ধ আছে তার বিবরণ। তাকে চোখে দেখা না গেলেও এই আলো দিয়ে তাকে চেনা যায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নীললোহিত বা রক্তমুখী নীল উজ্জ্বল রত্নশ্রেণীর পাথর স্বয়ংপ্রভ কি না। ভূবিজ্ঞানী তথা খনিজ বিজ্ঞানীরা স্বয়ংপ্রভ কোন রত্নশ্রেণির খনিজ বা মাণিকের (মিনারেল) সন্ধান এ পর্যন্ত পাননি বলেই জানি। বনজঙ্গল আলোয় আলোকময় ক'রে তোলা সাপের মাথার মণি গল্পকথা ছাড়া আর কিছু নয়। এ হেন অবস্থায় আমি মনে করি নীললোহিতের লিঙ্গের সঙ্গে আছে কোন স্বয়ংপ্রভ পাথর যার মধ্য থেকে উৎসারিত আলো চোমোলহরির পর্বতশৃঙ্গকে "জ্যোতি"—পর্বতে পরিণত করেছে।

আমি চাই নীললোহিতের লিঙ্গের কাছে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে। গুহামন্দিরে ঢোকার মূল প্রবেশপথ বন্ধ, বিকল্প কোন প্রবেশপথ খুঁজে বের করে আমি ভেতরে ঢুকতে চাই...

অসম্ভব।—লামা বললেন বিকল্প কোন প্রবেশপথ নেই। প্রায় তিন শতাব্দী ধরে বাইরের থেকে পূজা করা হচ্ছে। এই চাতালে পূজার বেদী তৈরি করা আছে, তাতে বসে আমি পুজো করি...

—খুঁজে দেখতে চাই আমি। আরও খোঁজাখুঁজি করলে হয়তো খুঁজে পেতে পারি...

—আরও খোঁজাখুঁজি করা চলবে না। আপনাদের নিয়ে আমাদের রাজাকে আমি হেলিকপটারে করে পারো ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানাই...

আট

কলকাতায় ফিরে গিয়ে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেলদের সঙ্গে দেখা করলাম আমরা। তাঁদের বললাম আমাদের অভিযানের বৃত্তান্ত।

শুনে খুশি হলেন তাঁরা দুজনেই। জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল মিহিরকুমার বললেন, নীললোহিতের লিঙ্গকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, তিনি সুরক্ষিত আছেন, নীললোহিতের সন্ধান সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সফল হয়েছে...

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ক্রিয়াকলাপ কিন্তু অসম্পূর্ণ থাকছে।—আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্

ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল বললেন : খুঁজে পেলেও উদ্ধার করতে পারলাম না...

খুঁজে পেলেও নীললোহিতের রহস্যভেদ পুরোপুরি করা যায়নি।—আমি বললাম ঃ নীললোহিত বা রক্তমুখী নানা জৌলুসযুক্ত উজ্জ্বল পাথর হলেও স্বয়ংপ্রভ নয়। যতদূর জানি রত্নশ্রেণির কোন পাথরই স্বয়ংপ্রভ নয়। চোমোলহরি পর্বতের মাথায় 'গুহামন্দিরে' নীললোহিতের লিঙ্গটি থেকে সার্চলাইটের মতো আলো বেরিয়ে এসে গুহার সামনের চাতালসহ পুরো পর্বতশৃঙ্গটিকে চোখ ধাঁধানো আলো দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে। লিঙ্গের পাথর থেকে জলপ্রপাতের ধারার মত আলো বেরিয়ে আসা সত্যিই বিস্ময়কর। রক্তমুখী নীলা থেকে এ রকম আলো বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়, হয়তো তার সঙ্গে অতিমাত্রায় স্বয়ংপ্রভ কোন পাথর মিশে আছে...

গুহামন্দিরের মধ্যে ঢুকে লিঙ্গটিকে পরীক্ষা করতে তো পারবে না।—মিহিরকুমার বললেন, কাজেই এই ব্যাপারটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অন্য কাজে মন দাও...

—ভাবছি খনিতে গিয়ে সন্ধান নেব। অর্থাৎ যে খনি থেকে রক্তমুখী নীলা খনন করে আনা হয়েছিল সেই খনিতে গিয়ে খবর নেব...

—খনিটার হদিস পাবে কি করে?

—কাশ্মীরের মহাকালের মন্দিরে গিয়ে খোঁজখবর নেব...

ডিরেক্টর জেনারেলের অনুমোদন নিয়ে যাত্রা করলাম কাশ্মীরের মহাকাল মন্দিরের উদ্দেশে। পহেলগাঁওয়ের কাছে মার্তণ্ডদেবের মন্দিরের (সূর্যমন্দির) কাছে মহাকালের মন্দিরের মোহান্ত নীললোহিতের লিঙ্গ-সংক্রান্ত পুঁথি পড়ে বললেন, লাদাখের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় চার হাজার মিটার উচ্চতায় নীলার (স্যাফায়ার) খনি ছিল। যে জায়গাতে খনিটা ছিল, তার নাম ''পেডার''। ওই খনি থেকে খনন করে আনা বড় আকারের রক্তমুখী নীলা খোদাই করে শিবলিঙ্গের আকার দিয়ে মহাকালের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। লুণ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কায় লিঙ্গটিকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ভুটানের চোমোলহরি পর্বতের গুহামন্দিরে যে তা সুরক্ষিত তা আপনার কাছ থেকে জানতে পেরে আমি আনন্দিত। তা চিরকালের মত ওই গুহামন্দিরেই বিরাজ করবে জেনেও দুঃখিত নই, মহাকালের মন্দিরে তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো আগ্রহ নেই আমাদের...

লিঙ্গের পাথর পরীক্ষা করতে চাই আমি। —আমি বললাম : যে পাথর খোদাই করে লিঙ্গটা তৈরি করা হয়েছিল, তার অবশেষ যদি কিছু থেকে থাকে, দয়া করে দেখান আমাকে...

—খোদাই করতে গিয়ে যে শিলাচূর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল তা সংরক্ষিত হয়নি, সম্ভবতঃ লিঙ্গের আসনে তা গেঁথে দেওয়া হয়েছিল...

অতএব যে পাথর থেকে নীললোহিতের লিঙ্গ খোদাই

করা হয়েছিল, তাকে পরীক্ষা করতে হ'লে লাদাখের ''পেডার''-এর খনিতে যেতে হবে আমাকে। মহাকাল মন্দিরের মোহান্ত বললেন, প্রায় চার হাজার মিটার উচ্চতায় অতি দুর্গম পর্বত শিখরের মুখে এই খনিতে খনন করা মানুষের অসাধ্য, আপনি পারবেন না ওখানে যেতে বা ঢুকতে...

মানুষের অসাধ্য তো কারা করে ওখানে খননের কাজ?— আমি প্রশ্ন করলাম।

না-মানুষ!—মোহান্ত জবাব দিলেন?

—না-মানুষ মানে?

—বনমানুষ বা অন্য কোন জন্তু! আপনি ওখানে পৌঁছাতে না পারলেও দূরবীনের সাহায্য ওদের ক্রিয়াকলাপ দেখতে পারেন...

নয়

পেডার-এর খনির কাছাকাছি জিপে করে যেতে পারলেও খনিতে পৌঁছতে হলে অতি দুর্গম এবং দূরারোহ চড়াই বেয়ে উঠতে হবে। আমি পর্বতারোহী নই, এই চড়াই বেয়ে পর্বতারোহণে আমি অক্ষম। কাজেই শরণাপন্ন হলাম স্থানীয় বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষের। তিনি ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সংক্রান্ত অভিযানে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। বললেন, বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে করে আপনাকে খনির কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি। যতদূর জানি খনিটা ধসে চাপা পড়ে আছে, খনির অবস্থান জানে এমন একজনকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

ঐ খনির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল এমন একজন দীর্ঘদেহী পাঠানকে পেয়ে গেলাম পহেলগাঁওতে। তাকে নিয়ে হেলিকপটারে করে ''পেডার''-এর পর্বতশীর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

লিডর নদের স্রোত অনুসরণ করে দু'পাশের পর্বতমালার মাঝখান দিয়ে শেষনাগ পর্বতের অভিমুখে চলতে থাকি। শেষনাগ পেরিয়ে বনাকীর্ণ অধিত্যকার (প্ল্যাটো) ওপর দিয়ে যেতে যেতে জনমানবহীন প্রস্রবণ গিরির তলায় একটি প্রায় আধ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের পাথরের চাতালের ওপরে হেলিকপটার নামিয়ে পাইলট বললেন, সামনেই পেডার পাহাড়, নেমে যান এখানে যা যা করার করুন, হেলিকপ্টার নিয়ে আমি ফিরে চলে যাচ্ছি। আগামীকাল এসে আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব পহেলগাঁও..

'আমার যা যা করার তা' করা হয়ে গেলে পর থাকব কোথায় বলতে পারেন?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—না, আমি বলতে পারব না। আপনার পাঠান সঙ্গীটি হয়তো তার ব্যবস্থা করবে...

আমাকে কোন ব্যবস্থা করতে হবে না।—আমার সঙ্গী ইউসুফ খাঁ বললে পাহাড়ে খনির গেস্ট হাউজ আছে সেখানেই থাকবেন...

হেলিকপ্টারটি যেখানে নেমেছে সেখান থেকে কিছুটা দূরে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ের পাথর খোদাই করা গুহার মতো ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল আমাকে ইউসুফ খাঁ। খাটবিছানা ও চেয়ার টেবিল ছাড়া রান্নার সরঞ্জাম এবং কেরোসিনের স্টোভ পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে এখানে।

ইউসুফ খাঁ বললে, দেখতেই তো পাচ্ছেন, আপনার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, নিশ্চিন্ত মনে আপনার কাজ সেরে ফেলুন...

আমার কাজ সেরে ফেলতে পারি না, কারণ খনিটাকে খুঁজে পাই না।

খনি কোথায় ইউসুফ খাঁ?—প্রশ্ন করলাম আমি।

এই পাহাড়েই ছিল!—ইউসুফ খাঁ জবাব দিল দশ বছর আগে খনির মধ্যে ঢুকে খোঁড়াখুঁড়ি করেছি। ধসে চাপা পড়ে গিয়েছে খনিটা।

—ধস খনির সঙ্গে খনির মধ্যে যারা কাজ করত তাদের খুন করেছে, তাই না ইউসুফ খাঁ?

—ধস যখন খনিটাকে চাপা দিল তখন আমি এখানে ছিলাম না, কাজেই খনির সঙ্গে খনিতে চাপা পড়ে কজন মারা পড়েছিল তা আমি বলতে পারব না...

—মহাকালের মন্দিরের মোহান্ত বলছিলেন যে খনির মধ্যে মানুষ নয় ''না-মানুষরা'' খননের কাজ করত। ঐ খনিতে তো তুমি কাজ করেছ, এই ব্যাপারে তোমার বক্তব্য বল...

—খনির মজুররা বন মানুষের চামড়ার পোশাক পরে খনির মধ্যে ঢুকে কাজ করত বলে মনে হত যেন বনমানুষরা খনির মধ্যে কাজ করত। বেঁটে খাটো তিব্বতী কুকুরদের সাহায্য নেওয়া হত যে সব গর্তে মানুষরা ঢুকতে পারত না সেই সব গর্ত থেকে পাথর বের করে আনার জন্য। খনির মধ্যে কাজ করার সময় বন মানুষের পোশাক

পরে কাজ করার সুবিধা হল, যে সব ছোট ছোট মণিরত্ন হাত দিয়ে কুড়িয়ে তোলা যেত না তারা চামড়ার লোমে এঁটে যেত। এমনি করে অনেক দামি পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে, আমি নিজেও এমনি করে লক্ষ লক্ষ টাকা দামের পাথর খনি থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলাম...

—সেই সব পাথরের একটাও আমাকে দেখাতে পার? পাথরটা আমি নেব না, দেখব এবং আমার যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করব...

—না পারব না, কারণ সেই সব পাথরের একটাও নেই আমার কাছে। খনন করা সব পাথর খনি থেকে বেরিয়ে আসার আগে খনির মালিকের কাছে জমা দিতাম। বনমানুষের রোমশ চামড়া দিয়ে তৈরি যে পোশাক পরে খনির মধ্যে কাজ করতাম, সেই পোশাকটাও মালিকের কাছে জমা দিতাম খনি থেকে বেরিয়ে আসার আগে, পরদিন সকালে খনিতে ঢোকার আগে পোশাকটা পরে নিতাম...

ধস চাপা পড়া পাহাড়ের খাড়া চড়াইটার ওপরের দিকে বিশেষ একটি জায়গাকে লক্ষ্য করে ডান হাতের তর্জনি তুলে ইউসুফ খাঁ বললে, ধস আলগা পাথরের স্তূপ বেয়ে ওপরে ওখানে ওঠা সম্ভব নয়। তা ছাড়া উঠেও কিছু করা যাবে না, ধসের মধ্যে খনন করে খনি সুড়ঙ্গে পৌঁছানো যাবে না, কারণ সুড়ঙ্গের শূন্যস্থান ধসের পাথর দিয়ে ভরাট হয়ে গিয়েছি...

খানিকক্ষণ পর্বত প্রমাণ ধস এবং চড়াই উৎরাইয়ের শোভা নিরীক্ষণ করে আমি ইউসুফ খাঁয়ের নির্দেশমত গুহাভবনে ঢুকে পড়লাম। আমাকে অনুসরণ করে ইউসুফ খাঁ বললে, খনিতে ঢোকা যখন অসম্ভব, তখন অহেতুক বাইরে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে ঢুকে বিশ্রাম করুন। চান তো বিছানায় শুয়ে পড়তে পারেন। আপনার জন্য রসুইয়ের ব্যবস্থা করছি, সামান্য কিছু রসদ সঙ্গে নিয়ে এসেছি...

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ইউসুফ খাঁ-এর রান্না শেষ হল, রুটি ও রাজমার তরকারি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে আমার রুকস্যাক ব্যাগে করে নিয়ে আসা মিনারেল ওয়াটার দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। ইউসুফ খাঁ যতই সুপেয় বলুক, এখানকার ঝর্ণার জল স্পর্শ করলাম না।

দুপুরে একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পর বাইরে ধুপধাপ আওয়াজ আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। জনমানবশূন্য পাহাড়ে পাথর ধসে পড়লেই এ জাতীয় শব্দ সৃষ্টি হতে পারে। উঠে বসে বাইরে গিয়ে সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করব ভাবলাম।

বাইরে যাবেন না।—চাপা উত্তেজিত স্বরে বললে ইউসুফ খাঁ।

কেন?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—কেন পরে বলছি। এখন এখানে চুপচাপ বসে থাকুন...

দশ

পাথর ধসে পড়ার ধুপধাপ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। এই শব্দের তীব্রতা ক্রমশ বেড়ে চলল। আমার মনে হল যেন নতুন করে ধস নামতে শুরু করেছে পাহাড়ের ওপর থেকে।

শব্দের মাত্রা বেড়ে চলা আমাকে উত্তেজিত করে তুলল। ইউসুফ খাঁ পাশের ঘরে ঢুকে পড়েছিল, চিৎকার করে ডাকলাম আমি তাকে।

আমার ডাকে সাড়া দিন না, ইউসুফ খাঁ। আবার ডাকলাম। ইউসুফ খাঁ নীরব। তার নিষেধ অমান্য করে বেরিয়ে এলাম ঘরের বাইরে।

বাইরে বেরিয়ে শব্দ অনুসরণ করে তাকালাম পর্বতশীর্ষের দিকে। সেখানে ধসের পর্বত ও পাথরের স্তূপটি নড়াচড়া করছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন ধসের মধ্যে চাপা পড়া কেউ বা কারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

মাটি পাথরের স্তূপের নড়াচড়ার সঙ্গে প্রস্তর বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার পায়ের কাছেও এসে পড়ল কয়েকটি পাথর। আমি পাথরগুলো কুড়িয়ে নেবার উপক্রম করতেই আমার দৃষ্টির আড়ালে কারা যেন সমস্বরে গর্জে উঠল, খবর্দার, একটা পাথরও যদি কুড়িয়ে নাও পাথর দিয়ে তোমার মাথা ভাঙা হবে। প্রাণে বাঁচতে যদি চাও ঢুকে পড় গুহা ঘরের মধ্যে...

ঘরে ঢুকে ইউসুফ খাঁয়ের মুখোমুখি হলাম। গম্ভীর মুখে কঠোর স্বরে সে বললে, আমার নিষেধ না মেনে মরতে যাচ্ছিলেন তো?

কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?—পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি, আমার ডাক শুনে তুমি এলে না বলেই আমি বেরিয়ে গেলাম...

—আমি আমার কাজ করছিলাম। ধস নামার দরুণ আমরা খনির মধ্যে ঢুকতে পারছিলাম না বলে আমাদের পোষা কুকুররা খনি থেকে পাথর নিয়ে এসে ফেলে দিচ্ছিল। সেই সব পাথরের কিছুটা আমার কাঁধের ঝোলায় তুলেছি...

—দেখাবে আমাকে?

—দেখাব, কিন্তু বিক্রি করতে পারব না। কিনতে হলে শ্রীনগরে যেতে হবে আপনাকে...

—কিনব না, শুধু দেখব এবং স্পেক্ট্রোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করব...

ইউসুফ খাঁর পরণে জোব্বা, জোব্বার বড় আকারের পকেট থেকে বের করল একটি থলি। থলি থেকে কয়েকটি পাথর বের করে টেবিলের ওপরে রাখল।

প্রায় অন্ধকার ঘর, টেবিলে রাখা কেরোসিনের ছোট ল্যাম্প ঘরটাকে আংশিক ভাবে আলোকিত করেছিল। পাথরগুলো টেবিলে রাখতেই অপরূপ নীলরঙের জৌলুস ফুটে উঠল।

পরীক্ষা করে দেখলাম পাথরগুলি বহুমূল্যবান নীলা বা স্যাফায়ার। বিরল সংখ্যক রক্তমুখী নীলাও চোখে পড়ল।

নীলা ও রক্তমুখী নীলায় অপরূপ জৌলুস প্রকাশ পেলেও তারা স্বয়ংপ্রভ নয়।

চোমোলহরির পর্বত শীর্ষে গুহামন্দিরের লিঙ্গ থেকে আলোকের যে ঝর্ণাধারা বেরিয়ে আসছে তা এই সব পাথরে প্রকাশ পাচ্ছে না। অর্থাৎ চোমোলহরির গুহামন্দিরের লিঙ্গে যে পাথর আছে তা এই পাথর নয়। স্বয়ংপ্রভ লিঙ্গ যে পাথর (যাকে নীললোহিত বলে জানি) খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল সে পাথর এই নীলা বা রক্তমুখী নীলা নয়। "পেডার" পর্বতের খনি নয় অন্য কোনও খনিতে পাওয়া গিয়েছিল, উজ্জ্বল, আলো বিকিরণকারী তথাকথিত "নীললোহিত"।

টেবিলের ওপরে সাজিয়ে রাখা নীলা এবং রক্তমুখী

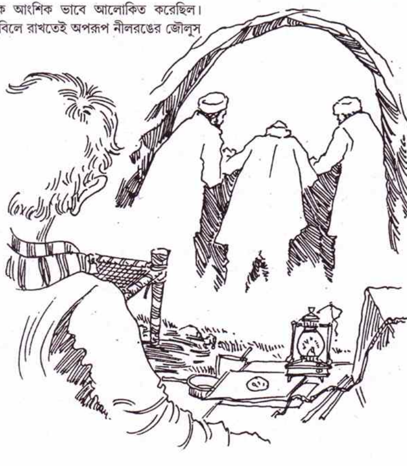

নীলার দিকে আমার নিস্পৃহ দৃষ্টিপাত অবাক করল ইউসুফ খাঁকে। সে বললে, ব্যাপার কি বাবুসাহেব, দুনিয়ার সেরা নীলা ও রক্তমুখী নীলা আপনাকে খুশি করতে পারল না?

না।—আমি বললাম আমি যে পাথর খুঁজছি তা থেকে সার্চ-লাইটের মত চোখ-ধাঁধানো আলো বেরিয়ে আসে, এই ঘরকে আলোয় ভরে দেয়। তিনশো বছর আগে এমন একটি পাথর দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করা হয়েছিল। মহাকালের মন্দির থেকে তাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। সরিয়ে ফেলে যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানকার হদিস সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। সেখানে গিয়ে অবশ্য শিবলিঙ্গটিকে দেখতে পাইনি, দেখতে পেয়েছি তার আলো...

—এমন ভুতুড়েপাথরের গল্প শোনা-যায়, চোখে দেখা যায় না...

—স্বচক্ষে আমি তার আলো দেখেছি...

—আলো দেখেছেন, তাকে দেখেননি—আলোটাও ভুতুড়ে...

—পুঁথিপত্র পড়ে জেনেছি যে এই পাথরের নাম নীললোহিত, এক ধরনের রক্তমুখী নীলা, আলো বিকিরণকারী রক্তমুখী নীলা...

এমন সময় গুহা-ঘরে ঢুকল ইউসুফ খাঁ-এর চেয়েও বলিষ্ঠ গড়নের দু'জন পাঠান, ইউসুফ খাঁ-র হাত ধরে বললে, চল আমাদের সঙ্গে...

তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার দরকার কি?—ইউসুফ খাঁ বললে আমি এখানে থেকেই কাজ করব...

—না, আমাদের সঙ্গেই তোমাকে থাকতে হবে....

—কাল সকালে বাবুসাহেবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হেলিকপটার আসবে, তাঁকে হেলিকপটারে তুলে দিয়ে যাব আমি তোমাদের ডেরায়...

—তাঁকে হেলিকপটারে তুলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে ঐ হেলিকপটারে করে তুমি পালিয়ে যাবার মতলব আঁটছ তো?

—না। হেলিকপটার যখন আসবে তখন তোমরাও চলে এস, তোমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যাওয়াকে অনায়াসে আটকাতে পারবে...

—আর কিছুক্ষণ বাদে মাঝরাত্রি নাগাদ ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা শুরু হবে এখানে, তুমি নিশ্চয়ই তার ফাঁদে পড়তে চাও না...

—তা চাই না, কিন্তু আমার অতিথি বাবুসাহেব এখানে একা থেকে তার ফাঁদে—পড়ে যান, তা-ও চাই না...

—তুমি না চাইলেও তিনি চাইছেন। ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার সঙ্গে মোকাবিলা একাই করুন তিনি, তুমি চল আমাদের সঙ্গে...

বলে ইউসুফ খাঁ-র হাত ধরে তাকে নিয়ে গুহা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তারা।

এগারো

ওরা চলে যাওয়ার পর ইউসুফ খাঁয়ের রান্না করা মাংস ও রুটি খেয়ে বিছানায় শুয়ে ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকি। ঘরের মধ্যে ছোট একটি কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছিল, তার ক্ষীণ আলো ঘরের অন্ধকারের মধ্যে একটি ছোট আলোর বৃত্ত রচনা করেছে। হঠাৎ এই আলোর বৃত্তটি প্রসারিত হতে শুরু করল এবং আঁধার ঘর আলোয় আলোকময় হয়ে উঠল।

বিছানায় শুয়ে ছিলাম, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। চারদিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝলাম যে আলোর উৎস ঘরে নয়, বাইরে। বাইরের দিকে বন্ধ দরজার পাল্লার ফাঁক এবং খোলা জানালা দিয়ে বাইরের হঠাৎ আলোর ঝলকানি ঘরের ল্যাম্পের আলোকে চাপা দিয়ে এই ঘর এবং পাশের ঘরকে উদ্ভাসিত করে তোলে।

বেরিয়ে এসে চোমোলহরি পর্বতশৃঙ্গের গুহামন্দিরের মত একটি গুহামন্দিরের মুখোমুখি হলাম। গুহাভবনের সমকোণে পাথর-টিলার সামনের অনেকটা পাথর সরে গিয়ে একটি আলোয় উদ্ভাসিত গুহাকে অপাবৃত করেছে। গুহার ভেতরটা আলো উজ্জ্বল, উপরন্তু গুহার ভেতর থেকে আলোর স্রোত বেরিয়ে আসছে।

"আলোকের এই ঝর্ণাধারার" উৎস গুহার মধ্যে উহ্য, গুহার মধ্যে একটি গহ্বরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে আলোর স্রোত। গুহার মধ্যে ঢোকা সম্ভব নয়, ভুটানের চোমোলহরি পর্বতের গুহামন্দিরের গুহার মতো এই গুহার মুখও কাচের মতো স্বচ্ছ স্ফটিকের (কোয়ার্টজ) দেয়াল দিয়ে বন্ধ। গুহার পাথরের সঙ্গে তা একাকার।

কোথাও কেউ নেই, তথাপি নাকে ধূপধুনোর গন্ধ, কানে বাজে পুজোর ঘণ্টার ধ্বনি। বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা নেই, হতবুদ্ধি আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকি, এমন সময় একজন অতি বৃদ্ধ ফকির আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে

বললেন, গুহামন্দিরের মধ্যে পুজো চলছে। রোজ রাতে এই সময় বাইরের পাথরের দেয়াল সরে যায়, ভেতর থেকে আলো বেরিয়ে আসে এবং পুজো শুরু হয়ে যায়। কে বা কারা এই সব করে জানি না...

—স্থানীয় লোকেরা বোধ হয় এই ব্যাপারটাকে ভুতুড়ে বলে এই সময় এখানে থাকতে ভয় পায়, তাই নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি ভয় পাই না, ব্যাপারটাকে ভুতুড়ে বলে মনেও করি না। পাহাড়ের নীচে মসজিদের পাশে দরগায় থাকি আমি, রোজ রাতে ঠিক এই সময় এখানে আসি...

—আমিও ব্যাপারটাকে ভুতুড়ে বলে মনে করি না। গুহামন্দিরের মধ্যে ঢুকতে পারলে যারা পুজো দিচ্ছে তাদের মুখোমুখি হতে পারতাম। অবশ্য তাদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে নীললোহিত পাথর দিয়ে তৈরি লিঙ্গটি দেখা ও পরীক্ষা করার সুযোগ পেলে খুশি হতাম। নীললোহিত বা রক্তমুখী নীলা স্বয়ংপ্রভ নয়। যে-সব পাথরের স্বয়ংপ্রভ বলে জানি, এতটা স্বয়ংপ্রভ তারা নয়, আমি যতদূর জানি কোন স্বয়ংপ্রভ পাথর থেকে এমনি চোখ ধাঁধানো আলো বেরিয়ে আসে না...

—এমন অনেক কিছু আছে যা আপনার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। স্বর্গীয় তেজে তেজিয়ান স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল দুটো শিবলিঙ্গের আকারের পাথর। তাদের একটি এখানে প্রতিষ্ঠিত, অন্যটিকে মহাকালের মন্দিরে...

—কি করে জানলেন আপনি এসব?

—প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে। বিবরণটি একটি পুঁথিতে লিপিবদ্ধ, আমাদের মসজিদের পুঁথিঘরে এই পুঁথিটি পেয়েছিলাম। স্বর্গ থেকে তার নেমে আসা স্বচক্ষে দেখেছিলেন তিনি। এখানকার খনিতে এই মণি তো আপনি খুঁজে পাননি, খননকারীরাও এমনি চোখ ঝলসানো মণির সন্ধান পায়নি...

কলকাতায় ফিরে এসে আমার সহ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে নীললোহিতের লিঙ্গ আকাশ থেকে নেমে আসা উল্কাপিণ্ড খোদাই করে তৈরি করা হয়েছিল।

কিন্তু দুটি গুহামন্দিরের প্রবেশপথে স্ফটিকের দেয়াল কি করে তৈরি হল তা বুঝতে পারি না আমরা। অতি উচ্চমাত্রায় তাপ প্রয়োগ করে স্ফটিক পাথর গলিয়ে তা করা হয়েছিল। তিনশো বছর আগে তা করা হল কি করে আমাদের বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না।

অত্যধিক তাপ সৃষ্টির প্রযুক্তি তখন সম্ভব ছিল না, সম্ভবত প্রকৃতিকৃত প্রক্রিয়ায় পাথর গলে গিয়ে স্ফটিকের আবরণ তৈরি করেছিল। চোমোলহরি পর্বতের গুম্ফার লামা বলেছিলেন যে ভূগর্ভ থেকে অত্যধিক তাপ ফাটলের ফাঁক দিয়ে উঠে এসে পাথর গলিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। গুম্ফার দিনলিপির পুঁথিতে তা নথিবদ্ধ অনুরূপ প্রক্রিয়ায় পেডার পর্বতের গুহামন্দিরের প্রবেশ পথটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে আমি আন্দাজ করি।

এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে লাভ নেই, কারণ যেভাবেই গুহার প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে থাকুক, তা পুরোপুরি দুর্ভেদ্য। দুর্ভেদ্য স্ফটিকের দেয়াল দিয়ে দুটি গুহামন্দিরেরই প্রবেশপথের বন্ধ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর, আমাদের বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না!

আমাদের বুদ্ধিতে ব্যাখ্যাহীন হলেও পেডার পর্বতের দরগার ফকির তার ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন, ঈশ্বর প্রেরিত দেবমূর্তির সুরক্ষার ব্যবস্থা ঈশ্বরই করেছিলেন, নীললোহিতের লিঙ্গদুটিকে গুহামন্দিরের মধ্যে একই পদ্ধতিতে সুরক্ষিত করেছিলেন তিনি। তাঁর মতে দৈবশক্তির প্রয়োগে যার সৃষ্টি তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে লাভ নেই।

অমীমাংসিত থাকে আর একটি প্রশ্ন। পেডার পর্বতের গুহামন্দিরের মধ্যে পূজার্চনা হয় কি করে? কারা করে? পেডার পর্বতের নিচে মসজিদের পার্শ্ববর্তী দরগার ফকির এ নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ বা প্রশ্ন করতে নিষেধ করলেন।

এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ ফকিরের মুখের পানে তাকিয়ে আমার মনে হল এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর জানা থাকলেও তিনি বলবেন না।

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

অনুভবের গল্প

দুধসাগর

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

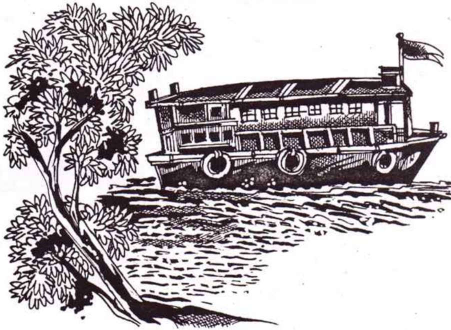

অনেক রাতে দীপুর ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে হঠাৎই যেন খেয়াল হয় না, কোথায় রয়েছে সে। তারপর একে-একে মনে পড়তে থাকে সব। সন্ধ্যাবেলায় তাদের স্টিমার ছেড়েছে বরিশাল থেকে। রকেট স্টিমার। কাল খুব ভোরবেলা ওরা পৌঁছে যাবে খুলনা। সেখান থেকে এক্সপ্রেস বাস ধরে কোলকাতায়। নীচের ইঞ্জিনঘর থেকে অবিশ্রান্ত শব্দ ভেসে আসছে। প্রপেলারের তীব্র ঘূর্ণনে পথ মেলে দিচ্ছে নদীর জল। অনেকক্ষণ কেবিনের মধ্যে শুয়ে সেই তোলপাড় করা শব্দটাকে অনুভব করলো দীপু। অল্প পাওয়ারের কেবিন বালব্‌টা কেঁপে-কেঁপে উঠছে জলের আন্দোলনে। এখন আর ঘুম আসবে না। পাশে অঘোরে ঘুমুচ্ছে বাবা। ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ ও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ওর চোখে যে ঘুম নেই। বালিশের পাশে রাখা আধখোলা গল্পের বইটাকে এবার বুজিয়ে রাখলো দীপু। বাংলাদেশের নামকরা শিশু সাহিত্যিক মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা, টুকুন জিল। কি ভালোই যে লাগছে তার!

একটু পরেই কেবিনের দরজাটা সামান্য ফাঁক করে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। ঘুমের মতো শিথিল আলো জ্বলছে একটা দুটো। মনে হয় কেউ জেগে নেই। আপার ডেকের ওপর রঙীন সতরঞ্চি বিছিয়ে আরামে ঘুম দিচ্ছে অসংখ্য যাত্রী। তাদেরই একপাশ দিয়ে সাবধানে পথ করে দীপু এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালে। হাওয়া, তোলপাড় হাওয়ায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব। সেই সঙ্গে জলের এক অদ্ভুত গন্ধ। এমন গন্ধ আগে সে কখনো পায়নি। নীচের ডেক থেকে শোনা যাচ্ছে খালাসিদের দেশীয় ভাষার কথাবার্তা। ঘুম জড়ানো অস্পষ্ট বেসুরো গলায় কেউ বুঝি গান গেয়ে উঠলো। অবশ্য সে গানের অর্থ দীপু মোটেই

বুঝতে পারলো না।

রেলিং ধরে সে তাকিয়ে রইলো ঘূর্ণমান জলের দিকে। আজ পূর্ণিমা, হঠাৎই মনে পড়ে গেল তার। আর অবাক হয়ে যাওয়া চোখে সে দেখলো, নদীর জল জোছনায় কেমন চকচকে সাদা হয়ে উঠেছে। স্টিমারের উজ্জ্বল সার্চলাইট ছড়িয়ে পড়েছে অনেক-অনেক দূর পর্যন্ত। মাঝে মাঝে কেমন অচেনা শব্দে বেজে উঠছে স্টিমারের ভোঁ। কেমন যেন লাগে এ সময়। বুকের মাঝখানটা শিরশির করে ওঠে দীপুর। হাওয়ার নিয়ম ভাঙা হল্লাট এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার চোখেমুখে। এক মাথা ঘন চুল অবিন্যস্ত হয়ে যায়। তবু স্টিমারের রেলিং থেকে সরে আসে না দীপু। ওর মুগ্ধ চোখের সামনে শুধুই এখন রাজকীয় মহার্ঘ ভোজ।

বরিশালের স্টিমার ঘাটায় বিদায় জানতে এসেছিলেন বাবার কলেজ জীবনের এক পুরনো বন্ধু। সঙ্গে তার ছেলে সিরাজ। অল্প-ক'দিনেই ভারী দোস্তি হয়ে গিয়েছিলো সমবয়সী ছেলেটির সঙ্গে। শ্যামলা রঙের ছেলেটির চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। মুখে সবসময় লেগে আছে হাসি। সিরাজ খুব ভালো আড়বাঁশি বাজায়। বি এম স্কুলের সংলগ্ন বিশাল মাঠে বসে কয়েকটা দিন সন্ধ্যাবেলা সে শুনেছে সিরাজের মিষ্টি বাঁশির সুর। আগে কখনও এমন নিবিড়ভাবে সে আড়বাঁশি শোনেনি। শুনতে-শুনতে কি এক মন খারাপ করা অনুভূতিতে চোখে তার জল এসে গিয়েছিলো। হঠাৎই বাঁশি থামিয়ে দিয়েছিলো সিরাজ। ধ্যাৎ তুই কাঁদছিস আর বাজাবো না। সঙ্গের ঝোলানো ব্যাগটায় বাঁশিটা পুরে ফেলেছিলো সে। দীপু তখন তাকে বলতে পারেনি, মার কথা বড্ড মনে পড়ছিলো তার। সেই কবে দুবছর আগে সবাইকে কাঁদিয়ে মা চলে গেছে অনেক দূরের এক দেশে। সেখান থেকে কেউ আর কোনদিন ফিরে আসে না। সিরাজ ওর হাত দুটো ধরে আশ্চর্য নরম গলায় বলেছিল—কাঁদিস না দীপু কাঁদিস না। আমরা তো সবাই আছি। চল উঠি এবার। জোছনার অজস্র জল-মুকুলের দিকে তাকিয়ে সে কথা মনে পড়ছিল দীপুর।

ঘোড়ায় টানা পুরনো দিনের গাড়ি এখনও রয়ে গেছে শহরে। হাড় জিরজিরে ঘোড়া ধুঁকতে-ধুঁকতে দৌড়ায়। তেমনি একটা গাড়িতে চেপেই ওরা আলেকান্দা থেকে এসেছিল স্টিমার ঘাটায়। রাস্তাঘাট ঝকমকে নতুন। পথে পড়লো একটা ঝাঁ চকচকে সিনেমা হল। আগে এই হলটার নাম ছিল জগদীশ সিনেমা। এখন নতুন কি যেন নাম হয়েছে। পিল-পিল করে শো ভাঙার পর লোকজন বেরিয়ে আসছে। বাবার প্রথম জীবন আর কলেজ পড়ার দিনগুলো কেটেছে এই শহরেই। স্মৃতি ভারাতুর সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল বাবার। দীপুর কাঁধের ওপর বাবার হাত। কোর্ট কাছারিকে পিছনে রেখে এক সময় ঘোড়ার গাড়ি এসে ঢুকলো স্টিমার ঘাটায়।

টিকেট আগেভাগেই কাটা। এখানে জলের কেমন এক সোঁদা গন্ধ। সেই সঙ্গে গা ঘুলিয়ে দেয় শুঁটকি মাছের তীব্র গন্ধ। জেটির ওপর দিয়ে পাতা গ্যাং ওয়ে চলে গেছে স্টিমার পর্যন্ত। চারপাশে লোকজনের গিজগিজে ভীড়। কথাবার্তা আর হাসির হল্লাট। সন্ধ্যার স্টিমারঘাটায় ভেপার গ্যাসের আলোয় ঝলমলে চেহারা। দু-পাঁচ মিনিট স্টিমার ঘাটার বাইরে হাঁটলেই ছিমছাম চেহারার বেলস্ পার্ক। বাবার কাছে শুনেছে সে কত গল্প। জিলা স্কুলের ডাকসাইটে ফুটবল খেলোয়াড়েরা প্রাকটিস করত এখানে। বাবাদের সেই বয়সে কি ভীড়ই না জমে যেতো পার্কের চারপাশে।

সকালবেলা সিরাজের সঙ্গে সাইকেল চেপে দীপু একদিন এসেছিলো। ইতস্ততঃ ছড়ানো বেশ কিছু বকুলের গাছ। ভোরবেলার ঠাণ্ডা ঘাসের ওপর ফুলগুলো ছড়িয়ে থাকত। ঠিক যেন তারাখসা ফুল। ওরা কাঠের বেঞ্চিতে বসে দেখত, দুধের ক্যানগুলো সাইকেলে ঝুলিয়ে ভোরবেলার ব্যবসায়ীরা বেরিয়ে পড়েছে সার বেঁধে। ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং সিরাজ হেসে বলেছিল, চড়াই পাখির কিচির মিচির শব্দ। অনেকক্ষণ শোনা যেতো সাইকেলের ধাতব বেলের সেই আওয়াজ। ফেরার পথে এখানকার নামকরা বুড়ো কাশী ময়রার মিঠাই-এর দোকানে মজা করে গুগাবাবার মতো পেল্লায় রাজভোগ খাওয়া আর সেইসঙ্গে বাদশাহী চমচম।

বাবার বন্ধু রফিক কাকু জিলা স্কুলে বাংলা পড়ান। ওর কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বলেছিলেন—আবার এসো দীপু, বাবার সঙ্গে। সিরাজ ওকে উপহার দিয়েছিলো দুটো গল্পের বই। তার মধ্যে একটা বই-এর নাম ভারী মজার। চিংড়ি-ফড়িং-এর জন্মদিনে। দীপুও অবশ্য খালি হাতে তাকে ফিরিয়ে দেয়নি। বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় সঙ্গেই ছিল। সেটা দিয়েই প্রতি বিনিময় করেছে। হাসিমুখে বলেছিলো—আবার আসব রে সিরাজ। তোর কাছ থেকে

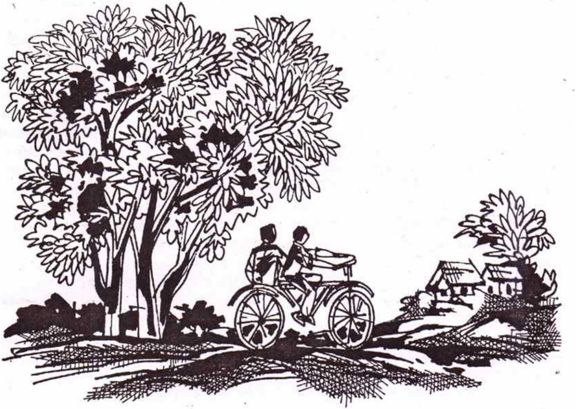

বাঁশি বাজানো শিখতেই হবে। দু জোড়া চোখের সরল-স্বচ্ছ আনন্দ মিশে গিয়েছিলো এক সাথেই। হঠাৎই সবাইকে সচকিত করে বেজে উঠেছিলো স্টিমারের দীর্ঘ ভোঁ। রফিককাকু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন আর দেরী নয়, উঠে পড়ো তোমরা, বাবার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কেমন ভেজা গলায় বলেছিলেন—আবার আসিসরে মণ্টু। তোদের দেখলে সেই পুরনো দিনগুলো যেন ফিরে আসে।

এখন স্টিমারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সেই খণ্ড খণ্ড ছবিগুলো যেন কোলাজের মতো গাঁথা হয়ে যাচ্ছে তার মনের সঙ্গে। ঘূর্ণমান জলের তুমুল শব্দ মিশে যাচ্ছে হাওয়ায়। প্লাবিত জোছনায় বুঁদ হয়ে আছে চরাচর। নক্ষত্র বীথি আকাশ থেকে যেন গলে-গলে পড়ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। মাথার ওপরে অখণ্ড চাঁদ। বুকের মধ্যটা দুলে ওঠে তার তীব্র আবেগে। আবার কি কোনোদিন এখানে আসার সুযোগ হবে। এমনি করে আসবে, সুযোগ হলে আর একবার অন্তত সে আসবে। আনন্দের এক অদ্ভুত শিহরণ ছড়িয়ে যায় তার বুকের মধ্যে। নিসর্গের তীব্র সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়ে দীপু যেন হারিয়ে ফেলেছে মুখের ভাষা।

স্টিমার এখন পাড়ের অনেকটা কাছ ঘেঁষে যাচ্ছে। দীপু দেখতে পেলো বিস্তীর্ণ ফসলের খেত দুধের মতো জোছনায় ক্রমশঃ ভিজে উঠছে। নারকেল আর সুপুরি গাছের দীর্ঘ মাথা চকচক করে উঠছে মোম জোছনায়। কোথাও আবার ঘন বুনোট বনের মধ্যে গলে-গলে পড়ছে সেই মায়াবী আলো। দূর পাড়ে কোথাও যেন দপ করে জ্বলে উঠলো এক ঝলক আলো। ওটাই কি আলেয়া। দীপু শুনেছে তার কথা, চোখে দেখেনি কখনো।

প্রপেলারের বিপুল ঘূর্ণনে ভেঙে যাওয়া সাদাটে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে নদীর পাড়ে। গভীর রাতে ঘূর্ণমান জলের এই তুমুল শব্দ তাকে যেন বিপুল বিস্ময়ে

অবাক করে দেয়। সবকিছু কেমন যেন গণ্ডগোল হয়ে যায় দীপুর।

হঠাৎই ও চমকে ওঠে। ওর চোখে পড়েছে উল্টোদিক থেকে আর একটা আলোকোজ্জ্বল স্টিমার ওদের ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। গম্ভীর ভোঁ বেজে ওঠে রাতের আকাশে। দীপু একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। উপরের ডেকে কেউ আর জেগে নেই এখন। যেন নিদালির কুহক মন্ত্রে ঢলে পড়েছে সবাই। যেন এক অদেখা ঘুমের দেশে পাড়ি দিচ্ছে ঐ দূরের জলযান। ঘুমন্ত মানুষজনেরা সে খবর হয়তো রাখে না। দীপুর মনে পড়লো এক-এক করে ছেড়ে আসা বিচিত্র সব বন্দরের নাম। নলটিটি, ঝালকাঠি, কাউখালি, হুলার হাট, আরও কত কি নাম। যেন অদ্ভুত সব নাম আর বিচিত্র ছবির অনিঃশেষ মিছিল। বাবার ছোটবেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ সব নামের মধ্যে। দূর থেকে দূরে কখন যে দিগন্ত রেখায় মিশে গেছে ঐ সব জলবন্দর। দীপু জানে আর কোনোদিন এ সব বন্দরে তার আর আসা হবে না। নির্জন রাতের ঐ চলে যাওয়া স্টিমার বুঝি পাড়ি জমাচ্ছে ঐ দিকেই।

স্টিমারের ভোঁ মিলিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরেও কেমন এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে দীপু। জোছনায় ডুবে যেতে-যেতে চমকে ওঠে এক সময়। আর তো দেখা যাচ্ছে না নদীর পাড়। গাছপালা আর ফসলের খেত। স্টিমার যেন হঠাৎই এক দিক চিহ্নহীন অনন্ত—অসীম পারাবার-এ ঢুকে পড়েছে। অবাক হয়ে যায় দীপু। এ কোথায় ভেসে চলেছে তাদের রাতজাগা জলযান! শুধু ফিনফিনে জোছনার বিপুল বিস্তার চারদিকে। তক্ষুনি ওর অনেক দিন আগে মায়ের মুখে শোনা সেই পুরনো রূপকথার গল্পটা মনে পড়ে যায়।

দুধসাগর! এতক্ষণে মনে পড়েছে তার। কি চমৎকার করেই না মা গল্প বলতে পারতো, কবেকার কোন রূপকথার দেশের রাজপুত্তুর পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলো সপ্তডিঙা সাজিয়ে। অনেক দেশ আর বন্দর পেরিয়ে, অনেক সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় ভাসতে-ভাসতে অবশেষে তার জীর্ণ ময়ূরপঙ্খী নাও পৌঁছেছিলো দুধসাগর। সপ্তডিঙা জীর্ণ হতে-হতে কবে ভেঙে তলিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সঙ্গের মাঝিমাল্লারা। শুধু একা রাজকুমার মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্গী করে ভেসে চলেছে সীমাহীন ঐ দুধসাগরের বুকে। সেখানে সমুদ্রের জল লবণাক্ত বিস্বাদ নয়। দুধের মতো সুপেয় আর সুমিষ্ট।

মা-র কথা আবার মনে পড়লো দীপুর। গলার কাছে কি একটা কষ্ট ডেলা পাকিয়ে উঠছে। দীপু যেন আর জোছনা দেখতে পাচ্ছে না, তার চোখের সামনে রূপকথার সেই দুধসাগর যেন ক্রমশই ঝাপসা হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। রেলিং-এর ওপর মাথাটা ঝুঁকে এলো তার। জোছনার অফুরান ঝরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগলো দীপুর চোখের জল। কেউ তা জানতেও পারে না।

ছবি : শংকর বসাক

ইতিহাসের গল্প

দুর্যোগের ঘূর্ণিঝড়ে

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

জানলা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বাদশাহ্। অপরাহ্ণবেলা। আকাশে অস্তসূর্যের রঙিন আভা, ভেসে যাচ্ছে খণ্ড-খণ্ড মেঘ। অনতিদূরে বহে যাচ্ছে শান্ত, স্বচ্ছ যমুনা। দু-তিনটি পালতোলা নৌকো। গোধূলির মায়াবি আলোয় ভরে আছে চরাচর।

দিল্লীশ্বরের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে,—কত কিছুই যে দেখা হল না! দুনিয়া কত সুন্দর। দীন দুনিয়ার মালিক আল্লাতালাহ, তাঁকেও কি জানার সময় মিলেছে? সারাটা জীবন কেটে গল, শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। এখন তাঁর জীবনেও তো গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে, শরীর ভেঙে পড়ছে।

ভাবতে-ভাবতে হুমায়ুনের বুক মুচড়ে ওঠে। সেই কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণ, যখন চোখে প্রথম রং লাগছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ আব্বাজান শাহেনশা বাবর চোখ বুঁজলেন। ব্যস, হিন্দুস্থানের চতুর্দিক থেকে নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দুশমনেরা। দেশের ভিতরে যখন টক্কর দিচ্ছেন, সেই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ধেয়ে এল আফগান শের শাহের ফৌজ। নাহ্, লোকটা সত্যিই বাঘের বাচ্চা। খাঁটি পাঠান, যুদ্ধ কৌশলে অদ্বিতীয়। হুমায়ুন পারলেন না। দিল্লির মসনদ হাতছাড়া হল। রাজ্যপাট ছেড়ে পালাতে হল। সে যে কী অসহ্য সময় কেটেছে জঙ্গল পাহাড়ে গুহাকন্দরে। তখন জীবনের যৌবনকাল, সোনার সময়।

তবে হ্যাঁ, তিনি হাল ছাড়েননি। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। শের শাহের এন্তেকাল হতেই সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে আঘাত হেনেছেন। দিল্লির মসনদে তখন শের শাহের উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহ্। ডরপোক, নাদান ছেলে। হুমায়ুনের আক্রমণে ঝড়ের মুখে কুটোর মাতা উড়ে গেল। দ্বিতীয়বার দিল্লির মসনদে বসলেন হুমায়ুন।

দ্বিতীয়বার দিল্লির মসনদে বসার পরে মাত্র একবছর পার হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই হিমুর সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ, পাহাড়ি

ভিলদের সঙ্গে যুদ্ধ, সামন্তরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ... চলছে তো চলছেই। একদিনের জন্যেও শান্তি নেই। মসনদ কায়েম রাখার জন্য যুদ্ধ করে যেতেই হবে।

অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার নিজের দিকে একটু তাকাতে হবে। দীন দুনিয়ার মালিকের ভজনা করতে হবে, জানতে হবে এই সুন্দর পৃথিবীকে, বিদ্যা-জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

ছেলে আকবরের চোদ্দো বছর বয়স হয়েছে। হুমায়ুন ঠিক করেছেন, এবার ওকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। ওর সঙ্গে বৈরাম আছে, সে ওকে গড়েপিটে ঠিক তৈরি করে নেবে।

বৈরাম খাঁ হুমায়ুনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু শুধু নয়, যুদ্ধের কলাকৌশল, বুদ্ধি-সাহসেও অদ্বিতীয়। চরম দুঃসময়েও বৈরাম তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি, ছায়ার মতো লেগে থেকেছে। সাহস যুগিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে, কূটবুদ্ধি দিয়েছে। আজ যে তিনি হিন্দুস্তানের মাথায় আবার বসতে পেরেছেন, তার পিছনে বৈরামের অবদান সবচেয়ে বেশি।

এবার যখন আফগান-রাজ আদিল শাহ্ আবার উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে হানা দিয়েছে, হুমায়ুন নিজে যাননি। আগ্রার এই কেল্লায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। বৈরাম আকবরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত খবর এসেছে, ভালোই লড়ছে আকবর। আদিলের দলবল প্রথম মোলাকাতে কুপোকাত হয়েছে মুঘলবাহিনীর কাছে।

—বন্দেগী জাঁহাপনা!

হুমায়ুনের ঘোর কেটে গেল। কুর্নিশ করে এসে দাঁড়িয়েছে খাস খানসামা ইস্রায়েল। তিনি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালেন।

—হুজুর, সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছি। মেহেরবানি করে—

হুমায়ুন মৃদু হাসলেন। বললেন,—চলো।

মহার্ঘ পালঙ্কে দামি গালিচা পাতা। সোনার রেকাবিতে বাদশাহের প্রিয় ফল আঙুর, আপেল, পেস্তা, আখরোট সাজানো। পাশে পানপাত্র। ইস্রায়েল বড় একটি পাত্র থেকে অল্প-অল্প করে পানীয় ঢালে। হুমায়ুন চুমুক দিতে থাকেন।...

সময় বহে চলে...স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিয়ে বেখেয়াল সম্রাট চুমুক দিয়ে চলেন পানীয়ে...

একসময় ইস্রায়েল মৃদুস্বরে বলে, আলমপনা, বেশি হয়ে গেছে।

চোপরাও।—জড়িতস্বরে হুমায়ুন ধমকে উঠলেন, —তোর কাজ হুকুম তামিল করা।

বিবশ চেতনা, ঢুলু-ঢুলু চক্ষু হিন্দুস্তানের শাহেনশাহ্‌কে আজ স্মৃতির ভূতে পেয়েছে। তাঁর সামনে থেকে মুছে গেছে বর্তমান, স্থান-কাল-পাত্র। তিনি এখন অতীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।...

একসময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করে, স্খলিত হাত থেকে খসে পড়ে পানপাত্র। অর্ধচেতন হুমায়ুন এলিয়ে পড়েন গালিচায়। ইস্রায়েল বাতি নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়...হুমায়ুন ধীরে-ধীরে চোখ মেলে তাকান...

এ কী। তিনি কোথায়? এত অন্ধকার কেন? কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গেলেন। মাথাটা টলে গেল। শরীর নিজের বশে নেই। পালঙ্কের বাজু ধরে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। অলিন্দ দিয়ে আলোর রেখা এসে পড়েছে ঘরে। সেই দিকে টলমল পায়ে এগোতে গেলেন।

পরক্ষণেই—ইয়া আল্লাহ।

কুর্সিতে পা আটকে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছেন হুমায়ুন। অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে তাঁর গলা চিরে।...

ঘোর অন্ধকার ঢাকা উষর প্রান্তর। মাঝে-মাঝে আলোর বিন্দু।

মুঘল বাহিনী কান্দাহারের অনতিদূরে এই প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেছে। আলোর বিন্দুগুলি সেই শিবিরের।

কাল সকালে আবার যাত্রা শুরু হবে কান্দাহার অভিমুখে। আদিল শাহকে এমন শিক্ষা দিতে হবে, সে যেন আর কখনও হিন্দুস্তান আক্রমণের খোয়াব না দেখে।

রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতিক্রান্ত। বেশিরভাগ শিবিরই নিদ্রামগ্ন। শুধু রাতের টহলদাররা এখনও জেগে। আর জেগে একজন।

তিনিই বকলমে এই যুদ্ধের প্রধান নায়ক। বৈরাম খাঁ।

বৈরাম খাঁর লোমশ ভ্রু কুঞ্চিত। তাকিয়ায় ভর দিয়ে তিনি নির্নিমেষ চোখে চেয়ে আছেন সামনের খোলা কাগজের দিকে। মাঝে-মাঝে বাঁ-হাতের আতশ কাচ ধরছেন কাগজের উপর। মুখে কুটিল হাসি ফুটে উঠছে।

বেয়াদব আফগানটাকে এবার উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ও জানে না, ওর ঠিকানা ঠিকুজি তাঁর হাতের মুঠোয়। আদিল শাহের রাজ্যের মানচিত্র।

হঠাৎ শিবিরের পরদা সরে গেল। কুর্নিশ করে প্রহরী এসে দাঁড়াল।

—জনাবে আলম! দিল্লি থেকে দূত এসেছে।

সোজা হয়ে বসলেন বৈরাম খাঁ। দিল্লির দূত। ভ্রূ কুঞ্চিত। এত রাতে?

—নিয়ে এস।

অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। দূত এগিয়ে এসে একটি মুখবন্ধ খাম তুলে দিল বৈরামের হাতে।

একটানে লেফাফা ছিঁড়ে ফেললেন বৈরাম খাঁ। চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করলেন।

পড়তে-পড়তে প্রৌঢ় বৈরাম খাঁর মুখ শ্রাবণের আকাশ হয়ে উঠল। স্থাণুর মতো তিনি চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে রইলেন।

—হুজুর, জবাব যাবে না?

সংবিত ফিরে পেলেন বৈরাম। বললেন,—জরুর। তুমি বাইরে ইন্তেজার কর, আমি লিখে দিচ্ছি।

দূত কুর্নিশ ঠুকে বেরিয়ে গেল।...

একী চিঠি এল? আচমকা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে সব তছনছ হয়ে গেছে, মূল্যহীন হয়ে গেছে সামনের ওই খোলা মানচিত্র। বৈরাম খাঁর মনের মধ্যেও চলেছে তুমুল ঝড়। জড়পাথরের মতো তিনি তাকিয়ে আছেন শূন্যদৃষ্টি মেলে। তাঁর বোধবুদ্ধি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে।

উপায়? এখন উপায়?

এই মহাসংকট কী করে সামাল দেওয়া যাবে? চতুর্দিকে শ্বাপদরা থাবা বাড়িয়ে আছে, তাদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে কীভাবে পৌঁছনো যাবে কূলে?

যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার, এই মুহূর্তে নিতে হবে। হ্যা, তাঁকেই নিতে হবে। জবাবি চিঠিতে নির্দেশ লিখে পাঠাতে হবে। সময় নেই, মোটেই সময় নেই।

সামনে তুলোট কাগজ, ডান হাতে কলম। অস্থিরভাবে পাশের দোয়াতে একবার কলম ডোবাচ্ছেন, কাগজের উপর ধরছেন। হাত আটকে যাচ্ছে। কী লিখবেন?

পল, অনুপল, মুহূর্ত পার হয়ে যায়...

পরদা সরিয়ে প্রহরী আবার ভিতরে ঢুকল।

—হুজুর দূত জিজ্ঞেস করছে, খত্ লেখা হয়েছে?

কেঁপে ওঠেন বৈরাম—হ্যাঁ। এই দিচ্ছি।

কী জবাব দেবেন? সব চিন্তাভাবনা তালগোল পাকিয়ে গেছে, কোথাও কোনো আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছেন না। নিকষ অন্ধকার।

অকস্মাৎ মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ ঝিলিক। বৈরাম সোজা হয়ে বসলেন। পেয়েছি! পেয়েছি! বৈরামের অন্ধকার মুখের পেশি শিথিল হল।

হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। খসখস করে কাগজে কলম চলতে শুরু করল। কাকপক্ষী জানতে পারলেই সব ভেস্তে যাবে। অতি সূক্ষ্ম সুতোর উপর ঝুলছে পরিত্রাণের পথ। যে-কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে পড়তে পারে। একমাত্র পথ!

—আসালাম আলেকুম চাচাজি।

—ওয়ালেকুম সালাম বেটা। এস বসো।

—চাচাজি, ব্যাপারটা কী, কিছুই বুঝছি না। কাল রাতে আপনার সঙ্গে কথা হল, আজ আমরা আফগানদের পিছনে ধাওয়া করব। আর আজ সকালে সেনাপতি আমায় বলল, আমরা আর এগোচ্ছি না। আপনি নাকি তেমনই বলেছেন।

শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গেছি। আপনি কি আমায় বিশ্বাস করেন না? তাহলে আমায় ঝুট বললেন কেন?

বৈরাম খাঁ কিশোরের পিঠে হাত রাখলেন। বললেন—বেটা আকবর, শান্ত হও। যুদ্ধ চলার সময় কোনো কৌশলই শেষ কথা নয়। অবস্থা অনুযায়ী ছক বদলাতে হয়। তোমায় বলেছিলাম কাল রাতে। তুমি তো জান, ওদের রাজ্যের নক্সা নিয়ে আমি অনেক রাত অব্দি দেখেছি। সব দেখে, শেষে আমার মনে হল, এখনই ওদের রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়া আমাদের উচিত হবে না। আমরা আফগান রাজ্যের কিছুই চিনি না, জানি না। তার চেয়ে দু-চার দিন এখানে থাকি, গুপ্তচর পাঠিয়ে ওদের রাজ্যের খবরাখবর নিই। তারপর এগোনো যাবে। আজ সকালে তোমাকেই আগে বলতাম। কিন্তু তার আগেই আজম এসে জিজ্ঞেস করল, কখন ফৌজ রওনা হবে। তখনও তুমি ঘুম থেকে ওঠনি। বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হল। বেটা, কিছু মনে করো না। এই বুড়ো চাচার গোস্তাকি মাফ করে দাও।...

আকবরের উত্তেজনা নিভে গেল। বৈরাম খাঁকে সে আব্বাজানের মতোই শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, ভালোবাসে। বৈরাম চাচা তাকে ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।

আকবর বলল, কিন্তু চাচা, এতে তো দুশমনরা তৈরি হওয়ার সময় পেয়ে যাচ্ছে। আপনিই তো বলেন, লোহা যখন গরম, তখনই তাতে হাতুড়ি পিটতে হয়। ওরা এখন খারাপ অবস্থায়, এই তো সুযোগ! এরপরে ওরা সামলে নিয়ে যদি ফের আক্রমণ করে, তখন?

—কথাটা তুমি ঠিকই বলছ বেটা। সামলে নেওয়ার মতো সুযোগ ওদের দেওয়া যাবে না। আজকের মধ্যেই ওদের খবর নিয়ে নিতে হবে। দারোয়ান, ফৌজি-আজমকে এত্তেলা পাঠাও।...

শত শত ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধুলো উড়ছে আবিরের মতো। সব ঝাপসা। মুঘল বাহিনী ফিরে চলেছে। খাইবার গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে, পাঁচ-পাঁচটি নদী অতিক্রম করে তারা ফিরে আসছে শ্যামল-সবুজ হিন্দুস্তানের সমতলে।

বিশাল মুঘল ফৌজের একেবারে সামনে সুদৃশ্য দুই-ঘোড়ার শকট। মাথায় ছাউনি, নরম মখমলের গদি। বসে আছেন বৈরাম খাঁ, পাশে আকবর।

আকবরের মাথায় শোভা পাচ্ছে হিরে-মণিমাণিক্যে তৈরি রাজ-উষ্ণীষ। ওই মুকুটের মধ্যেই রয়েছে দুর্লভ কোহিনুর। এখন সে আর যুবরাজ নয়, হিন্দুস্তানের অধীশ্বর শাহেনশা আকবর।

সমস্ত ব্যাপারটা আকবরের কাছে ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে। কিছুটা স্বপ্ন, কিছুটা অলৌকিক। যেভাবে দুদিনের মধ্যে সবকিছু ওলোটপালোট হয়ে গেল, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।

তবে রহস্য নিশ্চয়ই আছে! গভীর রহস্য। কী রহস্য? আকবর ভাবছে, আর ভাবছে। পরপর দুদিনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে। নাহ্, কিছুতেই অঙ্ক মিলছে না।

কী এত ভাবছ বেটা?—পাশ থেকে বৈরাম খাঁ বললেন, —যখনই দেখছি, তুমি গভীর চিন্তায় ডুবে আছ। আমাকে বলবে?

আকবর ঘুরে তাকাল। তার দু-চোখ জ্বলজ্বল করছে, —চাচাজি, আপনি আমার কাছে সাচ্ বাত গোপন করে যাচ্ছেন। প্রথমে ঠিক ছিল, আমরা আদিল শাহের পিছু তাড়া করব। দখল করব আফগানিস্তান। পরদিন সকালে ছক পালটে দিলেন। ফৌজ দাঁড়িয়ে গেল। সেইদিনই রাতে দিল্লি থেকে আব্বাজানের হুকুমনামা এল। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ তিনি আমাকে বাদশার মুকুট পাঠিয়ে মসনদ ছেড়ে দিলেন! কাল আপনি ওখানে সিংহাসন বানিয়ে আমার অভিষেকও করে দিলেন। বললেন, বাবার ইচ্ছেয় আমাদের দিল্লি ফিরে যেতে হবে। সিংহাসন ফাঁকা রাখা যাবে না। বলুন, সব যা ঘটছে, ঠিক আছে? কোনো গুপ্ত কারণ নেই? চাচাজি, আপনি ভুলে যাবেন না, আমি বয়সে ছোট হতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিতে এত ছোট নই। রাজরক্ত বইছে আমার শরীরে।

বৈরাম খাঁ ম্লান হাসলেন। বললেন,—ভুলে যাব কেন বেটা? তুমি এখন দিল্লির সম্রাট। আমি কে? কেউ না। বেটা, যা ঘটছে, সবই করুণাময় খোদাতালার অলক্ষ্য নির্দেশে। ভালোর জন্য। আমরা উপলক্ষমাত্র। দিল্লি চল, সব জানতে পারবে।...

ওই যে, ওই যে দিল্লির প্রধান ফটক। শেরশাহের তৈরি করা রাজপথের উপর প্রখর রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে, দূর থেকে ভেসে উঠেছে আকাশের গায়ে। কিশোর আকবরের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। আর তর সইছে না। কতক্ষণ, আর কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছবে রাজপ্রাসাদে আব্বাজানের কাছে।

সহিসকে সরিয়ে ঘোড়ার লাগামে নিজেই টান দিল, —চল্, চল্ আরও জোরে।

ঝড়ের গতিতে রাজপ্রাসাদের ফটক দিয়ে ঢুকে পড়েছে মুঘল ফৌজ। পথের দুপাশে কাতারে-কাতারে মানুষ। নতুন সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে, ফুল ছুড়ছে। বৈরামের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

আকবরের কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তার চক্ষু নিবদ্ধ রাজপ্রাসাদের অলিন্দের দিকে, খুঁজে ফিরছে বাবা হুমায়ুনকে।

ওই তো, ওই তো আব্বাজান। রাজপ্রাসাদের দোতলার অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন বাদশাহ্ হুমায়ুন। ছেলের উদ্দেশে আস্তে-আস্তে হাত নাড়ছেন। মুকুটহীন কাঁচাপাকা বাবরি চুল হাওয়ায় উড়ছে। পাশে দাঁড়িয়ে ঘোষক। হুমায়ুনের তরফ থেকে যে ঘোষণা করল—নতুন শাহেনশা আকবরকে দিল্লির তখ্তে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে।

পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সুগন্ধি গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ছে অবিশ্রান্ত। সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজসভাসদরা চেঁচিয়ে ওঠেন—জয়! দিল্লিশ্বর আকবরের জয়।

আকবর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। একলাফে গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গেল রাজপ্রাসাদের দিকে।

হকচকিয়ে গেলেন বৈরাম খাঁ। তিনিও পিছন-পিছন প্রাণপণে ছুটছেন আর বলছেন—বেটা থামো। থামো।

কে শোনে কার কথা! আকবর কয়েক লাফে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পৌঁছে যায় অলিন্দে। কিন্তু কোথায় হুমায়ুন, তার আব্বাজান?

অলিন্দ ফাঁকা! কেউ নেই।

বিমূঢ় আকবর দাঁড়িয়ে পড়েছে। ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকছে—আব্বাজান! আব্বাজান!

ততক্ষণে হাঁপাতে-হাঁপাতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রৌঢ় বৈরাম। আকবরের কাঁধ স্পর্শ করে ধীরে-ধীরে বললেন,—চল বেটা। তোমার আব্বাজান নীচে। ঘুমোচ্ছেন।

—মানে?

—হ্যাঁ, বেটা, যাকে তুমি দেখলে, যাকে সবাই দেখছে বাদশা হুমায়ুন বলে, তিনি আসল নন। নকল। হুবহু তোমার বাবার মতো দেখতে। সুরক্ষার কারণে বরাবরই সব সম্রাটদের এরকম নকল খুঁজে রাখতে হয়। তোমার বাবারও ছিল। আর তাকে দিয়েই দিল্লির মসনদটা টিকিয়ে রাখতে পারলাম।

আকবরের বাক্শক্তিরহিত। বিস্ময়ের ধাক্কায় সে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

বৈরাম কোমলকণ্ঠে বললেন,—সত্য কখনও গোপন থাকে না, বেটা। কিন্তু বাধ্য হয়ে সাময়িক ঝুটাকাজ করতে হয়, আরও বড় কিছুর জন্যে। তোমার বাবা আমার কাছে স্রিফ সম্রাট ছিলেন না। ছিলেন আমার প্রিয়তম দোস্ত। আমার হাতে তোমায় তুলে দিয়েছিলেন। তাই আমার দায়িত্ব ছিল দিল্লির মসনদে তোমায় বসাবার। কিন্তু কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল। হঠাৎ সেই রাতে গোপন খবর এল, বাদশা আগ্রার প্রাসাদে পড়ে গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড চোট পেয়েছেন। অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বাঁচার আশা নেই।

তখন কী করব? বুঝতেই পারছ বেটা, আমার মানসিক অবস্থা। ওই রাতে রওনা হলেও দিল্লি পৌঁছবার আগে আমার দোস্ত খোদাতালার কাছে পৌঁছে যাবেন। খবরটা জানাজানি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দিল্লির তখত্ বেদখল হয়ে যাবে। তাহলে উপায়? আমি নির্দেশ দিলাম, বাদশার এন্তেকাল হয়ে গেলে তাঁকে গোপন কুঠুরিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে শুইয়ে রাখতে। আর নকল যে লোকটি ছিল, তাকে বাদশা সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। তাকে দিয়েই লিখে পাঠাতে হবে উত্তরাধিকারের হুকুমনামা। তারপর যা ঘটেছে, সব তুমি জান, বেটা। আমি নিরুপায় বেটা, তোমার বাবার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। কোনো গুনাহ্ হয়ে থাকলে মাফি মাঙছি।

বলতে-বলতে প্রাজ্ঞ, বহু যুদ্ধের সৈনিক মানুষটির দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

আর আকবর? একদিকে পিতৃবিয়োগের আকস্মিক আঘাত, অন্যদিকে এই বিচিত্র মর্মস্পর্শী নাটক তাকে বোবা করে দিয়েছে। তার দু-চোখ বেয়ে উপছে পড়ে অবিশ্রান্ত অশ্রু।

বৈরাম খাঁর বুকে মুখ গুঁজে কিশোর শাহেনশা নিঃশব্দে কেঁদে চলে।...

ছবি : শংকর বসাক

হুক্কা ফক্কা'র
স্কুল পালানো
দিলীপ দাস
রাবিশ !
আর ভাল লাগছে না !
রোজ রোজ এই লেখাপড়া নিয়ে একেবারে জেরবার হয়ে গেলুম !
সে আর বলতে। সেই কবে গেমের ছক্কে সিডি এনে রেখেছি — সময় করে একটু বসতে পারছি না, খালি বলে পড়!
এর থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই হুক্কা ?
নেই বলেই পড়া চালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। সুতরাং "আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।"
আজ আবার বলাইবাবুর হিস্ট্রির ক্লাস। ভীষণ কড়া! ঔরঙ্গজেবের চার ছেলের একটা মিস করলে মারের চোটে বদন বিগড়ে দেবেন।
ওরে বাবা! তবে তো বাঁচার কোনো আশাই নেই। বাঁচার একমাত্র রাস্তা স্কুল কামাই তাতেও বিপদ, বাড়িতে জেঠুর ডাণ্ডা !

কিরে পড়া বন্ধ করে কী অত গুজুর-গুজুর ফসুর-ফুসুর করছিস? আজ ইস্কুল নেই নাকি?
আমরা ওই স্কুলের ব্যাপারেই আলোচনা করছিলুম জেঠীমনি।
তাই বুঝি? আমার তো মনে হয় কী করে ইস্কুলে না যাওয়া যায় তার ফন্দি-ফিকির করছিলি।
আরে বংকা না! ও এদিকে কোথায় আসছে?
হাতে বই-খাতাও তো দেখছি না!
এদিকে কোথায় চলেছিসরে বংকা?
স্কুলে যাবি না?
নারে। আমি এখন বাদাম কিনতে যাচ্ছি।
কেন! স্কুল ছুটি নাকি?
ধর্মঘট না হয় বনধ্‌—একটা কিছু তো হবেই।
ধুসস্
ওসব কিছু নয়, আমার হাম হয়েছে তাই স্কুলে যাচ্ছি না।
দেখছিস না আমার সারা মুখে কেমন লাল-লাল স্পট্‌।
হুম, এগুলো হামেরই লক্ষণ!

আচ্ছা বংকা, এতে কোনো ব্যথা বা যন্ত্রণা নেই তো?
না-না, সে সব কিছু নেই খালি জ্বর সঙ্গে—।
এতে কতদিন স্কুলে যেতে হবে না?
ডাক্তার বলেছেন সপ্তাহ দু-এক তো বটেই।
বাঃ, বেশ লম্বা ছুটি!
বোকার মত কথা বলিস না তো। অসুখ যখন করেছে তখন ছুটি দিতে বাধ্য।
টা টা বংকা,
মনের সুখে বাদাম খাও আর ছুটি এনজয় কর।
ছক্কা, এক মিনিট দাঁড়া, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!
তুই যাই বল, আমি স্কুল কামাই করতে পারব না। স্কুলে বলাই-বাবুর মার তো আছেই স্কুলে না গেলে জেঠুও ছেড়ে কথা কইবে না।
তুই অল্পেতেই ঘাবড়ে যাস। আমি কামাই করতে বলেছি? ধর, যদি আমাদের ছুটি দিয়ে দিল তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই?
তুই কোথাকার কে—যে বললেই তোকে ছুটি দেবেন?
আমাদের কিছুই বলতে হবে না, শুধুমাত্র মুখ দেখেই ছুটি দিয়ে দেবেন।
তুই নিজেকে কী মনে করিস বলত?
এখনও মিনিট পনের বাকি আছে। এর মধ্যে আমাদের একটা প্রস্তুতিপর্ব সেরে ফেলতে হবে।
?

বংকার কথা মনে আছে? মুখে লাল স্পট নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে?
ওর যে হাম হয়েছে!
ঐ হাম আমাদেরও হবে।
ওরে বাবা, আমাদেরও হাম!!
ভয় নেই সকলে হাম। এই লাল স্কেচ পেনটা দেখছিস?
ও, বুঝেছি, ছুটির জন্যে দরখাস্ত লিখবি আর, তাহলেই ছুটি দেবেন?
মোটেই না। এটা দিয়ে আমার মুখে টিপছাপ দেগে দে।
এ সব কী পাগলামো শুরু করেছিস বল তো ফস্কা?
যা বলছি একটু তাড়াতাড়ি কর। সময় চলে যাচ্ছে।
হুঁঃ, যত্তোসব!
হয়েছে, এবার বল কেমন লাগছে?
আরে, অনেকটা সেই বংকার মত—!
এবার তোকে।
নেভার, আমি ওতে নেই!
আরে, লজ্জার কিছু নেই। ছুটি পেতে গেলে একটু কষ্ট করতে হবে। তাছাড়া একটু জল দিলেই সব ফর্সা।
আস্তে কর, সুড়সুড়ি লাগছে!

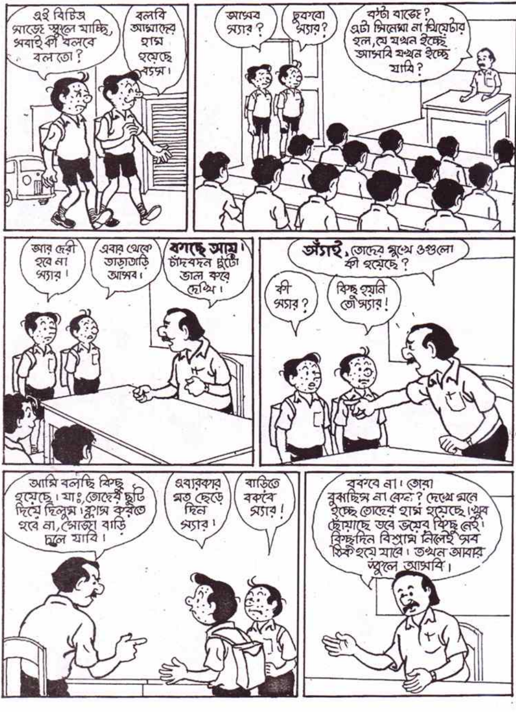
এই বিচিত্র সাজে স্কুলে যাচ্ছি, সবাই কী বলবে বল তো?
বলবি আমাদের ঘাম হয়েছে বড্ড।
আসব স্যার?
ঢুকবো স্যার?
ক'টা বাজে? এটা সিনেমা না থিয়েটার হল, যে যখন ইচ্ছে আসবি যখন ইচ্ছে যাবি?
আর দেরী হবে না স্যার।
এবার থেকে তাড়াতাড়ি আসব।
বসছে আয়। চাঁদবদন দুটো ভাল করে দেখি।
অ্যাঁই, তোদের মুখে ওগুলো কী হয়েছে?
কী স্যার?
কিছু হয়নি তো স্যার!
আমি বলছি কিছু হয়েছে। যাঃ, তোদের ছুটি দিয়ে দিলুম। ক্লাস করতে হবে না, সোজা বাড়ি চলে যাবি।
এবারকার মত ছেড়ে দিন স্যার।
বাড়িতে বকবে স্যার!
বকবে না। তোরা বুঝছিস না কেন? দেখে মনে হচ্ছে তোদের ঘাম হয়েছে। খুব ছোঁয়াচে তবে ভয়ের কিছু নেই। কিছুদিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন আবার স্কুলে আসবি।

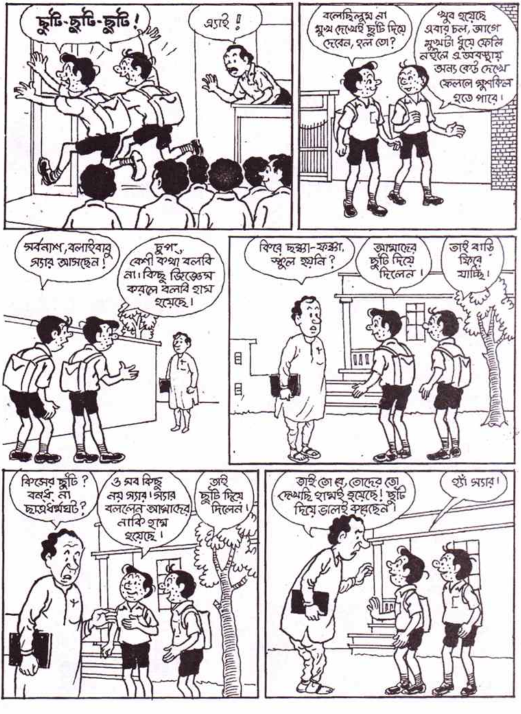
ছুটি-ছুটি-ছুটি!
এ্যাই!
বলেছিলুম না মুখ দেখেই ছুটি দিয়ে দেবেন, হল তো?
খুব হয়েছে এবার চল, আগে মুখটা ধুয়ে ফেলি নইলে এ অবস্থায় অন্য কেউ দেখে ফেললে মুশকিল হতে পারে।
সর্বনাশ, বলাইবাবু স্যার আসছেন!
চুপ, বেশী কথা বলবি না। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবি হাম হয়েছে।
কিরে ছক্কা-ফক্কা, স্কুল হয়নি?
আমাদের ছুটি দিয়ে দিলেন।
তাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।
কিসের ছুটি? বনধ্‌, না ছাত্রধর্মঘট?
ও সব কিছু নয় স্যার। স্যার বললেন আমাদের নাকি হাম্ম হয়েছে।
তাই ছুটি দিয়ে দিলেন।
তাই তো রে, তোদের তো দেখছি হাম্মই হয়েছে! ছুটি দিয়ে ভালই করেছেন।
হ্যাঁ স্যার।

এতে ভয়ের কিছু নেই। উপযুক্ত চিকিৎসা আর বিশ্রাম নিলেই ভাল হয়ে যাবি।
এখন যাই স্যার?
হ্যাঁ। রোদে বেশী ঘোরাঘুরি করিসনি কেমন।
আরে, তোদের গাল থেকে হাতে লাল ক্ষত কী লাগল বলতো?
বোধহয় ঘাম লেগেছে!
আমরা যাই স্যার!
রোদে বেশী ঘোরা উচিত নয়।
?
ইস.. আর একটু হলেই সব গুবলেট হয়ে যেতে বসেছিল!
ঘামেতে রঙটা ভিজে গেছিল। স্যার, তাতে হাত দিয়েই তো গণ্ডগোলটা করে ফেললেন।
আমাদের আর একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।
যা ঘটবার তাতো ঘটেই গেছে! এবার সবাই একে একে জেনে যাবে।
ব্যাপারটা খুব বিচ্ছিরি হয়ে গেল রে!
এখন কী করবি?
একটা কাজ করা যেতে পারে, তা হল সোজাসুজি অন্যায়টা স্বীকার করে নেওয়া এতে শাস্তিটা একটু লঘু হতে পারে।

ওরে বাবা! তখন কি আমাদের আস্ত রাখবে?
অন্যায় স্বীকার করে নেওয়ার মত মহত্ত্ব আর কিছুই নেই জানবি।
ঠিক আছে। তোকে কিছু বলতে হবে না, জেঠুকে যা বলার আমিই বলব।
কিরে ইস্কুলে যাসনি? এই দুপুরবেলা তোরা কী মনে করে?
জেঠু, একটা ব্যাপারে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।
হ্যাঁ জেঠু, আমরা একটা অন্যায় করে ফেলেছি তাই—।
অন্যায় করে ক্ষমা চাইতে এসেছিস? ভেরি গুড। এ রকম সৎসাহস যার আছে সে তো ক্ষমারই যোগ্য।
কাজ হয়ে গেল, এবার চল।
আমরা আসি জেঠু।
এই, এক মিনিট দাঁড়া। এবার বল, তোরা এমন কী অন্যায় করেছিস যে ক্ষমা চাইতে হল?
আমাদের হাম হয়নি জেঠু।
কে বলেছে তোদের হাম হয়েছে?
আমরা স্কুলে না যাবার জন্যে মিথ্যে বলেছিলুম।
জানতে পারলে তুমি বকবে তাই সত্যিকথাটা তোমাকে জানালুম।

অ্যাঁঃ, স্কুল পালানো! তাও মিথ্যে কথা বলে? এতো ক্ষমার অযোগ্য! তোদের তো শূলে দেওয়া উচিত!
!
?
আয় তো দেখি, তোদের মুখে ওগুলো কী হয়েছে!
এর কথাই তো বলছি জেঠু!
এগুলো আসল হাম নয়!
এতো মিডলেস হয়েছে! এর আবার আসল-নকল কী? এই সত্যটা ঢাকবার জন্য মিথ্যের আশ্রয় নিতে হল? আবার ক্ষমা চাইতে এসেছিস রাসকেল!
আরে আরে! তুমি ওদের ওপর অত চোটপাট করছো কেন?
চোটপাট নয়, এদের মেরে পাট করে দেওয়া উচিত। বলে কিনা হাম হয়নি!
মুখের ওই দাগগুলো তো হামের লক্ষণ!
এ সব অসুখ-বিসুখ লুকোতে নেই বাবা। এর ফল মারাত্মক হয়।
সত্যি করেই বলছি জেঠিমনি।
এগুলো সত্যিকার হাম নয়।
শাট্ আপ! মিথ্যেবাদী কোথাকার।
আঃ, ওরা ছেলেমানুষ। বকঝকা না করে তুমি ডাক্তারবাবুকে খবর দাও।
এক্ষুনি খবর দিচ্ছি।

কে যেতে হবে না।
এ্যাই!
আমরাই যাচ্ছি।
মাধববাবুর জরুরী তলব!
বাপস্!
আঁই!
ওপস!
আরে ছুক্কা-ফক্কা, এত তাড়াতাড়ির কি আছে? আমি তো এসে গেছি!
ঐ তো ডাক্তারবাবু এসে গেছেন! রুগীও দেখছি প্রস্তুত!
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর
নাঃ, তেমন কিছু হয়নি। কয়েকটা স্পট দেখতে পাচ্ছি তবে ওগুলো হাম নয়, লাল রঙ। পেন থেকে লেগে থাকতে পারে।
আর তাই নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড! যত্তোসব!
কোনো কারণে ওরা ভয় পেয়ে গেছিল।
একেই বলে ভীতুর মরণ।
ঝংকার হাম হয়েছে তো তাই দেখে—।
যাও, আর লোক হাসিও না, মুখটি ধুয়ে এসো।
হাঃ-হাঃ-হাঃ
হিঃ-হিঃ-হিঃ
হোঃ-হোঃ-হোঃ!
উফ, খুব জোর বেঁচে গেছি!
এর থেকে স্কুলের শাস্তি অনেক ভাল।

রহস্য গল্প

ঠাকুমার গাওয়া-ঘি

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

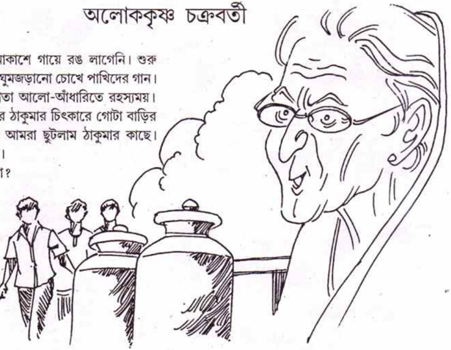

তখনও পুব আকাশে গায়ে রঙ লাগেনি। শুরু হয়েছে সবে ঘুমজড়ানো চোখে পাখিদের গান। গোটা কলকাতা আলো-আঁধারিতে রহস্যময়।

হঠাৎ সেই কাকভোরে ঠাকুমার চিৎকারে গোটা বাড়ির ঘুম ভেঙে গেল। সবাই আমরা ছুটলাম ঠাকুমার কাছে। তিনি তখন ঠাকুর ঘরে।

—কী হয়েছে ঠাকুমা?

—সর্বনাশ হয়েছে রে হুলো। বলে ঠাকুমা প্রায় কেঁদে ফেললেন।

—খুলে বলো তো ব্যাপারটা।

—খুলে আর কী বলব দাদাভাই! আমার দু-বয়েম গাওয়া-ঘি চুরি হয়ে গেছে।

—সেকী! মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ গো বউমা। ঠাকুমা বললেন, তুমি তো দেখেছ দিনের পর দিন সর তুলে আমি কত কষ্টে দুই বয়েম ঘি তৈরি করেছি। বাড়িতে কাউকে এক ফোঁটাও দিইনি। সব গুরুদেবের জন্যে তুলে রেখেছিলাম। আর আজই গুরুদেব আসছেন। অথচ...বলেই ঠাকুমা কেঁদে ফেললেন।

বাবা বললেন, কান্নাকাটি না করে ভালো করে খুঁজে দ্যাখো।

বাবার দিকে তাকিয়ে ঠাকুমা বললেন, অনেক খুঁজেছি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি রে খোকা। কোথাও নেই।

—অত বড়ো দুটো বয়েম কি হাওয়া হয়ে গেল?

—তাই তো দেখছি। নিশ্চয়ই কেউ চুরি করেছে।

—ঠাকুর ঘর থেকে কে তোমার ঘি চুরি করতে যাবে ঠাকুমা? ঠাকুমা বললেন, চুরি না হলে জিনিসটা যাবে কোথায়?

বাবা আবার বললেন, তুমি ভালো করে খোঁজো। নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।

—আমি অনেক খুঁজেছি। এবার তোরা এসে খোঁজ।

আমি বললাম, আমরা তো কেউ চান করিনি। তোমার ঠাকুর ঘরে ঢুকব কী করে?

—তুই চান করে আয় দাদাভাই। তুই আর আর আমি একসঙ্গে খুঁজব।

—এই সাতসকালে চান!

—কিচ্ছু হবে না লক্ষ্মীভাইটি আমার। এটা তো শীতকাল নয়। এখন ভোরে চান করলে ভালোই লাগবে। আমি তো চান করেছি চারটের সময়।

—ঠিক হ্যায় ঠাকুমা। আমি চট করে চান করে আসছি।

দুই

চান-টান সেরে ঠাকুর ঘরে আসার জন্যে যখন ছাদে উঠেছি তখন পুবের আকাশে রঙ লেগেছে। বাড়ির পেছনে বিছানো রয়েছে শিউলিফুলের সাদা কার্পেট। নতুন দিনের সূর্য জেগে উঠেছে অনেকটাই। শিউলিফুলের মিষ্টি গন্ধ জড়ানো শরৎকালের রোদ্দুর কাঁচা সোনার মতন টলটল করছে চারপাশে। পাখিদের গানের সুর ভাসছে বাতাসে। নীল অপরাজিতার মতন আকাশের রঙ। কী সুন্দর লাগছে! ঠাকুমা ঠিকই বলেছেন। ভোরে চান করলে মনটা সত্যি আনন্দে ভরে যায়। খুব ভালো লাগে।

ঠাকুর ঘরে ঢুকেই ঠাকুমাকে বললাম, এসো এবার দুজনে মিলে খুঁজি।

ঠাকুমা বললেন, উপরে যা রাখা আছে সব নামিয়ে ফেল। তারপর দুজনেই একসাথে ভালো করে খুঁজি।

আমরা দুজনে মিলে সব কিছু নামিয়ে, সব কিছু বের করে খুঁজতে লাগলাম। মা-বাবাও ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। না, ঘিয়ের বয়েম নেই। কোত্থাও নেই। একেবারে হাওয়া।

বাবা ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মা, তুমি অন্য কোথাও রাখোনি তো। ভালো করে মনে করো।

—আর কত মনে করব বল তো! পরশু রাত্তিরেও আমি দেখেছি।

আমি বললাম, এখন তো খুবই চিন্তায় পড়লাম। শুধু ঘিয়ের বয়েম চুরি হল না আরও অন্য কিছু চুরি হল—তাই বা কে বলতে পারে।

ঠাকুমা বললেন, এখন আমি গাওয়া ঘি পাই কোথায় বল। গুরুদেবকে কি আমি বাজারের ভেজাল ঘি খাওয়াব?

—ভেজাল ঘি খাওয়াবে কেন? আমি বললাম, খাঁটি ঘি পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা হল, কে চুরি করতে পারে দুই বয়েম ঘি।

—তুই আগে ভোম্বলকে ডাক দাদাভাই। ঠাকুমা বললেন, ও এক্ষুনি চলে আসুক।

বাবা বললেন, তাই ভালো। তুই ভোম্বলকে ফোন কর।

ভোম্বলদাকে ফোন করে সব বললাম। ভোম্বলদা বলল, আমি এক্ষুনি আসছি।

একটু পরেই ভোম্বলদা তার অ্যাসিস্ট্যান্ট খলশেকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এল। ঠাকুমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে ঠাকুমা? ব্যাপারটা তোমার মুখ থেকেই আমি শুনতে চাই।

কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমা বললেন, আমার দু-বয়েম গাওয়া-ঘি ঠাকুর ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলাম। পরশু পর্যন্তও ছিল। কালকেই চুরি হয়ে গেছে। আজ গুরুদেব আসছেন এখানে। এখন আমি কী করি?

ভোম্বলদা সব ব্যাপারটা ঠাকুমার কাছ থেকে বুঝে নিল। এবং আমাদের সন্দেহের তালিকায় কারা আছে, তা-ও জেনে নিল।

আমাদের বাড়িতে ঝি-চাকর অনেক। মোটামুটি প্রায় সবাইকেই জেরা করল ভোম্বলদা আর খলশে। কিন্তু লাভ কিছু হল না।

এবার ভোম্বলদা আমাকে জিজ্ঞেস করল, হুলো, দু-একদিনের মধ্যে তোদের বাড়িতে বাইরের কোনো লোক এসেছিলো?

—না।

—বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞেস কর। ভোম্বলদা বলল, আমার মনে হয় এসেছিলো।

খলশে বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—ঠিক আছে। আমি ব্যাপারটা জেনে নিই আগে।

ভোম্বলদা বলল, তুই এই ব্যাপারটা ভালো করে জানার চেষ্টা কর। আমি বরং ততক্ষণ ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলে দেখি কোনো ক্লু পাওয়া যায় কি না। চল খলশে।

ভোম্বলদা আর খলশে গেল ঠাকুমার কাছে। আমি এলাম মা-বাবার ঘরে। মা-বাবার কাছ থেকে জানতে পারলাম এই কদিনের মধ্যে একমাত্র আমার ঘরে ছোটোভাই পল্টুর বন্ধুবান্ধব ছাড়া অন্য কেউ বাড়িতে আসেনি। ঠাকুমাও ভোম্বলদা আর খলশেকে তাই বললেন।

এবার আমরা তিন জনে আলোচনায় বসলাম। ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যজনক। ভোম্বলদা বলল, কেসটা বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে।

—জটিল কেসের 'ক্লু' বের করাই তো গোয়েন্দাদের কাজ। আমি বললাম, তুমি ভালো করে চিন্তা করো ভোম্বলদা। চোরকে ধরতেই হবে।

খলশে বলল, না হলে ঠাকুমা চেঁচিয়ে গোটা বাড়ি মাথায় করে তুলবেন। তুলবেন'ই বা না কেন! অনেক

দিন ধরে কষ্ট করে দু বয়েম ঘি নিজে হাতে তৈরি করেছেন গুরুদেবের জন্যে। আর আজই আসছেন তিনি। অথচ ঠাকুমা তাঁকে গাওয়া-ঘি খাওয়াতে পারবেন না।

ভোম্বলদা বলল, এটা ঠিক—বাড়িতে যারা এসেছে তাদেরই মধ্যে কেউ চুরি করেছে!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী করে এ কথা বলছো?

—আমি সিওর হয়েই বলছি। ভোম্বলদা বলল, বাড়ির কাজের লোকেরা ঘি সরায়নি। তা হলে সেটা যাবে কোথায়?

—তা হলে কি তুমি বলতে চাও আমার বা পল্টুর বন্ধুবান্ধবদের কেউ এ কাজ করেছে?

—তোর বন্ধুবান্ধবদের কেউ এ কাজ করেনি হুলো। তাদের সকলকেই তো আমি চিনি। আমার সন্দেহ হচ্ছে পল্টুর...

ভোম্বলদার কথা শেষ হবার আগেই খলশে বলে উঠল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—চুপ-চুপ। আমি বললাম, পল্টু শুনলে চেঁচামেচি জুড়ে দেবে। তা ছাড়া ধরতে না পারলে বাড়িতে এই নিয়ে অশান্তি হবে।

—শোন হুলো, পল্টুর বন্ধুদের তুই তো চিনিস। ভোম্বলদা বলল, যারা এই দু-তিন দিনের মধ্যে তোদের বাড়িতে এসেছে তাদের বাড়িতে যাওয়া যাক। তাতে তো আর কোনো অসুবিধে নেই।

—না।

খলশে বলল, তাই করা যাক।

তিন

আমরা তিনজন—ভোম্বলদা, খলশে আর আমি উঠি-উঠি করছি এমন সময় ঠাকুমা আমার হাতে একখানা ছাপা ছোটো কাগজ দিয়ে বললেন, এই কাগজখানা ঠাকুরের আসনের নীচে পড়েছিল।

—দেখি কী কাগজ! বলে ভোম্বলদা আমার হাত থেকে সেটা নিয়ে নিল। তারপর বলল, এ তো দেখছি বুকলিস্ট।

—বুকলিস্ট! খলশে জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ। বলে ভোম্বলদা খলশের মুখের দিকে তাকাল।

—আমাকে একটু ভাবতে দাও। খলশে বলল, মনে হয় 'ক্লু'টা পেয়ে যেতে পারি।

খলশে চুপচাপ বসে কী যেন মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম, 'ক্লু'টা কি পেলি?

খলশে বলল, চল তো।

ভোম্বলদা জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

—পাঁচুদের বাড়ি।

—ওখানে কী আছে? ভোম্বলদার আবার প্রশ্ন।

—চলোই না আমার সাথে। পাঁচুর বোনকে একটু সাহায্য করতে হবে। আমরা তিনজন—ভোম্বলদা, খলশে আর আমি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাঁচুদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। পাঁচুরা থাকে কাছেই একটা বস্তিতে। তাই মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। আমাদের দেখে পাঁচু অবাক। জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? তোমরা তিনজন একসঙ্গে আমাদের বাড়িতে? ভেতরে এসো।

আমরা ভেতরে গেলাম। পাঁচুরা থাকে ছোট্ট দুখানা ঘরে। তার মধ্যে একখানা একেবারেই ছোটো। বাড়িতে ওরা মোট তিনজন। পাঁচু, ছোটো বোন আর বিধবা মা। খুবই অভাবের সংসার। মা আয়ার কাজ করেন। সামান্য রোজগার। তাই দিয়ে সংসার চলে। বলতে গেলে দিন আনা, দিন খাওয়া অবস্থা ওদের। এর মধ্যেও দুই ভাইবোনকে ইস্কুলে পড়াচ্ছেন মা। পড়াশুনায় ওরা দুজনেই ভালো। তবে পাঁচুর চেয়ে ওর বোন নমিতা বেশি মেধাবী। ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ডের মধ্যে থাকে। কী কষ্ট করেই না লেখাপড়া করে ওরা!

হঠাৎ খলশে পাঁচুকে জিজ্ঞেস করল, নমিতার বই কেনা হয়ে গেছে?

—আজকালের মধ্যেই হয়ে যাবে।

—টাকার যোগাড় হয়েছে?

—জানি না।

—কে কিনে দেবে?

—অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধ দিন তিনেক আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। ওরাই ব্যবস্থা করবে বলেছে।

—ভেরি গুড। বলে খলশে বলল, যদি অসুবিধে হয় তো আমাকে বলিস। আমরা সেই জন্যেই এসেছিলাম। মাসিমাকে দেখছি না। মাসিমা কোথায়?

—মা বাজারে গেছে।

নমিতার দিকে তাকিয়ে খলশে বলল, ভালো করে পড়াশুনা কর। বইপত্তর নিয়ে ভাবতে হবে না। আমরা তো আছি। চলি রে এখন।

—এই তো এলে। নমিতা বলল, এরই মধ্যে চলে যাবে! তোমরা বোসো। আমি চা করে আনি।।

—ঠিক আছে। খলশে বলল, চটপট করে নিয়ে আয়।

চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে ভোম্বলদা বলল, খলশে তো বেশ পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে। তা এখন নিশ্চয়ই অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধর বাড়ি যাবি?

—তা তো বুঝতেই পারছো। যেতেই হবে।

আমি বললাম, তুই তা হলে দিন কয়েক আগে নিশ্চয়ই পাঁচুদের বাড়িতে এসেছিলি। নমিতার বই কেনা হয়নি সেটাও জেনে গেছিস, তাই না?

—অবশ্যই।

—তা বুকলিস্টটা যে নমিতার, বুঝলি কী করে? তুই ওর ইস্কুলের নাম জানিস নাকি?

—না।

—তবে? আমি আবার প্রশ্ন করি।

হঠাৎ ভোম্বলদা বলে উঠল, তোর দ্বারা গোয়েন্দাগিরি হবে না রে হুলো। এ তো জলের মতন সহজ ব্যাপার। একেবারে দুইয়ে দুইয়ে চার।

—খুব ভালো কথা। বুঝিয়ে দাও তাহলে।

—তা হলে শোন। ভোম্বলদা শুরু করল, ওই বুকলিস্টটাই ইনভেস্টিগেশনে সুবিধে করে দিয়েছে। ওটা না পেলে অনেক অসুবিধে হত এবং সময়ও বেশি লাগত। এখন কেসটা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

—কী করে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—সবই তো শুনলি। খলশে আগে থেকেই জানত নমিতার বই কেনা হয়নি। তাই বুকলিস্টটা দেখেই ওর সন্দেহ হল।

—কিন্তু অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধর বাড়ি যাবে কেন? ওরা তো চোর নয়। ওদের তো ভালো করেই চিনি।

—ছি-ছি! খলশে বলল, ওদের দুজনের মতন ভালো ছেলে আর একটাও আমাদের পাড়ায় নেই। ওরা চোর হবে কেন?

—তবে?

—আসলে ওরা দুজন তো টো-টো করে পাড়া ঘোরে। সবার বাড়ির খোঁজখবর রাখে। কারও বিপদ দেখলেই সেখানে চলে যায়। এবং চেষ্টা করে সেই ব্যাপারে সাহায্য করতে। এর আগেও তো ওরা অনেককে সাহায্য করেছে। কেন, কল্যাণীর বিয়ের ব্যাপারটা মনে নেই? কী অসাধারণ ভূমিকা ছিল ওদের! কঞ্চিবাবুর মতন হাড়কিপটে লোকের কাছ থেকে অতগুলো টাকা বের করেছিল। কৃপণ হয়েছিল সেদিন দানবীর।

—ভালো কথা মনে করিয়েছিস। আমি বললাম, ওরা তো কঞ্চিবাবুর কাছ থেকে বই কেনবার এই সামান্য টাকা চাইলেই পেতে পারে।

এবার ভোম্বলদা বলল, পারে। কিন্তু সবসময় কঞ্চিবাবুর কাছে চাইবেই বা কেন! কঞ্চিবাবু তো ওদের দেনই। তাঁর মনে তো আসতে পারে যে পাড়ায় আমি ছাড়া আর কেউ কি নেই!

খলশে বলল, ভোম্বলদা ঠিকই বলেছে হুলো। একজনই বা সবসময় দেবে কেন। আর তুই জানতে চাস অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধর বাড়িতেই বা যাব কেন। খুব সহজ ব্যাপার। ওরা নমিতার বইয়ের ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে। কিন্তু কী ভাবে? সেটা জানা দরকার। হয়তো এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে ঠাকুমার ঘি চুরির রহস্যটা।

—ঠিক আছে। চল।

প্রথমে আমরা এলাম অনির্বাণের বাড়িতে। একটু পরেই ওকে নিয়ে গেলাম অনিরুদ্ধর বাড়িতে। দুজনের বাড়ি পাশাপাশি।

ওদের দুজনকে এক সঙ্গে বসিয়ে আলোচনা শুরু হল। প্রথমেই উঠল নমিতার বই কেনার ব্যাপারটা।

খলশে ওদের দুজনকে জিজ্ঞেস করল, তোরা কি নমিতার বই কিনে দিবি?

—এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন খলশেদা? অনির্বাণ বলল, অন্য কেউ দেবে নাকি?

—না রে। ঘুরতে ঘুরতে ওদের বাড়িতে গেছিলাম, তাই জানতে পারলাম। এটা তো আনন্দের কথা।

—ওঃ। বলে অনির্বাণ বলল, তোমরা একটু সাহায্য করো না! তা হলে কালকেই নমিতার বইগুলো কিনে দিই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কঞ্চিবাবুর কাছে যাচ্ছিস না কেন?

—কঞ্চিবাবু আর কত দেবে, বলো তো হুলোদা? অনিরুদ্ধ বলল, এই তো সে দিনও মণিরাম দেশে যাবার সময় তিন হাজার টাকা দিলেন তিনি।

—ঠিক আছে। ভোম্বলদা বলল, এ ব্যাপারে আমরা অবশ্যই সাহায্য করব। আজ বিকেলেই তোদের কিছু টাকা দিয়ে যাব।

অনিরুদ্ধর বাড়ি থেকে আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে আমি বললাম, কী রে খলশে, ক্লু পেলি?

খলসে জবাব দিল, পেয়ে যাব। ঠিক পেয়ে যাব। একটু ধৈর্য ধর। হঠাৎ ভোম্বলদা বলল, বুকলিস্টটা কোথায়?

সত্যিই তো। বুকলিস্টটা গেল কোথায়! আমরা তিনজনেই জামা-প্যান্টের পকেট ভালো করে দেখলাম। না, নেই। কোথাও নেই।

আমি বললাম, খলশে, তোর কাছেই তো বুকলিস্টটা ছিল।

আমার কথায় সায় দিয়ে খলশে বলল, হ্যাঁ।

ভোম্বলদা বলল, একেবারে শেষে তো আমরা অনিরুদ্ধর বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। চল তো সেখানে যাই।

আমরা তিন জনে আবার অনিরুদ্ধর বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। অনিরুদ্ধর বাড়ির সামনে পৌঁছে হঠাৎ দীপঙ্করের গলা কানে এল। ওরা সবাই হুলোর ছোটো ভাই পল্টুর বন্ধু। আমরা গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে গেলাম।

দীপঙ্কর বলছে বুকলিস্টটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু এখানে এল কী করে?

হুড়মুড় করে দরজা ঠেলে আমরা অনিরুদ্ধদের বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। আমাদের দেখে অনিরুদ্ধ বলল, তোমরা বাড়ি যাওনি?

—এ বার যাব। তার আগে দীপঙ্করের প্রশ্নের জবাবটা দিই। বলে ভোম্বলদা দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, দুই বয়েম ঘি বেচে কত টাকা পেয়েছিস?

—মানে?

—মানে-টানে ছাড়। যা বলছি তার জবাব দে।

—দেড় হাজার টাকা।

—নমিতার বই-খাতা কিনতে কত টাকা লাগবে?

—হাজারখানেক।

—তাহলে বাকি পাঁচশো টাকা ফেরত দে। ভোম্বলদা

বলল, আর যেখানে ঘি বেচেছিস, সেখানে আমাদের নিয়ে চল।

—চলো। বলে দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। উঠে পড়ল অনির্বাণ আর অনিরুদ্ধও। ওদের চোখে-মুখে বিরাট বিস্ময়ের ছাপ।

আমাদের কপাল ভালো। তাই ঘিয়ের দোকানে গিয়ে দেখি একটা বয়েম থেকে খানিকটা ঘি বিক্রি হয়েছে। অন্যটা যেমন ছিল তেমন আছে।

দোকানটা আমাদেরই বন্ধু অমিতের। একসঙ্গে আমাদের সবাইকে দেখে অমিত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

সমস্ত ব্যাপারটা ভোম্বলদা খুলে বলল। অনির্বাণ-অনিরুদ্ধও অবাক হয়ে শুনছিল ঘটনাটা। অমিতও সব ব্যাপারটা বুঝল।

হঠাৎ অনিরুদ্ধ দীপঙ্করকে বলল, তুইতো আমাদের এ ব্যাপারে কিছুই জানাসনি। এটা তুই ভুল করেছিস দীপু।

—কিছুই ভুল করিনি। জানালে কি ওই গরিব মেয়েটার বই কেনা হত? আর ঠাকুমার ঘি খাবেন তো গুরুদেব। গুরুদেবরা তো পরের পয়সায় খেয়ে-খেয়ে নাদুসনুদুস চেহারা করেন।

দীপঙ্করের কথা শুনে সত্যিই আমরা অবাক। ওর ভেতর যে এই জিনিস ছিল এতদিন আমরা তা বুঝতেই পারিনি। ভোম্বলদা গম্ভীর মুখে বলল, দীপু, এদিকে আয়।

ভয়ে দীপঙ্করের মুখ শুকিয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে ভোম্বলদার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমরাও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। হঠাৎ ভোম্বলদা দীপঙ্করকে বলল, তুই কাঁপছিস কেন?

—তুমি যদি মারো।

—পাগল! তোকে মারব কীরে, আদর করব। তবে একটু বকুনি দেবই। তুই একটা মহৎ কাজ করেছিস। কিন্তু চুরি করাটা অন্যায়।

দীপঙ্কর বলল, আর কখনও করব না।

অমিতের কাছ থেকে ভোম্বলদা এক বয়েম ঘি ফেরৎ নেবার সময় বলল, পাঁচশো টাকা রাখ। বাকিটা পরে দিচ্ছি।

অমিত বলল, বাকিটা আর দিতে হবে না। নমিতার ব্যাপারে আমারও তো কর্তব্য আছে। সে তো পাড়ারই মেয়ে। আমাদেরই বোন।

—ভেরি গুড। বলে ভোম্বলদা ঘিয়ের বয়েমটা আমার হাতে দিয়ে বলল, হুলো, ঠাকুমাকে ঘিটা দিয়ে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবি। আমরা সবাই বিকেলে তোদের বাড়িতে যাব। গরম লুচি তরকারি খাব। বুঝলি?

ছবি ঃ পার্থসারথি মণ্ডল

www.banglabooks.in

নানারঙের গল্প

বিপিনবাবু নেই

কল্যাণ মৈত্র

চড়কভাঙার মোড়ে ভোলার চায়ের দোকানে মিটিং বসেছে। টুল আর ভাঙা-বেঞ্চির মিটিং—বিষয় বড়দিন ফেসটিভ্যাল, ফ্লাওয়ার শো, বই মেলা। এবছরই আবার ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী। ফটকে বলল, 'পোভাতী' সংঘের প্রেস্‌টিজ ফাইট। বড় বাজেট। এমন জলসা বড়দিন উৎসব, বইমেলা হবে যে লোকের চোখ কপালে উঠে যাবে। পাড়ার মাঠ, রাস্তা, পুকুর, ঠাকুরবাড়ি জুড়ে বসবে বড়দিনের মেলা। তা নয় এমন একটা সময়ে বিপিনবাবু গোঁজ মেরে দিল। ফটকে বলল, এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ব না—তবে কুরুক্ষেত্র হয় হোক! শো রাস্তার মোড়েই হবে—আর ওই বিপিনবাবুর দোরগোড়াতেই হবে জলসা। জনা দশেক ছেলে ভোলাদার চায়ের দোকানের সামনে জড়ো হয়েছে। সেক্রেটারি তোতন চাকলাদারও আছে। পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি। শেষ মুহূর্তে আটকে গিয়েছে প্যান্ডেলের কাজ। বিপিনবাবু পুলিশে খবর দিয়েছেন—দরজা আটকে জলসা করা চলবে না। সদর দরজা দিয়ে সটান বেরোনো তার অভ্যাস—ক্রিসমাস ইভের ক'দিন কী হবে? ফটকে বলল, বলে কি মাইরি 'আমরা যাব কী করে? বেরোনোর জায়গা কই?'—ওই তো ফিঙে পাখির মতো চেহারা, তাতে কি সাত হাত জায়গা লাগে? জলসা যদি আটকায়, তোকে বলে রাখছি তোতন ওই বিপিনবাবুর পেছনে দোদোমা গুঁজে দেব। তোতন বলল, জ্বালাটা সেখানে নয় রে ফটকে। বিপিনবাবুর কারণসুধার দোকানটা যে ঢাকা পড়ে যাবে—উৎসব পার্বণ পুজোর সময় ভক্তরা সোমরস কিনতে আসে না—কী ভিড় হয়। গতবার তো দোকানটা ছিল না—তাই কোনো কিচাইন করেনি কেউ। যত ক্ষার এবার ঢেলেছে। দোকানটা জ্বালিয়ে দিলে হয় না?—টনি বলল। তোতন রেগেমেগে বলল—তাহলে তো সোনায় সোহাগা চাঁদ। তুই তোর মামার পেছনে বাঁশ দিতে চাইছিস কেনরে?

ফটকে বলল—তার মানে? আরে ওর ওই প্রফেসর মামা তো ফতুয়া আর লুঙ্গি পরে রাতেরবেলা মাল কেনে। বাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ আনে—ভাবটা এমন যেন বেড়াল ভাজা মাছ খেতে জানে না। বিপিনবাবুর মদের দোকানে বাম্পার সেল। সকাল সন্ধে ভিড়। পাড়ার লোক আটকাতে পারেনি। খুব আন্দোলন হয়েছিল—তারপর থানা পুলিশ—এবার ক্লাবের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে দশ হাজার টাকা চাঁদা চাইতে গেলে, বিপিনবাবু বললেন—সে কী রে—পঁচাত্তর বছর। হয়ে গেল। কবে? ফটকে বলল, সে হিসাব আপনি বুঝবেন না মেসোমশাই। আমরা ঠিক করলাম শিবতলা যদি ষাট বছর করতে পারে আমরা কেন 'সুবন্ন জয়ন্তী' পারি না! আপনি আমাদের 'পেসিডেন্ট'—দশ হাজার ছাড়ুন। বড় করে একটা ফাটাফাটি বর্ষপুত্তি করি। আসুন না কিছু করে দেখাই। বিপিনবাবু এরপর পুলিশে গিয়ে খবর দিলেন। সেখানেও নাকি অনেক টাকা... পাড়ার ছেলে কত ক্ষমতা! সহজে টাইট দেওয়া যায়? গানবাজনা আনন্দ অনুষ্ঠান একটা 'হিউম্যান রাইটস্'—যখন তখন বন্ধ করা যায়? শক্ত কাজ। থানার বড়বাবু বিপিনবাবুকে বোঝালেন— দেখুন, হামলা হুজ্জুতি হলে কে সামলাবে—দাঙ্গাটাঙ্গাও বাঁধতে পারে। তাছাড়া আপনার মালের দোকানের কারবারেও নজর পড়েছে লোকের—ভালো আমদানি হচ্ছে। ফটকে বলল, আইডিয়া! ফ্লাওয়ার শো-এর প্যান্ডেলটা হবে না—যেমন আছে তেমন থাকবে। স্টেজ হবে বড়—দূর থেকে দেখা যাবে। ডেকরেটরকে বল—প্ল্যানিং চেইঞ্জ করতে হবে—'ভাঙা চার্চ হবে'। তাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। দেখি বিপিন কী করে। সে রাতের সিদ্ধান্তর পর যে যার বাড়ি চলে গেল। ফটকে আজ একটা বড় আইডিয়া দিয়েছে আর সেটা তোতন অ্যাপ্রোভ করেছে।—গর্বে তার বুক ফুলে উঠেছে। ফটকে ক্লাব কমিটির ট্রেজারার। সে আর তোতন মদনের দোকানে গিয়ে চারটে ফিস ফ্রাইয়ের অর্ডার দিল—'বিবিধ অ্যাকাউন্টে যাবে'। তারপর দু'দিন চলে গেছে। ঠিক বড়দিনের আগের দিন রাতে ফটকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দেখল পাড়ার মোড়ে খুব ভিড়। বিপিনবাবুর বাড়িতে কান্নার রোল—দীপুদা, তোতন, হরি, দেবু সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডেকরেটরের লোকজন কাজ ফেলে চলে গেছে। 'বিপিনবাবু নেই'—তোতন ছলছল চোখে ফটকে-কে বলল। ফটকের তখন কী যে হল কে জানে, কোথা থেকে এক দলা কষ্ট তার গলায় আটকে গেল—সে চেঁচিয়ে বলে উঠল—আপনার যাবার জায়গা ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম মেসোমশাই। সেই তো গেলেন, কত জায়গা লাগল? ফটকের চোখে জল।

ছবি : শংকর বসাক

খেলার গল্প

এসপানিয়া ভিকতোরিওসা বিজয়ী স্পেন

চিরঞ্জীব

ভালো খেললেই জেতা যায়, সাফল্য আসবেই। এটাই প্রমাণ করেছে ইকের ক্যাসিলাসের আরমাডা বাহিনী—স্পেন। আর্জেন্টিনার কোচ কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনাও বলেছেন, যোগ্য দলই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। স্পেন কখনও ফাইনালে উঠতে পারেনি। ১৯৫০ সালে ব্রাজিলের বিশ্বকাপের শেষ চারে পৌঁছেছিল। ব্যস। আর সেই স্পেন কিনা ২০১০-এ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ জিতল! না, এ মোটেই বিস্ময়ের বা অঘটনের নয়।

আমার কিশোর কিশোরী বন্ধুদের অনেকেরই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে যেদিন নেদারল্যান্ডস ২-১ গোলে হারায় পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিলকে, আর পরদিন যখন জার্মানি ৪-০ গোলে চুরমার করে দেয় দু'বারের জয়ী আর্জেন্টিনাকে। কেউ খুব কান্নাকাটি করেছে এপার-ওপার দুই বাংলাতেই। ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার মানুষ এমনটা করতে পারেই—ঠিক

যেমনটি করেন এখানে মোহনবাগান বা ইস্ট বেঙ্গল হারলে। প্রিয় দল হারলে কার ভালো লাগে? কিন্তু সাত সমুদ্দুর তের নদী পারের ওদের জন্য কান্নাকাটিটা বাড়াবাড়ি নয় কী?

১১ জুন জোহানেসবার্গের সকার সিটি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের উদ্বোধনের আগে মারাদোনা বলেছিলেন, 'আমরা চ্যাম্পিয়ন হতেই নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে এসেছি। দুনিয়া দেখবে আমার ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ জয়ী দলের চাইতেও ২০১০-এর আর্জেন্টিনা অনেক অ-নে-ক উঁচুমানের। লাওনেল মেসি আমাকেও ছাপিয়ে যাবে। ফুটবল সম্রাট পেলে কখনও মারাদোনার মতো হইচই করেন না। তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মধ্যেই ফাইনাল হবে।

মারাদোনা সম্পর্কে পেলে প্রায়ই একটু আক্রমণাত্মক কথা বলেন। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে তিক্ততা না বাড়াতে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান নীতিই নেন।

আর ফুটবলের এই দুই মহাতারকার কথাগুলোকে বেদবাক্য ধরে নিয়ে দুই বাংলার খবরের কাগজ, টিভি মেতে ওঠে। বিশেষজ্ঞরা আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে দেন। আর তা সেমিফাইনাল, ফাইনালের অনেক আগেই। একইভাবে এদের সঙ্গে গলা মেলায় বাংলাদেশের প্রায় সব মিডিয়াই। চার বছর অন্তর প্রতিটি বিশ্বকাপ নিয়ে এমন উন্মাদনাই দেখেছি। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় যেমন—তেমনি কলকাতায়ও রাস্তায় রাস্তায় ব্রাজিলের ফেস্টুন, পতাকায় ছেয়ে যায়। ঢাকা ও কলকাতায় প্রতিবার ব্রাজিলকে ঘিরে বেশি উন্মাদনা থাকে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যোগ্যতা অর্জন করলে কী হবে! এবার ব্রাজিলকে ছাপিয়ে গেল আর্জেন্টিনা। লাওনেল মেসি'র চাইতে বড় বড় কাট আউট কোচ মারাদোনার। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল হারতেই আর্জেন্টিনা সমর্থকদের উল্লাসের সঙ্গে আর্জেন্টিনা যেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল—এমনই হৈ-হুল্লোড়। কিন্তু পরদিন আর্জেন্টিনা বেশি গোলের ব্যবধানে ০-৪ গোলে জার্মানির কাছে হারায় আর্জেন্টিনা ফানুসটি চুপসে গেল। রাতারাতি সব কাট আউট, ফেস্টুন, পতাকা খুলে ফেলা হল।

পরদিন অনেকেই হয়ে গেলেন স্পেনের সমর্থক। বিশ্বকাপের বহু আগেই ইওরোপ, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার অনেক (বাংলা বাদে) বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ ছিল ''কাপ জিতবে স্পেন''। কেউ শুধু বলেন, ''নতুন কোনো দেশ।'' ১১ জুলাই সেটাই হয়েছে। নতুন নতুন দেশ উঠলেই তো খেলাটির প্রসার হবে। এটাই বলতেন বিশ্বকাপের রূপকার জুলে রিমে। ১১ জুলাই মাঝরাতেই দুনিয়া জুড়ে নাম ছড়িয়ে পড়ল স্পেনের ইকের ক্যাসিলাস, সেরজিও রামস, জেরার্ড পিকে, কারলেস পিওল, জোয়ান ক্যাপডেভিলা, জামি অলনসো (সেস্‌ক্ ফাব্রে গেস), জাভি হার্নান্ডেজ, আন্দ্রেস ইনেস্তা (গোলদাতা), সেরাজিও বাস্কেয়োটেক, পেড্রো (জেসাস নাভাস) এবং ডেভিড ভিয়াদের (ফার্নান্ডো টোরেস)।

৯০ মিনিট পর্যন্ত ফল ছিল ০-০। অতিরিক্ত ১১৬ মিনিটে ইনেস্তা অসাধারণ গোলটি করে স্পেনকে কাপের দখলদার দিলেন আগামী চার বছর—২০১৪-য় ব্রাজিলের বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

গত বছর নভেম্বরে যখন সব অঞ্চলের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শেষ হয়, দেখা গিয়েছিল সকলের আগে যোগ্যতা পেয়েছে ইওরোপের ৭ নম্বর গ্রুপ থেকে নেদারল্যান্ডস—যারা ১৯৭৪ ও ১৯৭৮-এ দুবারই ফাইনালে হেরে যায়। স্পেন তো তার গ্রুপে একটিতেও না হেরে যোগ্যতা পায়। কয়েক মাসের মধ্যে ফিফা র‍্যাঙ্কিং-এ তারা ব্রাজিলকে পিছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে যায়। ইওরোপের নানা প্রতিযোগিতায় ক্যাসিলাস, ইনেস্তা, ডেভিড ভিয়া, ফার্নান্ডো টোরেসরা যেমন, তেমনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচে সফল হওয়ায় বিশেষজ্ঞরা বলতে থাকেন স্পেনকে বিশ্বকাপে কেউ ধরতে পারবে না। নেদারল্যান্ডসকেও সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বলা হয়েছিল। তারা এই নিয়ে তৃতীয়বার রানার্স।

দক্ষিণ আফ্রিকায়ও দেখা যায় লিগ পর্বে 'ই' গ্রুপে সব কটি ম্যাচে জিতে ৯ পয়েন্ট অর্জন করে চ্যাম্পিয়ন নেদারল্যান্ডস। প্রাক কোয়ার্টার ফাইনালে ২-১ গোলে স্লোভাকিয়াকে হারালেও কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের মতো শক্তিশালী পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে পিছিয়ে থেকেও হারিয়ে দিল। রবিনহো ১০ মিনিটে ব্রাজিলকে এগিয়ে দেন। কিন্তু ৫৩ মিনিটে ফেলিপ মেলো'র আত্মঘাতী গোলে নেদারল্যান্ডসের সমতা (১-১) এল। তারপর ৬৮ মিনিটে ওয়েসলে স্পাইডার ওলন্দাজদের ২-১ ব্যবধানে যে এগিয়ে দিলেন, তা আর শত চেষ্টাতেও শোধ করতে পারেনি ব্রাজিল। ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপ জয়ী

দলের অধিনায়ক এবারের কোচ কারলস দুঙ্গার সব আশা চুরমার হয়ে গেল নেদারল্যান্ডসের টোটাল ফুটবলের কাছে। কাকা, ফাবিয়ানো, রবিনহো, জুলিও সিজাররা মাথা নিচু করে মাঠ ছাড়লেন। ২০০২-এর পরে ২০০৬-এ তারা কাপ জিততে পারেনি। অধরা রইল এবারও। পরদিন দক্ষিণ আমেরিকার আর এক দাবিদার আর্জেন্টিনা আরও হতাশ করল। জার্মানির কাছে হারে ০-৪ গোলে। টমাস মুলার, মিশেস্লাভ ক্লোজে (২টি) ও আরলে ফ্রেডেরিশ-এর গোলে বিদায় নিতে হল মারাদোনার আর্জেন্টিনাকে।

এবার স্পেনের কথায় আসি, দক্ষিণ আফ্রিকায় লীগের প্রথম ম্যাচে ওদের সূচনা দেখে অনেকে অবাক হল। সুইজারল্যান্ডের মতো দেশের কাছে হার ০-১ গোলে। তবে পরের দুটি ম্যাচে হন্ডুরাসকে ২-০ ও চিলিকে ২-১ গোলে হারায়। প্রাক কোয়ার্টার ফাইনালেও মাত্র ১-০ ব্যবধানে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালকে ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম অগ্রণী দেশ প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে হারায়। কোয়ার্টার ফাইনালে জোর লড়াই করে ৮৩ মিনিটে ডেভিড ভিয়া'র গোলে। সেমি ফাইনালে তো ইওরোপের দুই সেরা দল। প্রতিপক্ষ জার্মানি। হাড্ডাহাড্ডি ফুটবল যুদ্ধ। ৭৩ মিনিটে পিওল যে গোলটি করলেন, তা শোধই করতে পারলেন জোয়াকিম লেও'র আরলে ফ্রেডেরিশ, বাসটিন সোয়েন স্টিগার, মিরোস্লাভ ক্লোজে, লুকাস পোডোলস্কিরা। স্পেন যেন 'স্লো বাট স্টেডি'। ফাইনালে চমৎকার কোনাচে কাটে জয়ের গোলটি করেন আন্দ্রেস ইনেস্তা। ৯০ মিনিট ০-০। তারপর অতিরিক্ত সময়ের ১১৬ মিনিটে ১-০ জয়। বাকি ৪ মিনিটে নেদারল্যান্ডস সুযোগ পেলেও স্পেনের আরমাডারা যেন কাপ জিততেই নেমেছিল। ১৯৫০-এ তারা লিগ প্রথায় খেলে ফাইনাল পুলে উঠে ব্রাজিলের কাছে ১-৬ গোলে হারে স্পেন। ৬০ বছরের মাথায় তারা সুযোগটা কাজে লাগাল।

মনে হয়েছিল ২০০৬-এর ফাইনালের মতো এবারও টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হবে। তাহলেও জিততো স্পেন। কারণ গোলে তাদের অধিনায়ক ইকের ক্যাসিলাস বিশ্বসেরা। চমৎকার দক্ষতাতেই তো পেলেন সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার গোল্ডেন গ্লাভস।

এবারের বিশ্বকাপে কোনো নায়ককে পাওয়া গেল না। ওয়েনে রুনির ইংল্যান্ড প্রাক কোয়ার্টার ফাইনালে ১-৪ গোলে জার্মানির কাছে হেরে বিদায় নেয়। একই অবস্থা সবচেয়ে ধনী ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দেশ পর্তুগালের। ২০০৬-এর চ্যাম্পিয়ন মার্সেলো লিপ্পির ইতালির ফাচিয়ানো কানাভায়ো, আন্দ্রে পিয়লো, ডানিয়েলে রটি, পেপেদের দেখাই গেল না তেমন ভাবে। গ্রুপ লিগে দুটি ম্যাচে ড্র করে তারা গ্রুপে চারদেশের মধ্যে চতুর্থ স্থান পায়। কী শোচনীয় হাল ইতালির। ফ্রান্সেরও তাই, বরং আরও দুরবস্থা। জিনেদাইন জিদানে থাকলেও বাঁচাতে পারতেন? ফ্রান্স ০-০ করেছিল কেবল উরুগুয়ের সঙ্গে। হারে মেক্সিকোর কাছে ০-১ গোলে আর দক্ষিণ আফ্রিকার মতো পিছিয়ে থাকা দেশের কাছেও ১-২ গোলে। ইতালির কোচ মার্সেলো লিপ্পি আর ফরাসি কোচ রেমন্ড ডোমেনেখ-এর চাকরি থাকে?

আয়োজক দেশ (দক্ষিণ-আফ্রিকা) এই প্রথম লিগ পর্বেই বিদায় নেয়। অথচ প্রথম ম্যাচে কিছুটা আশা জাগিয়েছিল মেক্সিকোর সঙ্গে ১-১ ড্র করে। তবে আফ্রিকার ৬ দেশের মধ্যে ঘানা কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠে অতীতের সেনেগাল ও ক্যামেরুনের ঐতিহ্যই বজায় রেখেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে শুরুতে তারা ১-০ এগিয়েছিল পঞ্চম মিনিটে। উরুগুয়ে ১-১ করে ৫৫ মিনিটে। তারপর ১২০ মিনিট পর্যন্ত ১-১। অবশেষে টাইব্রেকার এবং উরুগুয়ে জেতে ৪-২ গোলে। যে দেশটি বিশ্ব যুব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গত বছর ব্রাজিলকে হারিয়ে, তারা ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে হারলেও অগৌরবের নয়। গোটা দেশ শুধু নয়, নেলসন ম্যান্ডেলাও বলেন, তোমরা আফ্রিকার গর্ব।

এশিয়াও যে এগোবে প্রমাণ দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের প্রাক কোয়ার্টারে পৌঁছনো। লিগে তারা গ্রিসকে ২-০ গোলে হারায় আর ২-২ করে নাইজেরিয়ার সঙ্গে। কিন্তু প্রাক-কোয়ার্টার ১-২ গোলে হারে ২০০২-এর সেমিফাইনালিস্ট এশিয়ার দলটি। জাপানও চমৎকার খেলেছে। লীগে তারা ক্যামেরুনকে ১-০ গোলে ও ডেনমার্কের মতো শক্তিমানদের হারায় ৩-১ গোলে। প্রাক-কোয়ার্টারে ১২০ মিনিট পর্যন্ত ০-০ হওয়ায় টাইব্রেকার প্যারাগুয়ে জেতে ৫-৩ গোলে।

জাপানের কোমানোর শটটি ক্রসবারে লাগতেই সব আশা চূর্ণ। ভেঙে পড়ে গোটা দল। ঘানার মতো এরাও দেশে ফিরলে বীরের অভ্যর্থনা পেল।

এক নজরে এবারের বিশ্বকাপ

৬৪ ম্যাচে মোট গোল ১৪৫। গড় ২.২৬+।

- এক ম্যাচে সর্বাধিক গোল—পর্তুগাল ৭ : উত্তর কোরিয়া ০।
- বেশি ম্যাচে জয়—স্পেন ও নেদারল্যান্ডস ৬টি করে।
- একটিও ম্যাচ জেতেনি—আলজেরিয়া, ক্যামেরুন, ফ্রান্স, হন্ডুরাস, ইতালি, উত্তর কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড ও নাইজেরিয়া।
- বেশি গোল করেছে ১৬টি, জার্মানি।
- বেশি গোল খেয়েছে ১২টি, উত্তর কোরিয়া।
- কম গোল, ১টি করে খেয়েছে পর্তুগাল ও সুইজারল্যান্ড।
- এবারের প্রথম গোল—দক্ষিণ কোরিয়ার মিডফিল্ডার সিপহুয়ি সাবালালা'র। তিনি ১১ জুন মেক্সিকোর বিরুদ্ধে উদ্বোধনী ম্যাচে ৫৫ মিনিটে গোলটি করেন।
- হ্যাটট্রিক আর্জেন্টিনার গঞ্জালো হিগুয়েন ৩৩, ৭০ ও ৮০ মিনিটে গোল তিনটি করেন। আর্জেন্টিনা জেতে ৪-১ গোলে। প্রথম গোলটি আত্মঘাতী ১৬ মিনিটে। করেন দক্ষিণ কোরিয়ার ফরওয়ার্ড পার্ক তু-ইয়ং।
- আর একটি আত্মঘাতী গোল করেন ডেনমার্কের ডানিয়েল অ্যাগার। বিপক্ষে ছিল নেদারল্যান্ডস।
- এবার দ্রুততম গোলটি জার্মানির থমাস মুলারের। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে তিনি ২ মিনিট ২৮ সেকেন্ডের মাথায় ১টি করেন।
- পরিবর্ত খেলোয়াড়ের গোল—জার্মানির কাকাউ-এর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৭০ মিনিটে, চিলির রডরিগো মিলার করেন স্পেনের বিপক্ষে। আর স্লোভাকিয়ার কামিল কোপ্পনের করেন ইতালির বিরুদ্ধে।
- চারটি ম্যাচে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' নেদারল্যান্ডসের স্নেইডার—ডেনমার্ক, জাপান, ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিপক্ষে।
- মোট লাল কার্ড ১৭টি, হলুদ কার্ড ২৬০।
- টাইব্রেকার ছাড়া মোট পেনাল্টি ১৫, গোল হয়েছে ৯টি।
- গোল্ডেন বল পেলেন—উরগুয়ের দিয়েগো ফোরলান। গোল্ডেন বুট-থমাস মুলার, জার্মানির। গোল্ডেন গ্লাভস—স্পেনের ইকের ক্যাসিয়াস।
- ফাইনালে দুটি হলুদ কার্ড দেখে বহিষ্কৃত হন নেদারল্যান্ডসের জন হাইটিঙ্গা।
- অক্টোপাসা পল-এর ৮টি ভবিষ্যৎ বাণী মিলে যায়। এটা পুরোপুরি অঙ্কের হিসেব, পল বলেছে বলে যা প্রচারিত, তা সঠিক নয়। ওর নামে গপ্পো প্রচারিত মন্তব্য গণিত বিশেষজ্ঞদের।
- পরবর্তী বিশ্বকাপ। ২০১৪ সালে ব্রাজিলে ১৩ জুন থেকে ১৬ জুলাই। খেলা ১২টি স্টেডিয়ামে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে শব্দদূষণের ভুভুজেলা নিষিদ্ধ।

মানবিকতার গল্প

খিদে

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ই স্কুলে এলেই খিদেটা চাগিয়ে ওঠে। ফার্স্ট পিরিয়ডের পর থেকেই বাড়তে থাকে। বাড়ে, বাড়তেই থাকে। থার্ড পিরিয়ডের পর তো আর থাকা যায় না। মনে হয়, ঘণ্টা দিচ্ছে না কেন হারাধনদা? দিক না একটু আগে ভাগেই বাজিয়ে! দুষ্টু-বুদ্ধিও পেয়ে বসে, চুপিসাড়ে গিয়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে এলেও তো হয়!

ঘণ্টা বাজানোর কথা মাথায় আসা মাত্র সুশান্ত হেসে ফেলে। হাসির ঝিলিক খেলে যায় চোখে মুখে। পরমুহূর্তেই সে হাসি মিলিয়ে গেল। ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে আর রক্ষে আছে! চোখের সামনে ভেসে ওঠে হেডমাস্টারমশায়ের মুখ। খুব গম্ভীর, সব সময়ই যেন রেগে আছেন। দেখলেই ভয় করে। সেভেন এ-তে, গ্রামার-ক্লাসে কে না তাঁর কাছে বকা খেয়েছে! কখনো একটু আধটু মারও।

এই তো সেদিনের কথা। সুশান্তদের ক্লাসে পার্টস অফ স্পিচ পড়াচ্ছিলেন হেডমাস্টারমশায়। পড়াতে পড়াতে আচমকাই সুশান্তকে জিজ্ঞাসা করেন ইন্টারজেকশন বানান। সেটাও ছিল থার্ড পিরিয়ডের ক্লাস। ভাত খেয়ে আসেনি। ভেতরে ভেতরে তখন খিদেতে ছটফটাচ্ছে সুশান্ত। এমন সময় হঠাৎই প্রশ্ন। কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। সুশান্ত। ভুল করে বসে। ভুলের খেসারতও দিতে হয়। তিরস্কার, বকুনি। সেদিন সুশান্তকে খুব বকুনি দিয়েছিলেন, হেডমাস্টারমশায়। সে সব মনে পড়ে গেল। ততক্ষণে খিদের তীব্রতা আরও বেড়েছে। হেডমাস্টারমশায়, গ্রামার ক্লাস, ইন্টারজেকশন—এসব ভাবনায় ডুবে থাকায় খিদেটা ভুলেই ছিল সে। আবার চাগাড় দিয়ে ওঠে।

সুশান্ত মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করে এই থার্ড পিরিয়ড শেষ হতে আর কত বাকি! থার্ড পেরিয়ে ফোর্থ। এতক্ষণ থাকবো কী করে! সুশান্ত মনে মনে হিসেব কষে আঁতকে ওঠে।

পেটে খিদের ছটফটানি নিয়ে কি আর ক্লাসে মন বসে! ক্লাস নিচ্ছিলেন মনোতোষবাবু। অঙ্কের ক্লাস। বীজগণিত করাচ্ছিলেন তিনি। চকের গুঁড়ো উড়ে উড়ে লাগতে থাকে মনোতোষবাবুর ঘাম-ভেজা মুখে। এমনকি প্রশস্ত টাকেও।

মনোতোষবাবু উৎপাদক করাচ্ছিলেন। জানলার ধারে বসে থাকা সুশান্তর মন যতটা না ওই উৎপাদকের দিকে, তার থেকে ঢের বেশি উঠোনের পাশে যে ঘরে রান্না হচ্ছে, সেদিকে। দোতলার এই জানলা দিয়ে আবছা-ঝাপসা দেখা যায় বড়সড়ো এক ডেকচিতে কী যেন বসানো হয়েছে উনুনে। নিশ্চিত খিচুড়ি। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। সেই হাওয়ায় মন কেমন-করা খিচুড়ির গন্ধ ভেসে এসে লাগে সুশান্তর নাকে। প্রাণভরে সে গন্ধ নেয়।

গন্ধে কি আর খিদে জুড়োয়! গন্ধটা নাক দিয়ে গলা, গলা দিয়ে আদৌ পেটে পৌঁছোল কিনা ঠিক বুঝতে পারে না সুশান্ত।

হয়তো এই গন্ধেই আবার, আবার খিদেটা চাগাড় দিয়ে ওঠে। খুব খিদে পেয়েছে। খুউব। ঢকঢক করে খানিক জল খেয়ে নেয়। বোতল ভরা জল সঙ্গেই থাকে। বাড়ি থেকে নিয়ে আসে। টিফিনের আগেই সে জল ফুরিয়ে যায়। বাড়ির জল ফুরিয়ে গেলে ইস্কুলের জল। ইস্কুলের জল বোতল ভরে নেয়।

সুশান্তর বাবা বাজারে শাকপাতা বেচে। স্টেশনের ধারের বাজারে সকালের দিকে গেলে পাওয়া যাবে তাকে। আবার বিকেলে গেলেও। সকালের দিকে এখন তেমন লোকজন হয় না। বিকেলে বেশ ভিড়। সন্ধের পর তো জমজমাট ভিড়। লোক থই থই। অফিসফেরৎ মানুষ জন পরের দিনের বাজার সেরে নেয়।

পরপর অনেক দোকান। ডাঁই করে রাখা আনাজপাতি। ভরাগ্রীষ্মেও সাজানো রয়েছে শীতের সবজি। সুশান্তর বাবার ইট-সিমেন্টের পাকা দোকানঘর নেই। এমন কি ত্রিপল, নিদেনপক্ষে একখণ্ড পলিথিন-সিট টাঙিয়েও রোদ-বৃষ্টি আড়াল করে না।

বেচি তো সামান্য শাকপাতা, তার জন্য এসব আবার কী দরকার! ছাতা-ই যথেষ্ট। মনে হয় সুশান্তর বাবার। শিক-ভাঙা, ছেঁড়া একটা ছাতা আছে তার। সেই ছাতাতেই সকালের রোদ আড়াল হয়, বিকেলের দিকে কখনো বৃষ্টি এলে তাও আড়াল হয়। আদৌ আড়াল হয় কি? রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে।

যুগ বদলাচ্ছে। অসময়ের কপি চড়া দামে অনায়াসে বিক্রি হয়। শাকপাতার খদ্দের নেই। এসব রান্না করা কি কম ঝকমারি? কার হাতে এত বাড়তি সময় আছে! তবু শাকপাতাই আঁকড়ে আছে সুশান্তর বাবা। বিকোয় ভালো, এমন কিছু নিয়ে যে বসবে, সে পুঁজি তার নেই। কলমি-নটে বা পুঁইশাক বেচে যা আয় হয়, তাতে আর সংসার চলে না। মা লোকের বাড়ি কাজ করে। এত পরিশ্রম, হাড়-ভাঙা খাটুনি, তবু সংসারের অভাব ঘোচে না। পেটও তো কম নয়। সুশান্তর এক বোন আছে। বছর পাঁচেক বয়েস। তারা ভাইবোন দু'জন, বাবা মা, আর আছে পিসি। সহ মিলিয়ে পাঁচটি পেট। এতগুলো পেট ভরানো কি সহজ কথা!

বাবার চোখে মুখে অসহায়তা। অল্পতেই এখন রেগে যায়। খিটখিট করে। মা পাশে না দাঁড়ালে কী যে হতো! কীভাবে বাবা সংসার সামলাতো কে জানে! এসব সুশান্তর মনে হয়। যত মনে হয়, ততই খারাপ লাগে। মা'র কথা ভেবে কষ্ট হয়। সাতসকালে উঠেই মা পরের বাড়িতে বাসন মাজতে ছোটে। সব কাজ সেরে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে যখন বাড়ি ফেরে, সুশান্ত তখন ইস্কুল বেরুনোর মুখে। যেদিন একটু আগে ফেরে, চটপট আলু-সেদ্ধ ভাত বসিয়ে দেয়। আলুর বদলে যদি ডিমসেদ্ধ হয়, তবে তো আর কথাই নেই। সুশান্ত নিশ্চিত একমুঠো ভাত বেশি খেয়ে ফেলে। তেমন দিন কদাচিৎ আসে। মাঝে মাঝে তো খেয়ে আসাই হয় না। না খেয়ে ইস্কুলে আসে। মা যেসব বাড়িতে কাজ করে, সকলেই জলখাবার দেয়। অধিকাংশ দিনই রুটি-তরকারী খেয়েই ইস্কুলে চলে যায় সুশান্ত। ক'দিন আগেই মা নতুন এক বাড়িতে কাজ নিয়েছে। জানতে পারার পরই সুশান্ত একটু রাগ দেখিয়ে বলেছিল, 'আবার তুমি একটা নতুন কাজ নিলে! শরীর তো তোমার ভালো নেই। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়, কত কাশো।'

সুশান্তর উদ্‌বিগ্নতায় মা হেসে ওঠে। চোখে মুখে হাল্কা হাসির ঝিলিক খেলে যায়। হেসে বলে, 'আমাকে নিয়ে এত ভাবার কী আছে? আমি ঠিক আছি। নতুন কাজ না নিলে চলবে? সংসার চালাতে যে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, বাবা।'

মা'র গলা বুজে আসে, চোখে জল। ছেঁড়া আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে সুশান্তকে কাছে টেনে নেয়। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কেমন যেন কাঁদো কাঁদো গলায় বিড়বিড় করে বলে, 'কবে বড়ো হবি! কবে বড়ো হবি, বাবা!'

দশটা বাজতে চলল। এখনো মা কাজ সেরে ফিরল না। বছর পাঁচেক বয়েস বোন পিঙ্কির। তারও ভারি খিদে পেয়েছে। পিসি বাটিতে একটু মুড়ি দিয়েছে। ছেঁড়া মাদুরে বসে মুড়ি খাচ্ছে। পিঙ্কি বসেছে বারান্দায়, দরজার সামনে। দরজার সামনে বসার কারণ আছে। মা এলেই আগেভাগে ধরবে। কী এনেছে দেখবে, খাবে! সুশান্তর থেকে পিঙ্কি অনেক ছোট। দু'জনে খুব ভাব। সুশান্ত তাকে কোলে নিয়ে, কখনো বা হাঁটিয়ে প্রায় দিন বিকেলে ট্রেন দেখাতে নিয়ে যায়। পিঙ্কি ট্রেন দেখলেই হাত নাড়ে, টাটা করে। ট্রেন যখন ঝমঝমাঝম শব্দ তুলে ছোট্ট ব্রিজটা পেরিয়ে

যায়, তখন পিঙ্কির আনন্দ দেখে কে! সারা মুখ খুশিতে উচ্ছল, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিজের মনেই হাততালি দেয়।

ট্রেন দেখে ফেরার পথে বাবার কাছে যায় দু'টিতে। কদাচিৎ খদ্দের থাকে, হয়তো দ্যাখে বাবা কলমিশাক বিক্রিতে ব্যস্ত। প্রায়শই বাবা চুপচাপ বসে থাকে। সুশান্ত আর পিঙ্কিকে দেখে একগাল হাসে। এগিয়ে এসে পিঙ্কির হাত ধরে। কোনো দিন লজেন্স, কোনো দিন বিস্কুট কিনে দেয়। ইস্কুল থেকে ফিরলেই যে পিঙ্কি ট্রেন দেখানোর বায়না জুড়ে দেয়, তা কি ট্রেনের আকর্ষণে, না ওই লজেন্স-বিস্কুটের লোভে, তা বুঝতে পারে না সুশান্ত।

পাশের বাড়ির মুন্নির কী সুন্দর দেখতে একটা পুতুল আছে। ফ্রক পরা, মাথায় চুল। শুইয়ে দিলেই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। বসিয়ে দিলেই আবার চোখ খুলে তাকায়। পুতুলটা দেখার পর থেকেই ক'দিন ধরে পিঙ্কি বায়না ধরেছে, তারও এমন পুতুল চাই। সুশান্তর কাছেই পিঙ্কির যত দাবী, যত বায়না। সুশান্ত বলেছিল, 'নিশ্চয়ই কিনে দেবো। দাঁড়া, বড়ো হই, চাকরি পাই! প্রথম মাসের মাইনের টাকা দিয়ে ঠিক তোকে পুতুল কিনে দেবো।'

না, একথা পিঙ্কির মনপসন্দ হয়নি। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, তখন আমি পুতুল নিয়ে খেলবো নাকি? আমিও তো বড়ো হয়ে যাবো। সামনেই মা ছিল। হাসি-হাসি মুখে বলেছে, 'দাদা কোথায় টাকা পাবে? আমিই পুতুল কিনে দেবো। সামনের মাসে মাইনে পাই, আমার সোনামণির জন্য ঠিক পুতুল কিনে আনবো।"

গতকাল রাতে কেরোসিন বাঁচাতে মা হ্যারিকেন নিভিয়ে রেখেছিল অনেকক্ষণ। এখনো মাস শেষ হতে হপ্তাখানেক বাকি। কী করে যে চলবে, কে জানে! উঠোনে পিঙ্কিকে নিয়ে সুশান্ত মাদুরে বসেছিল। আকাশে মস্ত চাঁদ। জোছনায় ছেয়ে গেছে চারদিক। টালির চালে ছড়িয়ে পড়া কুমড়োগাছও স্পষ্ট দেখা যায়। সবুজ পাতায় জোছনা-আলো মিলেমিশে বেশ লাগে। কুমড়োগাছে ক'টা ফুল ফুটেছে। সুশান্ত আগে খেয়াল করেনি। মা-ই দেখালো তাকে।

বাবা বাজার থেকে ফিরে শুয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে তখন। মা'র রান্না সারা হয়ে গেছে। একটু ফুরসত পেয়েই এসে বসেছে ছেলেমেয়েদের পাশে। পিঙ্কিকে সেভাবে দেখতে পারে না, এ নিয়ে মা'র দুঃখ কী কম! ভাগ্যিস পিসি ছিল, তাই রক্ষে।

সুশান্ত ছড়া আওড়াচ্ছিল 'আমপাতা জামপাতা' আর বোনের সঙ্গে খেলছিল। খেলতে খেলতে কত গল্প। পিঙ্কি যত শোনে, তার থেকে বেশি হাসে। মাঝে মাঝেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। গল্পে গল্পে ওঠে ইস্কুলের প্রসঙ্গ। রাশভারী হেডমাস্টারমশায়ের কথা, গল্প বলিয়ে রমাকান্তবাবুর কথা। সংস্কৃত স্যার রমাকান্তবাবু দারুণ গল্প বলেন। ক্লাসে এলেই সবাই বায়না ধরে, 'গল্প বলুন, স্যার। গল্প বলুন।' কতদিন সে-গল্প শুনে এসে পিঙ্কিকে বলেছে সুশান্ত। কথায়, গল্পে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়। দূরের কারখানায় এগারোটার ঘণ্টা পড়ে। হঠাৎই পিঙ্কি জিগগেস করে বসে, 'আজ ইস্কুলে কী খাওয়ালো রে, দাদা?'

ইস্কুলে গেলে যে পেট পুরে খাওয়া যায়, তা পিঙ্কির অজানা নয়। সুশান্তই বলেছে। হঠাৎই সে বায়না ধরে, তার জন্য ইস্কুল থেকে খাবার আনতে হবে। পরে একদিন' আনবো না হয়, বললে চলবে না। কালই আনতে হবে।

বোনের আবদার ফেলে কী করে? সুশান্ত কথা দেয়, কালই নিয়ে আসবে। বাড়ি থেকে ছোট্ট টিফিনবক্সটা নিয়ে যাবে। টিফিনবক্স ভরে খাবার নিয়ে আসবে বোনের জন্য।

এসব বলতে বলতে হঠাৎই চোখ যায় মা'র দিকে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে মা। মা'র মুখে জোছনার আলো। বড়ো দুখিনি দেখায় তাকে। সারা মুখেই যেন ছড়িয়ে আছে দুঃখের ছাপ! সুশান্ত মনে মনে বলে ওঠে, মা গো তোমার কীসের এত দুঃখ? আমি তো আছি।

পিঙ্কিরও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। খেলায় গল্পে হয়তো ভুলে রয়েছে। সুশান্তরও খুব খিদে পেয়েছে। মা'র ওই দুঃখমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে আর ডাকতে ইচ্ছে করে না। সারাদিন এত পরিশ্রমের পর একটু না হয় ঘুমোচ্ছে—ঘুমোক না, মনে হয় সুশান্তর।

মা কাজের বাড়ির কাজ সেরে এখনো আসছে না দেখে উঠোনে পায়চারি করতে করতে গতকালের এসব কথা মনে পড়ে গেল সুশান্তর। স্নান হয়ে গেছে, বই গুছোনো-ইউনিফর্মও পরা হয়ে গেছে। শুধু খাওয়াটুকু বাকি।

এমন সময় প্রায় দৌড়তে দৌড়তে মা এলো। ঠোঙায় রুটি, বাটিতে তরকারী। দড়দড় করে ঘামছে। ঘামে ধেবড়ে গেছে সিঁদুর-টিপ। ধেবড়ানো সিঁদুর-টিপের আশেপাশে ঘামবিন্দু, ঠিক মুক্তোর মতো। সেই

ঘাম-বিন্দুতে রোদ পড়ে ঝলমলাচ্ছে।

ঘড়ি যেন তখন চোখ রাঙাচ্ছে। আর দেরী করলে প্রেয়ারে দাঁড়ানো হবে না। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা' গাওয়া হবে না। কোনো রকমে একটু রুটি-তরকারী খেয়েই সুশান্ত ছোটে ইস্কুলে।

ফার্স্ট পিরিয়ডে অমিতবাবুর ভূগোল, সেকেন্ড পিরিয়ডে প্রবীরবাবুর ইতিহাস। সেকেন্ড পিরিয়ডেই সুশান্তর খিদে খিদে লাগে। খিদেটা ক্রমেই বাড়ে, চাগিয়ে ওঠে। মনোতোষবাবুর অঙ্কের ক্লাস কোনোদিনই তার ভালো লাগে না। আজ যেন আরও বেশি খারাপ লাগছে। যত বোর্ডের দিকে তাকিয়ে অঙ্ক বোঝার চেষ্টা করছে, ততই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। গতকালের কথা, আজ সকালের কথা সব মনে পড়ে গেল সুশান্তর। পিঙ্কির জন্য খিচুড়ি নিয়ে যেতেই হবে কথা দিয়েছে সুশান্ত। না নিয়ে গেলে বেচারি কষ্ট পাবে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে।

জানলার ধারে বসলে এই লাভ, রান্নার গন্ধ পাওয়া যায় খুব। তাই এই জায়গাটাই সুশান্তর পছন্দ। এখানেই রোজ বসে। খিচুড়ির গন্ধ নাকে আসছে আর মা'র একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ক'দিন আগের কথা। কী প্রসঙ্গে মা যেন বলেছিল, আগে রোজ রোজ ইস্কুলের ভাত রেঁধে দেওয়ার এক তাড়া ছিল। এখন আর সে তাড়া নেই। ইস্কুলেই তো দুপুরের খাবার দেয়। মা হাসতে হাসতে বলে, 'আমাদের সময় যদি ইস্কুলে দুটো খেতে দিতো, তবে আর কি ইস্কুল ছাড়তাম? খাবারের লোভেই রোজ দৌড়তাম।' সুশান্ত লক্ষ করে একথা বলতে বলতে মা'র মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে যায়! চোখ জলে চিকচিক করে ওঠে।

এমন কত কিছুই তো মনে পড়ছে। স্যার অঙ্ক করাচ্ছেন আর সুশান্তর এসব মনে পড়ছে। কখন যে এসব ভাবনায় ডুব দিয়েছিল, মনোতোষবাবুর ডাকে পলাতকমন ফিরে আসে ক্লাসে। স্যার তাকে অঙ্ক করার জন্য বোর্ডে ডাকেন। দ্রুত হাতে চার প্রশ্নমালার আটের অঙ্কটা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে ফেলেন। সুশান্ত কাঁপা কাঁপা পায়ে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে এগিয়ে যায়। পা যেন আর চলতে চায় না। খিদেটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠছে। ভীষণ খিদে। খিদের চোটে পেটের নাড়িভুঁড়ি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। খিদে পেলে কিছু না জুটলে সুশান্ত জল খায়। এমনকি মাঝ-রাতেও মাসের শেষ, মা'র হাতে হয়তো পয়সা নেই, তাই রাতে ভাত বা রুটির বদলে মুড়ি খেয়েই শুয়ে পড়েছিল। মাঝ-রাতে খিদের চোটে ঘুম ভেঙে গেলে জল ছাড়া আর খাবে কী! অন্য কিছু পাবেই বা কোথায়!

লাস্ট বেঞ্চ থেকে ধীর পায়ে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে পৌঁছনো মাত্র ঘণ্টা পড়ে গেল। সুশান্তর ধড়ে যেন প্রাণ

আসে। পা-কাঁপুনি বন্ধ হয়। স্যার ভারী গলায় বলেন, 'পার পেয়ে গেলি ভাবিস না, সুশান্ত। কালকে তোকে দিয়েই শুরু করবো, মনে থাকে যেন।'

অঙ্কের পর বাংলা। বাংলার পর টিফিন। যতক্ষণ না স্যার আসেন, ততক্ষণ ক্লাসের ভেতর-বাইরে হুলুস্থূল চলে। স্যার না-আসা পর্যন্ত চিৎকার চেঁচামেচি চলতেই থাকে। স্যার ঘরে ঢুকলেই সব স্তব্ধ।

বাংলার মানসবাবু আজ একটু আগেভাগেই ক্লাসে ঢুকেছেন। এই তো মনোতোষবাবু ক্লাস ছাড়লেন। তিনি যেতে না যেতেই চলে এসেছেন মানসবাবু। কবিতার ক্লাস। ঈশ্বর গুপ্তের 'খল ও নিন্দুক' পড়াবেন তিনি।

সারা ক্লাস তখন মিড-ডে মিলের গন্ধে ম-ম করছে। মালতীমাসির খিচুড়ি রাঁধা বোধহয় শেষ। এখন নিশ্চয়ই তরকারী হচ্ছে। গন্ধতে ঠিক মালুম হচ্ছে না। সুশান্ত অনুমান করারর চেষ্টা করে। খিদের তীব্রতা ততক্ষণে আরও বেড়েছে। কুঠার চন্দনগাছ ছেদন করে, অথচ চন্দনগাছ সুবাস বিতরণ করে। এসবই বলছিলেন মানসবাবু। সুশান্তর কানে অবশ্য কিছুই ঢোকে না। মন জুড়ে একটাই ভাবনা, কখন ঘণ্টা পড়বে, কখন! ঘণ্টা পড়লেই তো টিফিন। টিফিন মানেই খিচুড়ি।

খিচুড়ির নামে আবার খিদেটা চাগাড় দিয়ে ওঠে। আর থাকা যাচ্ছে না। সুশান্ত মনে মনে বলে ওঠে, হারাধনদা, তুমি কোথায়? দাও না, টিফিনের ঘণ্টা বাজিয়ে।

ঠিক তখনই ঘণ্টা পড়ে। মানসবাবুর কবিতা বোঝানো থামে। ক্লাসের সবার চোখে মুখেই খুশির ঝিলিক ফুটে ওঠে সবাই বেরিয়ে পড়ে, যায় একতলায়, হলঘরে। ওই ঘরেই দেওয়া হয় মিড-ডে-মিলের খাবার। ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে বসে পড়ে। মালতীমাসি খাবার পরিবেশন করে।

সুশান্তর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সবাইকে খেতে দেখে তার খিদেটা আরও আ-র-ও চাগিয়ে ওঠে। দু'হাতা খিচুড়ি খাওয়ার পর খিদে জুড়োয়। মালতীমাসি আর লাগবে কিনা জিগগেস করে। সুশান্ত ঘাড় নাড়ে। আরও এক হাতা খিচুড়ি পড়ে তার পাতে।

এসময় রোজই হলঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন হেডমাস্টারমশায় নিজে। আরও তিন-চারজন স্যার ঘরের ভেতর পায়চারি করেন। খেতে বসে কেউ বদমায়েসি করছে কি না, সেদিকে নজর রাখেন।

সুশান্ত যে টিফিনবক্স নিয়ে খেতে এসেছে, এতক্ষণ কেউই খেয়াল করেনি। একটু আড়াল করেই রেখেছিল। নিজের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর সুশান্ত মালতীমাসির কানে কানে গিয়ে কী যেন বলে! হেডমাস্টারমশায়ের তা নজরে পড়ে গেল। দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখান থেকেই চিৎকার করে জিগগেস করে, 'কী বলছে গো মালতী?'

মালতীমাসির সাদা মনে কাদা নেই। বলে, 'একটু খিচুড়ি চাইছে, বাড়ির জন্য।'

হেডমাস্টারমশায় গর্জে ওঠেন, 'মানে? বাড়িতে নিয়ে যাবে, মানে? নিজে খাবে, ঝোলা বেঁধে নিয়ে যাবে, এসব হয় না কি?' বলতে বলতে এগিয়ে আসেন একেবারে সুশান্তর সামনে। খুব তিরস্কার করেন।

সুশান্ত আগুনে যেন ঘি ঢালে। রেগেই ছিলেন, হেডমাস্টারমশায় আরও রাগ বাড়িয়ে দেয় সে। হেডমাস্টারমশায়কে লক্ষ করেই বলে, 'বেশি নয়, এক হাতা দিলেই হবে। আমি কথা দিয়েছি...।'

সুশান্তর কথা শেষ হওয়ার আগেই হেডমাস্টারমশায় আবারও গর্জে ওঠেন, সুশান্তকে খুব বকাঝকা করে ছেলেরা অনেকেই এসব দেখতে ভিড় করে, অমিত স্যার তাদের সরিয়ে দেন।

হেডমাস্টারমশায়ের বকুনিতে সুশান্ত কেঁদে ফেলে। অব্যক্ত যন্ত্রণা দলা পাকিয়ে গলার কাছে যেন আটকে যায়। পিঙ্কিকে মনে পড়ে। পিঙ্কির মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে হয়, নিজে না-খেয়ে আমারটাই যদি মালতীমাসির কাছে চাইতাম, বলতাম, এই টিফিনবক্সে ভরে দাও, তবে কি দিতো?

এ প্রশ্নের উত্তর সুশান্তর জানা নেই। তখনো হলঘরের ভিড় পাতলা হয়নি। এইটের ছেলেরা খেতে বসেছে। চোখের জল মুছে পায়ে পায়ে সুশান্ত ক্লাসের দিকে এগিয়ে যায়। টিফিন বক্সটা একটু আড়াল করেই নেয়। সবাই দেখে ফেললে আবার কী ভাববে! টিফিনবক্স আড়াল করতে গিয়ে বোনের কথা ভেবে নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়। ভাবে, কেন খেলাম, কেন এত খিদে পায়!

ছবি : সুব্রত মাজী

ফিনিক্স পাখির ডানা

কালিদাস ভদ্র

—ভ্যান-রিকশায় যেতে পারবি তো?

—খুব পারবো। সংক্ষেপে উত্তর দিল নিতাই।

নিতাইয়ের মেসো নিবারণ মণ্ডল চশমাটা পাঞ্জাবিতে মুছে অবাক চোখে তাকালেন।

ভ্যানওয়ালা হেসে বলল, কি যে বলেন মাস্টারবাবু, আজকালকার ছেলে-ছোকরারা সব পারে।

নিবারণ মণ্ডল বোদাই গ্রামে প্রাথমিক স্কুলে পড়ান। এলাকার সবাই তাঁকে চেনে। চেনার আরও একটা কারণ নিবারণ মাস্টারের স্ত্রী দুর্গা মণ্ডল বিলকান্দা গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য। পঞ্চায়েত সদস্য হয়েই দুর্গা মণ্ডল গ্রামের বয়স্কদের নিয়ে একটা স্কুল করেছেন। সন্ধে হলে তেমাথা মোড়ে অশ্বত্থ গাছটার পাশে বাঁশের বেড়া ঘেরা ঘরে বসে স্কুল।

নিতাইয়ের খুব কৌতূহল, মাসির স্কুল দেখবে। বাবার অফিসের কাজ, নিতাইয়ের পড়াশোনার চাপে দিল্লি থেকে মাসির বাড়ি আসা আর হয়নি। এবারই প্রথম পরীক্ষা দিয়ে নিতাই জেদ ধরল মাসি বাড়িতে আসার। অনেক কষ্টে বাবাকে রাজি করিয়ে নিতাই বন্ধু বুলেটকে নিয়ে এসেছে। মেসো অবশ্য মধ্যমগ্রাম স্টেশনে ছিলেন।

ভ্যান-রিক্সায় বসে বুলেট চুপচাপ চারদিক দেখছে। সবুজ আর সবুজ ধানগাছে ভরা মাঠ। মাঝখান দিয়ে কালো ফিতের মতো পিচ রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে। মাঠের একদিকে উঁচু চিমনি দিয়ে গলগল ধোঁয়া উড়ছে। বুলেট সেদিকে তাকিয়ে নিতাইয়ের মেসোকে জিজ্ঞাসা করল, মেসো ওটা কিসের ধোঁয়া?

—ইটভাটার ওখানে ইট পোড়ানো হচ্ছে তো তাই চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

নিতাই বলল, তোমাদের গ্রামে আবার কারখানাও আছে!

—কারখানা থাকবে না? কারখানা না থাকলে মানুষ সামনের দিকে এগুবে কিভাবে? পড়নি, মানুষ চাকা আবিষ্কার করলো কেন!

বুলেট বলল, নিতাই তুই না ভারি বুদ্ধু!

—বুদ্ধু কেন?

—কেন তুই জানিস না। তুই তো ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব নিয়ে সেদিন ক্লাসে খুব বলছিলি তরুণ, সুখেন, গোপালদের।

লজ্জা পেয়ে নিতাই ফিক করে হেসে বলল, তোর মেমারি খুব সার্ফ।

মাঠের ভেতর থেকে টেকো মাথায় হেঁটে আসতে আসতে একজন মেসোকে জিজ্ঞাসা করলো, মাস্টারবাবু এই দুপুরে কোত্থেকে আসছেন?

—স্টেশন থেকে। দিল্লি থেকে আমার শালীর ছেলেরা এসেছে, ওদের আনতে গিয়েছিলাম।

ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক টিয়াপাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। সবুজ ধানখেতের উপর পাখিগুলোর রং ভারি সুন্দর লাগলো নিতাইয়ের। টিয়া পাখিগুলো উড়ে যেতেই রাস্তার পাশে নয়ানজুলির ধারে বাবলা গাছে বসে থাকা একটা মাছরাঙা উড়ে গেল। নিতাইদের মাথার উপর দিয়ে মাছরাঙাটা যাওয়ার সময় একটা পালক পড়লো বুলেটের কোলে। বুলেট পালকটা তুলে বলল, দেখ দেখ, কি অপূর্ব। যেন নীল ভেলভেটের চিরুনি।

নিতাই বুলেটের হাত থেকে পালকটা নিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, দেখ, আমার মাসির বাড়ি কি দারুণ জায়গায়। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে এ সব পাবি! চারদিক শুধু ধোঁয়া আর মানুষের ভিড়।

—হ্যাঁরে, কি বিচ্ছিরি জায়গায় আমরা থাকি। পাখি বলতে তো শুধু কাক দেখা যায় এখন দিল্লিতে।

প্যাক প্যাক হর্ন বাজিয়ে ভ্যান রিকশাটা থামল। রাস্তার পাশেই মাসির বাড়ি। ভ্যান থেকে নেমে নিতাই বুলেট মেসোর সাথে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। নিতাইকে বহুদিন পরে দেখে মাসি খুশিতে জড়িয়ে ধরলেন। নিতাই মাসিকে মেসোকে প্রণাম করে সোফায় বসল। বুলেটও নিতাইয়ের দেখাদেখি প্রণাম করতেই মাসি বললেন, হ্যাঁরে তোরা দেখছি এখনও সেই মাণিক-জোড়টি রয়েছিস। তা বেশ ভালো লাগছে। সারা জীবন এমনভাবেই থাকবি তো!

ঘাড় নেড়ে বুলেট সম্মতি জানাল। মাসি বললেন, দশ-বারো বছর আগে দিল্লিতে দিদির বাড়ি তোকে দেখেই বুঝেছিলাম তোরা খুব ভালো বন্ধু হবি।

মেসো বেশ রাশভারি গলায় বললেন, আগে ছেলেগুলোকে কিছু খেতে দাও। অনেকক্ষণ কিছু খায়নি। তাড়াতাড়ি ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর। একটু পরেই তোমায় আবার সাক্ষরতার ইস্কুলে যেতে হবে।

খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে নিতাই বাইরে এসে দাঁড়াল। রাংচিতা বেড়ায় হাজার পাখির জলসা শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা নামছে কালো ওড়না উড়িয়ে। পশ্চিম আকাশে আবিরের আঁকিবুকি ধীরে ধীরে যেন কে মুছে দিচ্ছে।

মাসির ডাকে চমকে ওঠে নিতাই। মাসি বলেন, কি রে, যাবি নাকি আমার স্কুলে?

—হ্যাঁ যাবো।

—চল্ তবে।

—দাঁড়াও বুলেটকে ডাকি।

নিতাই, বুলেট মাসির সাথে রাতের স্কুলে এসে খুব অবাক হয়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে মাসির মুখের দিকে তাকাল নিতাই। নিতাইয়ের কাণ্ড দেখে বুলেট ফিসফিস করে বলল, কি রে কি দেখছিস! এরা ছাত্র।

নিতাই কোনো কথা বলতে পারছে না। বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে দেখছে চারদিক।

মাসি বললেন, তোরা খুব অবাক হয়েছিস না!

—হুম। নিতাই কোনোমতে উত্তর দিল।

মাটিতে খেজুর পাতার সস্তা পাটিতে গোল হয়ে বসেছে গাঁয়ের আট-দশজন লোক। কাঁচা-পাকা চুল, দাড়িতে লোকগুলোকে ভারি অদ্ভুত লাগছে। এর মধ্যে তিনজন আবার মাঝবয়সী মহিলাও আছে। সস্তা শাড়িতে নাদুস নুদুস চেহারার একজন আদিবাসী মহিলা হঠাৎ বলল, ব্যাটা দুটো আপনার কে গো দিদিমণি?

—বোন পো।

—বোন পো! কলকল হাসিতে ক্লাসঘর মুখরিত হয়ে উঠলো।

পাশ থেকে দুপুরের ভ্যান-রিকশাওয়ালা সেই মাঝবয়সী লোকটা বলল ওরা আজই দিল্লি থেকে এসেছে। আমার ভ্যানে চেপেই তো এল।

—দিল্লি কত দূর গো দিদিমণি?

—অনেক দূর। তুই যাবি মালতী?

—কি করে যাব! আমরা যে মুখ্যু।

—কে বলেছে তুই মুখ্যু। তুই এখন ভালোভাবে পড়তে লিখতে পারিস। তাছাড়া তুই যেভাবে এখন গ্রামে কাজ করছিস তাতে সবার তুই খুব প্রিয়। দেখ তোকে হয়তো একদিন গ্রামের লোক ভোটে দাঁড় করাবে। তখন তুইও...

মাসির কথা শুনতে শুনতে মালতীর মুখ চোখ দ্রুত বদলে যায়। নিতাই দেখছে মালতী মাণ্ডীর মুখ যেন ডোকরাদের মতো আশ্চর্য হয়ে ফুটে উঠছে। অবিকল ভাস্কর্যের মুখ।

বুলেট অবাক চোখে দেখছে মালতীর হাতে ধরা কালো স্লেটে সাদা সাদা অক্ষরগুলো রাতের আকাশে তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। এত বয়সেও গ্রামের লোকেরা লেখাপড়া শিখছে!

উন্মুখ হয়ে বুলেট তাকালো সেই ভ্যান-রিকশাওয়ালার দিকে। ভ্যানওয়ালা বলল, দুর্গা দিদিমণি আমাদের সত্যিকারের দুর্গা প্রতিমা গো। এমনভাবে আমাদের লেখাপড়া না শেখালে আমরা যে সারা জীবন মুখ্যু থাকতাম। ছেলে-মেয়েগুলোও মুখ্যু থাকত।

মালতী বলল, রাতের ইস্কুলে আসায় গাঁয়ের মরদগুলান নেশা-ভাঙতো ছেড়েছে।

—হ, হ, নেশাভাঙ করব ক্যান! পঞ্চায়েত দুপুরে পোলাপ্যানদের ইস্কুলে পড়াচ্ছে তাছাড়া আমার ভ্যান-রিকশাটা তো কিনতে পঞ্চায়েত লোন দিয়েছে।

মাসি বললেন, থাক থাক ওসব কথা। মালতী তুই একটা ছবি এঁকে দেখা আমার বোনপোদের। ওরাও ভালো ছবি আঁকে।

চকখড়ি নিয়ে মাতলী ব্লাকবোর্ডে আঁকিবুকি কাটল। একটু পরেই কালো ব্ল্যাকবোর্ড জুড়ে ফুটে উঠল একটা আশ্চর্য পাখি। কি বিশাল তার দুটো ডানা!

বিস্ময়ভরা চোখে নিতাই জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি পাখি?

—ফিনিক্স পাখি।

—ফিনিক্স!

—হ্যাঁ গো খোকাবাবু। নাম শোননি!

—না। বইতে পড়েছি।

—আমরাও বইতে পড়ে কল্পনায় আঁকি। আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা কাপড়ে এখন কাঁথাস্টিচে এই পাখি করছে।

বুলেট নিতাইয়ের মুখের দিকে তাকাল অবাক চোখে। বাইরে তখন ম-ম করছে চাঁদের আলো। বাঁধভাঙা সে আলোর জোয়ারে বাঁশের বেড়া ঘর স্কুল ভেসে যাচ্ছে।

নির্বাক নিতাই মনে মনে বলল, সাবাশ মাসি সাবাশ। তোমার বোদাই গ্রাম, আজ জেগে উঠেছে ফিনিক্স পাখির ডানার মতন। ইস এই গাঁয়ে যদি মাসির কাছে থেকে যেতে পারতাম!

বাইরে কোথাও রাতচরা পাখি ডেকে উঠল। নিতাই সেই কুড়িয়ে পাওয়া নীল পালকটা হাতে নিয়ে উদাস হয়ে গেল।

ছবি : শংকর বসাক

ভূতের গল্প

সুধাময় হালদারের ম্যাজিক

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ট্যাক্সি থেকে নেমে রজনীবাবু পকেট থেকে টাকা বার করছিলেন। দমকা হাওয়ায় তাঁর মুঠো থেকে একটা একশো টাকার নোট উড়ে গিয়ে ট্যাক্সির ভেতরে গিয়ে পড়ল। দরজা খুলে সিট থেকে টাকাটা কুড়োবার সময় দেখলেন সিটে সুধাময় বসে আছেন। রজনীবাবু অবাক, "সুধাময়, আপনি!" সুধাময় কোনও উত্তর দিলেন না। মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। ড্রাইভার তাড়া দিল, 'কই, ভাড়াটা দিন।" ভাড়া মিটিয়ে রজনীবাবু দেখলেন সুধাময় নেই। ব্যাপারটা কী!

ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিয়ে একটু এগিয়ে থেমে গেল। সন্ধে হয়েছে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে আলো কম নয়। রজনীবাবু স্পষ্ট দেখলেন হাত তুলে ট্যাক্সিটাকে যিনি থামিয়েছেন তিনি সুধাময়। সুধাময় দরজা খুলে ট্যাক্সিটাতে উঠে পড়লেন। ট্যাক্সি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

রজনীবাবু হাঁটতে হাঁটতে ট্যাক্সিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। কই! ট্যাক্সিতে তো কেউ নেই! খালি ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। সিটে মাথা ঠেকিয়ে ড্রাইভার তন্দ্রায় ঢলে পড়েছে।

রজনীবাবুর ড্রাইভার রতন দেশে গেছে। রজনীবাবু নিজে আজকাল ড্রাইভ করেন না। তাই বাইরে বেরলে তাঁকে ট্যাক্সিতে চড়তে হয়। একেবারে বাড়ির সামনে নামতে পারতেন। নামেননি। হাঁটা দরকার।

আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন। আর ভাবছিলেন একটু আগে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল। অদ্ভুত কাণ্ড। তিনি কি ভুল দেখলেন! বড় রাস্তা থেকে এবার গলির ভেতর ঢুকলেন। বড্ড ভিড়। পেছনে একটা টানা রিকশা ঘণ্টি বাজাচ্ছে।

রজনীবাবু বাঁ পাশে সরে গেলেন। রিকশাটা তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেল। স্পষ্ট দেখলেন রিকশায় সুধাময় বসে আছেন। যাওয়ার সময় সুধাময় তাঁর দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসলেন।

খানিকটা এগিয়ে রিকশাটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। সরু গলিতে একটা ম্যাটাডোর ঢুকে রাস্তা জ্যাম করে দিয়েছে। রজনীবাবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন রিকশায় সুধাময় বসে আছেন। রজনীবাবু পা চালিয়ে রিকশার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রিকশা ফাঁকা। কেউ নেই।

তাঁর মাথাটা যেন কেমন করে উঠল। পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমা মুছলেন। জ্যাম কেটে যাচ্ছে। রিকশাটা এগোচ্ছে। রজনীবাবু আবার দেখতে পেলেন রিকশায় সুধাময় বসে আছেন।

বাড়ি ফিরে জামা কাপড় না বদলে নিজের ইজি চেয়ারটিতে এসে বসলেন। হরিকে ডাকলেন। হরি এল।

রজনীবাবু বললেন, "ফ্যানটা ফুল স্পিডে চালিয়ে দে। আগে খাবার জল দে। তারপর চা খাব।"

ফ্যানের স্পিড ফুল করে হরি চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। বলল, "কিছুক্ষণ আগে এক বাবু ফোন করেছিলেন। আপনাকে খুঁজছিলেন।" রজনীবাবু বিরক্ত হলেন, "কে আবার ফোন করলেন! নাম-টাম কিছু বলেছেন।" হরি বলল, "হ্যাঁ। বললেন, তাঁর নাম সুধাময় হালদার।" রজনীবাবু চমকে উঠলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন। হরি জল নিয়ে এল।

জল খেয়ে একটু সুস্থির হয়ে রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তা তিনি কিছু বলেছেন!" হরি বলল, "বললেন তো পরে ফোন করবেন।" হরি এবার চা আনতে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে রজনীবাবু সুধাময়ের কথা ভাবছিলেন। সুধাময় হালদার রজনীবাবুর সঙ্গে এক কলেজে পড়তেন। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তা নয়। সুধাময়ের একটা বিশেষ গুণ ছিল। যার জন্যে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুধাময় দারুণ ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। একটা ঘটনার কথা স্পষ্ট মনে আছে।

সেদিন কলেজে বাংলার অধ্যাপক ব্রজবিলাস চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের বলাকা থেকে সবুজের অভিযান কবিতাটি পড়াচ্ছিলেন। কবিতার একটি করে লাইন পাঠ করে রবীন্দ্র মানসের কথা ব্যাখ্যা করছিলেন। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ তিনি থেমে গিয়েছিলেন। তর্জনী তুলে সুধাময়কে দাঁড়াতে বললেন এবং তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী বই পড়ছো!" সুধাময় রজনীবাবুর পাশে বসে মন দিয়ে ম্যাজিশিয়ান হুডিনির জীবনী পড়ছিলেন। সুধাময় উঠে দাঁড়ালেন। অকপটে বললেন, "বলাকা কাব্যগ্রন্থ স্যার। আপনি পড়ছেন আর আমি পড়ে পড়ে ভাবটা মিলিয়ে নিচ্ছি।" রজনীবাবু দেখলেন সুধাময়ের হাতে হুডিনির জীবনী। ব্রজবিলাস চক্রবর্তী অর্থাৎ বি.বি.সি. সুধাময়ের কথাটা বিশ্বাস করলেন না। ডায়াস থেকে নেমে তিনি সুধাময়ের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। রজনীবাবুর বুক দুরু দুরু করে কাঁপছিল। এক্ষুনি সুধাময় ধরা পড়ে যাবেন।

মোকাসিন জুতোর মশ মশ শব্দ তুলে বি.বি.সি. সুধাময়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রজনীবাবু দেখলেন সুধাময় হুডিনির জীবনীটা স্যারের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এক্ষুনি একটা ভয়ংকর কাণ্ড হয়ে যাবে ভেবে রজনীবাবু চোখ বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু একটু পরে বি.বি.সি.র কথা শুনে চোখ খুললেন। স্যার সুধাময়ের পিঠ চাপড়ে দিতে দিতে বলছেন, "গুড বয়। এই রকম ছেলেই তো চাই।" তারপর ক্লাসের ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সুধাময়কে দেখে তোমরা সবাই শেখো।" ক্লাসসুদ্ধ সবাই এক দৃষ্টে সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই সময়ে কলেজের বন্ধুরা পরস্পরকে আপনি আজ্ঞে করতেন। রজনীবাবু ফিস ফিস করে বললেন, "এটা কী করে হল! বলাকা বইটাও সঙ্গে করে এনেছেন নাকি!" সুধাময় বললেন, "কোথায় পাব! আমার কাছে কেবল একটা খাতা আর এই হুডিনির জীবনীটা।" রজনীবাবু বললেন, "এত বড় ম্যাজিক জীবনে কোনওদিন দেখিনি।"

এত বছর পরে সুধাময় ফিরে এসে আবার ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। রজনীবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

বছর পঁচিশেক আগে বর্ধমানে এক পোড়ো বাড়িতে ভূতের গল্প পাঠের এক আসর বসেছিল। সেই আসরে রজনীবাবুকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছিল। আয়োজকদের পরিকল্পনাটা ছিল অভিনব। রাত বারোটা থেকে শুরু হবে গল্প পাঠ। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সুধাময় হালদার। রজনীবাবু সুধাময়কে চিনতে পেরেছিলেন, "আপনি আজকাল ভূতের গল্পটল্পও লিখছেন নাকি!" সুধাময় বিনীত ভাবে বলেছিলেন, "সে আস্পর্ধা আমার নেই। আপনার গল্প শুনতে এসেছি।" রজনীবাবু বলেছিলেন,

''আজ এখানে আমি সভাপতি। নিজের গল্প পড়ব না তো! বরং শুরুতে আপনি একটা ম্যাজিক দেখান দেখে আমরা মুগ্ধ হই।''

সভার দিকে তাকিয়ে রজনীবাবুর মনে হল এঁরা কেউ সুধাময়কে চেনেন না। রজনীবাবু সকলের সঙ্গে সুধাময়কে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ''ইনি আমার সহপাঠী। জীবনে অনেকের ম্যাজিক দেখেছি কিন্তু এঁর মতো চমকপ্রদ ম্যাজিক আজ পর্যন্ত দেখিনি।'' সভাসুদ্ধ সকলে বললেন, ''সুধাময়বাবু, আজ একটা ম্যাজিক দেখান।'' সুধাময় মাথা নাড়েন, ''না। না। এই সভায় ম্যাজিক বড্ডো বেমানান। আজ ম্যাজিক থাক।'' রজনীবাবু বললেন, ''আপনি যদি ম্যাজিক দেখান তাহলে আমার লেখা একটা গল্প পড়ব।'' এর পর সুধাময় আর না বলেননি। সেদিন সুধাময় একটা অদ্ভুত ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন।

ফোনটা বেজে উঠল। রজনীবাবু ভাবলেন নিশ্চয়ই সুধাময় ফোন করছেন। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন। কিংকর বর্মনের গলা। রজনীবাবু বিরক্ত হলেন, ''কী ব্যাপার!'' কিংকর বর্মণ বললেন, ''বর্ধমানে বছর পঁচিশেক আগে একটা অভিনব সাহিত্য সভা হয়েছিল। আপনার মনে আছে!'' ইদানিং রজনীবাবু সভাসমিতিতে যান না। আগে তবু মাঝে মধ্যে যেতেন। বর্ধমানে কোন সভার কথা কিংকর বর্মণ বলছেন! অভিনব বিশেষণ দেওয়াতে রজনীবাবু একটু বুঝলেন, ''সেই পোড়ো বাড়িতে রাত বারোটায় ভূতের গল্প পাঠ!'' কিংকর বর্মণ বললেন, ''ঠিক ধরেছেন। সেখানে আপনাকে যেতে হবে। আপনাকে ওঁরা সভাপতি করতে চান।'' রজনীবাবু চটে গেলেন, ''আপনি ওঁদের হয়ে বলছেন কেন! ওঁদের বলতে দিন।'' কিংকর বর্মন থতমত খেয়ে যান, ''না। না। ওঁরাই আপনার কাছে যাবেন।'' রজনীবাবু বললেন, ''ঠিক আছে। ফোন রাখছি। একটা ফোন আসার কথা আছে।''

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও সুধাময়ের ফোন এল না। রজনীবাবু উঠলেন। জামা-কাপড় বদলালেন।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের টেবিলে বসে জানলার দিকে তাকালেন। আজকাল আর চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসে জানলা দিয়ে আদি গঙ্গার চেহারাটা দেখা যায় না। ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকে না। সারি সারি ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হয়েছে।

রজনীবাবুর লেখার সময় এটা নয়। তিনি মধ্যরাত্রে লিখতে বসেন। পুজো সংখ্যার জন্য কিংকর বর্মনকে একটা গল্প লিখে দিয়েছেন। কিন্তু দেওয়ার পর তাঁর মনে হয়েছিল লেখাটা মোটেই ভাল হয়নি। মনটা খুঁত খুঁত করছে। অবশ্য কিংকর বর্মনকে বলে রেখেছেন লেখাটা যেন এক্ষুনি প্রেসে না পাঠান। অন্য একটা গল্প দিতে পারেন। কিন্তু মাথায় কোনও গল্প নেই।

আজ সন্ধে থেকে একের পর এক অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ট্যাক্সিতে সুধাময় এই আছেন এই নেই। রিকশাতেও তাই। ফোনেও সুধাময় তাঁর খোঁজ করছেন। অথচ সুধাময় হালদার কেবল একটা ঝাঁকি দর্শন দিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছেন। ভাবতে ভাবতে রজনীবাবু চমকে উঠলেন। পঁচিশ বছর আগে সুধাময়ের যেমন চেহারা দেখেছিলেন আজ একটু দেখেই বুঝলেন তাঁর চেহারার কোনও পরিবর্তন হয়নি। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি চোখে কালো ফ্রেমের চশমা আর হাতে একটা পোর্টফোলিও। এত বছর পরেও সুধাময়ের চেহারা পাল্টাল না কেন!

রাত বারোটাতেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন সুধাময়ের কথা।

সেবার বর্ধমানের পোড়ো বাড়িতে গভীর রাতে সুধাময় একটা অদ্ভুত ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন।

সেই সভায় এক প্রবীণ লেখক ছিলেন। যিনি কেবল ভূতের গল্প লেখেন। রজনীবাবু শুনেছিলেন ভবদেববাবু নাকি সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাতি। ভবদেববাবু তখন বয়সের ভারে ক্লান্ত। তাঁর দুহাতে অনেকগুলি আংটি ছিল। ডান হাতে চারটি। বাঁ হাতে তিনটি। সুধাময় তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''আপনি দু হাতে এত আংটি পরেছেন কেন! জ্যোতিষে আপনার খুব বিশ্বাস!'' ভবদেববাবু মাথা নেড়ে ছিলেন, ''না। ওসবে বিশ্বাস নেই। শখ করে পরেছি।''

সুধাময় এবার ম্যাজিক নিয়ে একটা ছোটোখাটো বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। সবাই মন দিয়ে সুধাময়ের কথা শুনছিলেন। বক্তৃতা শেষ করে সুধাময় আবার ভবদেববাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''কী বললেন! আংটির ভারী শখ!'' ভবদেববাবু বিরক্ত হয়েছিলেন, ''এককথা বার বার বলছেন কেন!'' সুধাময় বলেছিলেন, ''কারণ, আপনার হাতে তো কোনও আংটি আর দেখতে পাচ্ছি না। তাই!''

ভবদেববাবু সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁর হাতে একটাও

আংটি নেই। সকলে অবাক হয়ে গেলেন। রজনীবাবুও। আর ভবদেববাবু ব্যাকুল হয়ে বার বার বলতে লাগলেন, "আমার আংটিগুলো কোথায় গেল! কোথায় গেল!" রজনীবাবুও খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। সুধাময়কে জিজ্ঞেস করলেন, "আংটিগুলো কোথায়!" সুধাময় বললেন, "আমি কী করে জানব!"

ভবদেববাবু মাথা নিচু করে বসে আছেন। দুঃখে চোখ বন্ধ করেছেন। রজনীবাবু গম্ভীর হয়ে গেছেন।

খানিকক্ষণ এই রকম স্তব্ধতা চলল। তারপর সুধাময় ভবদেববাবুকে বললেন, "আপনার কোনও আংটি হারায়নি। দেখুন, আপনার আঙুলেই আছে। ভবদেববাবু দু হাত তুলে সুধাময়কে আশীর্বাদ করলেন, "দীর্ঘজীবী হও বাবা। এমন ম্যাজিক কোনওদিন দেখিনি।" সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন ভবদেববাবুর দু হাতের আঙুলে আংটিগুলি ফিরে এসেছে। এরপর ভূতের গল্প পাঠ শুরু হয়েছিল।

কাল শেষ রাতের দিকে ঘুম এসেছিল। ঘুম প্রগাঢ় হওয়াতে রজনীবাবু বেশ বেলা করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। হরি মাঝে মাঝে দেখে যাচ্ছিল বাবু উঠেছেন কি না। রজনীবাবু বাসি মুখে একটা সিগারেট ধরালেন। হরিকে ডাকলেন। হরি এসে বলে গেল, "চায়ের জল চাপিয়েছি।"

একটু পরে হরি চা নিয়ে এসে বলল, "আবার সেই বাবু ফোন করেছিলেন।" রজনীবাবুর ভুরু কুঁচকে উঠল, "কোন বাবু!" হরি বলল, "সেই সুধাময় হালদার।" রজনীবাবু বললেন, "কখন!" হরি বলল, "সে এক অদ্ভুত সময়ে বাবু। রাত তখন তিনটে। ফোনের ঝন্ ঝন্ শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। আপনি শুনতে পাননি!" রজনীবাবু মাথা নাড়লেন, "শুনতে পাইনি। তা সুধাময় কী বললেন!" হরি বলল, "ওই এক কথা। বাবু নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছেন। ঘুম থেকে উঠলে বলবে আমি ফোন করেছিলাম।"

সুধাময় তাঁর পিছু ছাড়ছে না। হঠাৎ রজনীবাবুর মনে পড়ে গেল সুধাময়ের বাড়ি তো দূরে নয়! হাওড়ায়। নিধিরাম মাঝি লেনে। বহুকাল আগে একবার তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। টেলিফোনের পুরনো খাতায় সুধাময়ের ফোন নাম্বার থাকতে পারে।

চা শেষ করে হরিকে ডাকলেন। হরি এসে দাঁড়াল। রজনীবাবু বললেন, "কয়েকটা পুরনো ডায়ারিতে অনেকের ফোন নাম্বার লেখা ছিল। সেগুলো নিয়ে আয়।" হরি জিজ্ঞেস করল, "এক্ষুনি লাগবে!" রজনীবাবু বললেন, "হ্যাঁ।" হরি বলল, "দিচ্ছি। একবার রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি।"

পুরনো ডায়ারি ঘাঁটতে ঘাঁটতে শেষ পর্যন্ত সুধাময়ের ফোন নাম্বারটা পাওয়া গেল। ফোন করে হতাশ হলেন। এই নাম্বারের কোনও অস্তিত্ব নেই। রজনীবাবুর মনে পড়ে গেল অংশুমানকে। অংশুমান তাঁর দূর সম্পর্কের ভাইপো। টেলিফোনে কাজ করে। কোনও নাম্বার সহজে না পেলে সে জোগাড় করে দেয়। অংশুমানকে ফোন করে সুধাময়ের নাম্বারটা দিয়ে বললেন, "নাম্বার বদলে এখন নতুন কী নাম্বার হয়েছে আর বাড়ির ঠিকানাটা জানাও।" অংশুমান বলল, "আধঘণ্টার মধ্যে জানাচ্ছি।" পনেরো মিনিট পরে অংশুমান জানাল, "না, কাকাবাবু। পারলাম না।"

সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। তিনমাস পরে আবার সেই চেনা পায়ের শব্দ।

রতন এসে দাঁড়াল। রজনীবাবু বললেন, "কী ব্যাপার রতন! একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে যে! একমাসের ছুটি নিয়ে তিনমাস কাটিয়ে এলে!" রতন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "কী করব স্যার। বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন।"

রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা এখন কেমন!" রতন বলল, "এখন একটু ভাল।"

বিকেলের রোদ পড়ে এল। রজনীবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বললেন, "হাওড়ায় নিধিরাম মাঝি লেনে যাব। চেনো!" রতন বলল, "হ্যাঁ স্যার। মল্লিক ফটক দিয়ে ঢুকতে হবে।"

নিধিরাম মাঝি লেনে ঢোকা গেল। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা! সেটা রজনীবাবুর মনে নেই। কোনও খাতায় বা ডায়ারিতে লেখা নেই।

রজনীবাবু বললেন, "বাঁ দিকে গাড়িটা রাখো তো!" এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসছিলেন। রজনীবাবু গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রলোককে থামালেন, "সুধাময় হালদারের বাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন!" ভদ্রলোক বললেন, "মাস দুয়েক হল এ পাড়ায় এসেছি। সবাইকে চিনি না। বলতে পারব না।" ভদ্রলোক চলে গেলেন। রজনীবাবু আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলেন। কেউ বলতে পারলেন

না। সকলেরই এক উত্তর, "সুধাময় হালদার নামে কোনও ভদ্রলোক এখানে থাকেন না।"

হতাশ হয়ে রজনীবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন। কী আর করা যাবে। সরু গলি। কোথাও আলো নেই। রতন জিজ্ঞেস করল, "এবার কোথায় যাব!" রজনীবাবু বললেন, "কোথায় আবার! বাড়ি।" খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রতন ব্রেক কষল।

রজনীবাবু চোখ বুজে সুধাময়ের কথা ভাবছিলেন। রতন ক্রমাগত হর্ন বাজাচ্ছে। রজনীবাবুর ভাবনাসূত্র ছিঁড়ে গেল। বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী হল!" রতন বলল, "দেখুন না। লোকটা কেমন রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। সরছে না।" সত্যি একটা লোক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। রতন হর্ন দিচ্ছে। লোকটা সরছে না। কালা নাকি!

রজনীবাবু জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললেন, "ও মশাই! শুনছেন!" ভদ্রলোক ঘুরে তাকালেন। রজনীবাবু চমকে উঠলেন। সুধাময় হালদার।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নামলেন। সুধাময় একবার রজনীবাবুর দিকে তাকালেন। মুখে মুচকি হাসি। তারপর সুধাময় হন হন করে হাঁটতে শুরু করলেন।

রজনীবাবু ডাকলেন, "সু...ধা...ময়। সু...ধা...ম...য়।" সুধাময় ফিরে তাকালেন না। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে রতনকে বললেন, "ওই ভদ্রলোকের কাছে চলো। ডাকছি। শুনতে .ছেন না।" রতন জিজ্ঞেস করল, "কোন ভদ্রলোক?" রজনীবাবু বললেন "ওই সাদা-পাঞ্জাবি-ধুতি পরা ভদ্রলো :। যিনি এতক্ষণ পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছিলেন।" রতন বলল, "এখন তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।" রজনীবাবু হতাশ গলায় বললেন, "আমিও এখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।"

ক্লান্ত মন নিয়ে রজনীবাবু রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে এসে দেখলেন দুজন ভদ্রলোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

রজনীবাবু ঘরে ঢুকতে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। রজনীবাবু বললেন, "আমি কিন্তু কোনও লেখা টেখা দিতে পারব না।" দুজনের মধ্যে একজন বয়সে প্রবীণ। প্রবীণ বললেন, "লেখা নয়। একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।" রজনীবাবু বললেন, "আপনারা বসুন।"

রজনীবাবুর বসার ঘর সাদা মাটা। একটা বড় টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার।

রজনীবাবু বললেন, "বলুন, কী বলবেন!" প্রবীণ বললেন, "আমাদের সভায় আপনাকে সভাপতি হতে হবে।" রজনীবাবু মাথা নাড়লেন, "আমি সভা-সমিতিতে যাই না।" প্রবীণ বললেন, "তা আমরা জানি। বহুকাল আগে আপনি আমাদের সভায় গিয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর পর আবার পোড়ো বাড়িতে ভূতের গল্প পড়া হবে। আমরা আপনাকে চাই।"

রজনীবাবু মনে পড়ল সেই সভার কথা। সেই সঙ্গে মনে পড়ল সুধাময়কে। তিনি এবার একটু নরম হলেন, "ওই সভায় সুধাময় হালদার যাচ্ছেন তো!" প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, "সুধাময় হালদার! এই নামে কোনও ভূতের গল্প লেখক আছেন নাকি!" রজনীবাবু বললেন, "না। ভদ্রলোক একজন ম্যাজিশিয়ান। সেবার তিনি সভার শুরুতে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন।" প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, "আগের সভায় আমরা ছিলাম না। তাঁর ঠিকানা যদি জানা থাকে দিন। তাঁকে আমন্ত্রণ জানাব।"

রজনীবাবু মাথা নাড়লেন, "তাঁর ঠিকানা তো জানি না।" হরি চা নিয়ে এল। রজনীবাবু বললেন, "আপনাদের ফোন নম্বারটা একটা কাগজে লিখে দিয়ে যান। ভাল কথা আপনাদের সঙ্গে তো সেভাবে আলাপই হল না।" প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম রাসবিহারী দত্ত। আর ইনি হলেন গোকুল বর্ধন। আমরা বর্ধমানেই থাকি।"

রাসবিহারী বাবু বললেন, "আর একটা কথা। সভাটা হচ্ছে সামনের মাসের প্রথম শনিবারে। আসছেন তো!" রজনীবাবু বললেন, "যদি যাই জানাব।" ওঁরা ফোন নম্বার দিয়ে চলে গেলেন।

সুধাময় হালদার কিন্তু রজনীবাবুকে ছাড়ছেন না। যখন তখন দেখা দিয়ে মুচকি হেসে চলে যাচ্ছেন। এই যেমন সেদিন হল।

সেদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় রজনীবাবু বাড়ি থেকে বেরলেন। গাড়িতে বসে রতনকে বললেন, "অনেকদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে যাওয়া হয়নি।"

আজকাল গড়ের মাঠ আর তেমন নেই। সবুজের অখণ্ড নির্জন বিস্তার কই! তারই মধ্যে একটু নিরালা শ্যামলে রতন গাড়িটা পার্ক করল। রজনীবাবু গাড়ি থেকে নামলেন।

বিকেল ফুরিয়ে আসছিল। গাছে-গাছে পাখিদের কিচির-মিচির। অন্ধকার নামছে। রজনীবাবু কিছুক্ষণ ছড়ি

হাতে পায়চারি করলেন। তারপর ঘাসের ওপর বসলেন।

অন্ধকার আরও প্রগাঢ় হল। রজনীবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা ফুঁ দিয়ে ফেলতে যাবেন একটা হাত এগিয়ে এল, "ফেলবেন না। আগুনটা দিন।" তাঁর হাত থেকে জ্বলন্ত কাঠিটা কে যেন নিয়ে নিলেন। রজনীবাবু স্পষ্ট দেখলেন। একটা ডান হাত। ঢিলে হাতা সাদা পাঞ্জাবিতে ঢাকা এ কার হাতা! হাতে কাঠিটা জ্বলছে। শুধু হাত। আর কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-অবয়ব নয়। খানিকক্ষণ কাঠিটা জ্বলে নিবে গেল। হাতটা অদৃশ্য। রজনীবাবুর ঠোঁট থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল।

কে যেন হাসছে। চাপা হাসি। হালকা মেঘ চাঁদের মুখ ঢেকে রেখেছিল। এখন ফিকে জ্যোৎস্না নেমেছে মাঠে। রজনীবাবু দেখলেন খানিকটা তফাতে বসে সুধাময় হাসছে। তার ডান হাতে জ্বলছে সিগারেট। গায়ে ঢিলে হাতা সাদা পাঞ্জাবি।

রজনীবাবু বললেন, "আপনাকে খুঁজছি। দেখা দিয়েও দেখা দিচ্ছেন না। কেন!" সুধাময় বললেন, "ম্যাজিক।" রজনীবাবু বললেন, "পঁচিশ বছরে আপনার চেহারা একটুও পাল্টাল না কেন!" সুধাময় আবার বললেন, "ম্যাজিক।" রজনীবাবু চটে গেলেন, "তখন থেকে ম্যাজিক ম্যাজিক বলছেন কেন!" আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে রজনীবাবু সামনে তাকালেন। কেউ নেই।

রজনীবাবুর মন বলছিল পোড়ো বাড়িতে ভূতের গল্প পাঠের আড্ডায় গেলে আবার সুধাময়ের দেখা পাবেন। সকালে কিংকর বর্মণকে ফোন করলেন। ফোন ধরেই কিংকর বর্মণ বললেন, "বর্ধমানে যেতে রাজি আছেন!" রজনীবাবু শান্ত গলায় বললেন, "যাব। ওঁদের বলবেন।"

রাসবিহারী দত্ত আর গোকুল বর্ধন গাড়ি নিয়ে শনিবার সকাল সাতটায় এলেন। রাসবিহারীবাবু তার আগে ফোনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "যদি একদিন আগে আসেন ভাল হয়। এখানে কত লোক যে আপনার লেখার ভক্ত। তাঁরা একটু আলাপ টালাপ করবেন।" রজনীবাবু মাথা নেড়েছেন, "না। না। শনিবার দিনই যাব।" রজনীবাবু কলকাতা থেকে শনিবার বিকেলে রওনা হবেন এমন ইচ্ছে ছিল। ওঁরা অনুনয়-বিনয় করে ঠিক করলেন সকালে যেতে হবে।

গাড়িতে যেতে যেতে রাসবিহারীবাবু বললেন, "সেবার যে পোড়ো বাড়িতে ভূতের গল্পের আড্ডা বসেছিল সেই বাড়ি আর নেই। ওখানে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং হয়েছে।" রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে এবার পোড়ো বাড়িতে আড্ডা হবে না!" এবার গোকুল বর্ধন কথা বললেন, "এবার আড্ডা বসছে তিনশো বছরের একটা পুরনো বাড়িতে সেই বাড়ির একতলায় কেবল একটা ঘর আস্ত আছে। বাকি বাড়িটা ধ্বংসস্তূপ।" রজনীবাবু সবিস্ময়ে গোকুল বর্ধনের দিকে তাকালেন।

এবার রাসবিহারীবাবু কথার খেই ধরলেন, "শোনা যায় এখানকার রাজার নাকি ওটা ছিল নাচমহল। বাড়িটার পাশে একটা ঝিল আছে। আর বাড়িটার চারপাশে বুনো গাছের জঙ্গল।"

গাড়ি ছুটছে হাই-ওয়ে দিয়ে। রজনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভবদেব বাবুর কী খবর!" রাসবিহারীবাবু বললেন, "উনি বছর পাঁচেক আগে মারা গেছেন। বয়স হয়েছিল পরিপূর্ণ একশো।" রজনীবাবু আপন মনে একটু উচ্চস্বরে বললেন, "সুধাময় আজ এলে ভারি আনন্দ হত।" রাসবিহারীবাবু বললেন, "যদি ওঁর ঠিকানাটা জোগাড় করে দিতে

পারতেন ঠিক ভদ্রলোককে নিয়ে আসতাম।" রজনীবাবু ম্লান হাসলেন, "ঠিকানা জানা থাকলে কি আপনাদের বলতাম! নিজেই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম।"

রাত সাড়ে এগারোটার সময় পোড়ো বাড়িতে সকলে এসে উপস্থিত হলেন। গোকুল বর্ধন যা বলেছিলেন ঠিক তাই। ধ্বংসস্তুপের মধ্যে কেবল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি ঘর। চারদিকে জঙ্গল। আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ছে কালো অন্ধকার। আজ অমাবস্যা।

ঘরটা ঝাড়-পোঁছ করে একখানা বড় শতরঞ্জি পাতা হয়েছে। আর খান চারেক হ্যারিকেন জ্বালা হয়েছে। রজনীবাবু বসলেন এক দিকে আর তাঁকে ঘিরে সাত-আটজন মানুষ। গোকুল বর্ধন বললেন, "এই আসরে তাঁদেরই আমন্ত্রণ করা হয় যাঁরা ভূতের গল্পে আগ্রহী এবং যাঁদের বয়স পঞ্চান্ন পেরিয়েছে।"

রজনীবাবু বললেন, "আপনারা হ্যাজাকের বন্দোবস্ত করেননি কেন! হ্যারিকেনের আলো বড্ড কম।" রাসবিহারীবাবু বললেন, "আমরা অন্ধকারকেই বেশি প্রাধান্য দিতে চাই। যিনি গল্প পড়বেন তাঁর কাছে তখন একটা হ্যারিকেন এগিয়ে দেবো।"

রজনীবাবুর মন ভাল নেই। বার বার সুধাময়ের কথা মনে পড়ছে। রাসবিহারী বাবু বললেন, "রজনীবাবু, আপনি সভার কাজ শুরু করুন।"

রজনীবাবু নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। বারোটা বাজল কাঁটায় কাঁটায়। রজনীবাবুর বাঁ পাশে জানলা। জানলায় গরাদ নেই। জানলা দিয়ে হু হু করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। জানলার ওপাশে ঝিল আর বুনো গাছের জটলা।

রজনীবাবু সভার কাজ শুরু করতে যাবেন। হঠাৎ ঝপাং করে একটা শব্দ হল। ভারী কোনও কিছু যেন ঝিলের জলে পড়ল। দূরে নয়। একেবারে জানলার পাশে। সকলে ছুটে গেল জানলার কাছে। রজনীবাবু ওঠেননি। রাসবিহারীবাবু একেবারে জানলার সামনে। তিনি মুখ ফিরিয়ে রজনীবাবুকে বললেন, "একটা লোক জলে পড়ে গিয়েছে।" সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রজনীবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

একটু পরে একটা লোককে ধরাধরি করে সকলে এই ঘরে নিয়ে এলেন। লোকটাকে শতরঞ্জির ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। রজনীবাবু লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। সকলে লোকটাকে ঘিরে ছিলেন।

রজনীবাবু উঠলেন। ভিড় সরিয়ে শায়িত লোকটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। সুধাময়।

গোকুল বর্ধন বললেন, "চেহারা দেখে ভদ্রলোক বলেই তো মনে হচ্ছে। ওই ঝিলের ধারে কেন গিয়েছিলেন কে জানে!" রজনীবাবু ডাকলেন, "সুধাময়।" সুধাময় চোখ খুলে রজনীবাবুর দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর সুধাময় একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

সবাই অবাক হয়ে দেখলেন সুধাময়ের গায়ে একফোঁটা জল নেই। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি এমনকি হাতের পোর্ট ফোলিয়োতে জলের কোনও চিহ্ন নেই।

রজনীবাবু এবার মুচকি হেসে বললেন, "আবার ম্যাজিক দেখালেন!" সুধাময় বললেন, "খবর পেয়ে ছুটে আসছি। আবার গল্প শোনাতে হবে।" রজনীবাবু বললেন, "তাহলে আগে আপনাকে একটা ম্যাজিক দেখাতে হবে।" সুধাময় বললেন, "ম্যাজিক আজ থাক।" রজনীবাবু বললেন, "না। না। থাকবে কেন!" সুধাময় বললেন, "আজ আপনার মুখে গল্প শুনব।" রজনীবাবু উপস্থিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে সুধাময়ের আলাপ করিয়ে দিলেন। তারপর সুধাময়কে কিছু বলতে যাবেন এমন সময় রাসবিহারী দত্ত রজনীবাবুর কানে কানে বললেন, "রাত তো শেষ হতে চলল। আগে গল্প পড়া শুরু হোক। শেষে না হয় ম্যাজিক দেখা যাবে।" রজনীবাবু বললেন, "না। আগে ম্যাজিক।"

সুধাময় বললেন, "বেশ। তবে ম্যাজিক দেখাচ্ছি। আমার সব থেকে ভাল ম্যাজিক। এরপর আর ম্যাজিক দেখাব না।"

রজনীবাবু বললেন, "ঠিক আছে। কেবল একটা ম্যাজিক দেখাও।" সুধাময় উঠে দাঁড়িয়েছেন। সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাকে দেখুন। আমি সুধাময় হালদার। আমাকে দেখছেন তো!" সকলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চকিতে সুধাময় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাইরের ঝিলে ঝপাং করে একটা শব্দ হল। মনে হল জলে ভারী কিছু পড়ল।

সকলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রজনীবাবু মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে, "আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। সুধাময় এক্ষুনি আবির্ভূত হবেন। কী দারুণ ম্যাজিক।" কে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু বাইরে ঝিলের জলে

কে পড়লেন!" রজনীবাবু বললেন, "কে আবার! সুধাময়। ওই জলে পড়াটাও ম্যাজিকেরই অঙ্গ।"

অপেক্ষা করতে করতে ভোর হয়ে গেল। সুধাময় আর ফিরলেন না। কিন্তু জলে কে পড়ল! তার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না। ওদিকে বুনো গাছের জঙ্গল। কোনও মানুষ ওদিকে যায় না। সুধাময় হালদার কেন ওই দিকে গিয়েছিলেন সেটাও রহস্য থেকে গেল। ঝিলে বেশি জল নেই। কেউ পড়ে গেলে ঠিক খুঁজে বার করা যেত।

ফেরার সময় রজনীবাবু বললেন, "আমাকে আপনাদের গাড়ি করে পৌঁছে দিতে হবে না। ট্রেনে ফিরব। একটা সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে আমাকে তুলে দিলেই হবে।"

সেকেন্ড ক্লাস। ভিড় ছিল। রজনীবাবুর জন্য বসার ব্যবস্থা হয়েছিল। রজনীবাবু বসে বসে সুধাময়ের কথা ভাবছিলেন। তাঁর পাশে একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি চিনেবাদাম খাচ্ছিলেন। বাদাম শেষ করে রুমালে হাত-মুখ মুছে পকেট থেকে একটা দুটাকার কয়েন বার করে হাতের তালুতে রেখে কী সব যেন করছেন। রজনীবাবু দেখলেন ভদ্রলোক কয়েনটা মুঠোয় নিয়েছেন। মুঠো খুললেন। কোথায় কয়েন! মুঠোয় একটা দশটাকার নোট। আবার মুঠো বন্ধ করলেন। সেই দু টাকার কয়েন। লোকটা চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবছেন। রজনীবাবুর মাথায় ম্যাজিক ঘুরছে। তিনি ভদ্রলোককে আস্তে আস্তে ডাকলেন, "ও মশাই। শুনছেন!" ভদ্রলোক চোখ খুলে রজনীবাবুকে বললেন, "আমাকে কিছু বলছেন!" রজনীবাবু বললেন, "হ্যাঁ। আপনি কি ম্যাজিশিয়ান!" ভদ্রলোক বিনীতভাবে বললেন, "তা পেট চালাবার জন্য একটু-আধটু ম্যাজিক দেখাতে হয় বৈকি।"

রজনীবাবু বললেন, "আর একটা ম্যাজিক দেখান না!"

বাসে-ট্রামে-ট্রেনে কেউ কারও দিকে তাকায় না। যে যার নিজেদের নিয়ে মগ্ন। ভদ্রলোক বললেন, "আপনার বাড়ির ঠিকানাটা দিন। একদিন আপনার বাড়িতে গিয়ে ম্যাজিক দেখাব।" রজনীবাবু বললেন, "বেশ। বেশ। ঠিকানা ফোন নাম্বার দুটোই দিচ্ছি। আপনার নামটা তো জানা হল না।" ভদ্রলোক বললেন, "আমি অতি নগণ্য একজন ম্যাজিশিয়ান। নামে চিনতে পারবেন না। আমার নাম গোপাল সামন্ত।"

কয়েকদিন পরে সত্যি গোপাল সামন্ত রজনীবাবুর বাড়িতে এলেন। রজনীবাবু বললেন, "আসুন। আসুন। আপনার ফোন পেয়ে বসে আছি।"

চা-টা খাওয়ার পর রজনীবাবু বললেন, "একটা ম্যাজিক দেখান।" গোপালবাবু বললেন, "অল্প কিছুদিন এক ভদ্রলোকের কাছে ম্যাজিকের তালিম নিয়েছিলাম। তাঁর শেখানো একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছি।"

গোপাল সামন্ত হঠাৎ রজনীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই গরমে দরজা-জানলা বন্ধ করে রেখেছেন কেন!"

রজনীবাবু চমকে উঠলেন। সত্যিই তো! রজনীবাবু হতভম্ব। এ কী করে হল! গোপাল সামন্ত বললেন, "দু সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করুন।" রজনী বাবু চোখ বন্ধ করলেন। দু সেকেন্ড পরে চোখ খুলে দেখলেন সব দরজা জানলা খোলা।

রজনীবাবু গোপালবাবুর হাতটা চেপে ধরে বললেন, "যিনি আপনাকে এই ম্যাজিক শিখিয়েছেন তাঁর সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিন।" গোপাল সামন্ত ম্লান হাসলেন, "তিনি তো আর নেই। পা পিছলে পুকুরে পড়ে মারা গেছেন।" রজনীবাবু বললেন, "ভদ্রলোকের নাম কী ছিল!" গোপাল সামন্ত বললেন, "পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা। ভদ্রলোকের নাম ছিল সুধাময় হালদার।"

রজনীবাবু কিংকর বর্মণকে জানিয়েছেন তাঁর অমানিশা পত্রিকার জন্য একটি নতুন গল্প দেবেন। রজনীবাবু সুধাময়ের গল্প লিখতে শুরু করেছেন।

ছবি : শংকর বসাক

নানারঙের গল্প

চড়াই পাখির খোঁজে

জয়ন্ত দে

তখন জানতাম না পাখি পোষা খুব খারাপ কাজ। টাপুর টুপুর বৃষ্টির জল পড়লেই মনে হত রথ আসছে। আর রথ এলেই রোজ বিকেল সন্ধের মুখে হাজির হতাম রাসবিহারীর রথের মেলায়। মেলাতে অনেকে অনেক কিছুর জন্যে যায় কিন্তু আমরা যেতাম পাখির খোঁজে। মেলার ঝলমলে আলো পেরিয়ে এগিয়ে গেলেই শুরু হত গাছের মেলা। আর গাছের মেলা পার হলেই পাখির মেলা। সেখানে টিয়া চন্দনা কাকাতুয়া বুলবুলি বদ্রিকা মুনিয়া বসত। দামি পাখি লাভার্স বার্ডসও আসত। কিন্তু আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতাম টিয়া পাখির খাঁচার কাছে। আমার খুব ইচ্ছে হত একটা টিয়া পাখি কিনতে। টিয়া পাখির কি সুন্দর রং, ঘন সবুজ। লাল টুকটুকে বাঁকানো ঠোঁট।

আমার ইচ্ছে ছিল পাখি কিনে তাকে কথা শেখাব। তখন আমাদের পাড়ার হালুয়াদাদের (তিনি আমারও দাদা, আমার বাবারও দাদা) একটা কাকাতুয়া পাখি ছিল। সে পাখি হালুয়াদাদের বারান্দার দাঁড়ে ঝুলত। তার নাম ছিল বুদ্ধু। বুদ্ধু নাকি খুব বুঝদার পাখি। তার সারাদিন বারান্দার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে তীক্ষ্ণ নজর থাকত। আমাদের দেখলেই 'শালা' 'শালা' বলে গালাগালি দিত। অথচ বুদ্ধু হালুয়াদার মায়ের কাছে চালের গোলা খেত আর রাম নাম করত। একবারও শালা বলত না।

সারা ছোটবেলায় আমি রথের মেলায় টিয়া পাখি দেখে এসেছি কিন্তু একটা টিয়া কিনতে পারিনি। কেন না টিয়া পাখির বেশ দাম ছিল। যা পয়সা পেতাম পাঁপড় ভাজা, ঘুগনি, জিলিপি খেতেই চলে যেত। বড় জোর শ্রাবণের ঝুলনের কথা ভেবে ঘন সবুজ রঙের প্লাস্টিকের টিয়া পাখি কিনতাম। জলপাই সবুজ রঙের মাটির সোলজার কিনতাম।

অত সব কেনার পয়সা পেতাম কিছুটা মেলার জন্যে

মা পিসি দিত, আর কিছুটা রথ টানার দক্ষিণা।

আমার বেশ বড় তিনতলা একটা রথ ছিল। বেশ বড়, প্রায় আমার আর আমার বন্ধুদের মাথায় মাথায়। সারা বছর রথটা থাকত আমাদের মিটার ঘরে। খবরের কাগজের জামা পরে। ভেতরে ভেতরে মাকড়সাময় হয়ে। ঠিক রথের আগে তা বের হত, তার নড়বড়ে চাকা সবল হত। চাকার ফাঁকে পেরেক পুঁততাম। দেশলাই কাঠি গুঁজে দিতাম। ব্যস, দুর্বল চাকা তখন গড়গড় করে গড়াত। রথ টানার জন্যে খুব বড় সুতলির দড়ি গোছানো থাকত মায়ের কাছে। দড়িও বেরিয়ে পড়ত।

মিটার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার রথ রঙিন কাগজে সাজত। রথের মাথায় রাঙতার পতাকা উড়ত। বড় বড় কাঠের জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বেরত আলমারি থেকে। তাঁরা এক একজন বসতেন এক একটা তলায়। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বসতেই রথের সঙ্গে জমজমাট। আমার বোন আর বন্ধুর বোনেরা শাঁখ, আমরা কাঁসর করতাল। প্রদীপ জ্বলত, ধূপ ধুনোর গন্ধে আমাদের রথ উড়ে চলত কালীঘাট রোড ধরে কালীঘাট মন্দির, নকুলেশ্বর তলা হয়ে এপাড়া ওপাড়া, এ-গলি ও-গলি বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি। বড়রা আমাদের রথ টানত, রথ টানলে দক্ষিণাও দিত। সেগুলো সব খুচরো পয়সা। দশ পয়সা, কুড়ি পয়সা, সিকি, খুব চেনারা আধুলিও দিত। শুধু আমাদের কয়েকজন বন্ধুর বাবারা দিত কাঁচা টাকা। এক টাকার কয়েন। সেগুলো দক্ষিণার থালায় রাখতাম না। সেগুলো থাকত নান্টুর পকেটে। সিকি আধুলি কাঁচা টাকা নান্টু খুব যত্ন করে রাখত। ও ছিল আমাদের রথযাত্রার ক্যাশিয়ার। রথের দক্ষিণার থালায় জমা সব খুচরো পয়সা জড়ো করলে কয়েক টাকা হয়ে যেত। সে টাকায় আমাদের সব বন্ধুদের রথের মেলায় বেশ ঘুগনিটা, জিলিপিটা হয়ে যেত।

একবছর আমাদের বাড়ির উলটো দিকে হালুয়াদার বড় ছেলে বোম্বের চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরি নিয়ে ফিরে এল কলকাতায়। সঙ্গে তার ছেলে জিকো। জিকো আমাদের থেকে বয়েসে ছোট কিন্তু বহরে পড়। সে ঢোলা ফুলপ্যান্ট পরে। তখনও আমাদের সবার হাফ প্যান্ট। জিকো দেদার রং দেওয়া গেঞ্জি পরে। আমাদের হাফ শার্ট। আর রথের দিন পাঞ্জাবি পাজামা। জিকোর কাছে আছে ডিউস ক্রিকেট ব্যাট, সিন্থেথিক ফুটবল। তাই সে এসেই ফুটবল ক্রিকেটে আমাদের ক্যাপ্টেন।

সেই জিকোর হঠাৎ কি হল সে ঘোষণা করল রথ বের করবে। যেমন কথা তেমন কাজ। সে বছর জিকোর রথ বেরল। রথের গায়ে জ্বলা—নেভা টুনি বাল্ব। রথের মাথায় বোঁ বোঁ ঘোরা আলোর চক্র। সারা রথটা রঙিন রাঙতা দিয়ে মুড়ানো। সে এক দারুণ ব্যাপার!

আমার রথে রঙিন কাগজ। মাঝে মাঝে রাঙতার নকশা। আমিও বাড়তি হিসেবে দেবদারু পাতা ঝোলালাম ঝালর করে।

এবার আমার রথে দেবতা বসল। শাঁখ, কাঁসর,

করতাল এল, ফুলের মালা দুলল, ধূপ ধুনো জ্বলল, কিন্তু পারলাম না। কয়েক পাক চাকা গড়িয়ে আমার রথে আমাদের বাড়ির উঠোন পেরিয়ে গলিতেই থমকে গেল। আর জিকোর রথ ঘুরে বেড়াল আমার রথের চেনা পথ দিয়ে। সেই রথের সন্ধেবেলা আমার রথ আমাকে ভয়ঙ্কর একা করে দিল। প্রচণ্ড একা। একা একা দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু ছেলেদের কাঁদতে নেই বলে কাঁদতে পাচ্ছি না। মা পিসিরা বলল, তোর বন্ধুরা কোথায় গেল? ডাক সবাইকে। তুই কি ঝগড়া করেছিস?

পাড়ার এক বদ ছেলে আওয়াজ দিয়ে গেল, ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও বাবুসোনা এ বছরের মতো রথ তুলে ফেল! /

জিকোর রথ চালিয়ে ওরা দক্ষিণার টাকা নিয়ে রথের মেলায় গেল। অনেক মজা করল। নান্টু বলল, পরের বছর আমাদের জিকোর রথে তোকেও নিয়ে নেব।

আমার ভারী বয়েই গেছে যেতে!

আমিও মেলায় গেলাম একা। একা একা পাখি দেখলাম। টিয়া পাখি। কাকাতুয়া দেখলাম না। কাকাতুয়া হালুয়াদাদের বাড়ি আছে। ও শালা বলে!

আর মনে মনে পরের বছরের রথের প্ল্যান করলাম।

পরের বছর ভাবলাম এবার রথে ব্যাটারি দিয়ে টুনি জ্বালাব। দু একজন বন্ধু বলল, আমরা তোর সঙ্গে আছি। কিন্তু রথের আগে গুপ্তচর মারফত খবর পেলাম, এবার জিকোর রথে সাউন্ড হবে, গেলাপ জল স্প্রে হবে। দুর্দান্ত ব্যাপার! আমার বন্ধুরা ও-শিবিরে ভেগে গেল। তখন আমার ভাবসম্প্রসারণের বয়েস। আমি ডেকে ডেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী'।

কিন্তু আমার কথা কেউ শুনল না। সবাই জিকোর রথেই মেতে গেল। আসলে তখন আমি জানতাম না অন্তর্যামী মানে মার্কেট। অলক্ষ্যে তিনিই হাসেন! আমি রথ বের করতাম না। মার্কেটে আমার রথ অচল।

ফলে রথ তুলে দিলাম। আমার রথ কাত হয়ে পড়ে থাকল মিটার ঘরে। তার গায়ে রথের দিনেও খবরের কাগজে জামা, রঙিন কাগজের জামা উঠল না। ছোট ছোট মাকড়সাগুলো এই বড় বড় হয়ে গেল।

আমি রথ তুলে দিয়ে শুধু রথের মেলায় যেতাম। মেলায় গিয়ে পাখি দেখতাম। টিয়া পাখি। আমজনতার পাখি। কাকাতুয়া দেখতাম না। অনেক দাম। ওসব বড়লোক বাড়ির দাঁড়ে থাকে। ঠিক করেছিলাম পাখি কিনব টিয়া। কিন্তু হল না। শেষে সস্তা দরে দুটো মুনিয়া কিনলাম। অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে পক্ষিসেবা চলল। কিন্তু উলটো রথের আগেই আমার মুনিয়া গায়ের রং ধুয়ে চড়াই হয়ে গেল।

যে দিন সকালে পাখিগুলোকে চান করিয়ে জানতে পারলাম, আমি মুনিয়ার বদলে চড়াই কিনেছি আমি হাঁ করে পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ভাবলাম কাউকে বলব না, টুক করে উড়িয়ে দেব।

কিন্তু আশা জাগল, তখনও মেলা ভাঙেনি। যদি পাখিঅলাকে গিয়ে ধরা যায়, ও চড়াই পালটে মুনিয়া দেবে না কি? গেলাম রথের মেলায়। পাখিঅলাকে গিয়ে ধরলাম। সে বলল, 'ওই দামে মার্কেটে চড়াই-ই মিলবে, মুনিয়া মিলবে না। ভাগো!'

কাউকে কোনো অভিযোগ করিনি, ঠকে যাওয়ার লজ্জায় একা ছাদে দাঁড়িয়ে পাখির খাঁচা খুলে দু চোখ ভরে দেখেছি, মুক্ত পাখি কেমন করে ওড়ে, হোক না সে চড়াই।

সেই তখন চড়াই যেন ঠিক পাখি ছিল না। কিন্তু চড়াই এখন বিলুপ্তপ্রায় এক পাখি। মোবাইল ফোনের মার্কেট তুচ্ছ চড়াইকে পক্ষী আখ্যা দিয়েছে। মোবাইল ফোনের যাওয়ারের জন্যে সব চড়াই পাখি মরে যাচ্ছে। এই কদিন আগে আমার চড়াই পোষার গল্প শুনে আমার ছেলে রিজুল চড়াই পাখি দেখতে চাইল। আমরা দুজন, বাবা আর ছেলে এই শহরের অনেক জায়গায় ছুটির দিনে ঘুরলাম কোথাও ভালো করে চড়াই পাখি দেখতে পেলাম না। যা দেখলাম তারা সবাই বড় রোগা। তারা আমাদের দেখে আগেই ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। তাহলে উপায়? তখনই আমার মনে হল উপায় একটা আছে।

আমি এখন ঠিক করেছি চড়াই পাখিকে দেখতে রথের মেলায় যাব। আমার ছেলে রিজুল যে চড়াই পাখি দেখতে চেয়েছে। ওকে চড়াই পাখি দেখাব কী করে জানো, রথের মেলায় গিয়ে ওকে মুনিয়া দেখাব। বলব, রঙটা ধুয়ে দিলে এটা চড়াই হয়ে যাবে।

ছবি ঃ শংকর বসাক

ইতিহাসের গল্প

রাজার সুবিচার

সৈয়দ রেজাউল করিম

পথে ঘাটে আজও বাউলেরা গেয়ে বেড়ায়—এদিন কাহারো সমান নাহি যায়। সত্যই দিন কারোর একরকম যায় না। কথাটা মনে পড়লেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে ব্রাহ্মণের। কি ছিল না তাদের? ছিল রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। ফলের বাগান, মাছের ঝিল, চাষের জমি আর গোয়ালভরা গোরু। চাকর বাকর পরিপূর্ণ ছিল তাদের ঘর। হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল। এক এক করে সব কিছু চলে গেল অন্যের হাতে। সহায় সম্বল বলতে শুধু থেকে গেল একটা ছোটো বসতবাড়ি, একচিলতে জমি আর একটা কুয়ো।

তবুও ভালো, সংসারে তারা মাত্র দুটি প্রাণী। সে আর তার বউ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণী। স্বল্প আয়ে কোনদিন অর্ধাহারে, কোনদিন অনাহারে দিন কাটে তাদের। কিন্তু এভাবে আর কতদিন দিন কাটানো যায়? তাই একদিন ভাগ্যের খোঁজে বিদেশের পথে বেরিয়ে পড়লো ব্রাহ্মণ। যাবার আগে রাহা খরচের জন্য বসতবাড়ি আর জমিটা বিক্রি করে দিলো এক বণিকের কাছে।

কিন্তু ব্রাহ্মণী কি করবে? কিভাবে তার দিনগুজরান হবে? থাকবে কোথায়, খাবে কি? সে চিন্তাটাও ছিল ব্রাহ্মণের মাথায়। তাই বসতবাড়ি ও জমিটা বিক্রি করলেও কুয়োটা বিক্রি করলো না। কুয়োর জল বেচে যা আয় হবে তা দিয়ে তার চলে যাবে, একথা ভেবে মাথা গোঁজার জন্য একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে পতিত জমিতে।

ভাগ্যের চাকাটা ঘোরাবে। বললেই কি ঘোরানো যায়? বিদেশে গিয়ে মর্মে মর্মে সেটা অনুভব করলো ব্রাহ্মণ। পঞ্চাশ বছর বয়সে নতুন উদ্যমে কোথাও কিছু করতে পারলো না। তবুও আশা ছাড়ল না ব্রাহ্মণ। হার মেনে স্বদেশে পালিয়ে এল না। মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকলো

বিদেশে।

দেখতে দেখতে বিশটা বছর পার হয়ে গেল। তখনও ভাগ্যের চাকাটা একটুও গড়ালো না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক জায়গায়। এভাবে বিদেশের মাটিতে তিল তিল করে মরার থেকে ঘরে ফেরা ভালো, একথা ভেবে একরকম কপর্দকহীন অবস্থায় একদিন বাড়ির পথে রওনা দিলো ব্রাহ্মণ।

দেশে ফিরে হতবাক হয়ে গেল ব্রাহ্মণ। নিজের ভিটেমাটিতে পা দিয়ে মনে হলো এই বিশটা বছরে তার পরিচিত ভুবন অনেকটাই পালটে গেছে। তার জমিতে গড়ে উঠেছে বণিকের ইমারত। সুদৃশ্য ফুলে ফলে ভরে উঠেছে বাগান। কিন্তু কোথায় গেল তার ছোট্ট কুঁড়েঘর? কোথায় গেল তার ব্রাহ্মণী?

চাতক পাখির মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো ব্রাহ্মণ। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেল না। অবশেষে লোকমুখে শুনলো, তার ব্রাহ্মণী পরের বাড়িতে দাসিবৃত্তি করে দিনাতিপাত করছে। একথা শুনে তার সারা শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠলো। কিন্তু কেন তার এমন দশা হলো? কুয়োর জল বেচে কি তার চলছিল না? ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা হতেই এই প্রশ্নগুলো তার দিকে ছুড়ে দিলো ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণী বলল—'কি করবো, এছাড়া আমার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না। আমাকে তো কুয়োর কাছে ঘেঁসতে দিলো না বণিক। তুমি নাকি কুয়োসহ স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে গেছো।'

ব্রাহ্মণীর কথা শুনে রক্ত গরম হয়ে উঠলো ব্রাহ্মণের। এই বিশটা বছরে কি অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে তাকে দিন কাটাতে হয়েছে একথা ভেবে আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইলো তার হাত। কড়মড় শব্দে বেজে উঠলো দাঁতের পাটি। চোয়াল দুটো হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠলো। সে ছুটে গেল বণিকের বাড়ি। জানতে চাইলো, কেন সে এরকম ঘৃণ্য কাজ করলো।

বণিক বলল 'যা করেছি, ঠিক করেছি। কুয়ো সমেত জমি কিনেছি। আমার কুয়োর জল আমি বেচবো, বুড়িকে দেবো কেন?'

একথা বলে ব্রাহ্মণকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলো বণিক। অসহায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলো ব্রাহ্মণীর কাছে। ব্রাহ্মণী বলল—'তুমি ভেবো না, ভগবান এর বিচার করবেন।'

ভগবান কবে বিচার করবেন কে জানে? ব্রাহ্মণের আর তর সইলো না। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। এই ভেবে স্থানীয় এক আদালতে গিয়ে অভিযোগ জানালো বণিকের বিরুদ্ধে।

যথারীতি একদিন মামলা উঠলো নিম্ন আদালতে। বাদী বিবাদী দুজনেই হাজির হলো যথাসময়ে। বিবাদীর পক্ষে অনেক লোকজন। বাদীর পক্ষে কেউ নেই। তাছাড়া গরিবের কথা শুনবে কে? তাই নীরবে নিভৃতে কাঁদলো বিচারের বাণী। রায় গেল বিবাদীর পক্ষে। তবুও নিরাশ হলো না ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ।

লোকজন পরামর্শ দিলো, রাজার কাছে যাও। তাদের পরামর্শ শুনে একদিন ব্রাহ্মণ হাজির হলো রাজ দরবারে। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের কথা শুনে মনে দয়া হলো রাজার। তিনি মনোযোগ সহকারে শুনলেন তার কথা। সঙ্গে সঙ্গে সমন জারি করলেন তিনি। নির্দিষ্ট দিনে বাদী, বিবাদী ও বিচারক যেন হাজির হয় তার দরবারে।

রাজার আদেশ, অমান্য করবে কে? যথা সময়ে তারা হাজির হলো তার দরবারে। পাত্র মিত্র সভাসদ, সাক্ষীরা বসে পড়লো যে যার আসনে। কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন বিচারক। রাজা এলেন। চারদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর বিচারকের চোখে চোখ রেখে শুধালেন—'বাদী তো বলছে, সে তার কুয়ো বিক্রি করেনি। আপনি কিভাবে বণিকের পক্ষে রায় দিলেন?'

বিচারক করজোড়ে বললেন—'মহারাজ! বিচারে আমার যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। আমি যে রায় দিয়েছি তা সবদিক বিচার বিবেচনা করে তবেই রায় দিয়েছি। দলিলে লেখা ছিল...।

—'দলিলটা কি আপনার কাছে আছে?'

—'না মহারাজ! আমার কাছে নেই। তবে দলিলটা বণিক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

—'কি লেখা আছে দলিলে?' ভ্রূদুটি কপালে তুলে রাজামশাই জানতে চাইলেন।

বিচারক বললেন—'দলিলের এক জায়গায় লেখা আছে, আমি আমার কুয়োসমেত সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বণিকের কাছে বিক্রি করলাম।'

রাজা মশাই বললেন—'দেখি দলিলটা।'

বণিক তার জামার পকেট থেকে ভাঁজ করা দলিলটা

বার করলো। এক পেয়াদা সেটা নিয়ে গিয়ে রাজামশাই-এর হাতে দিলো। রাজামশাই নিবিষ্টচিত্তে দলিলখানা পড়ে দেখলেন। পরখ করলেন হাতের লেখা। কিন্তু কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য খুঁজে পেলেন না।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? মনে মনে রাজামশাই হিসেব নিকেশ শুরু করে দিলেন। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছে। কুপসমেত ঘরবাড়ি বেচে দিয়ে মিছেমিছি বণিককে হয়রানি করছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের চেহারা তার কথাবার্তা শুনে তো একবারও মনে হলো না সে মিথ্যে কথা বলছে। তাহলে কি কোথাও...।

রাজামশাই-এর মনে গভীর চিন্তা। সে চিন্তার অবসান ঘটাতে, আসল ব্যাপারটা খুঁজে পেতে, সভাসদদের মুখাপেক্ষী হলেন। হাতের দলিলখানা বাড়িয়ে ধরে বললেন—'আপনারা ভালো করে দেখুন তো, কোন ভুল ত্রুটি খুঁজে পান কি না?'

দলিলটা হাতে নিয়ে সভাসদরা এক এক করে দেখতে থাকলেন, রাজা মশাই বণিকের দিকে তাকিয়ে শুধালেন—'আপনাকে এ দলিলটা কে লিখে দিয়েছিলেন।'

বণিক বললেন—'সত্যপ্রকাশ।'

রাজামশাই কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু বলা আর তার হয়ে উঠলো না। সভাসদরা সমস্বরে বলে উঠলেন—'মহারাজ! এ দলিলে কোন ভুল ত্রুটি নেই। এটি একই লোকের হাতে লেখা।'

রাজামশাই বললেন—'নীচের দস্তাখতটা?'

প্রশ্ন শুনে চুপ করে গেলেন সভাসদরা।

রাজামশাই ইশারা করলেন পেয়াদাকে। পেয়াদা দলিলটা নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ব্রাহ্মণের কাছে। ব্রাহ্মণ দলিলটা দেখে বলল—হ্যাঁ মহারাজ! 'এটি আমার-ই দস্তাখত।'

মনে মনে হিসাব কসতে গিয়ে রাজামশাই পা পিছলে পড়লেন। তাহলে তো বিচারকের কোনো দোষ নেই। বণিকের পক্ষে রায় দিয়ে কোনো ভুল করেননি। কিন্তু ব্রাহ্মণের যে কি ইচ্ছে তা বুঝতে পারলেন না রাজা। এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরেও কেন ব্রাহ্মণ তার কাছে এসেছেন? নিশ্চয়ই কিছু একটা বদমতলব...ভাবতে গিয়ে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। মাথা ঠিক করতে বিচার মুলতুবি রেখে অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকলেন রাজামশাই। তার পিছনে গেলেন মন্ত্রীমশাই।

বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন মন্ত্রীমশাই। এসেই ঘোষণা করলেন—'মহারাজা দরবারে আসতে একটু বিলম্ব হবে। তবে এই বিলম্বটুকু যাতে আপনাদের অস্বস্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, তার জন্য তিনি একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে বলেছেন। আপনারা আপনাদের হাতের অঙ্গুরীয়গুলো খুলে এখানে দিয়ে যান। আমি অঙ্গুরীয়গুলো নিয়ে মহারাজের কাছে যাব। তিনি দেখবেন কার অঙ্গুরীয়টি সবথেকে বেশি সুন্দর। তাতে কত দামী পাথর লাগানো আছে। মহারাজের পছন্দ হলে আংটির মালিক পাবেন দামী উপহার।

মন্ত্রীমশাই-এর কথা শুনে পাত্র-মিত্র সভাসদ সকলেই তাদের আংটি খুলে জমা করলো। বণিকও তার হাতের আংটি খুলে মন্ত্রীমশাই-এর সমীপে পেশ করলো। মন্ত্রীমশাই সেগুলো রুমালের মতো ছোট্ট একটা কাপড়ে

বেঁধে নিয়ে গেল রাজার কাছে। তার সমীপে সবগুলো পেশ করে বলল—'মহারাজ! এই আংটিটি বণিকের, বাকিগুলো পাত্রমিত্র সভাসদদের।'

বণিকের আংটিটি হাতে নিয়ে রাজামশাই ডাকলেন তার ভৃত্যকে। ভৃত্য এলে তার হাতে আংটিটা ধরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—'সোজা চলে যাও বণিকের বাড়ি। আংটিটা দেখিয়ে তার কর্মচারীর কাছ থেকে নিয়ে এসো বিশবছর আগেকার হিসাবের খাতা।'

সেসময় আংটি ছিল প্রমাণের একনম্বর প্রতীক। শুধু মুখের কথায় কেউ কাউকে বিশ্বাস করতো না। মালিকের আংটি দেখাতে পারলে তবেই বিশ্বাস করতো তার কথা। তাই মহারাজের আদেশ মতো আংটি নিয়ে ভৃত্য গেল বণিকের বাড়ি। আংটি দেখাতেই এককথায় বণিকের কর্মচারী, বাড়ির লোকজন বিশ্বাস করলো তাকে। খুঁজে খুঁজে বার করলো বিশবছর আগেকার হিসাবের খাতা। সেটা দ্বিধাহীন চিত্তে তুলে দিলো ভৃত্যের হাতে। খাতা নিয়ে ভৃত্য ফিরে এলো রাজবাড়িতে।

হাতে খাতা পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাজার চোখমুখ। তিনি সব কাজ ছেড়ে দিয়ে খাতা দেখতে শুরু করলেন। একাগ্রচিত্তে সবকিছু উলটেপালটে দেখতে দেখতে হঠাৎ তার চোখ জোড়া আটকে গেল হিসাবের একটা পাতায়। যে পাতায় লেখা ছিল—দলিল লেখা বাবদ সত্যপ্রকাশকে দেও টাকা পাঁচশত।

পাঁচশত! চোখ কপালে উঠলো রাজার। একপয়সা দিয়ে যেখানে দলিল লেখানো যায় সেখানে পাঁচশত টাকা কেন? নিশ্চয়ই হিসাবে ভুল লেখা আছে, না হলে এর মধ্যে কিছু গড়বড় আছে। কিন্তু কি সেই রহস্য? কোথায় পাওয়া যাবে সেই রহস্য উদ্ঘাটনের চাবি! মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিলেন মহারাজা। টনক নড়লো সঙ্গে সঙ্গে, খাস ভৃত্যকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, খুঁজে আনো সত্যপ্রকাশকে।

আদেশ পেয়ে ভৃত্য গেল সত্যপ্রকাশের খোঁজে। আর মহারাজ ঢুকলেন দরবারে। সকলে প্রথামাফিক উঠে দাঁড়ালো সৌজন্য দেখাতে। মাথা নিচু করে অভিবাদন গ্রহণ করে তিনি ইশারা করলেন সকলকে বসতে। বিচারকের আসনে বসে তিনি বণিককে শুধালেন—যেখানে এক পয়সায় দলিল লেখানো যায় সেখানে সত্যপ্রকাশকে পাঁচশ' টাকা দিতে গেলেন কেন?

প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেল বণিক। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল তার। মনে মনে ভাবলো, এত কথা রাজামশাই জানলেন কি করে? তাহলে সত্যপ্রকাশ কি আসল সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে? তাহলে তো, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচিন নয়। উত্তর দেওয়া মানে নিজের গলায় নিজে দড়ি পরা। তাই কোন জবাব না দিয়ে চুপচাপ কাঠগড়ায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলো।

কিন্তু জবাব না দিলে কি হবে, জবাব দেওয়ার লোক পৌঁছে গেল রাজার দরবারে। বয়োবৃদ্ধ লোকটাকে দেখে খুব মায়া হলো রাজার। তাই কোন ধমক না দিয়ে ধীরকণ্ঠে বললেন—'সত্যপ্রকাশ!'

একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ বলল—'আজ্ঞে মহারাজ!'

—'বছর বিশ আগে দলিল লিখতে তুমি কত পয়সা নিতে?'

—'একপয়সা থেকে শুরু করে পাঁচ ছ'পয়সা দাবী করতাম মহারাজ!'

রাজামশাই বললেন—'এই দলিলটা দেখো তো তোমার হাতের লেখা কি না?'

সত্যপ্রকাশ তার ছানিপড়া চোখ দুটো ভালো করে মুছে নিয়ে দলিলটার আগাগোড়া দেখলো। তারপর আত্ম নির্ভরতার সঙ্গে বলল—'হ্যাঁ মহারাজ! এ দলিলটি আমি লিখেছিলাম। এ হাতের লেখা আমার।'

রাজামশাই বললেন—'সেটা তো আমি জানি। কিন্তু এই দলিলটা লিখতে তুমি পাঁচশত টাকা নিয়েছিলে কেন?'

রাজামশাই-এর প্রশ্ন শুনে গলা শুকিয়ে উঠল সত্যপ্রকাশের। রাজামশাই তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। কিন্তু এ ব্যাপারটা তো ব্রাহ্মণের জানার কথা নয়। তাহলে কি বণিক সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছে! তার নামে নিশ্চয়ই অভিযোগ করেছে। বিচারে তার সাজা তাহলে অবধারিত। একথা ভেবে অত্যন্ত করুণস্বরে সত্যপ্রকাশ বলল—'মহারাজ! আপনি যদি অভয় দেন, তাহলে সত্যপ্রকাশ সত্যপ্রকাশে দ্বিধা করবে না।'

রাজামশাই বললেন—'আমি জানি তুমি খুব দরিদ্র। তোমার টাকা পয়সার বড় অভাব। আর বণিক হলো বড় ব্যবসায়ী। লাভ লোকসানের অঙ্ক বণিক ভালো বোঝে। তবে তোমার মতো হতদরিদ্রদের জন্য দানছত্র খুলে বসেনি। সে তোমাকে দলিল লেখার জন্য পাঁচশ টাকা দেবে, একথা ভাবা যায় না। নিশ্চয়ই এর পিছনে কারণ

আছে। তুমি নির্ভয়ে বলো, বণিক তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

সত্যপ্রকাশ বলল—'মহারাজ! দলিলে একটা 'র' কে 'স' লেখার জন্য আমাকে পাঁচশ' টাকা দিয়েছিলেন বণিক। আমি ধর্মত বলছি মহারাজ, আমাকে প্রলোভিত করেছিলেন ওই বণিক।'

রাজামশাই বললেন—'তোমার ওই হেঁয়ালি কথা রাখো। তোমার 'র' 'স' আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সত্যপ্রকাশ বলল—'মহারাজ!' ওই ব্রাহ্মণ সেদিন বণিকের কাছে গিয়েছিল কূপছাড়া তার সম্পত্তি বেচতে। আমি সেই মতো দলিলে লিখে দিলাম—আমি আমার 'কূপরহিত' স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বণিকের কাছে বিক্রি করলাম। দলিল পড়ে ভ্রু কোঁচকালো বণিক। কিছু একটা ভেবে বলল—দলিল আবার নতুন করে লিখুন সত্যবাবু। আমি ভাবলাম কোথাও ভুল লেখা হয়েছে। তাই দলিলটা আবার পড়ে দেখলাম কিন্তু কোথাও কোনো ভুল খুঁজে পেলাম না। একরাশ বিস্ময় নিয়ে বণিকের চোখের দিকে তাকালাম। বণিক বলল—ওতে কোনও ভুল নেই। লেখার মধ্যে শুধু একটা 'র' কে 'স' বানিয়ে দিতে হবে। আমি শুধালাম কোথায়? বণিক বলল—'কূপরহিত' লেখা চলবে না, লিখতে হবে কূপসহিত।' আমি তখন বুঝতে পারলাম বণিকের আসল মতলব। আমি রাজি হলাম না। কিন্তু নিজের দৃঢ়তার কাছে নিজেই হেরে গেলাম। অভাব আমাকে লোভী বানিয়ে দিলো। পাঁচশ' টাকা পেয়ে আমি লিখে দিলাম দলিলটা।...আমি আমার কূপসহিত সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বণিকের কাছে বিক্রি করলাম, ব্রহ্মণকে দিলিলটা পড়ে শোনাবার সময় 'কূপসহিত' না পড়ে কূপরহিত' বললাম। সরল বিশ্বাসে ব্রাহ্মণও সই করে দিলো দলিলে। আমি অন্যায় করেছি মহারাজ। আমাকে আপনি শাস্তি দিন। বলে কান্নায় ভেঙে পড়লো সত্যপ্রকাশ।

বিচারক, পাত্র-মিত্র, সভাসদ সকলেই বুঝতে পারলেন নেপথ্য কাহিনীটা আসলে কি? তারা ঘৃণাভরে তাকালেন বণিকের দিকে। রাজার কাছে সুবিচারের আর্জি জানালেন তারা।

রাজামশাই বললেন—'ওহে মহামান্য বণিক! তুমি কি এঘটনা অস্বীকার করবে?'

বণিক মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিল। উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না তার।

রাজামশাই বললেন—'আমি নির্দেশ দিচ্ছি, সাতদিনের মধ্যে তুমি তোমার সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে অন্য দেশে। সঙ্গে কোনো টাকাপয়সা, সোনাদানা কিছুই নিয়ে যাবে না। কিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, মৃত্যু তোমার অবধারিত। নতুন দেশে গিয়ে আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করো। এভাবে লোক ঠকিয়ে উপার্জনের চেষ্টা করো না।'

মন্ত্রীমশাই বললেন—'মহারাজ?' তাহলে কি ওর সব সম্পত্তি দেশের নামে ক্রোক করে নেবো।

রাজামশাই বললেন—'না। বণিকের সব সম্পত্তি ভোগ করবে ওই ব্রাহ্মণ ও তার পরিবার। এই পৃথিবীতে ওরা যতদিন বাঁচবে ততদিন অন্তত একটু সুখে শান্তিতে দিন কাটাক। তারপর না হয়...বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন মহারাজ।

রাজার আদেশ শুনে মনে মনে হেসে ফেলল ব্রাহ্মণ। যে ভাগ্যের খোঁজে সে বিশ বছর বিদেশে কাটিয়ে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে এলো, সেই ভাগ্যের দরজা হঠাৎ খুলে গেল তার চোখের সামনে, একদম অযাচিতভাবে। এই সম্পত্তি নিয়ে সে কি করবে না করবে সে তো পরের ব্যাপার। তবে সেই মুহূর্তে শ্রদ্ধায় অবনত হলো তার মাথা, সত্যি সুবিচার এখনো দেশে আছে। এরকম রাজা যুগযুগ ধরে বেঁচে থাক আমাদের দেশে।

কিন্তু তোমরা কি জানো কে ছিলেন সেই রাজা। কবে কোথায় ঘটেছিল এই ঘটনা? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, তিনি ছিলেন রাজা যশস্কর। তিনি ছিলেন কাশ্মীরের রাজা। ৯৩৯ খৃঃ থেকে ৯৪৮ খৃঃ পর্যন্ত তিনি সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করেন। এটি তার শাসনকালের এক উজ্জ্বলতম ঘটনা।

ছবি : পিন্টু মণ্ডল

রহস্য গল্প

গন্ধ

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

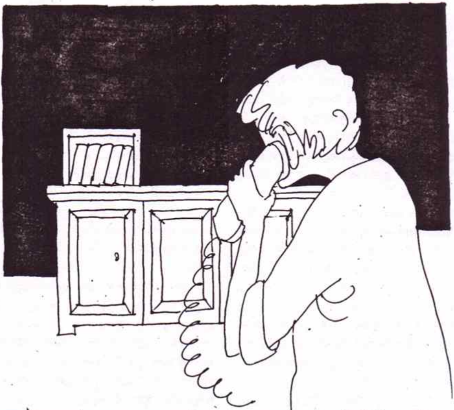

—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে সৌম্য। সর্বনাশ হলেও লোকে এরকম সরাসরি বলে না। কিন্তু দীপকের ভূমিকা করার স্বভাব নেই বিন্দুমাত্র। ব্যাংকের অফিসার। সারাজীবন ধরে হিসেব রেখে চলেছে। হিসেব রাখতে রাখতে বড্ড হিসেবি হয়ে গেছে। সেটা চলে এসেছে কথা বলাতেও। সরাসরি প্রসঙ্গে চলে আসে। সৌম্য রবিবারের বেলা করে ঘুম দিয়ে সদ্য উঠেছে। সেখানে ফোনে এরকম কথা কেউ বললে যা হওয়ার তাই হয়েছে। হকচকিয়ে গেছে। আমতা আমতা করে বলল, কে—ন—কি—হ—লো—

—ঘরের একটা দামি জিনিসও নেই।

—মানে!

—মানে আবার কি, ওয়ার্ল্ডকাপের সময়ে অফার দিচ্ছিল বলে একটা এল. সি. ডি, এইচ. ডি. টি. ভি কিনেছিলাম...

—বাব্বা সে তো অনেক দাম!

—হ্যাঁ রে বাবা অফারেই লেগেছে সাতাশ হাজার।

—হ্যাঁ, তা তো হবেই।

—সেই এল. সি. ডি টি.ভি, সেটটপ বক্স, মাইক্রো ওভেন, আমার ল্যাপটপ, রিন্টুর-র কম্পিউটার..

দীপককে কেটে দিল সৌম্য, আলমারি ভেঙে কিছু

নেয়নি আই মিন গয়না, ক্যাশ?

—খোলার চেষ্টা করেছিল, কোনো কারণে হয়তো সম্ভব হয়নি, তবে ভাঙলেও কিছু লাভ হত না, ওসব তো লকারেই থাকে, তবে ক্যাশ কিছুটা থাকে।

এরকম পরিস্থিতিতেও কথাটা বলে ফেলল সৌম্য, তাহলে সর্বনাশ বলছিস কেন, অনেকটাই তো বেঁচে গেছে...

—কতোটা চলে গেল একবার হিসেব করেছিস! প্রায় এক লাখ টাকার মতো জিনিস নিয়ে গেছে।

এতক্ষণ যেটা কিছুই মনে হচ্ছিল না এখন সেটাকেই অনেক কিছু বলে মনে হল সৌম্যর। বলল, তাহলে এখন তুই কি করবি?

—তুই আমার ফ্ল্যাটে এক্ষুনি চলে আয়।

—আমি! আমি গিয়ে কি করব।

—তোকে নিয়ে থানায় যাব।

—থানা?

—হ্যাঁ ইমিডিয়েট একটা পুলিশে ডায়রি করতে হবে যদি ওরা কিছু করতে পারে।

—ওই জিনিসগুলোর কি তোর ইনসিওরেন্স করা আছে?

—না।

—তাহলে থানায় গিয়ে কোনো লাভ নেই, একমাত্র ইনসিওরেন্সের ক্লেম পাওয়ার জন্যে যে বাধ্যতামূলক রিপোর্টিং সেটা করার জন্যে লোকে যায়, এছাড়া কোনো লাভ নেই।

এখন আর ভেঙে পড়ার ভাব নেই তার জায়গায় দীপকের স্বরে ভেসে উঠল একটা তীব্র রাগ। রাগ মিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে বলল, থানায় গিয়ে কোনো লাভ হবে না...

—সে তুই রাগই কর আর যাই কর যেটা ঘটনা আমি সেটাই বললাম উলটে জিনিসগুলোর ভ্যালুয়েশান বেড়ে যাবে।

—ভ্যালুয়েশান বেড়ে যাবে মানে! দীপকের স্বরে রাগের মধ্যে আবার একটু অবাক হওয়া মিশল।

—ব্যাংকের ম্যানেজার আর ভ্যালুয়েশান বুঝিস না! আরে বাবা হিসেব তুই যা দিলি মানে ওই লাখ টাকা হয়ে দাঁড়াবে এক লাখ তিরিশ থেকে চল্লিশ, তাহলে ভ্যালুয়েশান বাড়ল না!

—এরকম বিপদের মধ্যে তুই হেঁয়ালি করছিস! পরিষ্কার করে বল।

—এখনও পরিষ্কার হল না তোর কাছে! পুলিশ যে তোর ফ্ল্যাট থেকে চুরি যাওয়া জিনিস খুঁজবে তার ফিজ লাগবে না!

এবারে আর দীপকের দিক থেকে কোনো কথা ভাসল না টেলিফোন লাইনে।

সৌম্য বলল, চিন্তা করিস না আমি যাচ্ছি তোর ফ্ল্যাটে, কিন্তু থানায় যাওয়ার ভাবনা মাথা থেকে তাড়া।

—তাহলে কি করবো? একেবারে ছেড়ে দেব!

—আগে আমি তোর ওখানে যাই তারপরে আলোচনা করে ঠিক করবো।

—ঠিক আছে যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে আয়।

সৌম্য শুনল দীপকের গলা বেশ ধরে এসেছে।

দুই

রবিবার সৌম্যর একটা বড়সড় বাজার করা থাকে। সে এক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের কেমেস্ট্রির শিক্ষক। স্কুলে যাওয়া ছাড়াও প্রাইভেটে ছাত্র পড়ান রয়েছে। তারই সঙ্গে সিজিনাল সবজি বা ফুলের মতো পরীক্ষার খাতা দেখা আছে। তাই রোজ বাজারে যেতে পারে না। রবিবার স্কুল নেই, ছাত্র পড়ান নেই, তাই ঘুরে ঘুরে একটু বেশিই বাজার করে। যাতে ফ্রিজে রেখে দিন তিনেক চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু আজ সেই বিশেষ বাজার করাটা তাকে এড়াতেই হচ্ছে। দায়িত্বটা বউকে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সৌম্য। পেছন থেকে সুপর্ণার গজগজানি শুনতে পেল— চললেন উনি নিজের সংসারের কাজ ফেলে দেশ উদ্ধারে।

সৌম্য কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু মনে মনে বেশ বিরক্ত হল বউয়ের ওপরে। সুপর্ণাকে সে কি বোঝাবে! দীপক কি তার আজকের বন্ধু। এ-পাড়ায় বন্ধুবান্ধব স্থানীয়দের মধ্যে ওর সঙ্গে পরিচয়টা সবথেকে পুরনো। সেই স্কুল জীবন থেকে আলাপ। আগে তো পাড়ায় রোজই দেখা হত। ম্যানেজারের প্রমোশনটা পাওয়ার পর থেকে দেখা হওয়াটা একটু কমেছে। কারণ দীপক এখন কলকাতায় থাকে না। তাই বলে তো হৃদয়ের টান কমে গেছে তা তো নয়। সেখানে এরকম বিপদের ঘটনায় উদাসীন থাকে কি করে!

দীপকের ফ্ল্যাট সৌম্যর বাড়ি থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে।

তবুও একটা রিক্সা নিয়ে নিল। রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মেটাতে মেটাতে সৌম্য দেখল ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে ঝোড়ে কাকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে দীপক।

দীপকের ফ্ল্যাটে ঢুকে অবশ্য একটু অবাক হল সৌম্য। যে রকম ধারণা নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে মিলল না। সাধারণত চুরিচামারি হলে ফ্ল্যাটের যা অবস্থা হয় তার সঙ্গে এই মুহূর্তের দীপকের ফ্ল্যাটের বিশেষ মিল নেই। লণ্ডভণ্ড হয়ে কিছুই পড়ে নেই। শুধু খুব ফাঁকা লাগছে।

দীপক মাথা নিচু করে বসে আছে সামনের সোফায়। একটু আগে বারান্দায় যখন দেখেছিল তখন যতটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল এখন তার থেকেও বেশি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। সৌম্য বলল, ব্যাপারটা তোর নোটিশে এল কখন?

—আমি তো এখন ঝাড়গ্রামে পোস্টেড, শুক্রবার রাত করে বাড়িতে আসি, শনিবার, রবিবার এখানে থেকে সোমবার ভোর-ভোর বেরিয়ে যাই, শনিবারও তো ব্যাংক খোলা তা অন্য লোক ম্যানেজ করে নেয়, এই শনিবার মানে কালকে আসতে পারিনি ইয়ার এনডিঙের প্রচুর কাজ থাকায়, আজ সকালেই এসেছি, ফ্ল্যাটের তালা খুলে কিছুক্ষণ আগে ঢুকে এই অবস্থা দেখছি।

—অর্পিতা কোথাও? সৌম্য দীপকের বউয়ের কথা জিজ্ঞেস করল।

—ওর মা, মানে আমার শাশুড়ি তো খুব অসুস্থ, তাই আমিই ওকে মায়ের কাছে থাকতে বলেছিলাম, কয়েকদিন ধরে অর্পিতা তাই ওখানে আছে।

—তাহলে রাতে ফ্ল্যাটে কেউ ছিল না।

—কিন্তু রাতে কিছু হয়নি সৌম্য, কারণ এই অ্যাপার্টমেন্টে চব্বিশঘণ্টা সিকিউরিটির লোক পাহারা দেয়, হয়েছে কাল দুপুর বা সন্ধেবেলায়...

—দুপুর বা সন্ধেবেলায় ফ্ল্যাটের এতগুলো জিনিস বের করে নিয়ে গেল অথচ এই ফ্ল্যাটবাড়ির কোনো ফ্ল্যাটহোল্ডারের চোখে পড়ল না এটা কি হতে পারে?

—আমিও তো সেকথাই ভাবছি।

—সিকিওরিটির লোকটাকে একবার ডাক তো।

—কেন?

—তুই ডাকই না।

দীপক অনিচ্ছুক মন নিয়ে চলে গেল। ফিরে এল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে। তাকে দেখে মনে মনে হাসল সৌম্য। এর সিকিওরিটি কে দেয় তার ঠিক নেই ইনি আবার এতগুলো ফ্ল্যাটের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন! ওনাকে জিজ্ঞেস করে ঘটনার ওপরে কোনো আলোকপাতই হল না। তবে একটা কথা জানা গেল কাল দুপুরে প্রচণ্ড বৃষ্টির সময়ে একতলার বাইরের গেটের পাশে সিকিওরিটির খুপড়ি ঘরে উনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ওনাকে চলে যেতে বলল সৌম্য।

উনি চলে যেতেই সৌম্য বলল, এই লোকটাকে তোরা এরকম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রেখেছিস কেন আমি তো বুঝতে পারছি না।

—কেন!

—চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিস না লোকটা নেশাখোর, এই বেলা সাড়ে বারোটাতেও চোখ কিরকম লাল, মুখ থেকে অবশ্য কোনো গন্ধ পেলাম না, তার মানে শুকনো নেশা করে, এই ধর গাঁজা বা সিদ্ধি খায়।

দীপক বলল, উনি নয়, নেশা করে ঘুমিয়েছিলেন এটা নয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়ির সবাই তো আর ওনার মতো নয়, এতগুলো জিনিস নিয়ে গেল অথচ কারুর নজরে এল না এটা তো হতে পারে না!

—কথাটা ঠিক, আবার এটাও ঠিক কাল দুপুর বা সন্ধেতেই এটা ঘটেছে, কারণ রাতে ঘটলে মেনগেটের তালা ভাঙতে হত, সিঁড়ির তালা ভাঙতে হত তারপরে তোর ফ্ল্যাটের তালা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেসব কিছুই হয়নি।

—আমি কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম।

মহিলা কণ্ঠের কথাগুলো শুনে সৌম্য আর দীপক দুজনেই পেছনে তাকিয়েছে। চুরির কথা জানতে পেরে সম্ভবত উনি চলে এসেছেন। দীপক সৌম্যর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। এই ফ্ল্যাটের ওপরেই ওনার ফ্ল্যাট। শুভ্রা চক্রবর্তী। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা। একাই থাকেন।

শুভ্রা চক্রবর্তী বললেন, কাল দুপুরে যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে নীচের তলায় জিনিসপত্র সরানোর আওয়াজ পাচ্ছিলাম, তা সিঁড়িতে এসে দেখলাম কাগজের প্যাকিংবাক্স মাথায় করে এই ফ্ল্যাট থেকে একটা লোক বেরিয়ে আসছে, জিজ্ঞেস করায় বলল এই ফ্ল্যাটের টি.ভি. কম্পিউটার এসব কোম্পানিতে চলে যাচ্ছে বদলে নতুন আসবে মানে এক্সচেঞ্জ অফার, শুনে খুব একটা সন্দেহ হয়নি আমার, আজকাল তো এসব চলছে, তাই আবার নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলাম।

সৌম্য দীপকের দিকে তাকিয়ে হাসল, তাহলে আমার কথা মিলে গেল।

দীপক বলল, কি সাহস এ্যাঁ! ভরদুপুরে ঘটনাটা ঘটিয়েছে!

—সাহসের কিছু নেই, যে কাজটা করেছে সে এই ফ্ল্যাট সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল, কখন তোরা থাকছিস আর থাকছিস না সেটা জানে, এমনকি ফ্ল্যাটের তালার চাবিও তার কাছে আছে...

—চাবি আছে!

—আছে মানে ডুপ্লিকেট বানিয়ে নিয়েছে, যার জন্যে তাকে তালা ভাঙতে হয়নি, আর কারপক্ষে ডুপ্লিকেট চাবি বানানো সম্ভব? যার এখানে যাতায়াত আছে...

—তার মানে তুই বলতে চাইছিস যে কাজটা করেছে সে আমাদের পরিচিত?

—একেবারেই। সৌম্য হাসল।

শুভ্রা চক্রবর্তী বললেন, আমি আসছি ভাই, আমার আবার রান্না পড়ে আছে, কোনো দরকার পড়লে ডেকো।

দীপক মাথা নাড়ল। শুভ্রা চক্রবর্তী চলে গেলেন।

শুভ্রা চক্রবর্তী চলে যেতে সৌম্য বলল, আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন, এখন এই নিয়ে মাথা খারাপ করে কোনো লাভ নেই, আমাদের বাড়িতে চল, স্নান করে খাওয়া-দাওয়া কর, তারপর ঠান্ডা মাথায় এই নিয়ে ভাবা যাবে।

দীপক উত্তেজিত হয়ে বলল, কি বলছিল তুই! এখন কোথাও যদি যেতে হয় তবে সেটা হচ্ছে থানা।

সৌম্য হাসল, তার কোনো দরকার নেই, আমিই তোর সমস্যার সমাধান করে দেব।

—তুই!

সৌম্য তেমনই হাসল, বলছি তো, তুই একটু ধৈর্য ধর আমিই চোর ধরে দেব, ঠিক আছে, নে ওঠ।

উঠে পড়ল দীপক।

তিন

স্নান সেরে খেয়েদেয়ে দুজনে আবার চলে এসেছে দীপকের ফ্ল্যাটে। একটা ছোট রাইটিং প্যাড আর পেন খুলে দীপকের মুখোমুখি সৌম্য। সৌম্য বলল, তুই ভালোভাবে মনে করে বল এই ফ্ল্যাটে তুই আর অর্পিতা বাদ দিয়ে আর কে কে নিয়মিত বা প্রায়ই আসে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল দীপক। তারপর বলল, আমাদের দুজনের বাইরের এই ফ্ল্যাটে নিয়মিত আসে বলতে একমাত্র শিবানী।

—শিবানী?

—মানে আমাদের ঠিকে কাজের লোক।

—ও।

—তবে গত এক সপ্তাহ ধরে ও আসছে না।

—কেন?

—ওই যে বললাম না আমার শাশুড়ি অসুস্থ বলে অর্পিতা মায়ের কাছে রয়েছে, এ বাড়িতে রান্নাবান্না হচ্ছে না, ও এসে কি করবে।

—ও, আচ্ছা শিবানী ছাড়া?

—শিবানী ছাড়া প্রতি সপ্তাহে সুইপার রামরতন একদিন করে আসে।

ছোট রাইটিংপ্যাডে শিবানীর নামের নীচে দু নম্বর দিয়ে রামরতনের নাম লিখল সৌম্য। তারপর বলল, এ ছাড়া...

—এছাড়া মাসে একদিন করে ইনভার্টারের ব্যাটারিতে ডিসটিল ওয়াটার দিতে নগেনবাবু আসেন।

তিন নম্বরে নগেনবাবুর নাম লিখল সৌম্য, আর?

—আর খবরের কাগজ দেয় পরিতোষ, ও মাসের টাকা নিতে আসে, আর চঞ্চল আসে কেবেল কানেকশানের টাকা নিতে।

চার ও পাঁচ নম্বরে নাম দুটো লিখে নিল সৌম্য, আর?

—আর তো সেরকম কারুর কথা মাথায় আসছে না, এর বাইরে কখনও ধর জলের লাইনে কোনো প্রবলেম হল বা ইলেকট্রিকের কানেকশানে কিছু হল, মিস্ত্রিরা এসেছে তাদের নামধাম তো জানি না, ও তো আমাদের হাউসিঙের যে মেনটেনেন্স কমিটি আছে তারা ঠিক করে লোক নিয়ে আসে, আর সে তো সপ্তাহ বা মাসের কোনো ব্যাপার নয়, যখন প্রবলেম হয়েছে এসেছে...

—সে রকম কোনো প্রবলেম রিসেন্টলি হয়েছে?

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল দীপক। ভাবল। তারপর বলল, সেরকম কিছু তো মনে পড়ছে না।

পেনে খাপ লাগিয়ে সৌম্য বলল, দেখ দীপক চোর এই পাঁচজনের মধ্যেই রয়েছে, এখন আমাদের কাজ হবে চার পাঁচদিন অপেক্ষা করার পরে এই পাঁচজনের জীবনযাত্রা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া।

—জীবনযাত্রা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কারণটা খুব সোজা, তোর ঘর থেকে যা খোয়া গেছে তার মূল্য প্রায় লাখটাকার মতো, এই জিনিসগুলো যে নিয়ে গেছে সম্ভবত সে নিজে ব্যবহার করবে না, ব্যবহার করলে আশপাশের লোকের নজরে পড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে কি করবে, না বিক্রি করে দেবে, বিক্রি করলে চোরাই মাল হিসেবে বড় জোর হাফ দাম পাবে, এই ধর হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাবে, এই বাজারে ওই টাকাটা এমন কিছু নয় যে ও দিয়ে কোনো বড় কাজ হবে, তাহলে টাকাটা দিয়ে কি করতে পারে?

—কি করতে পারে? বোকাবোকা স্বরে জিজ্ঞেস করল দীপক।

—ফুর্তি, এই ধর দুম করে একটা দামি মোবাইল কিনে ফেলল, বা বেশি করে বাজার করল কয়েকদিন, কাজ ফেলে দীঘা কি মন্দারমণি বেড়াতে চলে গেল।

—তা এই কাজগুলো এই পাঁচজনের কেউ করছে কি না সেটা আমরা জানব কি করে?

ছোট রাইটিং প্যাডটার ওপরে পরপর লেখা নামগুলোর ওপরে চোখ রেখে সৌম্য বলল, দেখ শিবানী, রামরতন, পরিতোষ আর চঞ্চলের ক্ষেত্রে এই খোঁজগুলো পাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়, কারণ ওরা এই এলাকাতেই আশেপাশে থাকে, অসুবিধা হচ্ছে যিনি মাসে একবার করে তোদের ইনভার্টারের ব্যাটারিতে ডিসটিল ওয়াটার দিতে আসেন ওই নগেনবাবুর সম্পর্কে এই খোঁজগুলো পাওয়া, কারণ উনি এলাকার লোক নন। সেক্ষেত্রে তোকে যে দোকান থেকে ইনভার্টার কিনেছিস তাদের সাহায্য নিতে হবে।

—ওরা এই ব্যাপারে আমাকে হেল্প করবে?

—কেন করবে না, ঠিকমতো বুঝিয়ে বললে নিশ্চই করবে, দরকার হলে আমি তোর সঙ্গে যাব।

দীপক কিছু বলল না। শুধু হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকল সৌম্যর দিকে।

সৌম্য বুঝতে পারল মুখে কিছু না বললেও দীপক তার ব্যাপারে যথেষ্ট হতাশ। ও ভাবছে এসব কি হাবিজাবি বলে চলেছে সৌম্য। এর থেকে থানায় গেলে কিছু হলেও হতে পারত। সৌম্য আর কথা না বাড়িয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। ফ্ল্যাটের ভেতরটা ভালো করে দেখতে হবে। সকাল থেকে ঘটনার স্রোতেই শুধু ভেসেছে। স্রোতের তলায় ডুব দেওয়া হয়নি। ডুব দিয়ে আসল সত্য তাকে বের করে আনতেই হবে। দীপক থানায় যেতে চেয়েছে। সেই যেতে দেয়নি। সুতরাং তার দায়িত্ব কিনারা করার।

সৌম্য বলল, তুই আমায় নির্দিষ্ট জায়গাগুলো দেখিয়ে দে যেখানে যেখানে জিনিসগুলো ছিল।

এল. সি. ডি টি.ভি, মাইক্রোওভেন, কম্পিউটার, ল্যাপটপের শূন্যস্থানগুলো দেখাল দীপক।

জায়গাগুলো ভালো করে নিরীক্ষণ করছে। অর্পিতা বাড়িতে নেই, ঠিকে কাজের লোকটা তাই আসছে না, ফলে মাইক্রোওভেনের র‍্যাকের ওপরে ধুলো পড়ে রয়েছে। সৌম্য ভালো করে লক্ষ করল ধুলোর ওপরে কোনো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় কি না। কিন্তু সেরকম কিছুই নজরে এল না। চলে এল দীপকের ছেলে রিন্টুর স্টাডি টেবিলের সামনে। কম্পিউটারের শূন্য জায়গাটা দেখল। অথচ কিছুই ধরা পড়ল না। যে সেলফের ওপরে দীপকের ল্যাপটপ থাকে সেখানেও কিছু পেল না।

খুব হতাশ হয়ে দেয়ালের সামনে চলে এল সৌম্য। যেখানটায় এল. সি. ডি টি.ভি-টা ঝোলান ছিল সেই শূন্যস্থানটা দেখল। প্লাস্টিকপেন্টের মোমমসৃণ দেওয়াল ঘটনাহীন। হঠাৎই একটা গন্ধ হালকা করে ছুঁয়ে গেল সৌম্যর নাক। দেওয়ালের খুব কাছে গিয়ে প্রায় নাক ঠেকিয়ে ঘ্রাণ নিতে থাকল সৌম্য।

এরকম বিপর্যয়ের মধ্যেও দীপক মজা না করে পারল না, বলল, তুই কি স্নিফার ডগ হয়ে গেলি না কি!

সৌম্য বিরক্ত হয়ে বলল, চুপ কর চুপ কর, গন্ধটা কিসের বুঝতে দে। বেশ কয়েকবার ভালো করে নিঃশ্বাস ভেতরে নিলে। বুঝতে পারছে কোনো একটা কেমিক্যালের গন্ধ। কিন্তু রসায়ণের শিক্ষক হয়েও কেমিক্যালটা কি সেটা বুঝতে পারছে না। রঙের গন্ধ কি? রঙের মধ্যে অনেক ধরনের রাসায়নিক থাকে। আলাদা করে কোনো একটাকে বোঝা সহজ ব্যাপার নয়। দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সৌম্য জিজ্ঞেস করল, রিসেন্টলি কি রঙের কোনো কাজ করিয়ে ছিলিস?

দীপক বিরক্ত হয়ে বলল, ধ্যুৎ রং করিয়েছি তাও বছর দুয়েক হয়ে গেছে।

সৌম্য মনে মনে বলল তাহলে তো মিলছে না, এ গন্ধ তো বড়ই টাটকা, কাল দুপুরে টি.ভিটা এখান থেকে

যে খুলেছে তার আঙুলে লেগেছিল ওই কেমিক্যাল, টি.ভি-টা খোলার সময়ে আঙুলের গা থেকে লেগেছে দেয়ালের গায়ে, দেয়াল এখনও ধরে রেখেছে ওই কেমিক্যাল, হালকা হয়ে আসছে সেই গন্ধ। দীপককে কাছে ডাকল সৌম্য, একবার দেয়ালের গা শুঁকে দেখ তো গন্ধটা চিনতে পারিস কি না?

দীপক এগিয়ে গিয়ে ভালো করে শুঁকল, তারপর মাথা নাড়ল না গন্ধটা সে চেনে না।

সৌম্য বলল, তোর কাছে মণিদার ফোন নম্বর আছে?

—কোন মণিদা?

—ওই যে বাজারের আগে যার হার্ডওয়্যারের দোকান আছে।

—না, কিন্তু মণিদাকে দিয়ে কি হবে?

—ওনার দোকানে নানান ধরনের কেমিক্যাল আছে, ওকে নিয়ে আসতে পারলে ঠিক বলে দেবে এটা কিসের গন্ধ।

—তাতে কি হবে?

—দেখই না কি হয়, তুই বোস, আমি গিয়ে মণিদাকে নিয়ে আসছি।

চার

মণিদা একবার ঘ্রাণ নিয়েই বলল, এ তো হ্যাভাক্সের গন্ধ।

—হ্যাভাক্স?

সৌম্যর দিকে তাকিয়ে হাসল মণিদা, হ্যাভাক্স জানো না, কলের লাইনে কাজ করার সময়ে একটা পাইপের সঙ্গে আরেকটা পাইপ আটকানো হয় তখন ন্যাকড়ায় এই হ্যাভাক্স রং মাখিয়ে প্যাঁচের ওপরে প্যাঁচের টাইট দেওয়া হয় যাতে কোনোভাবে জল লিক না করে।

সৌম্য চিনতে পারল গন্ধটা। তাদের বাড়িতে কলের মিস্ত্রি কাজ করার সময়ে এই গন্ধ সে পেয়েছে।

দোকান ফেলে এসেছে বলে মণিদা আর দাঁড়াল না।

মণিদা চলে যেতেই সৌম্য বলল, তোর ফ্ল্যাটে কয়েকদিনের মধ্যে কোন কলের মিস্ত্রি কাজ করেছে?

—না।

সৌম্য কিছু বলার আগে দীপক বলে উঠল, তাহলে তো এবার আমায় থানায় যেতেই হচ্ছে।

—কেন?

www.banglabooks.in

—কারণ তোর তদন্ত তো কিছুই নির্দেশ করতে পারল না।

—মানে?

—মানে আবার কি তুই যে তোর ছোট রাইটিং প্যাডটায় এক দুই করে পরপর পাঁচটা নাম লিখলি তাদের একজনও তো কলের মিস্ত্রি নয়।

এবারে সৌম্য কিছু বলতে পারল না। একেবারে বোবা হয়ে গেছে।

দীপক বলল, এবার তাহলে থানায় যাওয়া যেতেই পারে।

সৌম্য মাথা নিচু করে বলল, চল।

পাঁচ

ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে সিঁড়িতে সবে পা রেখেছে অমনি পেছন থেকে এক উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল দুজনে। সৌম্য ও দীপক ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে দেখতে পেল এক হৃষ্টপুষ্ট কোল-বালিশের মতো চেহারার ভদ্রলোক কানে মোবাইল চেপে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে নামছেন। দীপকের সামনে পৌঁছতেই কানের ওপর থেকে মোবাইল নামিয়ে কলটা কেটে দিয়ে বললেন, খবরটা আমি পেয়েছি, কিন্তু আসতে পারিনি আপনার কাছে কারণ নিজেই একটা সমস্যায় পড়েছি।

সৌম্য দীপকের দিকে প্রশ্নসূচক তাকাতে দীপক বলল, উনি অমিয় হালদার, তিনতলায় থাকেন।

অমিয়বাবু বুকের কাছে হাতজোড়া করে সৌম্যকে নমস্কার জানালেন।

সৌম্যও জানাল। সৌজন্যমূলক প্রতি হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, তা কি সমস্যায় পড়েছেন?

—আর বলবেন না ভাই, সামান্য কাজ, আজ পনেরোদিন ধরে করেই চলেছে, কত আর অফিস ছুটি নেওয়া যায় বলুন তো!

—কি কাজ করাচ্ছেন?

—সেরকম কিছুই নয়, রান্নাঘর, বাথরুমের জলের লাইনগুলো সেডিমেন্ট পড়ে সব জাম হয়ে গেছে, ভালোভাবে জল আসছে না, তাই বলেছিলাম ভালো করে ওয়াশ করে দিতে, ও মা ওয়াশ করতে গিয়ে দু জায়গায় পাইপ ভেঙে গেল।

—পাইপ কি খুব পুরনো হয়ে গিয়েছিল?

—না, না, যথেষ্ট ঠিক ছিল, বোঝেন না, কাজ না থাকলে কাজ তৈরি কর এই হচ্ছে এদের পলিসি, তা সেটা ঠিক করল, তা এমন ঠিক করল যে কয়েক জায়গা দিয়ে লিক করতে থাকল, এতে আবার ঠিকমতো প্রেশার না পাওয়ায় ফ্লো পাচ্ছি না ঠিকঠাক, তারওপরে কাল হাফবেলা কাজ করে চলে গেছে, সে নয় দরকার পড়েছে বলে গেছিস ঠিক আছে, তা আজ তাড়াতাড়ি আয়, তা নয়।

সৌম্য উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, আজ কাজে আসেনি!

—আসা তো দূরের কথা। ফোন করছি ফোন পর্যন্ত ধরছে না। এতক্ষণে বাড়ির লোক ফোন ধরল, ফোন ধরে বলছে কোনো এক প্রমোটারের বড় প্রোজেক্ট হচ্ছে পাটনায়, কাজ করতে না কি আজ সকালে পাটনার উদ্দেশে বেরিয়ে গেছে।

হাসল সৌম্য, পাটনা ওকে মেরে করব বাটনা।

অমিয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, মানে?

—মানে আবার কি যে পাটনায় কাজ করতে যায় সে মোবাইল রেখে যাবে কলকাতায়!

—তাই তো, এটা তো আমার মাথায় আসেনি।

সৌম্য বলল, লোকটার বাড়ি চেনেন?

—চিনি না, তবে যার মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছে তার বাড়ি চিনি, কিন্তু কেন বলুন তো?

—আপনাকে একটু কষ্ট দেব, আমাদের সঙ্গে আপনাকে ওর বাড়িতে যেতে হবে, কারণ ওকে তো আমরা চিনি না, আপনি চেনেন, আমরা দেখতে পেলেও ওকে চিনতে পারব না।

—কিন্তু কেন?

দীপকের দিকে তাকিয়ে সৌম্য বলল, ওর ফ্ল্যাটে চুরিটা তো ওই করেছে।

—কি বলছেন কি!

সৌম্য হেসে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর বাড়িতে পৌঁছন দরকার, তারপর সব জানতে পারবেন।

ছবি : সুব্রত মাজী

বনজঙ্গলের গল্প

আজ রাত কাল রাত

মণিলাল মুখোপাধ্যায়

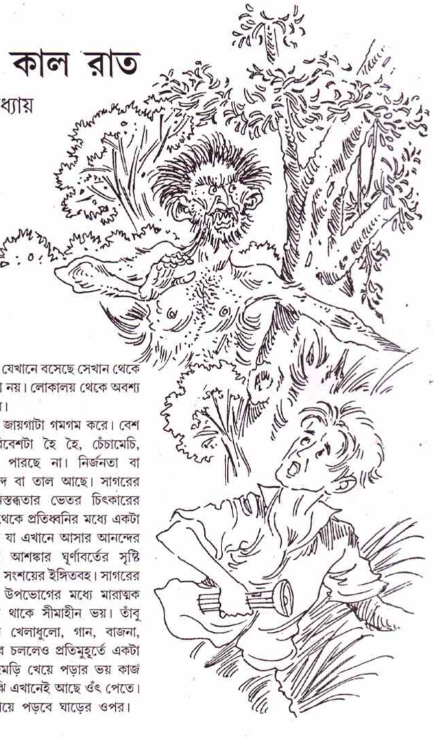

এন. সি. সি. ক্যাম্পটা যেখানে বসেছে সেখান থেকে বনটা খুব যে দূর তা নয়। লোকালয় থেকে অবশ্য অনেক অনেক দূরে।

মুহূর্তের মধ্যে নিরিবিলি জায়গাটা গমগম করে। বেশ বোঝা যায় প্রাকৃতিক পরিবেশটা হৈ হৈ, চেঁচামেচি, গণ্ডগোলকে মেনে নিতে পারছে না। নির্জনতা বা নীরবতার একটা নিজস্ব ছন্দ বা তাল আছে। সাগরের মাঝে মরুভূমির মতো নিস্তব্ধতার ভেতর চিৎকারের শব্দটাও বেমানান। ধ্বনির থেকে প্রতিধ্বনির মধ্যে একটা বিস্ময়বিমুগ্ধ ভয়াবহতা ছিল যা এখানে আসার আনন্দের চেয়ে একটা কুহেলিকাময় আশঙ্কার ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করছিল সেটা ঘনায়মান প্রাণ সংশয়ের ইঙ্গিতবহ। সাগরের উদ্বেলিত ঢেউপ্রবাহে স্নান উপভোগের মধ্যে মারাত্মক আনন্দের খোলসের ভিতর থাকে সীমাহীন ভয়। তাঁবু খাটানো থেকে শুরু করে খেলাধুলো, গান, বাজনা, রান্নাবান্না সব স্বাভাবিকভাবে চললেও প্রতিমুহূর্তে একটা অস্বাভাবিক ভয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভয় কাজ করে সকলের মধ্যে। সে বুঝি এখানেই আছে ওঁৎ পেতে। একটু অসতর্ক হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ের ওপর।

—স্যার, লোকটা বলছিল—

—কে লোকটা, কী বলছিল, কেন বলছিল, কোথায় গেল? ক্যাডেট কল্পকে তার বক্তব্য সম্পূর্ণ করার সুযোগ না দিয়েই প্রশ্ন করে চলেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হলদিবাবু। প্রশ্নগুলো যে আকস্মিক ভয়ের উৎস তা হলদিবাবুর মুখ দেখেই বোঝা যায়। তাঁর কৃত্রিম গাম্ভীর্যটা আড়ালে আবডালে অপেক্ষমান ভয়ের ঝাপটায় এই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

—ঐ যে লোকটা, শালগাছটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। হলদিবাবু ছুটে যান।

—কী বলছ? কী নাম? কোথায় বাড়ি?

প্রশ্নের মধ্যে পারস্পরিকতার অভাবটা প্রকট হয়ে ওঠে।

—নাম পিশাচ। বাড়ি তরাসে। ওই বনের পাশে। বলছে বনে যাবেন না।

—কেন? কিসের ভয়? বাঘ ভালুক আছে না কি?

—কেউ জানে না।

—ভয়টা কিসের?

—বনের ভয়।

—বনের ভয়!

হলদিবাবু একবার বনের দিকে তাকান। অন্ধকার বাইরে পাতলা হলেও ভেতরে তার গাঢ়তা প্রকট। কী নির্জনতা, নিস্তব্ধতা!

তার ভেতরেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর, হাড় হিম করা রহস্যময় অন্ধকার। পুরু, পিচের মতো জমাট বাঁধা।

—ভূতের ভয়ও আছে নিশ্চয়ই?

প্রশ্নটা করে উত্তরের আশায় ঘাড় ফেরায় হলদিবাবু। আশ্চর্য!

লোকটা তো নেই? গেল কোথায়? তরাসের পিশাচ?

ভয় মিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে ক্যাম্পের কাছে ফিরে আসেন হলদিবাবু।

—স্যার, স্টোভটা নিভে গেল। তার আগে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

—কেন? নিভে গেল কেন?

ভৈরব বলে, বেশ জ্বলছিল। হঠাৎ কেন জানি না নিভে গেল।

—আবার ধরাও।

—চেষ্টা চলছে। কিন্তু—

গাম্ভীর্যের মধ্যেও ভয় ফুটে ওঠে হলদিবাবুর মুখে।

—কাছে পিঠে তো লোকালয়ই নেই।

ঠিক তাই। চারপাশ নয়, মাইলের পর মাইল জায়গা পড়ে আছে। শুধু রক্তজমাট করা ফাঁকা। জনবসতি নেই। মাঝে মধ্যে এক আধটা শাল, সেগুন বা দেবদারু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। দেখামাত্র ভয় গিলতে আসবে।

—স্টোভ না জ্বালাতে পারলে রাতে উপোস করতে হবে।

স্ন্যাকসের ফেলে দেওয়া শূন্য প্যাকেটগুলো দেখেই মনে হচ্ছে, হালকা খাবার যা কিছু ছিল সব শেষ।

সম্বর্ত বলে, বন তো রয়েছে। কাঠ মিলবেই।

—কিন্তু বনের ভেতর তো ঢুকতে হবে।

কথাটা বলেই ছাত্রদের মুখের দিকে একবার তাকান হলদিবাবু।

—তরাসের পিশাচ বলছিল, বনে ভয়।

—কিন্তু, স্যার, উপোস তো নেকড়ের থেকেও, এমনকী ভূতের চেয়েও ভয়ের।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দমকা বাতাসের ঝাপটায় পলিব্যাগ, স্ন্যাক্সের ফাঁকা প্যাকেট যেগুলো ছত্রাকার হয়ে পড়েছিল, সেগুলো উড়তে উড়তে ফাঁকা মাঠের থোকা থোকা অন্ধকারের ভেতর ঢুকেই সেকেন্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মানুষ উদাসীন কিন্তু প্রকৃতি সক্রিয়।

—কাঠ চাইই, বলে শশধর। পাশেই বন অথচ কাঠের অভাবে রান্না বন্ধ থাকবে তা হতে পারে না।

—কিন্তু ভয়!

কল্পর কথাটাকে অস্বাভাবিক দম্ভে উড়িয়ে দেয় আর্য, হাতে টর্চ আর লাঠি থাকবে। কেউ ঘেঁষতে পারবে না।

—হ্যাঁ, অবশ্যই ছোটোখাটো জীবজন্তু। কিন্তু—

—ভূতের ভয়?

—না। তা ঠিক বলতে পারছি না। তবে বনের ভয়!

—জীবজন্তু, ভূতের ভয়কে বাদ দিলে বনের আবার আলাদা ভয় আছে নাকি?

—তরাসের পিশাচ তাই বলছিল।

কল্পর অর্থহীন ভয়কে উড়িয়ে দিতে আর্য সশব্দে হেসে ওঠে। তার অট্টহাসির বেমানান শব্দটা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতায় যে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলল তা অরণ্যের ওপর আছড়ে

পড়ে একটা অসহনীয়, অবর্ণনীয়, ব্যাখ্যাতীত, বিশ্রী, ভয়াল রূপ নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ওদেরই গ্রাস করতে।

—স্যার।

চমকে ওঠেন হলদিবাবু, অ্যাঁ!

—কাঠ ভাঙতে বনে ঢুকতে হবে। বেশি দেরি করলে যেতে যেতে রাত হয়ে যাবে।

—অজানা, অচেনা জায়গা। তার ওপর রাত। আবার কাঠ ভাঙতেও যেতে হবে গভীর বনে।

কল্পকে পাত্তাই দেয় না শশধর, তাবলে তো উপোস করা যায় না।

—কেউ কিন্তু গভীর বনে ঢুকবে না। কাছাকাছি থাকবে সবাই। লেট্স্ স্টার্ট।

হলদিবাবুর কথা শেষ হতেই স্কোয়াডের সদস্যরা সার দিয়ে এগিয়ে চলল বনের পেট বরাবর।

—ফিরে যান।

সবাই তাকিয়ে দেখে তরাসের পিশাচ।

লোকটা কোথায় যে আছে আর কোথায় যে নেই কেউ জানে না।

—যাও, যাও। বার বার ভয় দেখাচ্ছ কেন? তুমি চাও টা কী? স্যার লোকটার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে।

হলদিবাবু বলেন, হবে হয়তো। সাবধানতা নিতে হবে। হ্যাঁ, বনের খুব একটা ভেতরে না যাওয়াই ভালো। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না।

কিন্তু কোথায় তরাসের পিশাচ! হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ওরা থামে না। বনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশালকায় তেঁতুলগাছ থেকে কোঁচ বকগুলোর প্রতিবাদমুখর সমবেত চিৎকার ভেসে আসে, কঁ, কঁয়া—

—শুনতে পেলেন?

হলদিবাবুর ঘাড়ে তরাসের পিশাচের নিঃশ্বাসের স্পর্শ।

—কী! কী শুনব? শুধোন হলদিবাবু। প্রশ্নের মধ্যে ভয়ের বাসা।

—ওরা চায় না।

—দেখ বাপু, বার বার তুমি ভয় দেখিয়ো না। আমাদের যেতেই হবে। কাঠ চাই।

—বনে হাত দেবেন না।

সবাই মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, একসঙ্গে গর্জে ওঠে, ভেগে পড় ত।

—আজ রাতই হবে কাল রাত। তাই বলছি ফিরে যান।

মিলিয়ে যায় তরাসের পিশাচ। ওর কথায় কান দেবার প্রয়োজন মনে করে না কেউ। এগোচ্ছে সবাই। ধীর পায়ে, সন্তর্পণে। আমি টর্চ হাতে সামনে। হলদিবাবুর হাতেও টর্চ, তবে তিনি সবার পিছনে। শুকনো কাঠের সন্ধান মেলে না। থাকলেও এত ওপরে যে নাগাল পাওয়া অসম্ভব। এমনকি কাঁচা ডালও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। গভীর থেকে আরও গভীরে এগোয় স্কোয়াড। গাছগুলো গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ এক ঝলক মিষ্টি বাতাস ভেসে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল কোকিলের গান। দূর থেকে, বহুদূরে, বন থেকে আকাশে, বাতাসে বইতে থাকে সুরের বন্যা। অরণ্য ছাপিয়ে সব কিছু ভাসিয়ে দেয় মিষ্টি সুরের জোয়ার। বুলবুলি আর দোয়েলও বাদ যায় না।

আর্য ছাড়া সবাই বসে পড়ে, খুব ঘুম পাচ্ছে। কী সুন্দর! এই মনোরম পরিবেশ ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।

—কাঠ চাই। না পেলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ।

কল্প বলে, আর্য তুই যাবি না। আমরা আর এগোচ্ছি না।

বলাবাহুল্য হলদিবাবু নাক ডাকতে শুরু করেছে। শশধর যেতে চাইলে হবে কী জঙ্গলের জাদুকাঠির ছোঁয়ায় সেও বসা মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। তবে তার আগে একবার শুধু বলল, আর্য একা যাস নে।

—একটু এগিয়ে দেখি কাঠ মেলে কিনা। বেশি দূরে যাব না।

যাদের উদ্দেশ্যে আর্য কথাগুলো বলে তাদের কানে তা ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। এগোতে থাকে আর্য। যত এগোয় ততই অকল্পনীয় রূপের ডালি নিয়ে অরণ্য যেন চোখের সামনে হাজির হয় তবে এই সৌন্দর্যের মধ্যেও রয়েছে একটা মারাত্মক ভয়। হয় অমৃত পান কর, না হয় গরল তোমায় গ্রাস করবে।

—হুপো, হুপো—হুপো—

চমকে ওঠে আর্য, কে?

—কুপ—কুপ—কুপ—কুপ—

—কে ওরকম করছে? ভাবে আর্য।

ভয় পিছু টানে, প্রয়োজন সামনে।

—আর এগিয়ো না। পালাও।

আর্য যেন ঝড়ের কলাগাছ। যুক্তি ছাপিয়েও ভয় উঁকি মারে।

—তরাসের পিশাচ! তুমি! এখানে!

—যদি আর এগোও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। তরাসের পিশাচ অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেল।

—কুটুর—কুটুর—কুটুর—গুগুরর—গ্রগ্রর—

চারদিকে তাকায় আর্য। কিসের শব্দ, কোথা থেকে আসছে কিছু বুঝতে পারে না। দুপা এগোতেই শুনতে পায় শুকনো পাতার ওপর কারও পায়ের শব্দ। কে যেন আসছে। ভয়ে চলার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলছে আর্য। শব্দটা দ্রুত ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। টর্চের আলোটাকে ঘোরাতেই দেখে একটা ময়াল সাপ হিল-হিল করে ছুটে আসছে। ছুটতে শুরু করে আর্য। যত ছোটে ততই গভীর বনের ভেতর ঢোকে। ময়াল সাপটা পিছু ছাড়ে না। এত মোটা আর লম্বা যে অনায়াসেই একটা মানুষকে গিলে ফেলতে পারে। প্রাণ বাঁচাতে একটা গাছের ওপর ওঠে আর্য! রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে। বিশ্রাম আর নেওয়া হয় না। গাছের ভেতর থেকেই বো—ও—বোও, হুপ-হুপ-হুপ শব্দ বেরিয়ে আসছে। প্রায় চার, পাঁচটা বাঁদর, খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে আসে আর্যকে। ভূতের ভয় না খেলেও এদের কে না ভয় না খাবে?

আর্যর অবস্থা শাঁখের করাতের মতো। ওপরে, নীচে, সামনে, পেছনে, বাঁদিকে, ডানদিকে মৃত্যুর হাতছানি।

—এ বন জীবন্ত। কথা কয়। গায়ে রক্ত আছে। লাল।

—তুমি! তরাসের পিশাচ!

—চলে যাও।

—নীচে বিষাক্ত সাপ!

—তোমাদের বিষ আরও মারাত্মক। আকাশ, বাতাস, বন, জল সব তোমরা বিষিয়ে তুলছ। এখানে ঢুকলেই মৃত্যু। অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে কথাগুলো বলেই পুরু অন্ধকারের মধ্যে আবার ঢুকে যায় তরাসের পিশাচ।

সাপটা ওপরে উঠছে। বাঁদরগুলো নেমে আসছে। একটা কালপেঁচা কোটর থেকে বেরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারদিকে একবার চেয়েই যেই না সাপটার দিকে দৃষ্টি গেল সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে বসল পাশের বটগাছটার ওপর তারপর গাছেরই কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকে পড়ল।

উপায়ন্তর না দেখে আর্য গাছ থেকে ঝাঁপ দিতে গেল। সেকেন্ডের মধ্যে একটা দমকা ঝড়ে পাশেরই বটগাছটার একটা ডাল ঝড়ের দাপটে কিনা বোঝা গেল না ওর সামনে বার বার নুয়ে পড়ে ওর নাগালের মধ্যে আসতে লাগল। আর্য বাঁচার উপায়টাকে হাতছাড়া না করে ডালটাকে ধরে বটগাছটার মোটা ডালটায় আশ্রয় নিল। একবার মাথার ওপর আর চারপাশটা দেখে নিল। গাছের ডালে ডালে পাখির বাসা। টর্চের আলোটা নীচেয় পড়তেই ও দেখল এখানে সেখানে পড়ে আছে অজস্র আধ-খাওয়া বটের পাকা ফল। নিরাপদ আশ্রয় পেয়েই আর্যর প্রথম চিন্তা, কাঠ চাই। তা না হলে সকলকে উপোস করতে হবে। টর্চটা জ্বালিয়ে অন্য মন ও দৃষ্টি নিয়ে এপাশ ওপাশ দেখতে গিয়েই চোখ পড়ে একটা মোটা ডালের ওপর। বেশ কিছুটা শুকনো হলেও গোড়ার দিকটা কাঁচা। ধীরে ধীরে সাবধানে ডালটার কাছে যায় আর্য তারপরে সেটা সজোরে চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই পাশ থেকে মেঘ ডাকার মতো একটা ভয় জাগানো শব্দ ভেসে আসে, গুড়গুম! গুড়গুম!

আর্য একা। এর ওপর এই নির্জন বন। চিৎকার করে ডাকলেও সে ডাক কারও কানে যে পৌঁছবেই একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। আর্য বরাবরই ডাকাবুকো। ও সিদ্ধান্ত নেয়, কাঠ চাই। ডাল ভাঙতে হবে।

—ফিরে যাও।

চমকে ওঠে আর্য। তরাসের পিশাচ!

চারদিকে টর্চের আলো ফেলে তাকে খোঁজে। কিন্তু না, সে নেই! অথচ তার সমস্ত স্নায়ু দিয়ে আর্য তরাসের পিশাচের উপস্থিতিকে উপলব্ধি করতে পারছে, সে আছে। সে কাছেই আছে, আর তার প্রতিটি কাজের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখছে। প্রয়োজন ভয়ও মানে না। দ্বিধাগ্রস্ততাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডালটাকে টানতেই হাড়ভাঙার মতো একটা শব্দ হয়েই গোড়া থেকে ডালটার বেশ কিছুটা কাঁচা কাণ্ড আর ছাল সমেত ওর হাতে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসে, আ—আ—আ—আ—আ। উঃ! আঃ! আ—আ—আ—

আর্যর সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন লক্ষ লক্ষ গুণ শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ যাবৎ অননুভূত যন্ত্রণা, কষ্টের একটা তীব্র আঁচের ঝাঁঝ এসে আছড়ে পড়ল তার ওপর। সেই যন্ত্রণাকাতর চিৎকারের শব্দটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বনের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। অরণ্য দাপিয়ে ফাঁকা মাঠ ছাড়িয়ে আছড়ে পড়ল দিগন্তে। হতবুদ্ধ আর্য বিস্ময়াবিষ্ট, আড়ষ্ট, অনড় হয়ে বসে থাকে ক'সেকেন্ড। তারপর হঠাৎ সভয়ে দেখে গাছটার ক্ষতস্থান থেকে অঝোর ঝরে রক্ত বেরোচ্ছে। লাল, ঘন, চাপ চাপ।

—উঃ! মরে গেলাম। কী অসহ্য যন্ত্রণা!

কে কাঁদছে? আর্য সামনে তাকায়। কী ভীষণ, ভয়ঙ্কর ভয়াবহ ঘন অন্ধকার ওর দিকে এগিয়ে আসছে। এক পা এক পা করে। ডাল থেকে লাফ দেয় আর্য। পালাতে হবে এখান থেকে। যে ভাবেই বা যেমন করেই হোক। কিন্তু পালাতে গিয়েও পালাতে পারে না আর্য, কে যেন ওর পাটা টেনে ধরে। টর্চটা হাতে আছে আর কাজও করছে। টর্চের আলোটা জ্বালতেই দেখল বটগাছের একটা শেকড় আঁকড়ে ধরে আছে ওর ডান পাটা।

ওর সামনের পিচ-কালো অন্ধকারটা ডিগ্রির পর ডিগ্রি অতিক্রম করে চরম পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। অবর্ণনীয় দুর্ভেদ্য এক অন্ধকার এগিয়ে আসছে। তার দুচোখ দিয়ে গাঢ় নীল রংয়ের তীব্র একটা আলো বেরিয়ে এসে কাকে যেন খুঁজছে। আর্য কোনোরকমে পা টা ছাড়িয়ে বটগাছটার পেছনে লুকোয়। ঝুরির ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখে কী ঘটতে চলেছে। সেকেন্ডের মধ্যে এক অচিন্তনীয় রূপান্তর লক্ষ্য করে। সেই জমাট অন্ধকারটা সবুজ বলয়ের রূপ নেয়, আর সেই সবুজ বলয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে তরাসের পিশাচ। দুহাত বাড়িয়ে বলছে, সে কই? সে কোথায়? দুহাত দিয়ে চারপাশ হাতড়াতে হাতড়াতে ও এগিয়ে আসছে।

দুচোখে ভয়াবহ জিঘাংসা। হননের ইচ্ছেটা ক্রূর দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত। একদিক দিয়ে রক্ত ঝরছে। হায়নার মতো হাসি। নেকড়ের মতো রক্তমাখা দাঁত। তীক্ষ্ণ, ধারালো। দারুণ ভয়ে রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাবে বুঝি। মানুষের চোখ আর মন দিয়ে পিশাচের ওই ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখার মতো কঠিন মন আর সাহস কোনোটাই নেই আর্যর। ও

মুখ ফিরিয়ে নেয় তবু ভয় যায় না। ও দুচোখ বন্ধ করে। ভয় না কমে বেড়ে যায়। ও ছুটতে যায়, ভয় টেনে ধরে। চিৎকার করতে যায় ভয় গলা টিপে ধরে। হঠাৎ ওর মনে হল কারা যেন ওর পিঠে হাত রাখল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাড় হিম করা ঠান্ডা সাপের শিকার গেলার মতো আর্যকে গ্রাস করতে লাগল। আর্য অতিকষ্টে একবার পিছন দিকে চায়। অবাক বিস্ময়ে দেখে কারা যেন দাঁড়িয়ে। অন্ধকারের মধ্যেও ওদের দেখা যাচ্ছে।

খুব কাছে অথচ মনে হচ্ছে অনেক, অনেক দূরে। বর্তমান হলেও অতীত।

—কে তোমরা?

আর্যর মনে হল তার ভেতর দিয়ে অন্য কেউ কথা বলছে।

—অপরাধী।

—অপরাধ?

—এই বন জীবন্ত। আমরা অরণ্যের নিয়ম ভেঙেছি। অরণ্যের ওপর আঘাত হেনেছি।

—কে শাসক?

—অরণ্য। শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এখানকার নীতি। অরণ্য কথা বলে। আকারে, ইঙ্গিতে, কাজে অনেক কিছুই বোঝাতে চায়। আমরা তা বুঝতে চাইনি। তাই অরণ্যের হাতে শাস্তি পেয়েছি। আমরা প্রেতাত্মা।

হঠাৎ আর্যর মনে হল তার ঘাড়ে কে যেন দুটো গরম শলকা চেপে ধরেছে। ঘাড় ফেরাতেই দারুণ ভয়ে নড়ার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলে আর্য। তরাসের পিশাচ! বিকৃত, বীভৎস মুখ।

যেন এক ভয়ংকর নেকড়ে। দু'পাশের দুটো লম্বা দাঁত দ্রুত ঢুকে যাচ্ছে তার দেহের অভ্যন্তরে।

—কে তুমি? তরাসের পিশাচ!

একটা হিংস্র গর্জন। মুহূর্তের মধ্যে তোলপাড় সারা বনটা। যেন মহাকালের নৃত্য।

—বাঁচাও—

অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে বনটা। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও, আবেদন জানায় আর্য।

—আমাদেরও লাগে। যন্ত্রণা হয়। প্রাণ আছে। রক্ত আছে। জন্ম আছে। মৃত্যু আছে।

আর্য যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখ তুলে একবার চায়। কোথায় তরাসের পিশাচ! এ তো বটগাছটা। অন্ধকারের মধ্যেও বেশ বুঝতে পারছে আর্য, গাছটা তার শেকড় দিয়ে চেপে ধরে অক্টোপাসের মতো রক্ত খাচ্ছে।

শেষবারের মতো চিৎকার করে আর্য, শশধর, কল্প—

শশধরেরা তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

www.banglabooks.in

হাসির গল্প

ধাক্কার ধাক্কা

শোভন শেঠ

আমি পইপই করে বড়মামাকে নিষেধ করেছিলুম। কিন্তু শুনলেন না। কপালে গেরো থাকলে এরকমই হয়।

আমি আর এবছর তোমার সঙ্গে নেই।

নেই মানে! বড়মামার চোখ কপালে উঠল।

নেই মানে আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখব না, বেশ রাগত হয়েই বললুম, কী যাচ্ছেতাই ভিড় সব। ঠ্যালাঠেলি, গুঁতোগুতি, দড়ির খেলা, পুলিশের বাঁশি। তার থেকে বাড়িতে বসে টিভিতে ঠাকুর দেখব।

কী যে বলিস তার মাথামুণ্ডু নেই, বড়মামা মুচকে হেসে আমাকে মচকাবার চেষ্টা করলেন, বাঙালির পুজো এই একটাই, দুর্গাপুজো।

একটা না ছাই, আমি বললুম, দুর্গাপুজো দিয়ে বাঙালির পুজোপার্বণের উদ্বোধন হয়। তারপর লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী, কার্তিক, গণেশ পুজো, সরস্বতী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, মা শীতলা, রক্ষাকালী, সন্তোষীমাতা, বড়বাবা, গঙ্গাপুজো, বিশ্বকর্মা দিয়ে শেষ হয়। এবছর আবার একবছর ধরে রবীন্দ্রপুজো হবে।

তোর লিষ্টি থামা, বড়মামা বেশ বিরক্ত।

থামব কেন শুনি! এটাই তো পুজোর হিস্ট্রি। এতো পুজোর চাঁদার ভারে কুঁজো হবার অবস্থা। যাদের শক্তি নেই, তারাই শক্তির পুজো মানে কালীপুজো,

রক্ষেকালীপুজো করে। বই যারা ছোঁয় না, তারাই সরস্বতী পুজো করে।

তোর যেন আজ কী হয়েছে! শুধু বকে মরছিস, বড়মামা আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, এবারে তো আর বাসে-ট্রামে যাবো না। পুজোর ক'দিনই ট্যাক্সি চেপে যাব।

কীসে চাপবে বললে! আমি বিস্মিত।

ট্যাক্সিতে রে ট্যাক্সিতে। যত টাকাই লাগুক। পুজোর ক'দিনই ট্যাক্সি চেপে ঠাকুর দেখব।

আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ফেল মারল। আহা কী মজা! ট্যাক্সি চেপে ঠাকুর দেখব।

কাল চতুর্থী থেকেই শুরু করে দেব, বড়মামার মুখে একগাল হাসি, আজকাল অনেক ঠাকুর বেড়েছে। নতুন নতুন এলাকা বেড়েছে। গতবছর ৪২০টা ঠাকুর দেখেছি। সংখ্যাটা বড় খারাপ রে। এবারে ৪৫১ কমপ্লিট করব।

কিন্তু—

আবার কিন্তু কীসের!

আরে চতুর্থীতে তো অনেক ঠাকুরের উদ্বোধনই হবে না। তার ওপর ট্যাক্সিতে গিয়েই বা কী সুবিধে হবে? আমার প্রশ্ন বিখ্যাত বিখ্যাত প্যান্ডেলে তিন কিলোমিটার দূরে পুলিশ ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দেবে। তারপর শুধু বাঁশ আর দড়ির খেলা। দড়ি দিয়ে আটকে ভিড় বাড়াবে। কাগজে নাম উঠবে।

অতসব ভাবলে হয় না, বড়মামা বললেন।

চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী খারাপ ঘোরা হল না। বড়মামা সত্যি করেই ট্যাক্সি ভাড়া করেছেন। কিন্তু সপ্তমীর দিন থেকেই ঝামেলা বাড়ল। প্যান্ডেল থেকে ট্যাক্সি অনেক দূর দাঁড়াল। তারপর দড়ির খেলা। ঠাসাঠাসি ভিড়। ধাক্কাধাক্কী। ১৮৩-টা ঠাকুর দেখা হয়ে গিয়েছে। টার্গেট থেকে অনেক দূরে।

তাড়াতাড়ি নে, বড়মামা তাড়া দিলেন, একটা প্যান্ডেলে অতক্ষণ দাঁড়ালে হবে না। শুধু দেখবি আর ছুটবি।

আহা, এতো সুন্দর সুন্দর প্যান্ডেল, এতো সুন্দর সুন্দর মূর্তি, আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

বড়মামা প্রায় দৌড় লাগিয়েছেন। আমিও পিছু নিলুম। হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে বড়মামার ধাক্কা লেগে গেল।

দেখতে পান না! বুড়ো হাতি কোথাকার? ভদ্রলোক রেগে মেগে বললেন, এই বয়সেও বাচ্চাদের মতো দৌড়চ্ছেন।

আহা-হা, বয়স বাড়লেও কি মনটা বাচ্ছাদের মতো থাকতে নেই! বড়মামা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

না নেই, ভদ্রলোক বেশ ক্ষিপ্ত, এই যে আপনি আমার নতুন বুটজোড়ায় আপনার চটির কাদা লাগিয়ে দিলেন।

ও ওরকম হয়, বড়মামার মুখে একগাল হাসি। যেন শিশুর সারল্য। এতো ভিড়, এতো লোকজন, একটু ধাক্কাধাক্কি হবে না! এটুকু তো মেনে নিতেই হয় দাদা। আমাকেও তো কতো লোক ধাক্কা দিয়েছে।

তবে রে, মুখে মুখে উত্তর! সাফাই গাওয়া হচ্ছে! ভদ্রলোক প্রচণ্ড জোরে চেঁচালেন, ধাক্কার ধাক্কা তো দেখেননি। এবার দেখাচ্ছি।

ভদ্রলোক বড়মামার পাঞ্জাবীর বুকের কাছটা ধরে এক টান দিলেন। পাঞ্জাবি ফেঁসে গেল।

সব লোক হাঁ হয়ে গেল। ভদ্রলোক বীরদর্পে চলে গেলেন। বড়মামা মাথা নত করলেন। বললেন, এই একটুকুতেই এত রাগ! আপশোস করলেন, তাহলে আমাদের দেখে ছোটরা কী শিখবে!

পুলিশ ছুটে এলো। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

আমরা প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে একটা পাঞ্জাবির দোকানে এলাম। বড়মামা একটা নতুন পাঞ্জাবি কিনে সেটা পরলেন। তারপর আবার ঠাকুর দেখা শুরু হল। তবে ধীরগতিতে। সপ্তমীর সন্ধেতেই সবাই নেমে পড়েছে। প্রচণ্ড ভিড়। তিনশো তিন-এ শেষ হল।

এবারে ৪২০ থেকেও কম হবে, আমার হতাশ কণ্ঠ।

অলক্ষুণে কথা বলিসনি তো, বড়মামার আশ্বাস, এখনও অষ্টমী, নবমী, দশমীর সকাল আছে। আগামী বছর থেকে মহালয়ার দিন থেকেই বের হবো।

তার থেকে কুমোরটুলিতে, আর যেখানে যেখানে ঠাকুর তৈরি হয় সেইসব জায়গা ঘুরে নিলেই তো হয়, আমি বিরক্ত হয়ে বললাম।

অষ্টমীর সকাল থেকেই আকাশের মুখভার। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। বড়মামা ছাতা নিয়েই বের হচ্ছিলেন।

ছোটমামা নিষেধ করলেন, এই ওয়েদারে কেউ ঠাকুর দেখতে যায়!

তুই বুঝছিস না ছোট, মহাঅষ্টমী বছরে একবার আসে।

এই ঝড়ে জলে পড়ে হাত-পা ভাঙবে, ছোটোমামার সাবধানবাণী, রোগ বাধাবে। শরীর তোমার নিজেরই।

তবু বাধা শুনলেন না। ছাতা মাথায় দিয়ে বের হলেন। কিন্তু শুরুতেই বাধা। একটা ঝোড়ো হাওয়ায় ছাতাটা ফস্ করে উলটে গেল। আমি পিছনেই ছিলাম। বাধ্য ভাগনের মতো সিধে করে দিলাম। দু'পা এগোতে না এগোতেই দমকা হাওয়ায় ছাতাটা আবার উলটে গেল। বৃষ্টিটাও বেড়ে গেল।

অগত্যা বাড়ি ফিরে এলাম।

সারাদিন আকাশ গোমড়া হয়ে রইল। বড়মামার মুখও ভার। অবশেষে টিভির সামনে বসলাম।

গুণে ফেল, তিনশো তিনের পর থেকে গোণ, বড়মামা বললেন।

গুণব কি গো! আমি বিস্মিত, একই ঠাকুর দু'বার গুণব! এসব গত চারদিনে দেখেছি।

ও তাই বুঝি! বড়মামা হতাশায় সোফায় গা ছেড়ে দিলেন।

নবমীর সকাল থেকে আকাশ আবার ঝলমলে। বড়মামাও আনন্দে ঝিলমিল করে উঠলেন, ভাগনে, আজ সকাল থেকে যতটা পারা যায় দেখ। বাইরের দোকানেই খাব আর ঠাকুর দেখব। ট্যাক্সিতে বেশি টাকা দিতে হলেও কুছ পরোয়া নেই।

আমি গদগদ, জলখাবারটাও না হয় দোকানে সারব বড়মামা, আমি বললুম।

পনের মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লুম। দিনেরবেলাটা অনেক ফাঁকা। দেখতে দেখতে ৪০২-এ পৌঁছে গেলাম।

ঠাকুর দেখার আনন্দে এই বয়সেও বড়মামার কোনো ক্লান্তি নেই। আমার তো দেখারই বয়েস। বিকেলের দিকে একটা পার্কের বেঞ্চে বসে দুজনে একটু বিশ্রাম নিলুম।

এবারে টার্গেট মনে হয় পেরিয়ে যাবে, বড়মামার উক্তি।

তা যা বলেছ, আমি নিরুত্তর থাকতে পারলাম না, এখনও আজ সন্ধে আছে, কাল দশমীর সকাল আছে।

আবার বের হলাম। প্রচণ্ড ভিড়। ৪১৮ থেকে ৪১৯-এ পৌঁছতেই পাক্কা দেড়ঘণ্টা লাগল। বাঁশ আর দড়ির কী খেলা রে বাবা!

খুব সাবধান বড়মামা, ধাক্কা সামলিয়ে।

তা আর বলতে রে, বড়মামাও এখন খুব সাবধানী।

ধাক্কা বড় সাংঘাতিক গো, আমি বললুম, এই ধাক্কা খেয়েই অনেক সময় লোকের পকেট ফক্কা হয়ে যায়। এমনকি ধাক্কার চোটেই কেউ কেউ অক্কা পায়।

এই কথা বলতে বলতেই বড়মামার সঙ্গে দুজনের ধাক্কা লাগল।

একটু দেখে যান মশাই, এতো তাড়া কীসের, একজন বললেন।

বড়মামা পিছু ফিরে আমার দিকে তাকালেন, ভাগনে এইটা ৪২০ নম্বর।

কথাটা শেষ করতে না করতেই সামনে একটা বিরাটদেহ লোকের সঙ্গে বড়মামার রামধাক্কা লেগে গেল। দুজনের ভুঁড়িতেই ধাক্কা লেগে ভিড়ের মাঝখানে দুজনেই চিৎপটাং। পাবলিক ধরে তুললে।

সেই ভদ্রলোক বড়মামার কাঁধ খামচে বললেন, ইয়ারকি হচ্ছে না? কে তুমি? নির্ঘাত বদ মতলবে ধাক্কাধাক্কি করছ। এই ভিড়েই চোর-বদমায়েস ঘোরাফেরা করে। সে জন্যেই আমি পাহারায় আছি। আর আমাকেই কী না ধাক্কা! দেখাচ্ছি মজা।

আমার বড়োমামা, আমি বোঝাবার চেষ্টা করলুম, ঠাকুর দেখতে বের হয়েছি। কালকের দিনটা জলঝড়ে নষ্ট হল তো, তাই তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে—

থাম, লোকটা গর্জে উঠল।

আমি ভড়কে গেলুম। বুঝলুম সাধারণ পোশাকের পুলিশ ভিড়ের মধ্যে ছিল। আর বড়োমামা তাকেই কি না ধাক্কা মেরেছে।

বড়োমামাকে ছেড়ে দিন, আমার আকুতি।

মজা দেখাচ্ছি, সাদা পোশাকের পুলিশটা বললে, তুই ওর সাকরেদ।

অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সবই বিফলে গেল।

বুঝলুম কপালে দুর্ভোগ আছে। যমরাজকে বোঝালে তবু বুঝবেন। যমরাজ সত্যবান আর লক্ষ্মীন্দরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশে বুঝবে না।

অনেক লোক আবার বললে, ইনি তো ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করছিলেন। দেখুন পকেটমার কি না?

বিধি বাম! আমাদের দুজনকে পুলিশভ্যানে তোলা হল। থানায় চালান দিল। পরেরদিন সকালে ছোটোমামা খবর পেয়ে থানায় এলেন। ভ্যাগিস বড়ো মামার পকেটে মোবাইলটা ছিল। তাই খবরটা দিতে পেরেছিলেন। ছোটোমামা বড়বাবুকে অনেক বোঝালেন। তারপর আমরা ছাড়া পেলাম। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বড়মামা ছোটোমামাকে শুধু বললেন, এবারেও ৪২০টা। সংখ্যাটা বড়ো খারাপ রে!

ছবি : পলাশকান্তি বিশ্বাস

রূপকথার গল্প

কাগজের নৌকা

প্রশান্ত সরদার

ক'দিন ধরে মৃদুল আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছে। কেবলই ভাবছে। দিন নেই রাত নেই ভাবছে, সময় পেলেই ভাবছে। মাঝে মাঝে ভাবনার উৎসমুখ খুললেই গভীরে ডুবে যায়। মাঝে মাঝে আবার খেই হারিয়ে ফেলে। হতাশ হয়। বেশিরভাগ গল্প, যে গল্পই তা মনে করে শান্ত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওই যে কথায় আছে, বিপদে পড়লে মানুষ কুটো ধরেও বাঁচতে চায়। মৃদুলেরও তাই হয়েছে।

আসলে মৃদুলের বয়স আর কতই বা—দশ কি এগার। এই বয়সেই সে বাবাকে হারিয়েছে। মা গাছটাও যেতে বসেছে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে চলেছে মা। মা চলে গেলেই মৃদুল যে একেবারে একা হয়ে পড়বে।

মৃদুল ক্লাস ফাইভে পড়ে। পাড়ারই এক প্রাইমারি স্কুলে। দিন সাতেক আগে এক মাস্টারমশাই ক্লাসে একটা সাবেকি রূপকথার গল্প বলেছিলেন। সেই গল্পের নায়ক মৃদুলেরই বয়সী। নাম চন্দ্রদীপ। চন্দ্রদীপের অসীম সাহস। সে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে অজানা এক দেশের এক বন্দী রাজকন্যাকে রাক্ষসের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল। কেবল কি তাই! রাক্ষসের অত্যাশ্চর্য যাদুদণ্ডটিও হাতিয়ে এনেছিল।

মৃদুলের যত ভাবনা ওই যাদুদণ্ডটা নিয়ে। তার একটাই ইচ্ছা। যদি ওরকম কোনো যাদুদণ্ডের সন্ধান সে পায়। তাহলে তাই দিয়ে সে তার মাকে সুস্থ করে তুলবে। মা ছাড়া পৃথিবীতে তার কেউ নেই। কিছু নেই। একা।

ভীষণভাবে একা।

আজও মৃদুল রাত্রে শুয়ে শুয়ে চন্দ্রদীপের কথা চিন্তা করছে। চন্দ্রদীপের সঙ্গে সে যেন তার জীবনের কোথাও একটা মিল খুঁজে পায়। সারা গল্পে চন্দ্রদীপের জীবনে বহু ঝুঁকি এসেছে। সে সমস্ত ঝুঁকি হাসিমুখে গ্রহণ করেছে। কিন্তু কোথাও নিজের স্বার্থের জন্যে নয়। তার সব ঝুঁকির সুফল ভোগ করছে অন্যে। তাই মৃদুল তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। হৃদয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মেছে।

হঠাৎ মৃদুল দেখতে পেলো পশ্চিম আকাশে অপরূপ এক বর্ণের ছটা। নানা রঙে পশ্চিম আকাশ ছেয়ে গেছে। সে দু'চোখ ভরে সেই রূপসুধা পান করতে লাগল। তারপর সেই নানারঙে রঞ্জিত মেঘের ভেতর থেকে অপূর্ব সুন্দর একটা ঘোড়া বেরিয়ে এলো। দু'পাশে তার ঝলমলে রঙিন দুটো ডানা। ডানায় ভর দিয়ে সেই ঘোড়া বাতাসে ভাসতে ভাসতে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মৃদুল এমন ঘোড়া জীবনে দেখেনি। ডানা দুটিতে যে কত ধরনের রঙ ছিল তার ইয়ত্তা নেই। মৃদুল তার মাস্টারমশাইয়ের বলা পক্ষীরাজের সঙ্গে মিল খুঁজতে লাগল।

মৃদুলের সারা শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ। অপূর্ব এক মাদকতায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। চড়ে বসল পক্ষীরাজে।

যেই না বসা, অমনি সোঁ সোঁ বেগে পক্ষীরাজ মেঘের ভিতর দিয়ে উঠে যেতে লাগল। একের পর এক মাঠ-ঘাট নদী-নালা পেছনে ফেলে ঘোড়া এগিয়ে চলেছে। কোনো কিছু বাধা যেন বাধাই নয়। শুধু পথ চলা। যাওয়ার পথে মেঘেদের স্পর্শ মৃদুলকে সারাক্ষণ আদর জানিয়েছে। মাঝে মাঝে তার ঘোড়া মেঘেদের নীচে রেখে উড়ে চলেছে। তাকে অনেক দূরের দেশে যেতে হবে। তাই শক্ত হাতে লাগাম ধরে নড়ে-চড়ে বসেছে। সামনে আরো সামনে। পক্ষীরাজ উড়ে চলেছে...চ-লে-ছে...।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর তার ঘোড়া একটা দীঘির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অদ্ভুত দীঘিটা। দুধ দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি। সাধারণ দীঘির মতো ঢেউ ছিল। কিন্তু তা দুধের। ভয়ঙ্কর সুন্দর সেই দীঘির উথালপাতাল ঢেউ।

দীঘির পূর্বপাড়ে ছিল বিশাল এক বটগাছ। চারদিক থেকে অসংখ্য ঝুরি নেমেছে। ঝুরিগুলি মাটির সঙ্গে ভীষণভাবে গেড়ে গেছে। সেই বটগাছের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মৃদুল দেখতে পেল গাছের নিচে কে যেন একজন ধ্যানে মগ্ন।

গুটিসুটি পায়ে মৃদুল এগিয়ে যায় সেই দিকে। কাছে গিয়ে দেখে, তার অনুমান মিথ্যে নয়। এমনভাবে এক ঋষির দেখা পেয়ে মৃদুল খুশিতে ডগমগ। আস্তে আস্তে সে হাত জড়ো করে ঋষির পাশে গিয়ে বসে। মনে মনে ভাবে ঋষি নিশ্চয় ধ্যানযোগে আমার মনের কথা বুঝতে পারবেন। তারপর উপায় বলে দেবেন। আর তাহলেই মাকে সারিয়ে তুলতে সময় লাগবে না।

কতক্ষণ এইভাবে বসেছিল মৃদুল জানে না যখন তার জ্ঞান ফিরল দেখল একটা কুটিরের মধ্যে সে শুয়ে আছে। ভোরের আবছা আলো সবেমাত্র ফুটেছে। কুটিরে কেউ নেই। মৃদুল বেরিয়ে এল। একটু দূরে তাকিয়ে বটগাছের তলা দেখলো। না, ঋষিবাবা নেই। কোথায় গেলেন তিনি! তবে কি ঋষিবাবাই তাকে এখানে এনেছেন!

রক্তজবার মতো সূর্যকে ভীষণ ভালো লাগছিল মৃদুলের। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে ছিল সূর্যের দিকে। এমন সময় অচেনা এক শব্দে তার চমক ভাঙল। সে দেখলো হলুদ রঙের একটা পাখি কুটিরের চালে বসে আপন মনে ডাকছে। কোনো ভয় নেই। সে যে এতো কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। না থাকুক, মৃদুলের ভালো লাগছে পাখিটার দুঃসাহস।

একটু পরেই মৃদুল দেখলো শুধু ওই পাখিটা নয়, অনেক পাখি এসে কুটিরের আশেপাশে খেলা করছে নির্ভয়ে। মৃদুলকে তারা আমলই দিচ্ছে না। একটু রাগ মৃদুলের হচ্ছে বই কী। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে পারে এই রহস্য। আসলে এখানে কোনো হিংসা নেই। মারামারি নেই। তাই কেউ কাউকেই ভয় পায় না।

মৃদুল দেখছে কোনো পাখি স্নান করে এসে ঠোঁট দিয়ে পালক খুঁটছে। কোনো পাখি চোখ বন্ধ করে ঠায় বসে আছে। আবার কেউ কেউ খাবার খুঁজে এনে তার বাচ্চাদের ডেকে হেঁকে খাওয়াচ্ছে। এক এক জাতের পাখি এক এক রকম কাজ করে চলেছে।

এক সময় মৃদুল দেখতে পেল সেই ঋষিবাবাকে। স্নান করে কমণ্ডলু হাতে কুটিরের দিকে আসছেন। সৌম্যমূর্তি, সমস্ত শরীর জুড়ে বিরাজ করছে অদ্ভুত এক প্রশান্তি।

মৃদুলকে কুটিরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঋষিবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বাছা, এতো তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়লে যে?'

আগের দিন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন বলে মৃদুল ঋষিবাবাকে প্রণাম করতে পারেনি। তাই ঋষিবাবা সামনে আসতেই মৃদুল এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। ঋষিবাবা তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।'

ঋষিবাবার মুখ থেকে এমন কথা শুনে মৃদুলের চোখে জল ছলছল করে উঠল। চোখের জল দিয়ে ঋষিবাবার পদ্মের মতো রাঙা পা দুটো ধোয়াতে ইচ্ছা হল।

মৃদুলের চোখের জল দেখে ঋষিবাবা বললেন, 'তোমার মনের জ্বালা আমি জানি। তুমি এখানে কেন এসেছ তাও আমার জানা। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ। আমিও সেজন্যে তোমার ওপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়েছি। এখানে তোমার মতো মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এর আগে আর কেউ আসেনি। তোমার আগে যারা এসেছিল তারা প্রায় সবাই চেয়েছিল পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পেতে। তোমার মনোবাসনা চরিতার্থ করতে হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে তো চলবে না। অনেক কাজ করতে হবে।'

মৃদুল সাগ্রহে জানতে চাইল, 'আমাকে আদেশ করুন। আমি আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।'

তারপর হঠাৎই ব্যথিত হৃদয়ে জানতে চাইল 'আমার মা বাঁচবে তো ঋষিবাবা?'

ঋষিবাবা একটু চিন্তা করে বললেন, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার মার বাঁচা উচিত। তবে তার জন্যে তোমাকে আরো খানিকটা পথ এগিয়ে যেতে হবে মসৃণভাবে। নির্মল রাখতে হবে মন। মুছে ফেলতে হবে লোভ।'

তারপর তিনি মৃদুলকে আরো কাছে ডেকে বললেন, 'দ্যাখো বৎস, আমি যেমন ভাবে তোমাকে এগিয়ে যেতে বলব ঠিক সেই ভাবে গেলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অন্যথায় তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হতে পারে।'

একটু থেমে ঋষি আবার বললেন, 'ঐ যে দীঘি দেখতে পাচ্ছ, ওর নাম শ্বেতদীঘি। ওটা দুধ দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি। প্রথমে তুমি ঐ দীঘির উত্তর পাড়ে যাবে। সেখানে গিয়ে দেখবে একটা নৌকা বাঁধা আছে। ঐ নৌকা করে তুমি ওপারে চলে যাবে। কিন্তু নৌকাতে ওঠার আগে অলক্ষ্যে কয়েকটা কথা তোমাকে শোনাবে ঐ শ্বেতদীঘি। যদি তুমি তার কথার যোগ্য হও, তবেই নৌকাতে পা রাখবে। নতুবা নয়।'

'তারপর দীঘি পার হয়ে ওপারে গিয়ে দেখবে সুন্দর

পাথর বিছানো রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যাবে। খানিক পরে দেখতে পাবে এক গুহা। গুহার মুখের পাথর সরিয়ে ভেতরে ঢুকবে। দেখতে পাবে আমার মতো আর এক ঋষিকে। ওই ঋষির কাছে তুমি যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে। তবে খুব সাবধানে তোমাকে কাজটা করতে হবে।'

বলেই ঋষিবাবা ধ্যানে বসার জন্যে বটগাছের দিকে এগিয়ে গেলেন। মৃদুল ঋষিবাবাকে প্রণাম করে দীঘির উত্তর পাড়ের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল।

উত্তর পাড়ে গিয়ে মৃদুল হতাশ হয়ে গেল। চোখ ছলছল করে উঠল। তবে কী এত দূরে এসে তাকে ফিরে যেতে হবে? না, চেষ্টা একটা করে দেখবে।

আসলে নৌকা বাঁধা ছিল ঠিকই কিন্তু তা কাগজের। হাল, দাঁড় সবই কাগজের। এ কেমন রহস্য! মৃদুল ভেবে পায় না। খানিকক্ষণ চিন্তা করল সে। তারপর এগিয়ে গেল নৌকার দিকে।

যেই না নৌকোতে উঠতে যাবে, অমনি এক নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'যে জীবনে কোনোদিন মিথ্যে বলেনি, অন্যায় কাজ করেনি, গুরুজনের আদেশ পালন করে এসেছে, সেই কেবল এই নৌকা চড়তে পারে।'

একথা শোনার পর মৃদুল আবার থমকে দাঁড়াল। চিন্তা করল এক মুহূর্ত। তারপর ভেবে দেখল কথাগুলোর যোগ্য সে। যেটুকু সংশয় ছিল কেটে গেল। উঠে পড়ল নৌকাতে। না, কাগজের নৌকা বলেই তার ভারে নৌকা ডুবে গেল না, বরং তরতর করে এগিয়ে চলল।

নামমাত্র হাল ধরে ছিল মৃদুল। নৌকা আপন গতিতে অপর দিকে চলে গেল। নৌকা থেকে নেমে পাথর বিছানো পথে এগিয়ে যেতেই একটা গুহা দেখতে পেল। যেমনটি ঋষিবাবা বলেছিলেন, পাথর সরিয়ে ঢুকে পড়ল মৃদুল। দেখতে পেল আর এক ঋষিকে। ইনিও ধ্যানে মগ্ন। মৃদুল দেখল তার চারপাশে রাশি রাশি সোনাদানা ছড়িয়ে আছে। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে ঋষিবাবার পাশে অপেক্ষা করতে থাকল।

বেশ কিছুক্ষণ এমনিভাবে থাকার পর ঋষি চোখ খুললেন। তারপর মৃদুলকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আমি তোমার সততায় মুগ্ধ, তোমার যত খুশি ধনরত্ন তুমি নিয়ে যেতে পারো।'

ঋষির মুখ থেকে একথা শোনার পরও মৃদুল নড়ল না। যেমন ছিল তেমনই রইল।

ঋষিবাবা তাকে নড়তে না দেখে জানতে চাইলেন, 'কী হলো। তুমি ধনরত্ন গুছিয়ে নিচ্ছো না তো! ওই তো সুন্দর সুন্দর থলে আছে, যতো পারো ভরে নাও।'

মৃদুল এবার মৃদু স্বরে বলল, 'ধনরত্ন আমি চাই না।'

'তাহলে কী চাও তুমি?' ঋষি অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

'আপনি আমাকে একটা উপায় বলে দিন, যাতে আমার মা'র অসুখ সেরে যায়। আমি আর কিছু চাই না।'

'শুধু এইটুকুই পেতে তুমি এতদূর ছুটে এসেছো?'

মৃদুল উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ, মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই।'

ঋষিবাবা এবার মৃদুলের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমি তোমার মাতৃভক্তি দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। এই নাও একটা মন্ত্রপূত বেলপাতা। এটা বেটে তোমার মা'কে খাওয়াবে। তাহলে তোমার মা সেরে উঠবে।' বলেই তিনি আবার ধ্যানে মগ্ন হলেন।

মৃদুল ঋষিবাবাকে প্রণাম করে বেলপাতা নিয়ে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এল। নৌকায় চড়ে ফিরে এল প্রথম ঋষিবাবার কাছে। মৃদুলকে দেখে তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করে বলছেন, 'তুমি জয়ী হয়েছো। তাই সন্তুষ্ট হয়ে আমি তোমাকে এই ছোট কাগজের নৌকা দিচ্ছি। প্রয়োজন হলে এই নৌকোতে ভেসে চলে এস আমার কাছে।'

তিনি আরও বললেন, 'ওই গুহার মধ্যে যে সোনাদানা ছিল, তুমি যদি তাতে হাত দিতে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই ভস্ম হয়ে যেতে। সততাই তোমাকে রক্ষা করেছে।'

ঠিক সময়েই মৃদুলের ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে সে বিছানায় উঠে বসল। কঠিন বাস্তব তাকে অট্টহাস্য করে উপহাস করতে থাকে। কোথায় ঋষিবাবা, কোথায় বা বেলপাতা, কোথায় বা কাগজের নৌকা। মৃদুল দেখে অসুস্থ মা অকাতরে তারই পাশে ঘুমোচ্ছেন। মুখে তাঁর হাসি। মৃদুল কিন্তু সতেজ। যেন ইঙ্গিত বলছে, অনেক অসুখই তো সারে না। তাতে কী হয়েছে। তুই যে এমন সর্বস্ব পণ করে আমার নিরাময় চাইছিস এটাই কি কম কথা!

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

ভূতের গল্প

নিশির টানে বাঁশবাগানে

তপনকুমার দাস

অন্ধকারের আঁচল আলোর ছুরিতে চিরে চিরে এগিয়ে চলে জীপটা। রাতের শুনসান নীরবতার মাঝে চলমান গাড়ির শব্দ অনেকটা মানুষের গোঙানির মতো আছড়ে পড়ে কানে। সামনে আলোর রোশনাইয়ে পথ ঝলসে থাকলেও ডাইনে বাঁয়ে নিকষ অন্ধকারের দাপট। সেই দাপট আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে রাস্তার দু'পাড়ে সার সার বেড়ে ওঠা 'আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ কিংবা বাবলা গাছের ঝোপের দৌলতে। চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাঁয়ে কিংবা ডাইনে তাকালে ছম্ ছম্ করে ওঠে গায়ের ভিতরটা। মাথার ভিতর শির শির করে ওঠে ভয়ের ঘুণপোকা। ছোটখাট গাছগুলোকে মনে হয় বড়ো গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকা এক একটা আস্ত কঙ্কাল।

এখন কি অমাবস্যা চলছে?

জানি না। পঞ্জিকা পড়ে তো আর রাস্তায় নামিনি—সুনীলের প্রশ্নের উত্তরে ঝন্ ঝন্ স্বরে জানিয়ে দেয় বিতান।

তা ঠিক বলেছেন। ঠাক্‌মা দিদিমার আমল তো আর নেই, স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে ড্রাইভার রামশরণ যোগ দেয় সাহেবদের আলোচনায়।

মানে? এতক্ষণের ঝিমুনি ভাঙিয়ে পিছনের সিট থেকে সামনের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় নেপাল ঘোষ।

মানেটা জলের মতো সোজা। পঞ্জিকা টঞ্জিকা নয় গেরস্থের বাড়িতে এখন শুধু কেরিয়ার ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। রামশরণের বদলে নিজেই শুনিয়ে দেয় বিতান।

রোখকে! রোখকে! রোখকে—চলন্ত গাড়ির ইঞ্জিনের কাতরানি ছাপিয়ে চিৎকার করে ওঠে সুনীল। কিন্তু না, গাড়ি থামে না। তিন গোত্তা খেয়ে ঢেউয়ের মতো দুলতে দুলতে এতক্ষণের পিচ মোড়া রাস্তা ছেড়ে ভাঙা থ্যাবড়ানো টুকরো ইটের রাস্তায় নামে রামশরণের জীপ।

অন্ধা হ্যায় ক্যায়া? বিরক্তি ঝরায় বিতান।

কালা কাহিকা। কান মে শুনাই নেহি দেতা? বিতানের বিরক্তির সানাইয়ে পোঁ ধরে সুনীল।

হামারা মেরুদন্ড কা হাড় নিশ্চয় টুট গিয়া—করুণ সুরে জানিয়ে দেয় নেপাল ঘোষ।

গাড়ি আর যাবে না—সাহেবদের হিন্দি প্রশ্নের চাপান উতোর সহজ সরল বাংলা ভাষায় ভেঙে সাফ জানিয়ে দেয় রামশরণ। ছাপরা জেলায় আদি বাড়ি হলেও রামশরণের জীবন কেটেছে উত্তর কলকাতায়। পড়াশুনা করেছে বাংলা স্কুলে। বাংলা মাধ্যমে। সুতরাং সাহেবদের হিন্দি প্রশ্ন তোয়াক্কা করতে তার বয়েই গেছে।

কেন? কেন? গাড়ি যাবে না কেন? রামশরণের পিছনের সিটে বসে এক সঙ্গে, এক সুরে প্রশ্ন ছড়ায় সুনীল আর বিতান।

সামনে দেখুন—

কী? শিউরে ওঠে বিতান। সামনে পিছনে ডাইনে বায়ে, চারদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। থই থই অন্ধকারের বাঁধ ভাঙা বন্যা।

হেড লাইট নিভে গেছে—অবুঝ শিশুর সুরে অকপটে গাড়ি না যাওয়ার কারণ জানিয়ে দেয় রামশরণ।

কেন? হেডলাইট নিভে গেল কেন? এতক্ষণ তো ঠিকই ছিল? একটু আগেই গাড়ির ঝাঁকুনিতে চোট লাগা কোমরে ব্যথা ভুলে জানতে চায় নেপাল ঘোষ।

লুজ কানেকশান—কারণ জানিয়ে ছোট্ট উত্তর দেয় রাম।

বনেট খুলে একবার দেখলেই হয়—পরামর্শ দেয় সুনীল।

দেখে লাভ নেই। তাছাড়া টর্চ কোথায় পাবো? সিটে হেলান দেয় রামশরণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে অন্ধকার বাতাসে—কতদিন বলেছি গাড়িটা গ্যারেজে দিন। সাহেব কি আমার কথা শুনেছেন।

সাহেব কি এখনও ঘুমোচ্ছেন? ফিস্ ফিস্ শব্দে সুনীল আর রামশরণের কানে প্রশ্ন ঢেলে দেয় বিতান।

না, মোটেও ঘুমাচ্ছি না—এতক্ষণ পরে রামশরণের পাশে বসা সেনগুপ্ত সাহেব গম্ভীর সুরে জানিয়ে দেন নিজের অবস্থান—তোমাদের বকবকানি আর ইঞ্জিনের আওয়াজে কি ঘুমনোর উপায় আছে। চিন্তা করছি, চন্দনপুরে পৌঁছে...।

কিন্তু স্যার, গাড়ি যে বিগড়ে গেছে। হেড লাইট জ্বলছে না। চারদিকে যা অন্ধকার—সন্দেহ প্রকাশ করে আসল খবরটা পরিবেশন করে দেয় নেপাল ঘোষ।

সাইড লাইট কিংবা ইন্ডিকেটর ল্যাম্প জ্বালিয়ে চলো—নেপাল ঘোষ নয়, রামশরণকে আদেশ দেন সেনগুপ্ত সাহেব। রাত দুটো আড়াইটের মধ্যে চন্দনপুর পৌঁছাতেই হবে।

হাইওয়ে ছেড়ে হঠাৎ তুমি এই খানাখন্দের রাস্তায় নামতে গেলে কেন? রামশরণের উপর ওপরওয়ালার মেজাজ চাপিয়ে দেয় বিতান।

এটাই তো চন্দনপুর যাওয়ার বাইপাস। শর্টকাট রাস্তা, বলতে বলতে ক্লাচে পা চেপে চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করার চেষ্টা করে রামশরণ। সেনগুপ্ত সাহেবের কথা মতো ইন্ডিকেটর ল্যাম্প জ্বেলে দেয়। অন্ধকারে জ্বলা নেভা জোনাকির চেয়ে খানিকটা বেশি আলো ছড়িয়ে দপ দপ করতে থাকে ল্যাম্প দুটো কিন্তু ইঞ্জিন, না ইঞ্জিন চালু হয় না মোটেও।

ঠেলতে হবে স্যার—সকলের উৎকণ্ঠা আর নীরবতা ভেঙে দেয় রামশরণ।

এই অন্ধকারে খানাখন্দের মধ্যে নেমে গাড়ি ঠেলতে হবে, বিপদের অকূল পাহাড়ে পড়ে যায় নেপাল ঘোষ।

গরমকাল। দুদিকে ঝোপ-জঙ্গল। অন্ধকারে সাপ-খোপ থাকা অস্বাভাবিক নয়—ভয়ে হিম হয় বিতান।

আমার কব্জির ব্যথাটা কাল থেকে ভীষণ বেড়েছে—ইয়া লম্বা এক হাই তোলে সুনীল সামন্ত।

থাক, তোমাদের কাউকে কিচ্ছু করতে হবে না। টর্চ লাইটটা দাও তো রামশরণ। আমিই ঠেলছি—বলতে বলতে দরজা খুলে অন্ধকারে নিজের অর্ধেক শরীর গাড়ির বাইরে বের করে দেয় সেনগুপ্ত সাহেব।

না স্যার, আপনি বসুন। আমরা থাকতে আপনি ঠেলবেন গাড়ি? অফিসে জানাজানি হয়ে গেলে মান সম্মান কি কারও থাকবে, সাপ-খোপের ভয় শিকেয় তুলে অন্ধকার রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বিতান। মোবাইল ফোনে

আলো জ্বেলে পিছন পিছন রাস্তায় নামে সুনীল আর নেপাল ঘোষ।

একটু ঠেলতেই গাঁক গাঁক শব্দে চালু হয়ে যায় গাড়ির ইঞ্জিন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে ওঠে হেড লাইটের আলোও।

হুররে! আনন্দে গলতে গলতে গাড়ির ভিতর উঠে আসে সুনীল, বিতান আর নেপাল ঘোষ।

রামশরণের পায়ের চাপে চলতে শুরু করে গাড়ি। চলা ঠিক নয়, বরং বলা ভালো ঢেউয়ের বুকে উথাল পাথাল দুলতে থাকা ডিঙি নৌকোর মতো কাঁপতে থাকে। তা কাঁপুক। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় গাড়ি অমন একটু কাঁপে বই কি।

গাড়ি চালু হতেই আবার চোখ বন্ধ করে দেয় সেনগুপ্ত সাহেব। ডুব দেয় চিন্তার গভীরে। খবর আছে চন্দনপুর রোড ওভার ব্রিজের পাইলিংয়ে কন্ট্রাকটর সিমেন্ট কম দিচ্ছে। হাতে নাতে ধরতেই এই রাত অভিযান। কিন্তু রাস্তার যা হল, কতক্ষণে পৌঁছাতে পারবে কে জানে। ভাবতে ভাবতে ডান দিকের চোখ খুলে বাইরে মেলে দেয় সেনগুপ্ত সাহেব। বাঁ চোখ তখনও আধো ঘুমের কোলে। সেনগুপ্ত সাহেব সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যিনি এক চোখ খুলে অন্য চোখ বন্ধ করে ঘুমোতে পারে। কিন্তু না, বাঁ চোখ বন্ধ করে রাখার সাধ্যি হয় না একটুও। ডান চোখের পরিধিতে প্রকৃতির যে পরিবেশ ধরা পড়ে তাতে দুই চোখই চড়ক গাছে উঠে যায় সেনগুপ্ত সাহেবের। নিকষ অন্ধকার। দু-পাশে ঘন বাঁশবাগান। বাঁশবাগান চিরে সরু ইটের ভাঙাচোরা রাস্তা। হেডলাইটের আলোতেও তেমন জোর নেই। মাঝে মাঝে শকুন, পেঁচা, রাতচরা পাখি আর ঝিঁঝি-র ডাক। দেখে শুনে শিউরে ওঠে সেনগুপ্ত সাহেব। কাঁটার মতো খাড়া হয় গায়ের রোমকূপ। ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে মাথার ভিতর।

ভয় জড়ানো আড়চোখে একবার দেখে নেয় রামশরণের চেহারা। সরকারি গাড়ির ড্রাইভার নয়—রামশরণকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্য। ভূতের মতো চেহারা, নির্বোধ অতি ঘোর। মনে মনে সন্দেহ হয়। ডানদিকে ড্রাইভারের সিটে বসা মানুষটা রামশরণ তো?

রামশরণকে ছেড়ে পিছনে ফেরে সেনগুপ্ত সাহেব। তিন তিনজন সহকারী বিতান, সুনীল আর নেপালের চেহারা ঠিকমতো ঠাহর হয় না অন্ধকারে। স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো ঘুমের ঘোরে ঢুলছে, না জেগে জেগে ইষ্টনাম জপে ব্যস্ত আছে বোঝা যায় না। রক্ত মাংসের জীবন্ত মানুষ, না জোর করে বসিয়ে রাখা শবদেহের সারি? কিছুই বুঝতে পারে না সেনগুপ্ত সাহেব।

আর কতদূর? রামশরণের কানে ছোট্ট প্রশ্ন ঢেলে দেয় সেনগুপ্ত সাহেব।

বলতে পারব না স্যার। রাস্তার যা হাল শেষপর্যন্ত পৌঁছাতে পারব কিনা জানি না—খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দে উত্তর শুনিয়ে দেয় বিরক্ত রামশরণ—এবার গাড়ি গ্যারেজে না দিলে আমি কিন্তু আর রাতে বেরুতে পারব না।

দে না, দে। এই বাঁশবাগানের ভিতর গাড়ি নামিয়ে দে। কথার কি ছিরি। কিছু না বলতে বলতে একেবারে মাথায় চেপে বসেছে। সুনীলবাবু, কালই ফাইল প্রসেস্ করবেন, রামশরণকে ধমকে দিয়ে সুনীলকে আগাম আদেশ দিয়ে দেয় সেনগুপ্ত সাহেব।

আহ! রামশরণ, কি চালাচ্ছিস? একটু আগে কোমর ভেঙেছিস, এখন ঘাড় যাবে। কাতরে ওঠে নেপাল ঘোষ।

এবার থেকে যা কি রেড করার দিনের বেলায় করবেন স্যার—কোমরে হাত চেপে গোঙানীর সুরে পরামর্শ দেয় বিতান—রামশরণকে নিয়ে রাতে বেরুনো আর যমের দুয়ারে যাত্রা একই ব্যাপার। বিতানের কথা শেষ হতে না হতেই খ্যাঁচ। গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয় রামশরণ।

কি হল? অবাক হয় সেনগুপ্ত সাহেব—গাড়ি দাঁড় করালি কেন?

আমি চালাতে পারব না, সাফ উত্তর শুনিয়ে ব্যাক রেস্টে হেলান দেয় রামশরণ।

কেন? কেন? উদ্বিগ্ন হয় সেনগুপ্ত সাহেব।

আমি গাড়ি চালালে তো যমের দুয়ারে যেতে হবে। তার চেয়ে বরং বিতানবাবু চালান। আমরা স্বর্গে যাই—অভিমান মনের ভিতর না চেপে মুখে প্রকাশ করে দেয় রামশরণ—আপনি গাড়ি চালাতে পারেন। লাইসেন্সও আছে। তাছাড়া রাতদুপুরে এই ভূতের গলিতে কেউ আপনার লাইসেন্স দেখতে চাইবে না।

আহ্, রামশরণ! ইন সাব অর্ডিনেশনের একটা সীমা আছে। আমি কালই তোমায় চার্জসীট দেব—বিতান নয়, এবার গর্জে ওঠে সেনগুপ্ত সাহেব নিজে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। দরকার নেই চন্দনপুর যাওয়ার—সেনগুপ্ত সাহেবকে টপকে পরামর্শ দেয় সুনীল

বাগচী।

আমার কাছে কুড়োল, কাটারি কিছুই নেই, জবাব শোনায় নির্বিকার রামশরণ।

কুড়োল কাটারি দিয়ে কি করবে? রামশরণের হেঁয়ালি বুঝতে পারে না সেনগুপ্ত সাহেব।

বাঁশবাগান কেটে সাফ করে রাস্তা তৈরি করতে হবে, একই ভঙ্গীতে জানিয়ে দেয় রামশরণ।

কলেজ লাইফে অনেক বাঁশ কেটেছি। আমার মামার বাড়িতে বাঁশবাগান ছিল। বাঁশ কাটার কায়দা আছে। মাথার ঠিক ওপর থেকে কাটতে হয়। সাবধানে, নইলে ঘাড়ের উপর এসে পড়বে। তাছাড়া বাঁশবাগানে সাপ থাকে। বিশেষ করে দাঁড়াস সাপ। ইয়া লম্বা আর—

যাক তোমাকে আর বিন্যাস করতে হবে না, শুকনো গলায় নেপাল ঘোষকে ধমক দেয় সেনগুপ্ত সাহেব। তারপর হাত রাখে রামশরণের পিঠে—চল বাবা, আস্তে আস্তে চল। রাত দুপুরে অচেনা অজানা এই বাঁশবাগানের ভিতর দাঁড়িয়ে তর্কের তরজা করে কোনও লাভ হবে? ভূত প্রেত না হোক, ডাকাত ঠ্যাঙাড়েদের পাল্লায় পড়লে তো জানে প্রাণে মরতে হবে। চল ধাবা, চল! কেসটা ধরতে পারলে তোকে একটা রিওয়ার্ড দিয়ে দেব।

মাইনের পুরো টাকাটাই আমার পকেটে—ডাকাতের ভয়ে নরম হয় রামশরণ। গাড়ি চলা শুরু হয় ঢেউয়ের তালে। গাড়ির ভিতর শুনসান নীরবতা। সেনগুপ্ত সাহেব থেকে শুরু করে নেপাল ঘোষ পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছে সামনে সমূহ বিপদ। আর এই বিপদ উদ্ধারের একমাত্র কান্ডারী রামশরণ। সুতরাং রামশরণকে কোনওমতেই চটানো উচিত হবে না।

মনের ভিতরের ভয় তাড়াতে চোখ বন্ধ করে সেনগুপ্ত সাহেব।

ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়ে ডাক্তারি পড়লেই ভালো হতো। কুড়ি বছর আগের ছাত্রজীবনের স্মৃতিতে ঝাঁপ দেয় সেনগুপ্ত সাহেব। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে ডাক্তারি পড়াই তো শুরু করেছিল সুনন্দ। বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে। কিন্তু না, টিকতে পারেনি। তিনমাস পরেই সব পাঠ চুকিয়ে বাধ্য হয়েছিল বাড়ি ফিরতে। গায়ে তখন একশো চার ডিগ্রি জ্বর। বেহুঁস। মাকে মাঝে পাগলের মতো ভুলভাল বকুনি সঙ্গে তড়কা।

ছেলের অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেছিলেন সুমিত সেনগুপ্ত। কান্নায় বুক ভিজিয়েছিলেন মা। ঠাকমা ছুটে ছিলেন বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে—ভূত ছাড়ানোর জলপড়া আনতে। অসুখের কারণ জানার অনেক চেষ্টা করেছিলেন সুমিতবাবু। হোস্টেলের সিনিয়র ছাত্র থেকে শুরু করে সুপারিনটেনডেন্ট, পিয়ন থেকে শুরু করে কুক ঝাড়ুদার। জিজ্ঞাসাবাদ করতে বাকি রাখেননি কাউকেও। কিন্তু না জানতে পারেনি কিছুই—ছেলের সারা শরীরে দগদগে ফোস্কা কিংবা মাথা নেড়া করার কারণ।

দিন পনের যমে মানুষে টানাটানি করার পর সুস্থ হয়েছিল সুনন্দ। কিন্তু চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ মেলাতে সময় লেগেছিল অনেক অনেক দিন। প্রায় ছয় মাস।

এখন এই মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে সেই দৃশ্য ভাবতে ভাবতে এতদিন পরে আবার নতুন করে আঁতকে ওঠে সেনগুপ্ত সাহেব। মর্গের ছোট্ট খুবড়িতে সেদিন সারারাত বন্দি থাকতে হয়েছিল সুনন্দকে। ওয়ারিস, বেওয়ারিস ছ' সাতটা পচাগলা বিকৃত লোকের সঙ্গে রাত্রিবাস। একা।

দোহাই আপনাদের, আমাকে ছেড়ে দিন—মর্গের দরজা দু'হাতে গায়ের জোরে চেপে হাউ হাউ কান্নায় চোখ ভাসিয়েছিল সুনন্দ।

সাহস, বুঝলে খোকা, তোমার সাহস বাড়ানোর জন্যেই তোমাকে মর্গে রাখা। ডাক্তারি পড়তে এসেছ। সারাজীবন কত লাশ ঘাঁটতে হবে তা ইয়ত্তা নেই। এখনই যদি ঘাবড়ে যাও, ভবিষ্যতে কি করবে? গলায় একরাশ মধু ঢেলে বুঝিয়েছিল থার্ড ইয়ারের অনিন্দ্যনন্দন।

ভূত, ওই ঘরে ভূত আছে—কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল সুনন্দ—ওরা আমার ঘাড় মটকে দেবে।

ভূত ভবিষ্যত বাদ দিয়ে কি ডাক্তার হওয়া যায় খোকা? ধমক দিয়েছিল হস্টেলের মনিটর জীবন সামন্ত।

আমি ডাক্তার হতে চাই না। কাল সকালেই হোস্টেল ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাব—মর্গের ভিতর থেকে উগরে আসা পচা গন্ধ কোনওমতে সামলে মিনতি করেছিল সুনন্দ।

সকাল পর্যন্ত ঘাড় ঠিক থাকলে নিশ্চয়ই যাবে—বলেই এক ধাক্কায় ঘরের ভিতর সুনন্দকে ছুঁড়ে ফেলেছিল অভিনন্দন। তারপর অট্টহাসিতে আকাশ ফাটিয়ে ঝনাৎ বন্ধ করেছিল মর্গের দরজা। আর সুনন্দ? আচমকা ধাক্কায় তাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে পড়েছিল কোনও এক লাশের উপর।

সুনন্দের কান্না আর চিৎকারে শেষপর্যন্ত মায়া হয়েছিল

হারির। ডোম হলেও তার বুকের ভিতর ছিল দয়া মায়া ভালোবাসা। কলেজের দাদাদের এমন নিষ্ঠুর র‍্যাগিং পছন্দ হয়নি তার। ঘণ্টাখানেক পরে চুপিচুপি উদ্ধার করেছিল সুনন্দকে। সারারাত লুকিয়ে রেখেছিল নিজের ছোট্ট খুপরি ঘরে।

সেই রাতেই উদোম জ্বর হয়েছিল সুনন্দের। হারি আর হারির বউয়ের হাজার অনুরোধও হোস্টেলে ফিরতে রাজি হয়নি সে। অগত্যা ডাঃ ব্যানার্জীকে ডেকে এনেছিল হারি। কিন্তু না কোনও চিকিৎসাই কমাতে পারেনি সুনন্দের জ্বর।

ওফ! পুরোনো সে দিনের কথা ভাবলেই শিউরে ওঠে সেনগুপ্ত সাহেব।

কি হল স্যার? জানতে চায় রামশরণ।

না, কিছু না—রামশরণকে এড়িয়ে যায় সেনগুপ্ত সাহেব। জানতে চায়—আর কতক্ষণ লাগবে?

ঠিক বুঝতে পারছি না, জানিয়ে দেয় উৎকণ্ঠিত রামশরণ। পনেরো বছরের ড্রাইভারি জীবনে এমন বিচিত্র রাস্তায় কোনওদিন গাড়ি চালায়নি সে।

একটা গন্ধ পাচ্ছিস? পচা শবের গন্ধ? নাকে শব্দ করে কয়েকবার প্রশ্বাস টেনে নেয় সেনগুপ্ত সাহেব।

কই না তো—ঠাহর করার চেষ্টা করে রামশরণ।

তোমরা, তোমরা কোনও গন্ধ পাচ্ছো? ঘাড় ঘুরিয়ে বিতান, সুনীল আর নেপালের কাছে জানতে চায় সেনগুপ্ত সাহেব।

বাঁশবাগান আর মাটির রাস্তার একটা আলাদা গন্ধ থাকে। সেই গন্ধটাই হয়তো আপনার নাকে লাগছে স্যার—জানিয়ে দেয় বিতান।

কেমন একটা মন ভোলানো গন্ধ। সঙ্গে পাট পচানো ডোবা থাকলে তো আর কথাই নেই—নদীয়া জেলার অজ পাড়া গাঁ জাহাঙ্গীরপুরে কাটানো ছেলেবেলার স্মৃতি মনে পড়ে নেপাল ঘোষের।

আমার একটা গান গাইতে ইচ্ছে করছে। গাইব স্যার? সেনগুপ্ত সাহেবের অনুমতির অপেক্ষা না করে গলা ছাড়ে সুনীল—গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ—

আবার ঘ্যাচ! গায়ের জোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামায় রামশরণ।

কি রে? আবার কি হল? আচমকা ঝাঁকুনি সামলে চানতে চায় সেনগুপ্ত সাহেব।

ওই দেখুন স্যার—উইন্ডস্ক্রীনের সামনে—ইশারা করে রাম।

কারা ওরা? মানুষ? এত মানুষ এই গভীর রাতে কি করছে ওখানে? হর্ন বাজা, হর্ন—বিরক্ত নয়, অবাক হওয়ার সীমা পরিসীমা ছাড়ায় সেনগুপ্ত সাহেব।

শুয়ে আছে। ঘুমাচ্ছে, এতক্ষণে পর দরজা খুলে রাস্তায় নামে রামশরণ। সামনে ছোট্ট কালভার্ট। কালভার্টের সিমেন্ট বাঁধানো স্লাবের উপরে শুয়ে আছে সারি সারি সব মানুষ। খালি গায়ে কঙ্কালসার চেহারা। আহা, বেচারা। মাথার উপর এক টুকরো ছাদও জোটেনি। চন্দনপুর ব্রিজে লেবারের কাজ করতে এসেছে হয়তো—মনে মনে ভাবে

সেনগুপ্ত সাহেব, সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত কাটাতে শেষপর্যন্ত এই কালভার্ট বেছে নিয়েছে। এখনই যদি ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি নামে, কোথায় যাবে ওরা। কালই পদ্মনিধিবাবুকে ফোন করবে সেনগুপ্ত সাহেব। বলবে, এত বড়ো কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন। লেবারদের জন্যে কিছু একটা করুন। অন্ততঃ হোগলাপাতার ঘর বানিয়ে দিন কয়েকটা। খোলা আকাশের নীচে এঁদো নালা আর বাঁশবাগানে কি মানুষ ঘুমোতে পারে? চড়ুই পাখির মতো চেহারার মশার ঝাঁক ছেঁকে ধরেছে ওদের সারা শরীরে। এরপর তো ডেঙ্গু কিংবা ম্যালেরিয়া হবে।

এই ওঠ! ওঠ বলছি—চিৎকারে গলা ফাটায় রামশরণ।

না, বেশিক্ষণ হাঁক ডাক করতে হয় না। সার সার মানুষ কঙ্কালের মিছিল হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘুম চোখে ঢুলতে ঢুলতে নেমে যায় কালভার্ট ছেড়ে। গাড়ির পথ সুগম করতে।

তোমরা কারা? এত রাতে এখানে শুয়ে আছ কেন? একজন বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করে সেনগুপ্ত সাহেব।

কবর ঘরে গরমে টিকতে পারিনে, খন্ খন্ উত্তর দেয় বৃদ্ধ, বাঁশবাগানের হাওয়ায় শুয়ে প্রাণ জুড়িয়ে নিই।

কবর ঘর? মানে? তোমরা থাকো কোথায়? জেনে বুঝে নিতে চায় রামশরণ। আর ঠিক তখনই কানে ভেসে আসে শিশুর গোঙানির মতো কান্নার স্বর।

আর থাকা? এই পাড়াতেই থাকি। ভাগাড়ে। কঙ্কালসার হাতের হাড় সম্বল তর্জনী তুলে ধরে বৃদ্ধ।

আপনারা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন, রাস্তা ছেড়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে বিতান, সুনীল, নেপালদের উদ্দেশ্যে জানতে চায় সেনগুপ্ত সাহেব—জীবন দেখুন, জীবন। মানুষ কি ভাবে বেঁচে বর্তে আছে ভাবতে পারেন।

গন্ধ স্যার! গন্ধ, নাকে রুমাল চাপা দেয় নেপাল ঘোষ।

ভূ-উ-ত! স্যার, ওখানে ভূ-উ-ত—কাতর স্বরে জানায় সুনীল।

আমার হাত কাঁপছে স্যার। পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। আমি আর গাড়ি চালাতে পারব না স্যার, হাউ হাউ কান্নায় মুষড়ে পড়ে রামশরণ—আমি কালই চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশের বাড়ি চলে যাব। ধানক্ষেত্রে লাঙল চালাব।

আহ! কি যা তা বকছো সব? ধমক দেয় সেনগুপ্ত সাহেব।

যা তা নয়, ওরা ঠিকই বলছে স্যার, এতক্ষণে গলায় স্বর ফোটে বিতানের—ওই দেখুন। এক নিমেষে অতগুলো মানুষ কোথায় উধাও হয়ে গেল?

সত্যিই তো! কালভার্টের উপর অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশজন মানুষ শুয়ে ছিল। তারা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় গেল? হেড লাইটের আলোয় যত দূর দেখা যায় কোথাও কেউ নেই। আর সেই বৃদ্ধ? ভাবতে ভাবতে শরীর ভারী হয় সেনগুপ্ত সাহেবের।

ভূত স্যার। নির্ঘাৎ ভূতের খপ্পরে পড়েছি আমরা, কান্না থামে না রামশরণের—ওই শুনুন।

আবার এক ঝাঁক শিশুর কান্না আছড়ে পড়ে সেনগুপ্ত সাহেবের কানে। নাকে ধাক্কা মারে দমকা হাওয়ায় ভেসে আসা পচা গন্ধ। ঠিক বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজের মর্গের গন্ধের মতো। কাছে পিঠে তবে কি কোনও ভাগাড় আছে? কিংবা কবরখানা?

চল, রামশরণ, জোরে চালিয়ে পালিয়ে চল—ভয় বিহ্বল কাঁপা কাঁপা গলায় নির্দেশ দেয় সেনগুপ্ত সাহেব।

জল, জল—পিছন থেকে বিতান না সুনীল, কার কাতরানি বোঝা যায় না। চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে রামশরণ। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোরাস চিৎকারে অন্ধকারের বাতাস ভারী হয়ে যায়। রামশরণের গাড়ি লাফিয়ে পড়ে কালভার্টের নীচে-গর্তে। কালভার্টের ওপারে রাস্তার লেশমাত্র নেই জানা ছিল না কারও।

সবার আগে জ্ঞান ফেরে নেপাল ঘোষের।

বাঁশবাগানের মাথার উপর সকালের আলো ঝল্মল্ করছে। আলো ছায়ায় মায়াবি এক পরিবেশ। বিতান আর সুনীল একে অপরের কোলে পড়ে আছে মাথা গুঁজে। সেনগুপ্ত সাহেবের অর্ধেক শরীর ঝুঁকে আছে দরজার বাইরে। স্টিয়ারিং-এর উপর মাথা ঠেকিয়ে বেহুঁশ হয়ে আছে রামশরণ। পিছনের দরজা খুলে নীচে নামে নেপাল ঘোষ। ব্যথায় ভারী হয়ে আছে সারা শরীর। মাথার ভিতর টিপ টিপ যন্ত্রণা। যতদূর চোখ যায় শুধু বাঁশবাগান আর বাঁশবাগান। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ। কব্জি উলটে ঘড়ি দেখে নেয় নেপাল—ছ'টা দশ।

স্যার! স্যার—সেনগুপ্ত সাহেবের গায়ে মৃদু ধাক্কা দেয় নেপাল ঘোষ।

হুঁ, জ্ঞান ফিরে আসে সেনগুপ্ত সাহেবের। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়ে থাকে নেপাল ঘোষের

দিকে—চন্দনপুর আর কত দূরে?

জানি না। আমাদের গাড়ি খাদে পড়ে গেছিল। ভাগ্যিস উলটে যায়নি—ভাগ্যকে মনে মনে ধন্যবাদ জানায় নেপাল।

কী সব্বোনাশ! ধড়ফড় উঠে বসে সেনগুপ্ত সাহেব।

আর ঠিক তখনই পিছনে শোনা যায় ভারী সব বুটের শব্দ। খাঁকি পোষাক পরা ছ'জন পুলিশ। কারো হাতে বন্দুক, কারো বেতের লাঠি। সঙ্গে রাতে দেখা সেই বৃদ্ধের মতোই চেহারার মানুষ।

কারও কোনও আঘাত লাগেনি তো? অবাক সেনগুপ্ত সাহেবের নীরবতা ভেঙে জানতে চায় এস আই গোবিন্দ গোপাল গোপ। বুকের উপর নেমপ্লেটে লেখা নাম এবং পদের পরিচয় জেনে নিতে দেরি হয় না নেপাল ঘোষের।

না, মানে, আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি, কবুল করে সেনগুপ্ত সাহেব—চন্দনপুর যাওয়ার কথা ছিল।

সে তো হাইওয়ে থেকে ডানদিকে মাত্র দু'মাইলের পথ, পুলিশের জেরা শুরু করে গোবিন্দগোপাল—এই করবখানার রাস্তায় এলেন কেন?

জানি না। ঠিক বলতে পারব না, গাড়ি ছেড়ে খাদের মাটিতে নেমে দাঁড়ায় সেনগুপ্ত সাহেব।

নিশির টান। তেনারা টেনে এনেছেন। আপনাদের ভাগ্যি ভালো তাই কোনও ক্ষতি হয়নি। কবরডাঙার এই খাদে পড়ে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই—গোবিন্দ গোপালবাবুদের সঙ্গে আসা বৃদ্ধ মানুষটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—ভোরবেলায় হাটে যাওয়ার পথে চাকার দাগ দেখেই বুঝলাম আবার একটা গাড়িকে তেনারা খাদে এনে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম থানায়।

রাতে আপনি ওই কালভার্টের উপর শুয়ে ছিলেন না? সন্দেহ প্রকাশ করে সেনগুপ্ত সাহেব।

না, না। উনি নন। আপনারা যাকে দেখেছেন তিনি ওর যমজ ভাই। মাস ছয়েক আগে এই খাদের নীচে বাইক অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন।

কালভার্টের উপর যারা শুয়ে ছিল, তারা? কখন যে রামশরণের হুঁস ফিরে এসেছে খেয়াল করেনি সেনগুপ্ত সাহেব কিংবা নেপাল ঘোষ।

ভূত! কবরখানার অশরীরি আত্মা সব। শুনেছি অমাবস্যার রাতে ওরা নাকি কবর ছেড়ে এসে কালভার্টের উপরেই শুয়ে থাকে—বুঝিয়ে দেন গোবিন্দগোপালবাবু।

কি সব্বোনাশ! শেষপর্যন্ত আমরা ভূতের খপ্পরে পড়েছিলাম—ঘাড়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠে বিতান।

পুলিশদাদা, প্লিজ! আমাদের একটু বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন—দু'হাত জোড় করে গাড়ির ভিতর বসেই মিনতি করে সুনীল—আমরা আর কোনওদিন চন্দনপুরে আসব না। প্লিজ।

এত ঘাবড়ে গেলে চলবে? সরকারি চাকরি করতে গেলে অমন অনেক ভূতের মোকাবিলা করতে হয়—নিন ভাই, গাড়ি স্টার্ট করুন, রামশরণকে নির্দেশ দেয় গোবিন্দ গোপাল।

কিন্তু গাড়ি উঠবে কেমন করে? চেষ্টা না করেই হতাশ হয় রামশরণ।

উঠবে, উঠবে ঠিক উঠবে। চেষ্টা করুন, হুম হুম মাথা নেড়ে পরামর্শ দেয় গোবিন্দগোপাল—ডান দিকে কাটিয়ে অ্যাক্সিলেটরে পুরো চাপ দিন।

গোবিন্দগোপালের কথা মতো অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিতেই গাড়ি গ্যাঁক গ্যাঁক শব্দে উঠে আসে কালভার্টের উপর। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে সেনগুপ্ত সাহেব—ধন্যবাদ! অনেক অনেক ধন্যবাদ। শেষ একটা কথা জিজ্ঞাসা করব গোপালবাবু?

হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন না—

কাল রাতে আমরা শিশুর কান্না শুনেছিলাম—

ও, এই কথা—বলেই অট্টহাসিতে সকালের বাঁশবাগান ফাটায় এস আই গোবিন্দগোপাল—শকুনের বাচ্চা মশাই। শকুনের বাচ্চার ডাক অবিকল শিশুদের কান্নার মতো। দু'একটা বাচ্চা নিয়ে যাবেন নাকি, বাড়িতে পোষার জন্যে?

ঠিকই বলেছেন। বিপাকে পড়লে জানা কথাও হারিয়ে ফেলে মানুষ, মাথা নাড়ে সেনগুপ্ত সাহেব।

হরিভক্তবাবু। আপনি একটু এদের সঙ্গে যান। হাইওয়েতে পৌঁছে দিয়ে থানায় চলে যাবেন, সঙ্গে আসা কনেস্টবলকে নির্দেশ দেয় গোবিন্দগোপাল।

পিছনের দরজা খুলে হরিভক্তবাবুকে গাড়িতে তুলে নেয় নেপাল ঘোষ। ভাঙা ইটের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে দেয় রামশরণ। ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করে বিতান আর সুনীল।

ছবি : শংকর বসাক

মজার গল্প

বাঘ নয়, আমাদের চণ্ডীচরণ

নীতীশ বসু

ছাদে উঠেই ব্রত জলের ট্যাঙ্কের পাশে একটা বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল। কী করবে ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ও শুনতে পেল—এদিকে এসো। ব্রত এদিক ওদিক তাকাল। কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। ভয়ে ভয়ে আবার বাঘের দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবল ঐ সময় নীচে নামাটাও ঠিক হবে না। সন্ধের সময় একা একা ছাদে আসাটা ঠিক হয়নি। দিদুমার মুখেই শুনেছে সন্ধের সময় ভূত প্রেত নানা বেশে ঘোরাফেরা করে। ওর দিদুমাই একদিন কথায় কথায় বলেছিল, এ দিকে নাকি এক সময় নদী ছিল, গভীর বন ছিল। এখন সে সবের চিহ্ন নেই। মানুষ বন জঙ্গল সাফ করে এক একজন আকাশ ছোঁয়া বাড়ি বানিয়েছে। এখন যেখানে শাক সব্জি মাছের বাজার সেখানে এক সময় সবুজ মাঠ ছিল। দিদুমার মুখে আরও শুনেছে এক সময় নাকি মানুষকে মেরে এসব জায়গায় পুঁতে রাখত। বাবা কী এসব কিচ্ছু জানত না? দিদুমাও কেন বাবাকে বাধা দেয়নি? এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আবার শুনতে পেল—কি হল ব্রত এদিকে এসো।

ব্রত এবার সত্যি সত্যি ভয় পেল। দৌড়ে সিঁড়ির দিকে যেতেই শুয়ে থাকা বাঘটা ছুটে এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কি হল ব্রত কোথায় পালাচ্ছো? আমি তো তোমাকেই ডাকছি। চল ওদিকে বসি। তাহলে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। বাঘ মানুষের মতো কথা বলতে পারে? মনে মনে ভাবলো বাঘ নয় একটা ভূত, বাঘের বেশে আছে। কোনো উপায় না পেয়ে ব্রত বীরপুরুষের মতো বলল, তুমি বাঘ হয়েও মানুষের মতো কথা বলছ? বাঘটা এবার হাসতে হাসতে বলল আমি ছোটো বেলা থেকেই মানুষের মধ্যে বড়ো হয়েছি, তাই তোমাদের ভাষায় কথা বলতে পারি। এবার জলের ট্যাঙ্কের পাশে চল তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

ব্রতের মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। বাঘ মানুষের মতো কথা বলতে পারে অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে। এসময় ওকে কিছু বলে লাভ নেই বরং কী বলতে চায় চুপচাপ শোনাই ভালো। ব্রতকে চুপচাপ থাকতে দেখে বাঘ বলল কি হল, কী ভাবছো? অনেক হয়েছে এবার চল। আরে বোকা ভয় নেই, তুমি না সাহসী ছেলে! ব্রত আর কথা না বাড়িয়ে বাঘের পেছন পেছন গিয়ে জলের ট্যাঙ্কের পাশে মুখোমুখি বসল। ব্রতকে শান্ত হয়ে বসতে দেখে বাঘ বলল তুমি যেন কোন ক্লাশে পড়? ব্রত বলল, ফোরে। ব্রতের কথা শুনে বাঘ বলল তুমি কী একা একা স্কুলে যাও? ব্রত বলল, না চণ্ডীদা আমার সঙ্গে যায়। খুব ভালো। ওর কথা শুনতে শুনতে আমার হাসি পায়।

বাঘ বলল, আচ্ছা তোমার এত বই—পড়তে কষ্ট হয় না?

—কিসের কষ্ট? আমাকে তো দুবেলায় মিস্ পড়ান। বাবার সময় নেই অফিস আর অফিস। মায়েরও সময় হয় না আর দিদুমা? সে তো ঠাকুর ঘরে পুজো নিয়েই ব্যস্ত। সময় পেলে আমার সঙ্গে লুডু খেলে আর নিজের মেয়েবেলার দস্যিপনার গল্প বলে।

—তোমার চণ্ডীদা?

—চণ্ডীদা! সে তো এক অদ্ভুতুড়ে মানুষ।

বাঘটা এবার হেসে উঠল। বাঘের হাসির শব্দে ব্রতের ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। মনে মনে ভাবল সত্যি যদি বাঘ হয়, বাঘের স্বভাব তো হিংস্র। ওরা কচি মাংস খেতে ভালোবাসে। এবার যদি ঘাড় মটকে পেটের নাড়ি ভুঁড়ি বের করে দেয় তাহলে? আর যদি বাঘের বেশে ভূত হয়? এসময় চিৎকার করলেও তো কেউ আসবে না। মা বাবা দুজনেই তো বাইরে গেছে। দিদুমা তো ঠাকুর ঘরে। কাজের মাসি তো কাজ করে চলে গেছে। আর চণ্ডীদা? নিশ্চিত ঘরের দরজা বন্ধ করে যাত্রার পাঠ মুখস্থ করছে। কি প্রয়োজন ছিল সন্ধের সময় ছাদে ওঠার।

প্রতিদিন ব্রত এসময় ছাদে ওঠে। ও আকাশ দেখে, আকাশে ঘরে ফেরা পাখিদের দেখে। আকাশ ছোঁয়া বাড়ি দেখে। ও আর চণ্ডীদা দুজনে ছাদে একটা ফুলের বাগান করেছে। বাগানে হরেক রকম ফুল ফোটে। ফুলের উপর প্রজাপতির বসে থাকা দেখে। এসব ওর ভালো লাগে। আজ যে এমন একটা ঘটনা ঘটবে ভাবতেও পারছে না ব্রত। এমন সময় বাঘটা গর্জে উঠে বলল, কি হল ব্রত, আমার কথা শুনছো না? বাঘের সঙ্গে থাকতে থাকতে কখন যে মন থেকে ভয়টা উবে গেছে নিজেই জানে না। সাহস করে ব্রত বলল, কে বলল শুনছি না, বল। বাঘ বলল এই তো সাহসী ছেলে। তোমার কথা ভেবেই অনেক কষ্ট করে ছাদে উঠে তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। ব্রত বাঘের কথা শুনে বলল, অনেক হয়েছে এবার কী বলবে, বল। বাঘ বলল, আমরা আর তোমাদের সাজানো বাগানে থাকতে চাই না। তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই। আমাদের হিংস্র স্বভাবের চেয়ে মানুষের হিংস্রতা অনেক বেশি। বনে আমরা একটা সভা করেছি। গণ্ডার, হাতি, সিংহ, বাইসন, ভালুক, শেয়াল এরা ছাড়াও অনেকে ছিল। সেই সভায় ওদের বুঝিয়ে বলে এসেছি, তোমার সঙ্গে কথা বলে তারপর যা করার করব। একটু থেমে বাঘ আবার বলল, প্রকৃতির সম্পদ শেষ হয়ে আসছে, তোমাদের আধুনিক বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক-না কেন, বিজ্ঞান তোমাদের ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দিচ্ছে। আমরা পশু হয়েও মানুষকে বিশ্বাস করতে পারি, আশ্চর্য মানুষ কিন্তু মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না। এই যে তুমি আমার পাশে বসে আছ ইচ্ছে করলেই তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারি কিন্তু তা আমি করব না। ব্রত বাঘের কথা শুনে ভয়ে বাঘের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

ওদিকের ব্রতের মা বাবা ফিরে এসে ব্রতকে পড়ার টেবিলে না দেখে ওর দিদুমাকে জিজ্ঞেস করতেই দিদুমা বললেন, তোরা ব্রতকে নিয়ে যাস নি? ব্রতের বাবা বললেন সে কি আমরা তো যাবার সময় তোমাকে বলে গেলাম। হারামজাদা চণ্ডীটা কোথায়? এ ঘর ও ঘর, বাথরুম রান্নাঘর আলমারির পেছনে এমন কি খাটের তলাতেও যখন ব্রতকে খুঁজে পাওয়া গেল না ব্রতের মায়ের কান্না পেল। ওর বাবা বেরিয়ে গেলেন। এ বাড়ি ও বাড়ি, এগলি সেগলি কোথাও ব্রতকে দেখা গেল না। লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। অনেক লোকের অনেক

কথা। এমন সময় কে যেন বলল এই তো আপনাদের ব্রত ছাদে। একটু থেমে বলল কিন্তু ওর পাশে ওটা কী? ব্রতের বাবা সঙ্গে সঙ্গেই তরতর করে ছাদে উঠলেন। ব্রতের বাবার পেছন পেছন অনেকেই উঠলো। ছাদে উঠে সবাই চমকে উঠল। সে কি ব্রত একটা জ্যান্ত বাঘের পাশে! সবাই চিৎকার করে বলতে লাগল এক্ষুনি বাঘটাকে মারতে হবে। কেউ কেউ বলল বনদপ্তরে খবর দাও। এর মধ্যেই পাশের বাড়ির নানু মণ্ডল তার লাইসেন্স করা বন্দুক নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলতে লাগলেন কোথায় বাঘ, কোথায় বাঘ? ছাদে উঠে বললেন ওমা বাঘটা যে ব্রতের সামনে, তাহলে?

ব্রতের কষ্ট হচ্ছিল। বাঘটা ব্রতের কানে কানে বলল দেখলে তো, তুমি আমার সামনে না থাকলে এতক্ষণে আমার কি হত? এবার বুঝলে তো মানুষ কোথায় নেমে গেছে! আমি হিংস্র তবু তোমার কোনও ক্ষতি করিনি বলেই বাঘটা এবার মুখোশ আর পোশাক খুলে ফেলল। পোশাক খুলতেই অবাক হয়ে সবাই বলল, এ কি! এ যে আমাদের চণ্ডীচরণ! ব্রতও অবাক হয়ে বলল সে কি চণ্ডীদা তুমি! চণ্ডীদা বলল, হ্যাঁরে আমি। তোর সাহস দেখলাম, এবার তুই আমাকে বাঁচা। ব্রত বলল তা নয় বাঁচাবো, কিন্তু সত্যি সত্যি নানুজ্যেঠু যদি তোমাকে গুলি করত, তাহলে? ব্রতের চণ্ডীদা বলল, অসম্ভব। তুই যেখানে আছিস।

চণ্ডীচরণ আর ব্রতের কীর্তি দেখে সবাই হাসতে হাসতে নীচে নেমে গেল। ব্রতের বাবা ওদের কাছে এসে এক হাতে ব্রতের কান অন্য হাতে চণ্ডীচররের কান ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিচে নেমে গেলেন। ব্রতকে বললেন পড়ায় ফাঁকি! চণ্ডীচরণকেও ছাড়লেন না, বললেন, যাত্রাদলের পোশাক পরে পাঠ মুখস্থ করা এবার বের করছি।

ছবি : পার্থ মৈত্র

অলৌকিক গল্প

অপার্থিব ইশারা

কুমার মিত্র

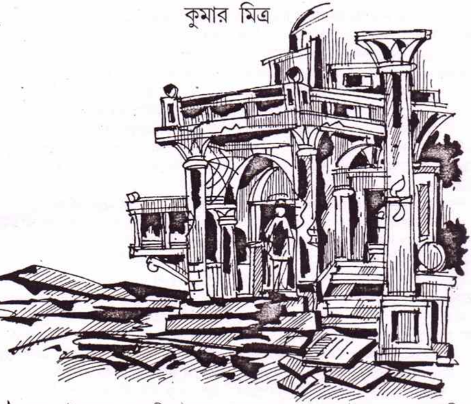

আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল প্রতীপ সামন্তর। ট্রেন জার্নি, রাতজাগা, বাসা খোঁজার ঝক্কি—এসব মিলিয়ে ক্লান্তি ছিল যথেষ্ট। গভীর ঘুম ছেঁকে ধরেছিল। ঘুম ভাঙার স্পষ্ট কোনও কারণ ছিল না। তবু কেন যে ভেঙে গেল ঘুমটা!

না, কারণ ছিল, কারণ আছে। একটা শব্দ ভেসে আসছে এখনও। গোঙানির মতো শব্দ। একটা বুকচাপা আর্তনাদ নিথর-স্তব্ধ এই শীতরাত্রিতে কেমন একটা অলৌকিক আবহ ঘনিয়ে তুলছে। ওই শব্দটাই প্রতীপের গাঢ় ঘুমে তীক্ষ্ণ নখরের মতো বিঁধে গিয়েছিল। একটু কান পেতে শুনল প্রতীপ। দূর থেকে নয়, শব্দটা আসছে পাশের ঘর থেকে। ওখানেই তো ঘুমোচ্ছে তার গিন্নি সুলতা আর তাদের আট বছরের ছেলে সন্দীপ। গায়ের লেপটা একরকম ছুড়ে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এলো প্রতীপ।

পাশের ঘর বললেও পুরোপুরি ঘর নয় ওটা। একটা বড়োসড় ঘরেরই কিছু অংশ মানুষপ্রমাণ দেওয়াল তুলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা দরজা। দরজাটা শুধু ভেজানো ছিল, আলতো করে ঠেলতেই খুলে গেল। এ বাড়িতে বিদ্যুতের আলোর কোনও বন্দোবস্ত নেই। ঘরের এক কোণে ছোটো একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। ধূম্রধূসর অন্ধকারের গায়ে সামান্য আলোর আভা। গোঙানির মতো আওয়াজটা তখনও বেরিয়ে আসছে সুলতার গলা থেকে। সন্দীপ এর

মধ্যেও ঘুমিয়ে। জেগে উঠলে ভয় পেয়ে যেত। উৎকণ্ঠিত প্রতীপ স্ত্রীর গায়ে একটু জোরেই ঝাঁকুনি দিল।

—অমন করছো কেন? কী হয়েছে?

আরো দু'তিনবার প্রশ্নটা করল প্রতীপ। সেইসঙ্গে ঝাঁকানি। গোঙানিটা থামল। ধড়মড় করে উঠে বসল সুলতা। হ্যারিকেনের আলো বাড়িয়ে স্ত্রীর মুখের সামনে ধরল প্রতীপ। কেমন ঘোরের মধ্যে আছে সুলতা। মুখে আতঙ্কের ছাপ। চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত। এই হিমার্ত রাতেও মুখখানা ভেজা ভেজা। ঘেমে গেছে।

—আমার খুব ভয় করছে। থেমে থেমে জড়ানো গলায় বলল সুলতা।

প্রতীপ স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ভয়ের কী আছে? খারাপ স্বপ্ন দেখছিলে, এই তো!

—স্বপ্ন! কী জানি! আমি যেন স্পষ্ট দেখলুম—

—কী দেখলে?

—দেখলুম বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখমুখে ভয়ঙ্কর রাগের ভাব। আঙুল নেড়ে নেড়ে আমাকে কী যেন বলছে। কাউকে শাসালে মানুষ যেভাবে বলে।

—ও কিছু না। স্রেফ স্বপ্ন। ভয়ের কিছু নেই। ঘুমোও। আমি পাশের ঘরে আছি, দরকার পড়লে ডাকবে। দরজাটা খোলাই থাক।

সযত্নে সুলতার গায়ে লেপ টেনে দিয়ে নিজের বিছানায় চলে এলো প্রতীপ। শুয়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এলো না। ভাবতে লাগল। সুলতার বাবার কথা।

সুলতার বাবা, তার শ্বশুরমশাই, মারা গিয়েছেন বছরখানেক হলো। একটু সাদাসিধে সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একটু বোকাটে ধরনের বলা যায়। এ ধরনের মানুষের আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে। তার শ্বশুর মশাইয়েরও ছিল। খুব সহজেই অন্যের পরামর্শের ফাঁদে পা দিতেন এবং চালিত হতেন। বন্ধু বা আলাপীদের সব পরামর্শই সুপরামর্শ ছিল না। ফলে অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জীবনে। সবচেয়ে মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্তটা হলো একমাত্র পুত্রসন্তান শৈলেশকে মৃত্যুর আগে বাড়ি উইল করে দিয়ে যাওয়া। ডিড অব্ গিফট্ বা দানপত্র করে দিয়ে গেলে কোনও ঝামেলাই বাধত না। অথচ বাধল ঝামেলা। আর বাধাল কিনা সুলতা, তারই স্ত্রী। খুবই পরিতাপের ব্যাপার। দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রতীপ।

সুলতা নিতান্তই গড়পড়তা মানুষ। কোনও কিছুই ওর মনে তেমন দাগ রেখে যায় না। আসলে কোনও কিছু নিয়ে গভীরভাবে ভাবাভাবির অভ্যাসটাই ওর নেই। অ্যাভারেজ মানুষ যেমন হয় আর কী! বাবা মারা যাবার পর বাবার কথা ওকে বিশেষ বলতেও শোনা যায়নি। বাবাকে স্বপ্নে দেখেছে, এমনও বলেনি কোনওদিন। তাহলে হঠাৎ এরকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখতে গেল কেন? স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন। বাবার স্নেহকোমল মূর্তি নয়, তাঁর ক্রোধী আর ভয়ানক মূর্তি দেখার কথাই বলেছে সুলতা। কেন? এটা কি ওর অপরাধী মনের প্রতিফলন? ন্যায়-অন্যায়ের যে বোধ মানুষকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করে দুঃস্বপ্নটা কী তারই প্রতিচ্ছায়া? কে জানে!

ভেবে কূল না পেয়ে প্রতীপ হাল ছেড়ে দিল। রাত বেশি নেই, ঘুমোবার চেষ্টা করাই ভালো।

অনেকটা বেলা পর্যন্ত বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকার বদভ্যাস কোনওদিনই নেই প্রতীপের। সূর্যিওঠা সকালেই সে বিছানা ছাড়ে। হাল্কা কিছু ব্যায়াম সারে। তারপর খানিকটা দুধছাড়া চা গলায় ঢেলে হাঁটতে বেরিয়ে পড়ে। এই সাত সকালেও মানুষ পথে নামে, ফাঁকা সুনশান রাস্তা দুর্লভ, তবু রোজ কিছুটা প্রভাতফেরি তার করা চাই। আর এই শিমুলতলা জায়গাটা তো সূর্যোদয়ের সকালে হাঁটাহাঁটির পক্ষে আদর্শ। নির্জনতা, টিলা, পাহাড়, জঙ্গল, প্রান্তর, তাজা বাতাস—প্রভাতী সফরের জন্যে তুলনাহীন। প্রতীপের যখন ঘরসংসার হয়নি তখন বন্ধুদের সঙ্গে এসেছে দু-একবার। পাঁচ সাত দিনের ছুটিছাটায় মানুষ ছোটে পুরী, চাঁদিপুর, গোপালপুর অন সি, প্রতীপরা যেত মধুপুর, দেওঘর, শিমুলতলা, আগে এসব জায়গায় ট্যুরিস্ট হতো প্রচুর। এখন টেস্ট বদলে গেছে পাবলিকের। অবশ্য প্রতীপের কথা স্বতন্ত্র। এবার এখানে আসার উদ্দেশ্য অল্প খরচে সুলতা আর সন্দীপকে জায়গাটা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। ওরা আগে কেউ আসেনি এখানে।

ঘণ্টা দেড়েক বেড়িয়ে টেড়িয়ে প্রতীপ ফিরে এসে দেখল গিন্নি আর ছেলে দুজনেই ঘুম থেকে উঠেছে। ছেলে মোবাইলে গেম খেলছে। সুলতা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে। চোখেমুখে অনিদ্রার ছাপ। দেখে মনে হচ্ছে বাকি রাত ভালো করে ঘুমোয়নি।

প্রতীপ নরম গলায় বলল,—খারাপ স্বপ্ন মানুষ কী দেখে না? অতো ঘাবড়ে যাবার কী আছে?

সন্দীপ খেলতে খেলতেই বলল,—জানো বাপী, মা সারা রাত শুধু ছটফট করেছে।

প্রতীপ হাসল,—তুই জানলি কী করে? তুই তো অঘোরে ঘুমোচ্ছিলি!

—সে তো প্রথম দিকে। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় কেউ ছটফট করলে ঘুমোতে পারা যায়? মা নিজেও ঘুমোয়নি, আমাকেও ভালো করে ঘুমোতে দেয়নি।

প্রতীপ বলল,—ভেরি ব্যাড। আমি তোর মাকে খুব করে বকে দোব। শোনো, বেকার বসে না থেকে সবাই তৈরি হয়ে নাও। খানিকটা ঘুরে আসি চলো। জলখাবারটা বাইরেই সারা হোক। এখানকার ভঁয়সা ঘিয়ের পরোটা আর বেগুনভাজা অতি উপাদেয়। খেয়েদেয়ে বাজারটাও সেরে নেওয়া যাবে।

ওরা সকলে পাহাড়ের দিকে গেল। দেদার মাঠ আর অনুচ্চ শৈলমালা দেখল। সরভাসা চা আর পরোটা তৃপ্তি করেই খেল। সবই রুটিনমাফিক হলো কিন্তু সুলতার মনের মেঘ কাটল বলে মনে হলো না প্রতীপের। ওর চোখের তারায় দুশ্চিন্তার ছায়াটা জমে আছে এখনও।

বাসায় ফিরে একরাশ বিরক্তি উগরে দিল সুলতা,—তুমি আর বাড়ি খুঁজে পেলে না! একখানা একটেরে ঘর, ইলেকট্রিক নেই, চারপাশে বনজঙ্গল—দিন দুপুরেই চারদিক কেমন ভুতুড়ে। এখানে মানুষ থাকে? অথচ আসার আগে কত ভালো ভালো বাড়ির কথা বলেছিলে! সেসব গেল কোথায়?

প্রতীপ অপরাধী অপরাধী মুখ করে বলল,—চেষ্টার তো কসুর করিনি। সব ভালো ভালো বাড়িই আগে থেকে বুকড। এসব জায়গায় এমনই হয়। চট করে এসে ভালো বাড়িঘর পাওয়া যায় না। স্টেশনপাড়াটা জমজমাট। সবাই ওখানে জমে যায়। রেললাইন পেরোলেই পুরনো মহল্লা। পোড়ো বাড়ি, জঙ্গল। সব জায়গায় বিজলী আলোর ব্যবস্থাও নেই। আমরা দু-চারদিনের মুসাফির, কোনওরকমে ম্যানেজ করে নাও কটা দিন।

সুলতা উত্তর দিল না। গুম মেরে রইল। বেড়াতে আসার মজার ছিটেফোঁটাও নেই হাবভাবে।

তবু খাওয়া দাওয়া আর ঘুম বাদ দিলে কী-ই বা করার আছে ঝাড়খণ্ডের এই না-গ্রাম না-শহর জায়গাটায়? অতএব বেরোতে হলো বিকেলে। স্টেশনপাড়া বাদ দিলে সবটাই নির্জনতার সমুদ্র। অগত্যা ঘুরতে ঘুরতে ওই স্টেশন। শীতের দিনে এসব পাহাড়ী এলাকায় বিকেল খুব তাড়াতাড়ি সাঁঝের গায়ে ঢলে পড়ে। চারদিক মুখ-আঁধারি হবো-হবো করছে সেই সময় ব্যাপারটা ঘটল।

পাজামা-পাঞ্জাবি পরা চাদর গায়ে এক প্রৌঢ় গোছের ব্যক্তি হঠাৎ এগিয়ে এসে সুলতার দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে বললেন, সুলত্য না! হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। ইনি বুঝি হাজব্যান্ড, আর এটি ছেলে! বেড়াতে এসেছ বুঝি! তা তোমার বাবা একা একা ঘুরছেন কেন?

সুলতার মুখের চেহারা হলো দেখার মতো।

—আপনি কী বলছেন মাস্টারমশাই? আমার বাবা—

—হ্যাঁ, তোমার বাবা। ভাবছ চিনতে আমার ভুল হয়েছে? মোটেই না। আমার চোখ এখনও পরিষ্কার। রাতের বেলাতেও খালি চোখে খবরের কাগজ পড়তে পারি। আরে বাপু, তোমাদের বাড়িতে আমি এক যুগের কাছাকাছি শিক্ষকতা করেছি। পড়িয়েছি তোমাদের তিন বোনকে। তুমি হলে মেজ, কেমন? তোমার বাবা অন্তত একশো কুড়ি বার নিজের হাতে আমাকে পে-প্যাকেট তুলে দিয়েছেন, তারপরও ভুল হবার প্রশ্ন আসে? তার ওপর তাঁর ওই দশাসই খানদানি চেহারা, ভুরুর ওপরের জড়ুল, থুৎনির কাছে কাটা দাগটা—এসব তো মনে গেঁথে আছে। তোমার বাবার নাম তো মনোহরবাবু! দেখো, সেটাও আমার খেয়াল আছে। অবিশ্যি তোমার বিয়েতে আমি যেতে পারিনি। সেই সময় মুম্বাইতে ছিলাম, ছেলের কাছে। ছেলে ওখানে চাকরি করে। তা দুঃখের কথা কী জানো, তোমার বাবা আমায় চিনতেই পারলেন না। আমি মনোহরবাবু, মনোহরবাবু বলে অনেকবার ডাকলাম। ফিরেও তাকালেন না। তারপর চোখের পলকে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। এরপর ভাবতে পারতাম কোথাও একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমাদের দেখে বুঝতে পারছি ভুল আমার হয়নি।

সুলতা শ্বাসরুদ্ধ গলায় কোনওক্রমে বলল,—আপনি বোধহয় ঠিকই দেখেছেন।

মাস্টারমশাই আশ্চর্য হয়ে বললেন,—এখনও বোধ হয়? তার মানে?

সুলতা পালাতে পারলে বাঁচে,—না, না, আপনার দেখার ভুল হয়েছে বলছি না। আচ্ছা, চলি মাস্টারমশাই। কাজ আছে।

সুলতা যেভাবে তাড়াহুড়ো করে চলে এল তাতে

মাস্টারমশাই যে খানিকটা হতভম্ব হয়ে যাবেন, এমনকি মনে মনে আঘাতও পাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সুলতারই বা করার কী ছিল?

খানিকটা আসার পর প্রতীপ বলল;—ব্যাপারটা খুব খারাপ হলো। স্যার কী ভাবলেন! ওকে আসল ব্যাপারটা তুমি বলতে পারতে।

সুলতা আবছা গলায় বলল, কী বলবো? বলবো, —স্যার, আপনি ভুল দেখেছেন। আমার বাবা বেঁচে নেই! তাহলে উনি নির্ঘাৎ আমাকে পাগল ঠাওরাতেন। সম্ভবত বাবার মৃত্যুর খবরটা উনি পাননি।

—হতে পারে। এই বলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে খানিকটা আশ্চর্য হয়ে গেল প্রতীপ। রাস্তার কমজোরি আলোয় পাহাড়ি এলাকায় কুয়াশা মিশে সুলতার মুখখানা কিরকম অচেনা-অচেনা লাগছে। দুর্ভাবনা-উদ্বেগ আর চাপা কষ্টের ঘোর একটা প্রলেপের মতো ব্যাপ্ত হয়ে আছে মুখখানায়।

দুই

সে রাত্রের কথাটা কোনওদিন ভুলবে না প্রতীপ। সবে অফিস থেকে ফিরেছে। অন্যান্য দিন প্রতীপ বাড়ি ফিরলে এগিয়ে আসে সুলতা। পোশাকে পাল্টানো থেকে চা জলখাবার দেওয়া পর্যন্ত পরিচর্যাগুলোয় সাহায্য করে যায়। সে রাতে দুবার নাম ধরে ডেকেও সুলতার সাড়া পায়নি। খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখে বারান্দার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আছে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

—কী হলো, এমনভাবে দাঁড়িয়ে যে!

সুলতা মুখ ফেরাল। মুখখানা থমথমে। ভেতরে যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে। তারপর নিজেই খুলে বলল ব্যাপারটা। ভাই শৈলেশের বিরুদ্ধে সম্পত্তির ভাগ দাবি করে উকিলের চিঠি পাঠিয়েছে।

প্রতীপ বোবা বনে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। মুখে ভাষা ফুটতে দেরি হয়েছিল।

—এটা কিরকম হলো? তোমার বাবা তাঁর বাড়িটা শৈলেশকে উইল করে দিয়ে গিয়েছেন। তাতে তোমরা সম্মতি জানিয়েছ। সইও করেছ। তোমাদের এক পিতৃবন্ধুর স্বাক্ষরও আছে তাতে। এরপর এই কাণ্ড! এ তো ব্রিচ অব ট্রাস্ট। বিশ্বাসভঙ্গ।

সুলতা হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল,—বিশ্বাসভঙ্গ আবার কিসের? বাবার সম্পত্তিতে সব সন্তানের সমান অধিকার। এ অধিকার তো আইনই দিয়েছে।

—কিন্তু অধিকার তো তোমরা ত্যাগ করেছ। আর উইলের সইটা? সেটা তো মিথ্যে নয়। মামলা বাধলে জালিয়াতি কেসে পড়ে যাবে যে!

—জালিয়াতি আবার কী! বলবো যে বাবা আমাকে ভয় দেখিয়ে সই করিয়ে নিয়েছেন। উকিল এরকমই বলতে বলে দিয়েছে।

—সেটা তো মিথ্যে। শেষকালে বাবাকেও ফাঁসাবে?

—সম্পত্তির জন্যে মানুষ অনেক কিছু করে। এ আর এমন কী! দরকার হলে এও বলতে হবে যে উইল করার সময় বাবা ফিজিক্যালি ফিট আর মেন্টালি অ্যালার্ট ছিলেন না।

—তার মানে বাবাকে পাগল সাজাবে!

—তা সে যা ইচ্ছে বলতে পারো। বনেদি এলাকায় বাড়ি। চার ভাগের এক ভাগ আমার। অন্তত পাঁচ-ছ লাখ টাকার ব্যাপার। কম কী!

প্রতীপ গুম মেরে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলে,—আমাদের তো কোনও অভাব নেই সুলতা। আমি সরকারি চাকুরে, তুমি স্কুলশিক্ষিকা। যথেষ্ট সচ্ছল। ওদিকে তোমাদের তিন দিদির এক ভাই। কত আদরের জিনিস। তার ওপর জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়নি। সেটাও তোমাদেরই দোষে। এক সময় বেশি আস্কারা পেয়েছে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে শিখল না। ভালো চাকরি বাকরিও জুটলো না কপালে। টুকিটাকি কাজ করে, তারপর বাড়ির কিছুটা অংশ ভাড়া দিয়ে যা পায়। এদিকে সংসার ফেঁদে বসে আছে, একটা বাচ্চাও আছে বছর চারেকের, তোমাদের একমাত্র ভাইপো। বেচারার মুখ দেখলে মায়া হয়। তোমার তো এসব ভুলে যাবার কথা নয় সুলতা। তাছাড়া, বাড়ি বিক্রি না হলে তো ভাগের টাকা পাবে না। তার মানে তোমাদের বাপের বাড়ি বলে আর কিছু থাকবে না।

সুলতা থেমে থেমে বলে, বড়দি আর ছোটো সম্পত্তির ভাগ চায় না। আমার দাবিমতো টাকা পেলেই গোল মিটে যায়।

প্রতীপ চাপা গলায় চিৎকার করে ওঠে,—তার মানে তুমি একলাই সম্পত্তির ভাগ চেয়েছো! ছিঃ ছিঃ। এত লোভ তোমার? অন্যায়, ঘোর অন্যায়।

প্রতীপের তীব্র ভর্ৎসনাতেও টলেনি সুলতা। তেতো গলায় বলেছে, তুচ্ছ সেন্টিমেন্টের চেয়ে কয়েক লক্ষ টাকা অনেক বড় ব্যাপার।

—কিন্তু তোমার ভাই দেবে কোথা থেকে?

—সেটা সে বুঝুক।

—তার মানে তাকে মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছ!

—সেইরকমই তো দাঁড়াচ্ছে। হয় মামলা করুক, নয়তো দাবির টাকা মিটিয়ে দিক।

—মামলা করা ছাড়া বেচারার উপায় রইল না। কাজটা ঠিক হলো না।

—এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।

মাথা ঘামায়নি প্রতীপ। তবে অবাক হয়ে ভেবেছে—সুলতা তো এতটা হার্টলেশ নয়। ভাইকে ভালবাসে, এটাই তো এতকাল দেখে এসেছে। তাহলে কারো পরামর্শে কাজটা করেছে নিশ্চয়ই। আসলে হয়েছেও তাই। সুলতা নিজেই জানিয়েছিল কথায় কথায়। সুলতা যে স্কুলে পড়ায় সেখানকার এক শিক্ষিকাই ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢোকায়। তারপর একটা জেদ বলো লোভ বলো—ওকে চেপে বসেছে। সেটা এতটাই প্রবল যে ওর বোনেরা ব্যাপারটা ওকে মিটিয়ে নিতে বললেও কানে তোলেনি। আদর্শবাদী প্রতীপ স্ত্রীর আচরণে দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু তার তো করার কিছু নেই।

তিন

অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে প্রতীপ গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। ঘুমটা ভেঙে গেল বিশ্রীভাবে। একটা যাচ্ছেতাই স্বপ্ন দেখছিল।

আমেরিকার কালো মানুষদের ভুডু দেবতা ব্যারন সেমাডিকে হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ জেগে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছে। ব্যারন সেমাডি কবরস্থানের অধিপতি। কাকতাড়ুয়ার মতো চেহারা। ল্যাগবেগে হাত-পা। কালো মানুষগুলো শয়তানের উপাসক। ব্যারন সেমাডি শয়তানেরই প্রতীক। ভুডুতন্ত্র আইনত নিষিদ্ধ বলে উপাসকরা হাজির হয়েছে এক নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে। রহস্যময় পরিবেশ। দূর থেকে পার্বত্য নেকড়ের রক্ত-জল-করা চীৎকার ভেসে আসছে। উপাসকরা আকাশের দিকে মুখ তুলে হাত ছুঁড়ছে আর টানা বিলম্বিত স্বরে শয়তান আবাহনের মন্ত্র আওড়াচ্ছে। বাজছে অদ্ভুত

ধরনের বাদ্যযন্ত্র। পাগলের মতো নাচছে কেউ কেউ। ব্যারন সেমাডি জাগবেন। এই রাতে প্রেতাত্মা ঢুকে যাবে মানুষের শরীরে। মানুষটা হয়ে যাবে চলমান প্রেত। তার নাম জোম্বি। ওই তো জোম্বিটা আসছে। কী আশ্চর্য, জোম্বিটা রক্তলাল চোখ নিয়ে প্রতীপের দিকেই তাকিয়ে আছে যে! বীভৎস জোম্বিটা এগোতে এগোতে একেবারে কাছে এসে পড়ল যে! গলা টেপার মতলব নাকি!

প্রতীপ ধড়মড় করে উঠে বসল। অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। ঠিকই বটে। কিছুদিন আগে অকাল্ট সায়েন্স নিয়ে একটা বই পড়েছিল। স্বপ্নটা তারই প্রতিক্রিয়া।

সহজে ঘুম আসবে না। একটা সিগারেট ধরালে মন্দ হয় না। অন্ধকারেই একটা প্যাকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল। দেশলাই জ্বালাল। আর তখনই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। কেঁপে উঠল। আপাদমস্তক।

ঘরের মূল দরজার দুটো পাল্লাই অনেকখানি খোলা। একটা হিমস্রোত হুহু করে ঢুকছে ঘরের মধ্যে। পাশের ঘরে যাবার দরজাটার দিকে চোখ পড়ল। সেটাও খোলা। অদ্ভুত ব্যাপার তো! প্রতীপের মাথার মধ্যে একরাশ আতঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়ল। টর্চটা খুঁজে নিয়ে ঢুকল পাশের ঘরে। যা আশঙ্কা করেছিল তাই। বিছানার এক পাশে সন্দীপ গুটিসুটি মেরে শুয়ে। সুলতা নেই।

ভিতু মানুষটা গেল কোথায়?

এই পাহাড়ি শীতেও কপাল ঘেমে উঠল প্রতীপের। বাইরে রাত সাঁইসাঁই করছে। কোথায় যেন একটা রাতপাখি ডাকছে কুস্বরে। আশেপাশে বনজঙ্গল। সেখান থেকে হুড়মুড় করে একটা শব্দ ভেসে এল। নেকড়ে টেকড়ে নয় তো? ঝাঁঝার জঙ্গলে নেকড়ে আছে শোনা যায়। সেখান থেকে দু'একটা এসে পড়া আশ্চর্যের কিছু নয়। আকাশের দিকে মুখ তুলে এক দঙ্গল শেয়াল ডাকছে। এ যেন অকাল্ট সায়েন্স নিয়ে লেখা বইটায় পড়া ভুডু-আবাহনের রাত।

কোথায় যে গেল সুলতা! অমন রাতে নাম ধরে ডাকাডাকি করা বেখাপ্পা ব্যাপার। তবু প্রতীপ চাপা গলায় কয়েকবার সুলতার নাম ধরে ডাকল। কারো সাড়া নেই। প্রতীপের গলা শব্দহীন রাতের শরীরে মিশে গেল। প্রায় টিলার মতো উঁচু জায়গায় এই বাড়িটা। সেখানে থেকে সিঁড়ির মতো করে কাটা বেশ কয়েকটা ধাপ নীচে নেমে গেছে। প্রতীপ টর্চের আলো বুলোল ধাপগুলোর ওপর। কেউ নেই। আলোর সন্ধানী চোখ চারদিক ছুঁয়ে এলো। কোথাও কেউ নেই। এবার কী করা।

আরো খোঁজাখুঁজি করতে হবে। প্রতীপকেই করতে হবে। এতবড় এই দুনিয়ায় এই মুহূর্তে আর কেউ পাশে নেই। উৎকণ্ঠার বোঝাটা যতই গুরুভার হোক প্রতীপকেই বইতে হবে। সন্দীপ একা থাকবে। থাকুক। দরজা ভেজিয়ে শেকলটা তুলে দিল প্রতীপ। হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে হয়তো ভয় পাবে, কান্নাকাটি করবে, তবে বিপদে পড়বে না। কাজটা মানবিক না হলেও এই মুহূর্তে এটাই একমাত্র রাস্তা।

এলোমেলো পদক্ষেপে খাঁজকাটা ধাপগুলো ভেঙে সমতলমতো জায়গাটায় নেমে এল প্রতীপ। এখানে আঁধার একটু ফিকে। গাছপালা কিছুটা কম বলে মাথার ওপর ডালপালার ছাউনি ঈষৎ হাল্কা। আকাশে চাঁদ আছে সম্ভবত, সেজন্যই হয়তো পাতাচোঁয়ানো জ্যোৎস্নায় পথঘাট তেমনই অস্পষ্ট লাগছে না। খানিকটা এগিয়ে গিয়েই দেখল রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে। একটা গিয়েছে স্টেশন পাড়ার দিকে। প্রতীপ সেদিকটা যাওয়াই স্থির করল। এগোতে এগোতে স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলও কয়েকবার। যথারীতি প্রত্যুত্তর নেই। গলাটা কাঁপছে প্রতীপের, কিন্তু সেটা শৈত প্রবাহের জন্যে নয়। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা।

খুব একটা সাহসী পুরুষ নয় প্রতীপ এবং এই পরিস্থিতিতে ঠিক কী করা উচিত তাও তার অজানা। তবু কোত্থেকে যেন প্রবল সাহস এসে গেল। সেইসঙ্গে এল দুর্দম জেদ। সব হারানোর সংকটমুহূর্তে মানুষ এভাবেই বদলে যায়। সুলতাকে খুঁজে না পেলে ছেলের সামনে সে দাঁড়াবে কী করে?

আরো কিছুটা এগোবার পর—ওকী!

অন্ধকারের পটভূমিতে একটা চলমান ছায়া। প্রতীপ গলা তুলে ডাকল। নীরবতা ফিরে এলো উত্তর হয়ে। প্রতীপ দৌড়ল।

সুলতাই। কিন্তু সুলতাও যেন নয়। বাহ্যজ্ঞান নেই। ওর এলোমেলোভাবে হাঁটা অবয়বটা জড়িয়ে ধরল প্রতীপ। অনুভব করল গভীর এক আঁধারের মধ্যে ডুবে আছে সুলতার চেতনা। একটা অচেনা অঞ্চল, নৈশ ভয়াবহতা আর স্তব্ধতা নিয়ে রাত্রির মধ্যযাম, নিশিযাপন করা

জীবজন্তু আর পাখির আতঙ্ককর শব্দ—কোনওকিছুর দিকেই খেয়াল নেই শহরজীবনে অভ্যস্ত সুলতার। এই অবস্থাকে কী নিশি-পাওয়া বলে? সুলতা কি নিশির ডাকে ঘর ছেড়েছে? অথবা ওর স্লিপ ওয়াকিংয়ের অভ্যেস রয়েছে?

প্রতীপ এ নিয়ে আর চিন্তা করল না। সুলতার ভারী দীঘল শরীরটা হেলে আছে ওর কাঁধে। প্রতীপ সিনেমার হী-ম্যান না হলেও কর্তব্যের তাড়নায় এখন শক্তিমান পুরুষ। সুলতাকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর টালমাটাল পায়ে কিভাবে সে আস্তানায় ফিরে এল সেটা তার নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়।

একনাগাড়ে ঘণ্টা পাঁচেক অঘোরে ঘুমিয়ে সুলতা প্রথম যেটা বলল তা এই,—জানো, বাবা এসেছিল কাল রাতে। আমাকে নাম ধরে ডেকেছিল। ঘুমোচ্ছিলাম, উঠে পড়লাম। তারপর হাতছানি দিয়ে সঙ্গে যাবার ইশারা করল। বেরিয়ে পড়লাম। আমার মনে হচ্ছিল কে যেন জোর করে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না। তারপর কি হয়েছে আমি কিচ্ছু জানি না।

প্রতীপ আস্তে আস্তে বলল,—তোমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছি। কাঁধে করে। তোমার কোনও সেন্স ছিল না। তখন ঠিক মাঝরাত।

সুলতা শিউরে উঠল,—তাই? তাহলে বিপদও তো হতে পারত।

—পারত। তোমাকে খুঁজে পেয়েছি এটা আমার সৌভাগ্য।

—আচ্ছা, কেন এরকম হচ্ছে বলোতো? বাবা বারবার দেখা দিচ্ছে কেন?

—প্রশ্নটা তোমার মনে যখন জেগেছে উত্তরটা তোমাকেই খুঁজতে হবে।

—তুমি সুপারন্যাচারাল কোনও কিছুতে বিশ্বাস করো? যেমন স্পিরিট? ইভল স্পিরিট যাকে বলে।

—আমি এসব ঠিক জানি না সুলতা। তবে জগতে আশ্চর্য অনেক কিছুই ঘটে।

কিছুক্ষণ কথা বলল না সুলতা। আত্মমগ্ন ভাবভঙ্গি। তারপর বলল,—রাতের দিকে একটা ট্রেন আছে। চলো, ফিরে যাই।

প্রতীপ বলল,—সেই ভালো।

ট্রেনে উঠে গুছিয়ে বসার পর সুলতা বলল,—তুমি উত্তর খোঁজার কথা বলছিলে না! উত্তরটা খুঁজে পেয়েছি।

প্রতীপ বলল,—আমি জানতাম তুমি পাবে। তুমি একজন সৎ পিতার সৎ সন্তান। বেসিক্যালি অনেস্ট মানুষ।

—আমি ফিরে গিয়েই উকিলের কাছে যাব। সঙ্গে তুমি থাকবে। শৈলেশের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করেছি, ওটা তুলে নিতে চাই। বাবা আমার ভুলটা শুধরে দিয়েছে।

—দ্যাটস নাইস। ভুল হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। সংশোধনটাই আসল কথা।

সুলতাকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। ওর চোখে সকালবেলাকার ঘোরটুকু আর নেই। বলল,—শিমুলতলা জায়গাটা কিন্তু বেশ। দুঃখের কথা ভালো করে দেখা হলো না।

প্রতীপ বলল,—তাতে কী! আবার আসবো একসময়।

—কিন্তু বাবা যদি আবার—

—না, উনি দেখা দেবেন না আর। আমি নিশ্চিত। তাঁর কাজ ফুরিয়েছে।

শহরে ফিরে সুলতা তার কথা রেখেছিল। পাকা চুলের প্রবীণ প্রাজ্ঞ উকিল অবাক হয়ে বলেছিলেন,—এটা কিরকম হলো? বলেছিলেন কম সে কম হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়বেন, আর এই মধ্যেই মামলা তুলে নিচ্ছেন? জিততে পারলে অনেক টাকা পেতেন। সরে দাঁড়াচ্ছেন, কারণটা কী?

সুলতা উত্তর দিয়েছিল—বাবা চাননা যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা চালাই। তার ইচ্ছেই শেষ কথা।

ছবি : শংকর বসাক

ইতিহাসের গল্প

গুনু মামার ঘুড়ি

প্রবীর জানা

ক'দিন ধরে মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া বইছিল। মেঘেরা কি দুষ্টু। ওড়ার প্রতিযোগিতায় শুধু ব্যস্ত নয়, তারা কি ছিঁচকাঁদুনে! চোখের জলপড়া শুরু হল তো ব্যাস, রিম ঝিম রিমঝিম, টাপুরটুপুর টাপুরটুপুর, ইলসেগুঁড়ি, কতরকম ফোঁটা হয়েই পড়ছে তো পড়ছে। তুলতুল মুখ গোমড়া করে বসে আছে বাড়িতে। তার দাদা মিতুনেরও মুখে হাসি নাই। থাকবে বা কেন? কাল যে ঘুড়ির দেশে উড়ে বেড়ানোর কথা। বিশ্বকর্মা পুজো।

এর পরের দিনগুলো কি তাড়াতাড়ি কেটে যাবে বুঝা যায় না। বাতাসে ভেসেবেড়াবে পুজো পুজো গন্ধ। ইসকুলে পড়ে যাবে ছুটির ঘন্টা।

ঢ্যাম কুড়াকুড় ঢ্যাম কুড়া কুড় কুড়,
ওই পাড়াতে আসছে বুঝি এবার দুর্গাঠাকুর।

দুর্গা পুজোর তো দেরী আছে। তার আগে বিশ্বকর্মা পুজো মানেই ঘুড়ির আকাশ দখল।

রাতের মধ্যে আকাশের চেহারা পালটে গেল। পরের দিন ভোর না হতেই সূর্যি ঠাকুরের হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল আকাশ, নদী, গাছপালায়, ঝলমলে রোদ্দুরে চারদিকে যেন খুশির ঝিলিক।

হুগলী নদী পেরিয়ে তালপাটি খালের ঘাটে লঞ্চ ভিড়ল। দেখি গুনু মামা আসছে। গোঁফের নীচে তার একরাশ হাসি। বাড়ির উঠোনে পা রেখে বলল আমাদের দিকে তাকিয়ে,

—তোদের জন্য ঘুড়ি এনেছি।

মা অবশ্য তার কথার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে বললেন—লঞ্চ নিশ্চয় মাঝরাতে ছেড়েছিল সুন্দরবন থেকে, তাই এত সকাল সকাল চলে এলি। আগে হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নে।

গুনু মামা আসার খবরটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল তুলতুল মিতুনদের কাছে। পৌঁছে গেল বললে ঠিক বলা হল না। আরতি তাদের ডেকে আনে। আমাদের পাড়ার ভজু অসিত রুমকিও চলে এল। আসবে না বা কেন! তাদের আসতেই হবে। এখানে গুনু মামার সংসার বলতে

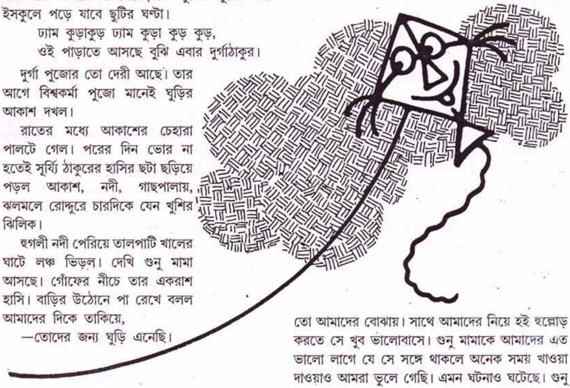

তো আমাদের বোঝায়। সাথে আমাদের নিয়ে হই হুল্লোড় করতে সে খুব ভালোবাসে। গুনু মামাকে আমাদের এত ভালো লাগে যে সে সঙ্গে থাকলে অনেক সময় খাওয়া দাওয়াও আমরা ভুলে গেছি। এমন ঘটনাও ঘটেছে। গুনু

মামা এলে সারা পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন এক পরিবার হয়ে যায়। অন্য পাড়ার সঙ্গে হাডুডু, ফুটবল, সাঁতার প্রতিযোগিতা, পাড়ায় সরস্বতী পুজো এসবের নাটের গুরু গুনু মামা।

আমাদের গ্রামের মাঝে একটা বিশাল মাঠ আছে। সেখানে হাডুডু ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়, যাত্রার আসর, মেলা বসে বছরের বিভিন্ন সময়ে। প্রতিবছরের মতো এবারও সকাল থেকে এই মাঠে ঘুড়ি ওড়ান শুরু হয়েছে। আমাদের মাঠে পৌঁছানোর আগে পেটকাটা, চাঁদিয়াল, পঙ্খিয়াল, চাপরাশ, চৌরঙ্গি, বল্গা, চিল, বাক্সঘুড়ি, লেজওয়ালা পতঙ্গ প্রভৃতি ঘুড়ি আকাশ দখল করেছে। গুনু মামা নিজে একটা ঢাউস ঘুড়ি বানিয়েছে। তার ঘুড়ির নাম ভোমরা ঘুড়ি। বিশাল লেজ, মোটা সুতোয় কাচের গুঁড়োর মাঞ্জা দেওয়া। ঘুড়ির মাথায় আটকানো পেছনের দিকে এক ধরনের বাঁশি।

গুনু মামা ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দিল। ঘুড়িতে আটকানো কাগজের বাঁশি ভোমরার মতো গুন গুন শব্দে যেন বলছে,

ভোঁ কাট্টা ভোঁ,
থাকলে সাহস লড়বি যদি
একবার আমায় ছোঁ।

চাঁদিয়াল ঘুড়ি সাঁইসাঁই শব্দে উড়তে উড়তে বলছে,

আমরাও লড়তে জানি
ভয় পাইনা তোকে,
দেখবি কেমন মারব গুঁতো
সোজা তোর চোখে!

যেই বলা সেই কাজ। চাঁদিয়ালও পেট কাটা ঘুড়ি এগিয়ে এল ভোমরা ঘুড়ির দিকে। তুলতুল চেঁচাতে থাকল—গুনু মামা, সাবধান! আমাদের ঘুড়ির মতো ওরা কেটে দেবে। গুনু মামা গর্জে উঠল,

ছোড়কে নেহি ছোড়কে,
জিতুঙ্গা আভি
লড়কে লেঙ্গে লড়কে!

গুনু মামার কথা শুনে তুলতুল, মিতুন, আরতি, ভজু, অসিত, রুমকিরা করতালি দিতে লাগল চারদিক থেকে চিৎকার ভেসে এল—ভোঁ কাট্টা ভোঁ, চাঁদিয়াল ঘুড়ির সুতো আটকে গেল পেটকাটা ঘুড়ির সুতোয় 'শুরু হল দু'জনের লড়াই। হাওয়ায় ভেসে আসছে দর্শকদের করতালির শব্দ। ঘুড়ি ওড়ানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে মেলাও বসেছে এই মাঠে।

গুনু মামা ঘুড়ির লাটাই মাটিতে রেখে সুতোর শেষ প্রান্ত মাটিতে পোতা একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—রকেটে চেপে প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন আকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন। পরে নীল আর্মস্ট্রং প্রভৃতি মহাকাশচারীরা চাঁদে পা রাখেন। মঙ্গল গ্রহেও মানুষের তৈরি রটেক পৌঁছে গেছে। ঘুড়ির থেকে বিজ্ঞানীরা রকেটের কল্পনা করেন।

মিতু বলল—তাই বুঝি।

গুনু মামা বলল—পনের খ্রিস্টাব্দে চীন সম্রাট ওয়ান হু সশরীরে স্বর্গে পৌঁছাতে পেরেছিলেন?

তখন মানুষের ভুল ধারণা ছিল স্বর্গ সম্বন্ধে। অবশেষে ঘুড়ির সঙ্গে সম্রাট ফিরে এলেন পৃথিবীতে। তবে সম্রাট জীবিত ছিলেন না। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের দু'শ বছর আগে চীনে ছিলেন হান সম্রাট। তাঁর সেনাপতি ছিলেন হান সিন। শত্রুরা সাম্রাজ্য দখল করতে এলে হান সিন গুপ্তচরকে ঘুড়ির পিঠে চাপিয়ে আকাশে পাঠালেন। সে দেখে এল শত্রুরা কোথায় রয়েছে। হান সিন সুড়ঙ্গ কেটে শত্রুদের সেনা সজ্জা পার হয়ে বাইরে এসে পেছন থেকে আক্রমণ করলেন। শত্রুরা পরাজিত হল। গ্লাইডারও এরোপ্লেন ঘুড়ির নামান্তর বলা যেতে পারে।

ভজু বলল—চাঁদিয়াল ও পেটকাটার লড়াই বেশ জমে উঠেছে। ঘুড়িতে চেপে মেঘের কাছে যদি যেতে পারতাম তাহলে কি মজা হত।

তা তো হতই এবার মন দিয়ে ঘুড়ি বিষয়ক কিছু তথ্য জেনে রাখ। যা কেউ দিতে পারবে না—বলো মামা, বলো। গুনু মামা দম নিয়ে কাজ শুরু করল।

যিশুখ্রিষ্টের জন্মের চারশত আটাত্তর বছর আগের কথা চীন দেশে ঘুংসু পান নামে একজন লোক বিশেষ ধরনের ঘুড়ি বানিয়ে তাতে চেপে তিনদিন আকাশে পাখির মতো উড়ে বেড়ান। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের প্রায় একশ বছর পর ঘুড়ি বানিয়ে তাতে চেপে ধরে ঘুড়ি পৌঁছায় ইতালিতে। ভারতীয় সাহিত্যে মুঘল আমলে পতঙ্গ বা ঘুড়ির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় পনের শত বিয়াল্লিশ খ্রিষ্টাব্দে।

—মামা তুমি এত জানো?

—কথার ডগা ভাঙবি না, যা বলছি শুনে যা। গুনু মামা আবার বলা শুরু করল।

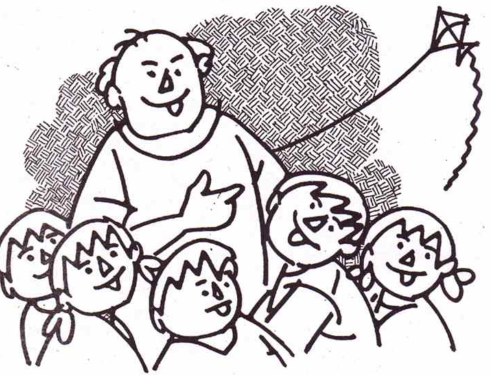

জাপানে এক চোর ঘুড়িতে চেপে পাহারাদারদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নাগোয়া প্রাসাদের ছাদে রাখা সোনার অলংকারে সজ্জিত একটি ডলফিন মূর্তি, সোনাদানা মণিরত্ন চুরি করে। অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি, ধরা পড়ে যায়। বিদ্যুতের আবিষ্কারক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম সিল্কের কাপড়ের ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে বিদ্যুৎ ধরেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ঘুড়িতে মানুষ চাপিয়ে আকাশে পাঠিয়ে নানা পরীক্ষার কাজ করেন। রাইট ভাইয়েরা বিমান আবিষ্কার করেন। তাঁরাও প্রথমে ঘুড়ির সাহায্যে পরীক্ষা চালান। প্রায় ছ'শ খ্রিষ্টাব্দে সিলা সাম্রাজ্যের জেনারেল ছিলেন ইউ সিন। যুদ্ধে রওনা হওয়ার সময় সৈন্যরা তারাখসা দেখে ভাবলেন অশুভ সংকেত। তারা যুদ্ধে যেতে চাইলে না। জি ইউ সিন ঘুড়ির সঙ্গে বাতি জ্বালিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে সৈন্যদের বুঝালেন, খসে পড়া তারাটা আবার আকাশে ফিরে গেছে। বৌদ্ধরা নাকি বিশাল ঘুড়িতে চাপিয়ে ছোট ছোট ছেলেদের আকাশ সফর করাতেন। চীনারা কাঠের ঘুড়িকে বলত মুইয়ুয়ান, কাগজের ঘুড়িকে বলত ঝি ইউয়ান, বিলাসিতা হিসাবে ঘুড়ি মুঘল সম্রাটের সময়ে ওড়ান হত। কলকাতায় ঘুড়ির প্রচলন হয় নবাব ওয়াজেদ আলির মাধ্যমে। বাবু সমাজে ঘুড়ি ওড়ান সম্মানের ব্যাপার ছিল। তখন এই ছড়াটি মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত।

ঘুড়ি তুড়ি জস' আখড়া বুলবুসি মানিয়াগান,
(আর) অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

মানে, তখন বাবুরা ঘুড়ি উড়িয়ে তুড়ি মেরে বুলবুলির লড়াই দেখে সপ্তাহের শেষে বনভোজন করতেন। কথার ছেদ পড়ল।

রুমকি চেঁচাক শুরু করল—গুনু মামা, চাঁদিয়াল ও পেটকাটা আমাদের ঘুড়িকে আক্রমণ করতে কাছাকাছি এসে গেছে। আরে আরে হচ্ছে কি। ওদের ঘুড়ির সূতোর সঙ্গে আমাদের ঘুড়ির সূতো জড়িয়ে গেল যে।

গুনু মামা ঠোঁট চেপে হাসল। তারপর বলল—আমার সঙ্গে লড়তে আসা। দেখিয়ে দিচ্ছি প্যাঁচের মার কাকে বলে। ওই ঘুড়িগুলোকে অন্য গ্রহে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

খুঁটিতে আটকানো ঘুড়ির মোটা সূতো খুলে নিজের

কোমরে বেঁধে সূতো ধরে টান মেরে প্যাঁচ খেলার চেষ্টা করতে লাগল গুনুমামা। দমকা হাওয়া এসে ঘুড়িতে এমন হেঁচকা টান দিল যে ঘুড়ির সুতোয় টান পড়ায় গুনু মামা প্রথমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল কিছুটা। গুনু মামা ঘাবড়ে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগে দেখল ধীরে ধীরে মাটি ছেড়ে ওপরের দিকে সে উঠে যাচ্ছে।

আমরা চিৎকার শুরু করলাম—গুনু মামা, তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘুড়ি। সাবধান! আমরা তোমার পা ধরে ঝুলে থাকছি। গুনু মামা...!

কয়েক ফুট ওপরে ওঠার পর ধপাস করে সে পড়ে গেল মাঠের শেষ প্রান্তে কাদায়। আমরা ধরাধরি করে তাকে দাঁড় করালাম। পেটকাটা ও চাঁদিয়াল ঘুড়ির সুতোর সঙ্গে গুনু মামার ঘুড়ির সূতো আটকে যাবার পরে তিনটে ঘুড়ির সূতো কেটে নিয়ে উড়তে উড়তে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। গুনু মামার সারা শরীরে কাদা।

অন্য পাড়ার ছেলে মেয়েরা চিৎকার করে বলতে লাগল— ভোঁ কাট্টা ভোঁ ভোঁ কাট্টা ভোঁ!

আমি গুনু মামাকে বললাম—তোমার ঘুড়িটা ওরা কেটে দিল!

গুনু মামা তার শরীর থেকে কাদা মুছতে মুছতে বলল—দেখলিতো, আমার ঘুড়ি গাইড করে চাঁদিয়াল ও পেটকাটাকে অন্য গ্রহে কেমন পাঠিয়ে দিল।

ছবি : শংকর বসাক

www.banglabooks.in

সামাজিক গল্প

জন্মদিনে

পুণ্ডরীক চক্রবর্তী

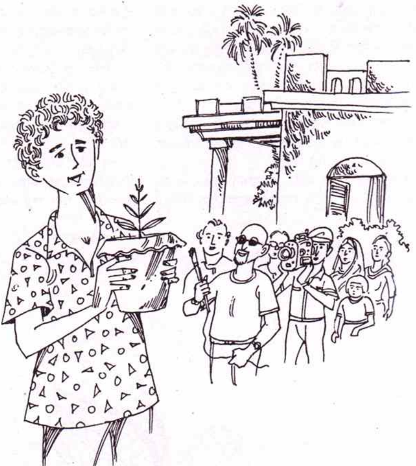

আজ সকাল থেকে বিপুল উৎসাহে রয়েছে দেবোত্তম। একবার ছোটোকাকার কাছে ছুটছে। একবার ছোটোমামার কাছে। কানে কানে চাপা গলায় কথা বলছে। দেখে বোঝা যায় নয় ও পরামর্শ করছে, না হয় কোনও প্রস্তাব রাখছে।

হাত-মুখ নেড়ে ছোটোকাকা আর ছোটোমামা যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে কোনও টেনশন নেবার প্রয়োজন নেই। সব ঠিক আছে। তাছাড়া আমরা তো আছি।

একটু আগে বাবা জলযোগ থেকে অর্ডার দেওয়া মস্ত বড় কেক নিয়ে বাড়ি ঢুকেছেন। কেকের উপর জ্বলজ্বল করছে সুন্দর নকশা কেটে লেখা। দেবোত্তম, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।...

ফুল আর বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘরগুলো। আত্মীয়-স্বজন এখনও তেমন কেউ এসে পৌঁছোয়নি, কেবল ছোটোমামাই যা কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছে। তবে এক্ষুনি সব এসে যাবে। সময় হয়ে গেছে। দেবোত্তমের বন্ধুরা অবশ্য দু-একজন করে আসতে শুরু করেছে।

বারো বছরের দেবোত্তমের জন্মদিন। এবার একটু অন্যভাবে পালন হতে চলেছে। তার জন্য বেশ বকুনিও জুটেছিল বাবা-মা-র কাছে। বাবাকে ততটা না হলেও মা-কে রাজি করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

প্রথমে দেবোত্তম তার মনের পরিকল্পনাটা জানিয়েছিল ছোটোকাকাকে। পরে ছোটোমামাকে।

দেবোত্তম বলেছিল, আমার জন্মদিনে তোমার কাছে একটা জিনিস চেয়ে নেব। দেবে তো ছোটোকাকা?

ছোটোকাকা হেসে বলেছিল, না হয় তোর ছোটোকাকা

এখনও চাকরি পায়নি। কিন্তু টিউশনি তো করে। বল কী চাস তুই?

দেবোত্তম গদগদ গলায় বলল, ছোটোকাকা তুমি আমায় কয়েকটা মাটির টব এনে দেবে?

ভুরু কোঁচকালো ছোটকাকা, জন্মদিনে কয়েকটা মাটির টব! তাও গাছ ছাড়া! কেন কী করবি?

দেবোত্তম মৃদু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলল, শোন ছোটকাকা এবার আমি ঠিক করেছি, আমার জন্মদিনে সকলের কাছ থেকে একটি করে গাছের চারা চেয়ে নেব। বন্ধুদেরও বলে দেব। কেমন হবে বলো তো ছোটোকাকা?

বলিস কী? ছোটোকাকার চোখ কপালে।

হ্যাঁ ছোটোকাকা। ছোটো মাসি থেকে বড়ো মাসি-পিসি সবাইকে ফোনে বলে দেব, আমার জন্য তোমরা একটা করে গাছের চারা আনবে। অন্য কোনো গিফ্‌ট এবারে আমি নেব না। কেউ দেবে না।

ছোটোকাকা হেসে খুন।

—বারে হাসছো যে?

হাসব না! জন্মদিনে গাছ আর গাছের টব!

আইডিয়াটা কেমন বলো তো ছোটোকাকা?

ধ্যাৎ! কোথায় ভালো কিছু গিফট আশা করবি মাসি-পিসির কাছে। তা নয় ফুল-ফলের চারাগাছ। অদ্ভুত তোর চিন্তা-ভাবনা! তা এত ফুল-ফলের চারাগাছ লাগাবি কোথায়?

কেন? বাড়ি ঢোকার পথের দু-পাশে কিছু বাগানে, বাকিটা ছাদের উপর। ও নিয়ে তুমি কিছু ভেব না ছোটোকাকা। ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দেবোত্তম বলল।

তোর মাথায় এসব কে ঢোকাল বলতো? নিশ্চয়ই স্কুলের শিক্ষক ওই করুণাময়বাবু?

ছোটোকাকা ভুল বলেনি, ঠিকই ধরেছে, করুণাময়বাবু শুধু স্কুলের শিক্ষকই নন, একজন পরিবেশবিদও বটে। পরিবেশ নিয়ে কাজকর্ম করেন। তা এ তল্লাটে অনেকেই জানে।

গাছপালার প্রতি বিশেষ টান ও ভালোবাসার পিছনে করুণাময়বাবুর ভূমিকা রয়েছে যথেষ্ট।

করুণাময়বাবু ক্লাসে বিজ্ঞান পড়ান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ পরিবেশ বিজ্ঞানের হালচাল সব গল্পই করেন ক্লাসে, ছাত্রদের কাছে।

দেবোত্তম মন দিয়ে শোনে। দেবোত্তমের কাছে এ ব্যাপারে করুণাময়বাবু একজন আদর্শ শিক্ষক।

স্যারের কাছে সে জেনেছে প্রাণের বন্ধু অক্সিজেন, নানা কারণে আজ পৃথিবীতে কমে আসছে, খাদ্যে-জলে যে কারণে এত ভেজাল। মানুষের এত অসুখ-বিসুখ। আর এ সবের মূলে রয়েছে পরিবেশ দূষণের অভিশাপ। বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। ঋতু পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, কোথাও খরা কোথাও বন্যা হওয়া। শস্য উৎপাদন কমে আসা, তাছাড়া মাটির ধারণ ক্ষমতা কমে আসায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যে সব কারণে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে আমাদের জীবন। রোগ-ব্যাধি ঢুকে পড়ছে বেডরুম থেকে কিচেনে।

দেবোত্তম শুধোয়, এর হাত থেকে কি বাঁচার কোনও পথ নেই স্যার?

করুণাময়বাবু বলেন, আছে, পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে গেলে অনেকরকমের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং তা যুদ্ধকালীন ভূমিকায়। সে সব বড়োদের কাজ। সমাজে বড়ো বড়ো মাথাদের কাজ। তোমরা ছোটো তোমরা যেটা পারো পরিবেশ-দূষণ ও তার প্রতিকারে গাছ লাগাতে, গাছ বাঁচাতে। দম নিয়ে করুণাময়বাবু আরও বলেন, ইটকাঠ, পাথরের এই নাগরিক সভ্যতার পাশাপাশি বেশি বেশি করে এখনই পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন না হলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে সভ্যতার এই ইমারৎ। এটা তোমরা জেনে রাখো। তোমাদের জেনে রাখা উচিত।

ছোটোকাকা হেসে বলল, চুপ করে আছিস যে? ঠিক বলিনি?

দেবোত্তম শান্তভাবে ছোটোকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দেয়, হ্যাঁ এসব শিক্ষা করুণাময়বাবুর কাছ থেকেই পাওয়া।

ছোটোকাকা সিরিয়াস ভঙ্গীমায় বলল, ঠিকই বায়ুমণ্ডলের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। বিষাক্ত হয়ে পড়েছে চারপাশ। মানুষ জীবজন্তু ও উদ্ভিদের সুস্থ থাকা এই পৃথিবীতে আর সম্ভব নয়। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে বৃক্ষরোপণও খুবই জরুরি। কিন্তু তা বলে তোর জন্মদিনে হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে? বাবা, মা জানলে কি বকাটা দেবে একবার ভেবে দেখেছিস।

দেবোত্তম বলল, ছোটোকাকা ও নিয়ে তুমি চিন্তা কর না। বাবা মাকে রাজি করানোর ভার আমার। তুমি শুধু

আমার পাশে থেকে আমাকে হেল্প কর তাহলেই আমি সাকসেসফুল হব। কি করবে তো?

ছোটকাকা দেবোত্তমের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বারো বছরের ছেলে দেবোত্তমের আত্মবিশ্বাস ও মনের দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়।

শান্ত গলায় বলে বেশ আমি আছি তোর পাশে। এগিয়ে যা। তবে জেনে রাখ ঝড় উঠবে!

—উঠুক গে। দেবোত্তম সাহসের সঙ্গে বলল।

এরপর দেবোত্তম একদিন তার জন্মদিনের উৎসব কেন্দ্র করে মনের দুটো ইচ্ছের কথা মা-বাবার কাছে একান্তে জানাল।

প্রথমটা তার জন্মদিনের উৎসবে মাসি-পিসি আত্মীয় স্বজন থেকে এমন কি কোনও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কোনও ধরনের কোনওরকম উপহার স্বরূপ কোন যৌতুক নেওয়া চলবে না। সে ঘড়ি আংটি হোক আর জামা-প্যান্ট হোক।

মায়ের চোখ কপালে উঠল। তার মানে? তুই কি বলতে চাইছিস? তারা যদি তাদের আশীর্বাদ কিংবা শুভেচ্ছা স্বরূপ তোর জন্মদিনে কিছু উপহার দিতেই চায় তুই নিবি না? না মা নেব না। আমরা সেটা ফিরিয়ে দেব।

ফিরিয়ে দেব কেন? সেটা কী ভদ্রতা হবে?

বাবাও মার কথায় ষোলআনা সায় দিয়ে বললেন, ঠিকই তো ওভাবে তাদেরকে রিফিউজ করলে তারা তো অসম্মানিত হবেন। শুভ দিনটাও মাটি হয়ে যাবে। এসব তুই কি বলছিস দেবোত্তম?

দেবোত্তম মাথা নেড়ে বলল, আমি ঠিক ওরকম কথা বলতে চাইছি না বাবা।

—তাহলে?

আমি ওসবের পরিবর্তে প্রত্যেকের কাছ থেকে একটা করে গাছের চারা চেয়ে নেব বাবা। দেবোত্তমের গলায় ষোলআনা আবেগ।

গাছের চারা? মা দেবোত্তমের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি অবাক হয়ে দেখে, ভাবে বলে কী দেবোত্তম। গাছের চারা?

বাবাও রীতিমতো বিস্মিত। মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, তার মানে?

হ্যাঁ বাবা, আমি এরকমটা ভেবেছি, আমি চাই তোমরা সবাইকে বলে দেবে আমার জন্মদিনে যদি কেউ কিছু দিতে চায় তো একটা করে সবুজ গাছের চারা যেন দেয়। তা ফুলের হোক কিংবা ফলের হোক। আমি ভীষণ আনন্দ পাব, খুশি হব।

বাবা বললেন, আশ্চর্য।

মা ঘোর আপত্তি জানিয়ে প্রতিবাদ করলেন। বললেন, অসম্ভব। এমনটি কোনোমতে সম্ভব নয়।

বাবা খানিক গুম থেকে এরপর একটু রেগেই বললেন, দ্বিতীয় ইচ্ছেটা কি শুনি?

মা কৌতূহলের সঙ্গে নড়েচড়ে বললেন, দেবোত্তমের মাথায় আবার কী বদ খেয়াল চেপেছে শোনা যাক।

দেবোত্তম এবার একটু বড়ো ধরনের দম নিয়ে বলল, আমার বয়সি এই অঞ্চলে যে বস্তির ছেলে কটা আছে। যারা আমাকে চেনে, জানে, ভালোবাসে। হয়তো তারা আমার মতো জামা পোশাক-আশাক পরে না। না মা স্কুলে পড়াশোনা করে না, ভালোমন্দ খেতে পায় না কিন্তু ওরা আমায় খুব ভালোবাসে। ওরা আমার জন্মদিনে না থাকলে খুব মিস করব। তাই এবারের জন্মদিনে আমি ওদের প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করতে চাই বাবা।

মা শুনে আবার চোখ কপালে তুলে বললেন এসব তোর কী পাগলামী? ওসব চিন্তাভাবনার ভূত ঘাড় থেকে এখনই নামিয়ে ফেল। ওসব আবদার রাখা কোনওমতে সম্ভব নয়। রীতিমতো অন্যায় আবদার।

দেবোত্তম শক্ত গলায় বলল, না মা আমার এই দুটো ইচ্ছে এবারের জন্মদিনে তোমাদের পালন করতে হবে। তা না হলে—

—তা না হলে কী? তেতে উঠলেন মা।

—তা না হলে আমার জন্মদিনে আমিই থাকব না। বড়োদের মতো দেবোত্তম আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বসল। দমকা হাওয়ার মতো এলোমেলো করে দিল ঘরের পরিবেশ।

মা দেবোত্তমের সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন বয়েসের তুলনায় বড্ড পাকামি হয়ে যাচ্ছে না? শোন, কান খুলে শোন তুই কি চাস না চাস তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথা ব্যথা নেই। কী ভেবেছিস? তোর ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর আমাদের চলতে হবে? ভালো চাস এখনও বলছি ওসব পাগলামী মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল।

বাবা প্রথমটা ভেবেছিলেন দেবোত্তমকে বোঝালে বুঝবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল দেবোত্তমকে বোঝানো

সহজ নয়। দেবোত্তমের বয়সী আর পাঁচটা ছেলের মতো ও হাল্কা নয়, বরং বয়সের তুলনায় একটু বেশি সিরিয়াস। আর সেখানেই সমস্যা।

দেবোত্তমের নাছোড়বান্দা মনোভাব দেখে মা আবার ধমকে বললেন, কী ভেবছ? তুমি যা ইচ্ছে করবে, যা ইচ্ছে বলবে, আমাদের তা মেনে নিতে হবে! কক্ষনো তা হবে না।

দেবোত্তম ঠান্ডা গলায় বলল, না মা তুমি আমায় ভুল বুঝো না। এবারের জন্মদিন আমি ওভাবেই করতে চাই। তুমি অমত করো না মা।

মা রীতিমতো রেগেমেগেই বললেন, আমিও বলে রাখলাম। তোমার মতে তোমার জন্মদিন হবে না। আমি যা করব তাই হবে।

দেবোত্তমও মায়ের চোখের ওপর চোখ রেখে চোয়াল শক্ত করে বলল, বেশ তো কর। আমি কিন্তু আমার জন্মদিনে থাকব না।

বাবা দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি সামলে নেবার চেষ্টা করেন। বলেন, ও ভাবে নিচ্ছ কেন? ওর জন্মদিন। ওর তো কিছু আবদার থাকতে পারে। একটু অ্যাডজাস্ট করে নিলেই তো হয়।

মা গম্ভীর গলায় বললেন, কীসের অ্যাডজাস্ট। আমাদের ইচ্ছে অনিচ্ছার দাম নেই। ওর আবদার শুনতে হবে। পাগলামী মেনে নিতে হবে। কক্ষনো না।

বাবা মাকে সবরকমভাবে ঠান্ডা করার চেষ্টা করেন। বোঝান, বলেন, জন্মদিন যখন ওর, তখন ওর ইচ্ছে অনিচ্ছা থাকতেই পারে সেটা আমাদের শোনা উচিত। ভেবে দেখা উচিত।

মা এবার বাবাকে সরাসরি আক্রমণ করল, তুমি খুব খারাপ করছ কিন্তু! যা নয় তাই ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছ। ফল ভালো হবে না কিন্তু।

বাবা বললেন, ওভাবে নিচ্ছ কেন? এটাও তো সত্যি, বস্তির ছেলেগুলো দেবোত্তমকে ভীষণ ভালোবাসে। তুমিও তা জানো। সেবার আমি অফিসের কাজে বাইরে ছিলাম। একা ছিলে তুমি বাড়িতে। দেবোত্তম স্কুল থেকে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল। সেদিন ওরাই তো এক ছুটে ডাক্তার ডেকে এনেছিল। দেবোত্তম সুস্থ হয়ে না ওঠা অবধি ওরা রোজ খোঁজ খবর নিত। এমনকি তোমার ফাইফরমাশও খেটে দিত। কি দিত কি না?

মা চুপ করে রইলেন। হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না।

বাবা দম নিয়ে আরও বললেন, একবার কিছু বদ ছেলে দেবোত্তমের পিছু নিয়েছিল। যে কোনও কারণে হোক মারবে বলে শাসিয়েছিল। দেবোত্তম দলে ছিল একা।

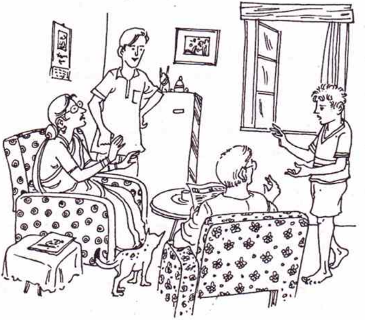

সেদিন ও রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছিল। সেদিনও ওই বস্তির ছেলেগুলো দেবোত্তমের পাশে দাঁড়িয়ে রুখে না দাঁড়ালে দেবোত্তমের বড় ধরনের বিপদ হতে পারত। মনে আছে তোমার?

মা খানিক রাগ নামিয়ে বললেন, তা ঠিকই। আমি তা অস্বীকার করছি না।

বাবা বললেন, তাহলে আর আপত্তি কোথায়। ওদের নেমন্তন্ন করাই যেতে পারে। কী বলো?

মা আর এ ব্যাপারে বিতর্কে গেলেন না। বরং কী ভেবে যেন সবুজ সিগন্যাল দিয়ে দিলেন। বললেন, দেবোত্তমের যখন এত ইচ্ছে ওদের ও নেমন্তন্ন করুক। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে একটা করে গাছের চারা ওর জন্মদিনে কেউ উপহার দিক একথা আমি কাউকেই বলতে পারব না।

দেবোত্তম বলল, প্লিজ মা, ওই দায়িত্বটা তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু আপত্তি কোরো না মা, প্লিজ। এবার দেবোত্তমকে সাপোর্ট করে বাবাও গলা মেলালেন, দেখো দেবোত্তম যখন এ ব্যাপারে স্থির সংকল্প নিয়ে বসে আছে সবুজ গাছের চারা ছাড়া অন্য কিছু উপহার নেবে না এবারের জন্মদিনে ওর ইচ্ছেই না হয় পূরণ হোক। তুমি আর বাধা দিও না। দেবোত্তমের বাবা মনে মনে ভাবলেন একেই ছেলেটা একগুঁয়ে প্রকৃতির। বাধা দিলে যে অশান্তি বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। তিনি তা স্পষ্ট আঁচ করলেন।

মা বললেন, তাই বলে জন্মদিনে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী মাটি লাগানো চারা গাছ নিয়ে ঢুকবে। কী বিশ্রী কাণ্ড হবে ভেবে দেখেছ?

আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন দেবোত্তমের বাবাও। সত্যি বাড়িটার কি হাল হবে। তবু তিনি শান্ত গলায় দেবোত্তমের মা-কে বোঝান। বলেন, তুমি কী ওকে নতুন দেখছ? ছেলেবেলা থেকেই ও গাছপালা বড্ড ভালোবাসে। ওকে আর পাঁচটা ছেলের মতো কখনও ফুল-ফল ছিঁড়তে দেখেছ? অথবা গাছের ডাল ভাঙতে দেখেছ।

মা বললেন, জানি ও গাছপালাকে ভীষণ ভালোবাসে। সেবার তো টগর গাছের চারাটা একরকম মরেই গেছিল। আমরা তো গাছটার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। একমাত্র ওর সেবাযত্নে গাছটা আবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল। এখন তো দিব্যি ফুলও দিচ্ছে।

বাবা বললেন, সত্যি গাছটা যে আবার উঠে দাঁড়াবে। শাখায় কুঁড়ি আসবে। ফুল ফুটবে এ আমিও স্বপ্নে ভাবিনি।

মা বললেন, গাছপালাকে ভালোবাসা ভালো, তা বলে...

বাবা বললেন, গাছপালাকে ও নেহাতই ভালোবাসে না। জন্মদিনে এই যে একটি করে চারাগাছ চাইছে তার একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে।

দেবোত্তম বলল, হ্যাঁ মা, বাবা ঠিকই ধরেছেন। তুমি দেখ আজ চারদিকে কারণে অকারণে বনভূমি ধ্বংস করছে মানুষ। অথচ বড়দের কাছে শুনেছি, জেনেছি অরণ্য হননের আর এক নাম আত্মহনন। আমি তাই আমার জন্মদিন ঘিরে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে মানুষের মনে শুভ বোধ জাগাতে চাই মা।

মা, বাবা দেবোত্তমের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকান। হঠাৎ দেবোত্তমের ভেতর থেকে যেন এক অচেনা দেবোত্তমকে বেরিয়ে আসতে দেখেন।

মা তবু শেষ চেষ্টা চালিয়ে গেছিল ছোটোমামাকে দিয়ে যেহেতু দেবোত্তম ছোটোমামার খুব অনুগত। কিন্তু ছোটমামাও দেবোত্তমের একগুঁয়েমির কাছে পেরে ওঠেনি। বরং দেবোত্তমের দৃষ্টিভঙ্গীর ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল পুরোপুরি। শেষমেশ ছোটোমামা মাকে বলছিল, ও যেটা চাইছে সেটাই মেনে নাও দিদি। সেটা হলেই বোধ হয় মঙ্গল হবে। যাই বলো তাই বলো ওই টুকুন ছেলে কিন্তু চিন্তাভাবনা কি বিশাল সেটা ভেবে দেখেছ দিদি। পারলে আমাদের সকলের ওর পাশে দাঁড়ানো উচিত।

কী জানি বাপু এসব কাণ্ডকারখানার কথা শুনে আমার তো মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এত চারাগাছ রাখব কোথায়। পুঁতবোই বা কোথায়? এছাড়া গাছ পুঁতলেই তো হবে না। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নিয়ম করে গাছের পরিচর্যা করতে হবে। সেসব কে করবে?

সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে দিদি। ওসব নিয়ে তুমি মোটে টেনশন করো না। আমরা তো আছি।

ছোটোকাকাও এগিয়ে এল। বলল, গাছের যত্ন-আত্তি আমি করব। আমি তো বাড়িতে বসেই থাকি। অনেক সময় পাই। তার থেকে না হয় কিছুটা সময় আমি স্পেয়ার করব।

শেষমেশ পরিস্থিতি বুঝে মা চুপ করে গেলেন। দুটি প্রস্তাবে সবুজ সিগন্যাল পেয়ে যেতে দেবোত্তমের খুশি

দেখে কে। আনন্দে আবেগে সে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি ভীষণ ভালো মা। ভীষণ।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন, দেবোত্তমের বন্ধু-বান্ধব আসা শুরু হয়ে গেল। আসছে তো আসছে। আর প্রত্যেকের হাতে গাছের চারা।

প্রথমে এলেন ডায়মণ্ডহারবার থেকে বড়ো মাসি। দরদর করে ঘামতে ঘামতে বারান্দায় পা রাখলেন।

পিছন পিছন ঢুকলেন নামখানা থেকে ছোটো পিসি। দুজনেই হাঁফাতে হাঁফাতে গলা মিলিয়ে বললেন, ট্রেনে-বাসে যা ভিড় গাছের চারা এভাবে আনা যায়। বাসে তো কনডাক্টার কিছুতেই তুলবে না। একরকম জোর-জুলুম করে নিয়ে আসা। নেহাত দেবোত্তম দুঃখ পাবে তাই। এসব কী যে ওর খেয়াল।

বারুইপুর থেকে আসা মেজমাসি বলল, এ এক অভিনব জন্মদিন পালন হচ্ছে। কস্মিনকালে শুনিনি বাপু! বলিহারি চিন্তাভাবনা। কার মাথা থেকে এল কে জানে!

চাম্পাহাটি থেকে এসেছেন ছোটো মাসি। তিনিও গলা মেলালেন, ট্রেনে যা ভিড় তিল ধারণের জায়গা নেই। না ট্রেনে ওঠা যায় না নামা যায়। সেখানে গাছের চারা আনা সেকি চাট্টিখানি কথা। রীতিমতো গালিগালাজ শুনে, লড়াই করে আনতে হয়েছে।

বড়ো মাসি বলল, দেবোত্তম ফোনে আরও বলে দিয়েছে কাজবাড়িতে কেউ কোনো প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে ঢুকবে না। আমার জন্ম দিনে কোনওভাবে পরিবেশ দূষণ করা যাবে না। শোন কথা!

গলা মিলিয়ে আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী সবাই বলল, হ্যাঁ আমাদেরও তাই বলে সাবধান করে দিয়েছে। বাস্তবে প্লাস্টিক ব্যাগ ছাড়া আমরা তো এক মুহূর্ত চলতে পারি না।

দেবোত্তমের মা খানিক অসহায় গলায় বলল, কী করব! এসব তোমাদের দেবোত্তমের হঠাৎ খেয়াল। বলে একটা দিন একটা পরিবারে আমরা কিছু মানুষ তো পরিবেশ সচেতন থাকতে পারি। চারদিকে সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বৃক্ষরোপণের মহাব্রত গ্রহণ করতে পারি।

দিদা এত কিছু জানত না। ব্যাপার-স্যাপার দেখে চমকে গেলেন। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললেন, জন্মদিনে এসব কী উপহার। এতো সব গাছের চারা। নেহাতই ঘর বাড়ি ময়লা করা। ওসব কী হবে?

ব্যস্ত দেবোত্তমের কানে গেল কথাটা। সে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, না দিদা ও গুলো জঞ্জাল নয়। ওগুলো এক একটি প্রাণ।

—প্রাণ। তার মানে।

—ওগুলো আছে বলেই আমরা প্রাণের বন্ধু অক্সিজেন পাচ্ছি। নিঃশ্বাস নিতে পারছি। শুধু তাই নয়। ফুল, ফল মাথা গুঁজবার শীতল ছায়া পাচ্ছি। এক কথায় বেঁচে আছি।

—ওমা তাই নাকি?

দেবোত্তম ব্যস্ত। বলল পরে তোমাকে আরও সব বুঝিয়ে বলব দিদা।

—তাই বলে আজ তোর জন্মদিনে ওই সব উপহার। গাছের চারা। মাটির টব। কি জানি বাবা, আমার তো এসব শুনে মাথা ধরে যাচ্ছে।

দেবোত্তম হাসে। আর কথা বাড়ায় না। চারদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। অনেকের অনেক কৌতূহল ও প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। আবার মাথা ঠান্ডা রাখতে হচ্ছে।

জন্মদিনের শুভ অনুষ্ঠানে আর পাঁচজনের যা হয়ে থাকে দেবোত্তমের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব ঘিরে দাঁড়াল দেবোত্তমকে হাসি-খুশি মুখে মধ্যমণি দেবোত্তম প্রথমে প্রদীপ জ্বালালো। পরে কেক কেটে একে একে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের হাতে তুলে দিল। দেবোত্তম নিজেও মুখে দিল।

হাসি-আনন্দ-গানে সারা বাড়িটা যেন নেচে উঠল। দেবোত্তমকে ঘিরে একে একে কত জনে কত ছবিও তুলল। নির্মল আনন্দে ভেসে গেল গোটা বাড়িটা।

এত কিছুর মধ্যে দেবোত্তমের খেয়াল আছে আজ এই শুভ দিনে একটাও গাছের চারা যেন কোনওভাবে অবহেলিত না হয়। সে ছোটোকাকা ও ছোটোমামা মিলে বাড়ির এক ধারে যত্নসহকারে গাছের চারাগুলোকে রাখার সুবন্দোবস্ত করেছে। এমন কী কোন গাছ কোথায় বসানো হবে সে জায়গাও চিহ্নিত করে রেখেছে দেবোত্তম, ছোটোমামা ও ছোটোকাকা মিলে।

অনেকেই দেখছে স্তম্ভিত হয়ে আনন্দসহকারে গাছের চারাগুলোকে। কত রকমের ফুল ও ফলগাছের চারা। বেল, জুঁই, মল্লিকা, গোলাপ, টগর, বকুল, হাসুহানা, চাঁপা, সূর্যমুখী আবার কৃষ্ণচূড়া, আম, জাম, জামরুল, নিম

সপ্তপর্ণা আরও কত রকমের গাছ। সবাই যেন বলছে আমাকে দেখ, আমাকে দেখ।

প্রথম প্রথম যারা দেবোত্তমের এইসব কাণ্ড কারখানাকে ভালো ভাবে নেয়নি, বাঁকা চোখে দেখেছিল, বেশি বেশি জ্যাঠামী ভেবেছিল তারাও দেবোত্তমের আজকের ভূমিকায় মুগ্ধই শুধু নয়, প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের কাউকে কাউকে এও বলতে শোনা গেল। সত্যি আমাদের ভাবতে হবে। আগামী প্রজন্ম কি ভাবে বেঁচে থাকবে। একদিকে কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া। বর্জ্যপদার্থে গঙ্গা দূষণ। অপরদিকে বায়ুমণ্ডলে রকেট নিক্ষেপ। রাসায়নিক ও জীবাণু বোমা এবং পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এছাড়া তো রয়েছে পৃথিবীর বুকে চলমান মোটর গাড়ির দূষিত গ্যাস নির্গমণ। সব মিলিয়ে ত্রাহি ত্রাহি রব। কতটুকুন ছেলে ও। হতে পারে কিশোর কিন্তু আশাপাশের সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ও। চমৎকৃত হবার মতো ঘটনা শুধু নয় শিক্ষা দেবার মতো ঘটনা। উদাহরণ তুলে ধরেছে দেবোত্তম। প্রতিবেশীদের অনেকেই এগিয়ে এসে থ্যাঙ্কস্ জানায় দেবোত্তমকে।

শত ব্যস্ততার ভেতরেও দেবোত্তমের মা, বাবা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আদর আপ্যায়নে কোনও রকম ত্রুটি রাখলেন না। প্যান্ডেলের ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন বিরিয়ানি থেকে আইসক্রীম। যে যত খেতে পারে।

পরিবেশনে পাছে কোনও ভুল ত্রুটি হয় ঘুরে ঘুরে নজর রাখলেন ছোটোকাকা, ছোটোমামা।

হাজার ব্যস্ততার ভেতরেও দেবোত্তম ঘুরে ঘুরে এল প্যান্ডেলের ভেতর বন্ধুবান্ধবদের কাছে।

আহারের পর্ব শেষ হতে না হতে সচরাচর অনুষ্ঠান বাড়িগুলোতে যা হয়ে থাকে আজও তার ব্যতিক্রম হল না। বাড়ি ফেরার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। প্রথমে প্রতিবেশীদের মধ্যে, পরে আত্মীয় স্বজনের ভেতর। কর্মব্যস্ত জীবনে কে আর অনর্থক সময় অপচয় করতে চায়?

খেয়ে-দেয়ে এখনই সকলের যখন বাড়ি ফেরার তাড়া ঠিক তখনই বাইরে একটি গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। সবাই দেখল একটা প্রেসের গাড়ি এসে থামল দেবোত্তমদের বাড়ির সামনে।

কী ব্যাপার! প্রেসের গাড়ি কেন? ছোটো থেকে বড়ো সবাই কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে রইল।

গাড়িতে কারা? কার কাছে এসেছে? কেনই বা এসেছে? কী চায় ওরা। নানান প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিল উপস্থিত সকলের মনে।

এরপর গাড়ি থেকে নেমে এক সুদর্শন যুবক জিজ্ঞেস করল, এটাই কী অভিজিৎ চ্যাটার্জী বাড়ি? যুবকটি বোধ হয় নিশ্চিত হতে চাইলেন।

দেবোত্তমের বাবা এগিয়ে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ আমিই অভিজিৎ চ্যাটার্জী। কেন বলুন তো?

আপনার ছেলের নাম কী দেবোত্তম চ্যাটার্জী?

হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো?

আগন্তুক যুবকটি হেসে বললেন, সব জানবেন, একটু ধৈর্য ধরুন। এই বলে গাড়ির দিকে তাকিয়ে ইশারা করা মাত্র আরও দুজন যুবক গাড়ি থেকে নেমে এল। তাদের একজনের হাতে ভিডিও ক্যামেরাও দেখা গেল।

ছোটোমামা কৌতূহল সামলাতে পারলেন না, বললেন আপনারা এভাবে হঠাৎ...

যুবকটি এরপর খুলে বললেন, শুনুন আমরা দূরদর্শনের একটি চ্যানেল থেকে আসছি। আমাদের যা কাজ। দিনের বিশেষ খবর সংগ্রহ করা এবং তা সুষ্ঠুভাবে জনগণের মধ্যে তুলে ধরা? আসলে দেবোত্তমের একটা ছোট্ট ইনটারভিউ নিতে এসেছি আমরা।

—ইনটারভিউ? মায়ের চোখ কপালে ওঠে। আশ্চর্য! ভাবেন, কি এমন কাজ করেছে দেবোত্তম? যাতে করে একটা চ্যানেল তার কাছে দৌড়ে এসেছে। কোথায় সে তাকে ডাকুন। আমরা তার সঙ্গে আগে পরিচিত হই।

মা, বাবা ডাকার আগে দেবোত্তম নিজে থেকে এগিয়ে এসে স্মার্টলি বলল, আমিই দেবোত্তম।

তুমিই সেই আজকের মহৎ কাজের নায়ক? এই বলে হেসে হাত বাড়িয়ে একে একে তিনজনেই দেবোত্তমের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে অভিনন্দন জানাল।

আনন্দে গর্বে চকচক করে উঠল বাবা ও মায়ের মুখ। আশ্চর্য! দেবোত্তমের ইনটারভিউ দূরদর্শনের চ্যানেলে দেখানো হবে। দেবোত্তম কাগজের খবর হবে! এ কী স্বপ্ন। না সত্যি!

ছোটোমামা আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, কী বলেছিলাম দিদি! ও একটা জিনিয়াস।

ছোটোকাকা বলল, সত্যি দেবোত্তম আমাদের গর্ব। ওকে আমরা চিনতে সবাই ভুল করেছি।

বাবা বললেন, দেবোত্তমের জন্মদিন মানুষের চৈতন্য,

মনকে এভাবে নাড়া দেবে, দূরদর্শনের খবর হবে তা একটু আগে স্বপ্নেও ভাবিনি।

গোটা ব্যাপার-স্যাপার দেখে মা শুধু হকচকিয়েই যায়নি। রীতিমতো স্তম্ভিত। আগাগোড়া ঘটনাকে দেবোত্তমের ফচকেমি বলে ভেবেছিল। সেটা যে হঠাৎ এত বড়ো গুরুত্ব পেতে পারে মা তা স্বপ্নেও ভাবেননি। এমন কী এখনও তাঁর পুরোপুরি সংশয় যায়নি। তাই এত কিছুর পরেও সকলের সামনে মা ফস করে বলে ফেললেন, দেবোত্তম কী এমন কাজ করেছে যে ওকে আপনারা ক্যামেরা বন্দী করতে এসেছেন? আমি তো এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

একথা শুনে সুদর্শনধারী যুবকটি বললেন, কী বলছেন মাসিমা? গোটা দুনিয়া যখন দূষণের ব্যাপারে উদাসীন তখন একটা কিশোর ছেলে যে পরিবেশ দূষণ নিয়ে কিছু ভাবছে, কিছু করে দেখাতে চাইছে সেটা কী কম কথা হল? সেটা তো খবর হবেই। শুধু তাই নয়, দেবোত্তমের জন্য আরও একটি সুখবর রয়েছে মাসিমা।

সুখবর! কী রকম? দেবোত্তমের বাবা, মা, ছোটোমামা, ছোটো কাকা থেকে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ল খবরটা জানার জন্য।

—আমাদের চ্যানেল থেকে এ বছর দেবোত্তম একটি পুরস্কার পেতে চলেছে।

—পুরস্কার? বলেন কী?

—হ্যাঁ, পুরস্কার। পরিবেশ-দূষণ প্রতিরোধ কল্পে প্রতি বছর ৫ জুন রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে যে বিশ্ব-পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়, ওদিন আমাদের চ্যানেল থেকে পরিবেশ নিয়ে যারা কাজ কর্ম করেন, ভাবেন তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এবারের পুরস্কারটি পাচ্ছে দেবোত্তম।

বলেন কী? পুরো ব্যাপারটা সকলের কাছে স্বপ্নবৎ মনে হল।

—হ্যাঁ, আর পুরস্কারটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজে হাতে দেবোত্তমের হাতে তুলে দেবেন।

—কী বলছেন? আমাদের দেবোত্তম মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার পাবে? ছোটো মামা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল।

—হ্যাঁ, আসলে কিশোর দেবোত্তমকে সমাজের বুকে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। দেবোত্তমের দেখাদেখি যাতে আগামী দিনে ঘরে ঘরে লক্ষ দেবোত্তম তৈরি হয়। আমাদের সেটাই মূল উদ্দেশ্য। যাইহোক এখন আলো আর ক্যামেরার সামনে আসার আগে ওকে একটু ফ্রেশ হতে বলুন।

সংসারে এমন কিছু কিছু খুশি আর আনন্দ রয়েছে যা কোটি-কোটি অর্থ মূল্যে ক্রয় করা যায় না। যা পেলে মানুষের মুখ চাঁদের মতন সুন্দর হয়ে ওঠে, পবিত্র দেখায়। জীবন অপার্থিব আনন্দে ভেসে যায়।

দেবোত্তমের কর্মকাণ্ডে বাবা মা ছোটোকাকা, ছোটোমামা এখন সে রকমটা খুশি আর আনন্দের মধ্যে অবগাহন করছে।

দেবোত্তমের মা এক ঝলক খুশিতে চাপা গলায় কী যেন বললেন দেবোত্তমের বাবার কানে কানে। আর অমনি দেবোত্তমের বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে নমস্কারের ভঙ্গীমায় বিনয়ের সঙ্গে আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আলো আর ক্যামেরার সামনে আসার আগে দেবোত্তম একটু তৈরি হয়ে নিক, কিন্তু ততক্ষণ আপনারা খালি মুখে বসে থাকবেন। তা তো হয় না।

—ওসবের কোনো দরকার নেই মেসোমশাই। আমরা সকলেই ভরাপেটে রয়েছি। আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলে উঠল।

দেবোত্তমের মা আবেগে ও খুশিতে যার পর নাই গদগদ হয়ে দেবোত্তমের বাবার সঙ্গে গলা মেলালেন। তা বললে হয়? কথায় আছে অতিথি নারায়ণ। আজ এই শুভদিনের শুভ মুহূর্তে আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গ পেয়েছি। কম সৌভাগ্যের কথা? খালি মুখে তো আপনাদের ফেরাতে পারি না তাতে করে যে দেবোত্তমের অকল্যাণ হবে। কিছু খেয়ে যেতে হবে।

কথার ছেদ পড়ল। দেবোত্তমের মা-কে থামিয়ে দেন দেবোত্তমের বাবা। বলেন, জানি আপনারা ব্যস্ত মানুষ। বেশি সময় তাই আপনাদের নষ্ট করব না। এখনই ছেড়ে দেব। আসুন ভেতরে আসুন। আসন গ্রহণ করুন। একটা কিছু মুখে না দিয়ে যাবেন না। প্লিজ।

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

ভূতের গল্প

সত্যি ভূত মিথ্যে ভূত

কাশীনাথ ভট্টাচার্য

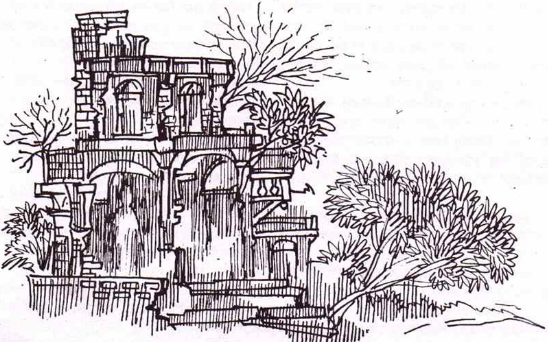

খবরটা খুব দ্রুত রটে গেল। ভট্টাচার্য পাড়ায় আজ কাল নাকি ভূতেরা আসা যাওয়া করছে। বাস্তববাদী লোকেরা ব্যাপারটা পাত্তা না দিলেও অনেকেই তা বিশ্বাস করতে লেগেছে। এই নিয়ে পাড়ার মহিলা মহলে, চায়ের দোকানে এমনকি স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেও ভূত এখন আলোচ্য হয়ে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে খবরটা রটে নাকি তমাল গুহঠাকুরতার বাড়ি থেকে।

তমাল গুহঠাকুরতা এই অঞ্চলের একজন নামকরা অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষক। বহু ছাত্র-ছাত্রী তার কাছে পড়তে আসে। কেউ কামাই করলে যেমন উত্তম মধ্যম আছে আবার মাঝে মাঝে গুল্পগুজবে আসর জমেও ওঠে। তমাল স্যার শুধু পড়াশোনাই করান না, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ক্যুইজ করান। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান মনস্ক হয় তার জন্য নানা গল্পও বলেন। নানাভাবে সকলের মধ্যে সাহস যোগান, বুদ্ধির গোড়ায় সান দেওয়ার নানা ব্যবস্থা করেন।

তমাল স্যারের বাড়িটা বেশ ভেতরে। প্রধান সড়ক থেকে চারটে দীর্ঘ গলি পার হয়ে তবেই স্যারের বাড়ি পৌঁছানো যায়। রাতের বেলা ওই গলি দিয়ে হাঁটতে বেশ গা ছম্ ছম্ করে। স্যারের বাড়ির কাছাকাছি শেষ গলিটায় এসে একটু দূরে ডান দিকে এগিয়ে গেলেই বন জঙ্গল ঘেরা একটা পোড়োবাড়ি দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে আছে। আসপাশটা খুব ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনের পা এখানে পড়ে বলে মনে হয় না। অপ্রয়োজনীয় জায়গা বলে এখানে কোনও আলোর ব্যবস্থা করা হয়নি। পোড়োবাড়ির বয়স

যে কত হল তা কেউ বলতে পারে না। তবে এ অঞ্চলের এক জমিদার ইংরেজ আমলে এটা তৈরি করেছিল বলে অনেকের ধারণা। গ্রাম ও শহর মেশা এমন এক জায়গায় এমন একটা বাড়ি সকলের মধ্যেই একটা রহস্য জাগায়। দিনের বেলাতেও এই বাড়িটা পুরোপুরি দেখা যায় না। একবারে ভগ্ন দশা। গাছগাছালি, লতা পাতা, বট অশত্থ ঘিরে রেখেছে পুরো বাড়িটা। গাছপালার আড়াল থেকে উঁকি মারছে স্যাঁতস্যাঁতে ভাঙা ভাঙা ইট। কোথাও কোথাও দেওয়াল ভেঙে পড়ে আছে। কোথাও কোথাও জানালা দরজা বলে আর কিছু অবিশিষ্ট নেই। তমাল স্যারের বাড়ি যেতে ওই বাড়িটার দিকে সকলেই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একবার তাকাবেই।

এই গলি পথ দিয়েই সে দিন রাত্রে তমাল স্যারের বাড়ি থেকে টিউশানি পড়ে ফিরছিল মনিদীপা। সে নাকি স্পষ্ট দেখেছে একটা ছায়ামূর্তি পোড়োবাড়িটার দিকে চলে যাচ্ছে। সেই মূর্তি নাকি স্বাভাবিক কোনও মানুষের মূর্তি নয়। ঠিক ভূতের মতন। সেই মূর্তি দেখে মনিদীপা আর একা একা পড়তে আসে না। কেউ না কেউ স্যারের বাড়িতে ওকে দিয়ে যায় ও নিয়ে যায়। ক্লাস নাইনে পড়া মেয়ের এত ভয় দেখে ওর বন্ধুরা মনিদীপাকে খুব খেপায়। আসলে মনিদীপা খুব ভীতু মেয়ে। এই ভীতু হওয়ার সুযোগ নিয়ে জাগরী, অহনা, অন্বেষা, ঋতুপর্ণারা মনিদীপাকে বেশ খেপায়, পেছনে লাগে।

একদিন তো তমাল স্যার পড়াচ্ছেন বেশ মন দিয়ে। ব্ল্যাকবোর্ডে একের পর এক অঙ্ক বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সবাই বেশ মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে। তমাল স্যারের মনে হল মনিদীপার মনটা অঙ্কের মধ্যে নেই, তাই তিনি বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, মনিদীপা, বোর্ডে এসে পরের অঙ্কটা করে দে। মনিদীপা এমনিতে পড়াশোনায় বেশ ভালো। অঙ্ক বোঝে। সে তাড়াতাড়ি ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল অঙ্কটা করতে। সবে অঙ্কটার দুলাইন কষেছে হঠাৎ লোডসেডিং। চারদিক অন্ধকার। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। তমাল স্যারের তিনতলা ঘরে টিউশানির ক্লাস হয়। তিনতলার খোলামেলা ঘর থেকে যেটুকু আকাশের আলো আসে তাই দিয়েই অস্পষ্টভাবে জানালা দরজা থেকে যেটুকু দেখা যায় তাই দেখছে সবাই। হঠাৎ দরজার ওপর দেখা গেল একটা ছায়া মূর্তি। জাগরী চেঁচিয়ে উঠল, মনিদীপা ওই দ্যাখ ভূত! দরজার দিকে তাকিয়ে সবাই অবাক! সত্যিই একটা ছায়া মূর্তি! এই ফাঁকে জাগরী নাকিসুরে বলে উঠল, আঁমি পোঁড়োবাড়ির ভূঁত! মঁনিদীঁপাকেঁ নিঁয়েঁ যেঁতেঁ এঁসেছিঁ! চঁলে আঁয়, চঁলে আঁয় বঁলছিঁ।

মনিদীপা অত্যন্ত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এক লাফে বন্ধুদের কাছে ফিরে যেতে গিয়ে স্যারের টেবিলটা উলটিয়ে দিল। টেবিলটা গিয়ে পড়ল অহনার গায়ে। মনিদীপা অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে একটা বেঞ্চে ধাক্কা খেলো। বেশ জোরে লেগেছে। খুব জোরে চিৎকার করে উঠল মনিদীপা-বাবা গো, মা গো। মরে গেলাম। উঃ উঃ...মরে গেলাম বাঁচাও...!

মনিদীপার এমন অবস্থার মধ্যে সকলের চোখ খোলা দরজার দিকে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সাদা রঙের মূর্তি! সাদা কাপড়ে শরীর ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। এই মূর্তি দেখে সবাই বোধহয় একটু ভয় পেয়েছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু মনিদীপা ধীরে ধীরে ফিস ফিস করে বলে যাচ্ছে রাম রাম রাম...!

হঠাৎ বিদ্যুৎ এল। জ্বলে উঠল আলো। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল তমাল স্যার সাদা শাল গায়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ধকারের মধ্যে কখন তিনি নীচে নেমে শাল গায়ে দিয়ে চলে এসেছেন তিনতলায় তা কেউ জানতে পারেনি। স্যারকে দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। হাসল না মনিদীপা। ওর চোখে তখনও জল। কী যেন একটা ঘোরের মধ্যে তখনও সে রয়েছে।

তমাল স্যার ঘরে ঢুকে বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তোদের রকম সকম দেখছিলাম। মনিদীপা, তুই অত ভয় পেলি কেন? ভূত বলে কি কিছু আছে? মনিদীপা বলল, হ্যাঁ স্যার, আমি নিজে ওই পোড়োবাড়িতে ভূতকে যেতে দেখেছি। অদ্ভুত তার চেহারা! স্যার আমি শুনেছি অনেকদিনের পোড়োবাড়িতে ভূতেরা গুপ্তধন পাহারা দেয়। আমি যে নিজের চোখে ভূত দেখেছি কেউ বিশ্বাস করছে না স্যার! কথাগুলো বলতে বলতে মনিদীপা শব্দ করে কেঁদে উঠল। আর এমন সময় স্যারের বাড়ি কাজের মাসি মালতি স্যারের জন্য চা দিতে এসে মনিদীপার সমস্ত কথা শুনে ফেলল। আর মালতি শোনা মানে পরের দিনই সারা পাড়ায় রটে গেল ভূতের খবর। মুখ থেকে মুখে নানা রং মেখে পোড়োবাড়ির ভূতের গল্প ছড়িয়ে পড়ে অনেক দূর পর্যন্ত।

এলাকার অধিকাংশ মানুষ বেশ রসাল করে বলতে লাগল—'ভট্টাচার্য পাড়ার পোড়োবাড়িতে ভূতেরা গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে'।

তমাল স্যারের বাড়িতে দিনের বেলায় ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যেও ভূতের গল্প বেশ ছড়িয়ে পড়ল। স্যার ওদের ধমক টমক দিয়ে থামিয়ে রাখে। কিন্তু সন্ধেবেলার মনিদীপা, অহনা, অন্বেষা, জাগরী ঋতুপর্ণাদে ব্যাচে ভূত বিষয়ক গল্প বেশ জাঁকিয়ে বসল। মনিদীপা দিনে দিনে যত বেশি ভীতু হয়ে উঠল তত বেশি করে অহনা জাগরী তার পেছনে লাগতে লাগল। এভাবেই চলছিল দিন। স্যার বকে ঝকে ভূতের আলোচনা থামিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেশ কিছু দিন পর মনিদীপা স্যারকে বলল, স্যার আপনার বাড়িতে আসার সময় রাস্তায় একদল লোক বলাবলি করছিল ওরা নাকি পোড়োবাড়িতে ভূতকে যেতে দেখেছে। অনেকদিন পর আবার অঙ্ক করার ফাঁকে ফাঁকে ভূত নিয়ে আলোচনা শুরু হল। আর মনিদীপার কান্না কান্না গলায় আরও কান্না এসে হাজির।

মনিদীপার এই ভয় পাওয়াটা তমাল স্যারকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। মনে মনে একটা মতলবও ফেঁদে ফেলেছেন যা দিয়ে মনিদীপার ভূতের ভয়টাও কাটানো যাবে। আর মতলব অনুযায়ী কাজও শুরু করে দিলেন।

তমাল স্যারের বাড়িতে ক্লাস নাইনের টিউশান শুরু হয় সন্ধে সাতটায়। ছ'টা সাড়ে ছ'টার মধ্যেই সকলে আসতে শুরু করে। অন্য দিনের মতো আজও স্যার সাতটায় অঙ্ক করানো শুরু করলেন। কিছুক্ষণ অঙ্ক করানোর পর স্যার যে যার খাতায় একটি অঙ্ক কষতে দিলেন। সবাই যখন মন দিয়ে অঙ্ক কষছে স্যার সেই সময় খুব ধীরে ধীরে শব্দহীনভাবে দেওয়ালে আলোর সুইচটা অফ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে জাগরী পরে আহনা বলল, মনিদীপা সাবধান, পোড়োবাড়ির ভূত আসছে, ওই তাকিয়ে দ্যাখ দরজার দিকে, ভালো করে দ্যাখ! ভূত আসছে! ভূতের কথা শুনে মনিদীপা কান্না গলায় বলল, স্যার! স্যার!

তমাল স্যার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর মনিদীপাকে বলল, আমার মনে হয় ভূত বলে কিছু নেই। আচ্ছা আমি যদি এখন ওই পোড়োবাড়ি থেকে ঘুরে আসি তবে নিশ্চয় বিশ্বাস করবি ভূত বলে কিছু নেই। মনিদীপা বাদে সবাই বলল, হ্যাঁ স্যার তাই হবে। অহনা আর জাগরী বলল, স্যার আপনাকে যেতে হবে না আমরা দুজন যাব। মনিদীপা বলল, না স্যার কাউকে যাবার দরকার নেই। ওখানে গেলে ক্ষতি হতে পারে। না স্যার, কেউ যাবেন না। স্যার বললেন, সাহস, বুদ্ধি এসব না থাকলে কেউ বড় হতে পারে না। যাক অহনা আর জাগরী। কিচ্ছু হবে না। অহনা আর জাগরী তোরা যা। আমরা তোদের জন্য এখানে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করব।

অহনা আর জাগরী নিজেদের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পোড়োবাড়ির উদ্দেশ্যে। সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছে তমাল স্যার তাদের কাছে এসে বললেন, তোরা যেন সত্যি সত্যি পোড়োবাড়িতে যাস না। তিনটে গলি পরে যে একতলা হলদে রঙের বাড়িটা আছে ওটা আমার বন্ধুর। ওখানে গিয়ে তোরা ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবি। আমার বন্ধুর কাছে অনেক ইন্ডোর গেমস আছে খেলতে পারবি। এক ঘণ্টা পরে যখন ফিরে আসবি আমার বন্ধু একটা জিনিস দেবে যেটা পোড়োবাড়িতে যাওয়ার নিদর্শন, প্রমাণ। ওটা নিয়ে চলে আসবি। যা সাবধানে যাবি।

অহনা আর জাগরী বেরিয়ে পড়ল। দুজনের কাঁধে ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে টর্চ লাইট, জলের বোতল, মোবাইল আর বই খাতা। ওরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে গলিটার যেখানে এসে দাঁড়াল সেখান থেকে পোড়োবাড়িটা বেশ অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। জাগরী অহনাকে বলল, যাবি পোড়োবাড়িতে? অহনা বলল, যাবি? জাগরী একটু ভেবে বলল, চল যা হয় হবে। টর্চ আর মোবাইল তো আছে কিছু একটা করা যাবে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারপর দুজনেই চলল পোড়োবাড়িটার দিকে। অহনা ফিস ফিস করে বলল, মোবাইলটা সাইলেন্ট মুডে রাখ। কল আসলে শব্দ হবে না। আর টর্চের আলো পুরো জ্বালানো ঠিক হবে না। দাঁড়া আমার ব্যাগে খাতার মলাটে লাল সেলোফেন পেপার লাগানো আছে, ওই কাগজ দিয়ে দুটো টর্চের মুখ ঢেকে দিয়ে জ্বালালে কম আলো হবে, দূর থেকে কেউ অতটা বুঝতে পারবে না।

এই ভাবে খুব অল্প আলো জ্বালিয়ে দুজনে অত্যন্ত ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। এদের দুজনের খুব সাহস। গোয়েন্দা ও অ্যাডভেঞ্চার গল্প পড়ে পড়ে এদের মধ্যে সব সময় ফেলুদা হওয়ার ইচ্ছা। যে কোনও বিষয়কে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার প্রবণতা প্রবল। তাই এমন

একটা রহস্যময় সুযোগ হাতের মধ্যে আসতে ওরা তা লুফে নিয়েছে। কিছু দূর এগোবার পর কিসের একটা শব্দ হল। কারো ডাক বলে মনে হয়। দুজনে একটু থমকে দাঁড়াল। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘন জঙ্গলটার মধ্যে খুব একটা কিছু দেখা যাচ্ছে না। আবার কিছু একটা ডাকার শব্দ হল। দুজনে তা মন দিয়ে শুনল। অহনা বলল, ওটা কিছু না, পেঁচার ডাক। আমাদের বাড়ির কাছে প্রায় প্রতিদিন এই ডাক শুনতে পাই। বাবা এই ডাকটা আমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। আরও একটু এগোতেই দুজনের মুখে জড়িয়ে ধরল ঘন মাকড়সার জাল।

কোনক্রমে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ধীর পায়ে এগোতে লাগল। গায়ে এসে লাগছে কত অজানা গাছের ডাল পাতা। শুকনো পাতার ওপর পা ফেলার শব্দ হচ্ছে। চোখ কান সজাগ রেখে দুজনে এগোচ্ছে। এক সময় পৌঁছে গেল একাবারে পোড়োবাড়ির মধ্যে। দুজনে হাত ধরাধরি করে এক জায়গায় দাঁড়াল। জাগরী অহনার কানে ফিস ফিস করে বলল, কিছুক্ষণ আলো না জ্বালিয়ে চুপচাপ দাঁড়া, চোখ কান খুলে শুধু চারদিকটা ভালো করে পরখ করি, কিছু শব্দ-টব্দ আসে কিনা দেখি।

চারদিক ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুজনে ভীষণ চুপচাপ। নিজেদের নিশ্বাসের শব্দ নিজেরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, না আর কোনও শব্দ নেই। শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। এই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দুজনের চোখ চারদিকে ঘুরছে, যদি অস্পষ্ট কিছু দেখা যায়। না কিছু দেখা গেল না। শুধু কয়েকটা বাদুড় বা চামচিকে এদিক ওদিক উড়ে গেল বলে মনে হল।

এদিকে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হয়ে গেল জাগরী অহনা আসছে না দেখে তমাল স্যার দুঃশ্চিন্তায় পড়লেন। বন্ধুকে ফোন করে জানতে পারলেন, ওর দুজন তার বাড়িতে যায়নি। তাই জাগরীর মোবাইল ফোনে এস এম এস এল, তোরা কোথায়? তাড়াতাড়ি চলে আয়। জাগরী এস এম এসের উত্তর দিল, আপনারা তাড়াতাড়ি পোড়োবাড়িতে চলে আসুন।

এদিকে অহনা আর জাগরী অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

থাকার পর দুজনে এক সঙ্গে টর্চ জ্বালল। এদিক ওদিক টর্চ দুটো ঘোরাতে লাগল। টর্চের আলো দুটো খুব ক্ষীণ, রক্ত বর্ণ। এই আলোর সঙ্গে সঙ্গে দুজনের চোখ যখন ঘুরছে তখন হঠাৎ একাবারে মানুষের গলায় কারা যেন বলে উঠল, ভূ...ত, ভূ...ত! ও ভূ...ত, আ...ম...রা তোমার কা...ছে এসেছি। গুপ্তধন কোথায় বলে দাও। অহনা আর জাগরী বুঝতে পারল, ওদের হাতের লাল লাল আলো দেখে কোনো মানুষ ভুলকরে অহনা আর জাগরীকে ভূত ভেবেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাগরী নাকি সুরে বলল, আঁমরাঁ ভূঁত নঁয় পেঁতনি। আঁগে বঁল তোঁরা কাঁরা? কঁজন আঁছিস? উত্তর এল, আমরা দুজন কালু আর জগাই। আমরা এখন প্রতিদিন এখানে আসা যাওয়া করি। তোমাদের দেখা পাই না। আমরা চোর। এখন আর চুরি করে সংসার চলে না। কারো বাড়িতে আর দামি জিনিস থাকে না চুরি করে ক'পয়সা পাই বলো! তাই তোমাকে আজকে পেয়ে বলছি ওহে ভূত ভাই, না না ওহে পেতনি বোন যদি আমাদের কিছু গুপ্তধন দাও তবে আমরা আর চুরি করব না। গুপ্তধন পেলে আমরা দুজন খুব একটা ঘটা করে ভূতের, না না পেতনির পুজো করব। অহনা বলল, আমাদেঁর দেঁখে তোঁদের ভঁয় কঁরছে নাঁ? চোরেরা বলল, না, মানে আমাদের কাছে তো মন্ত্র পড়া মাদুলি আছে তাই একটু কম কম ভয় করছে। জাগরী এবার বলল, ঠিঁক আঁছে তোঁরা এঁবার চোঁখ বঁন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাঁক। আঁমাদের দেঁখার চেঁষ্টা কঁরবি নাঁ। যাঁ যাঁ বঁলব তাঁই তাঁই কঁরবি, নাঁ কঁরলে ঘাঁড় মঁটকে দেঁব। অমনি চোর দুটো বলল, আমরা তাই করব। অহনা বলল, চোঁখ খুঁললেই তোঁদের মঁরণ। এঁকটু দাঁড়া আঁমরা এঁকটু আঁলোচনা কঁরেনিই, কঁতটা গুঁপ্তধন তোঁদের দেঁয়া যাঁবে। চোঁখবঁন্ধ। চোঁখ খুঁললেই নিঁর্ঘাত মঁরণ। আঁমরা বঁললে তঁবে চোঁখ খুঁলবি।

ঠিক এই সময় তমাল স্যার মনিদীপা, অন্বেষা, ঋতুপর্ণাদের দল ও পাড়ার কয়েকজন জোয়ান ছেলেকে নিয়ে পোড়োবাড়িতে ঢুকল। অনেকগুলো টর্চ এক সঙ্গে জ্বলতে চারদিক আলোয় আলো। অহনা নাঁকি সুরে বলল কেউ কঁথা বঁলবে নাঁ। অহনা আর জাগরী টর্চের ওপর থেকে লাল কাগজ খুলে ফেলে চোর দুটোর ওপর আলো ফেলল। কালো চাদরে মোড়া চোর দুটো তখনও চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। জাগরী মনিদীপার হাত ধরে বলল, তোর ভূত! মনিদীপা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, হ্যাঁ স্যার আমি মনে হয় এমন ভূতই দেখেছি। অহনা বলল, এরা ভূত নয়। এরা নাম করা চোর। স্যার চোর দুটোকে ধরুন। অহনার কথা শেষ হওয়ার আগেই স্যারের সঙ্গে আসা জোয়ান ছেলেগুলো চোর দুটোকে ধরে ফেলল। মনিদীপা এবার বেশ সাহস পেয়ে জাগরী আর অহনাকে বলল, সত্যি ভূত বলে কিছু নেই না! অহনা অমনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ছড়া কেটে বলল,

ভূত বলে কিছু নেই
সব ভুল মনে
দিন রাতে ঝেপ্ ঝাড়ে
কত রূপ বনে।
মানুষেরা ভূত সেজে
থাকে কেউ কেউ
তাই দেখে অনেকেই
কাঁদে ভেউ ভেউ।

ছবি : শংকর বসাক

ম্যাজিকের গল্প

অদৃশ্য ভ্রমণ

যাদুকর সমীরণ

আজ তোমাদের যে খেলাটা শেখাতে যাচ্ছি সেটা সত্যই সুন্দর খেলা। খেলাটা দেখতে দারুণ ভালো লাগে। প্রথমেই তোমাদের খেলাটার একটা বর্ণনা দিই।

স্টেজের পর্দা খুলে গেল। স্টেজের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা টেবিল। টেবিলের ওপরে পাশাপাশি বসানো আছে ছটা কাঁচের গ্লাস। প্রথম গ্লাসে রয়েছে সাধারণ স্বচ্ছ পরিষ্কার জল, দ্বিতীয় গ্লাসে আছে লাল রঙ-এর জল, তৃতীয় গ্লাসে সাধারণ জল, চতুর্থ গ্লাসে লাল রঙ-এর জল, পঞ্চম গ্লাসে সাধারণ জল এবং ষষ্ঠ গ্লাসে রয়েছে লাল রঙ-এর জল। অর্থাৎ সাধারণ জল এবং লাল জল একটা অন্তর একটা গ্লাসে সাজানো থাকবে। যাদুকর স্টেজে ঢুকলেন এবং দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। টেবিলে রাখা ছটি গ্লাসের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন :

"উপস্থিত দর্শকবৃন্দ, আপনারা একটু লক্ষ করে দেখুন টেবিলের ওপরে ছটি গ্লাস রাখা হয়েছে। এই ছটি গ্লাসে সাধারণ কলের জল এবং লোহিত সাগরের জল আছে। প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম গ্লাসে রয়েছে সাধারণ কলের স্বচ্ছ জল, যা আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করে থাকি। দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ গ্লাসে রয়েছে লোহিত সাগরের লাল জল, যা আমি বহু কষ্টে সংগ্রহ করে এনেছি। এই সাধারণ জল এবং লোহিত সাগরের জল দিয়ে আমি আমার এবারের ম্যাজিকটা দেখাব। আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, সাধারণ জল এবং লোহিত সাগরের জল কোনওটাই পাশাপাশি গ্লাসে পর পর রাখা নেই। একটা অন্তর একটা গ্লাসে এগুলি রয়েছে। লোহিত সাগরের জলের একটা বিশেষ গুণ রয়েছে। সেই গুণটা হল, একটা যাদুকরী মন্ত্র যদি একে শোনানো হয় তাহলে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সমস্ত লোহিত সাগরের জল পাশাপাশি চলে আসে। অর্থাৎ আমি যদি গ্লাসে রাখা জলগুলিকে এই মন্ত্রটা শোনাই, তাহলে সাধারণ জলকে হটিয়ে দিয়ে লোহিত সাগরের জল পাশাপাশি তিনটে গ্লাসে চলে আসতে পারে। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ জলকেও বাধ্য হয়ে পাশাপাশি তিনটে গ্লাসে চলে যেতে হবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই যে জলের এক গ্লাস থেকে অপর গ্লাসে চলে যাওয়া—এটা ঘটবে সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে। আপনারা বুঝতেও পারবেন না কখন কিভাবে এটা ঘটল। সেজন্যই আমি এই খেলাটার নাম দিয়েছি—'অদৃশ্য ভ্রমণ'। যাই হোক, এবার আমি আপনাদের সামনে সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটিয়ে দেখাচ্ছি।"

বক্তৃতা শেষ করে যাদুকর ছটা গ্লাসকে ছটা বড় সাইজের রুমাল দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর তিনি জানালেন এবারে সেই ম্যাজিকের মন্ত্রটা পড়লে পরেই অদৃশ্যভাবে জলেদের যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে। রুমাল ঢাকা ছটা গ্লাসের সামনে যাদুর কায়দায় হাত নাড়তে নাড়তে যাদুকর পড়লেন তাঁর বিচিত্র যাদুর মন্ত্র :

"লম্বা ভূত আর বেঁটে ভূতে
হল্লা করে শেষকালে,
বেঁটে বসে গাছের তলায়
লম্বা ওঠে মগ্‌ডালে।
হল্লা তাদের ছুটলো জোরে
ছুট্‌ছে যেন পঞ্চবাণ,
কাঁপছে তাতে আকাশ-বাতাস।
লোহিত সাগর কম্পমান।
লম্বা-বেঁটের মন্তরেতে
আজও জলে উঠছে ঢেউ,
এধার থেকে যাচ্ছে ওধার
দেখতে নাকি পায় না কেউ।"

আজব মন্ত্র পড়া শেষ করে যাদুকর ছ'টা গ্লাসের ওপরে

ঢাকা রুমালগুলো চট্ চট্ করে সরিয়ে নিলেন।

কী বিস্ময়কর কাণ্ড!

যাদুকর যা বলেছিলেন, তাই ঘটে গেছে। প্রথম তিনটে পাশাপাশি গ্লাসে অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্লাসে এসে গেছে, সাধারণ পরিষ্কার জল ; আর পরের তিনটে পাশাপাশি গ্লাসে অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ গ্লাসে রয়েছে লোহিত সাগরের লাল জল। কেমনভাবে ঘটলো এই অদৃশ্য ভ্রমণের ব্যাপারটা তা অতি বুদ্ধিমান দর্শকেরা অনেক ভেবে-ভেবেও বার করতে পারলেন না। অনেকে হয়তো ভেবেও নেবেন ওই মন্তরের গুণেই বোধহয় ঘটলো ব্যাপারটা।

এবারে নিশ্চয় তোমাদের শিখতে ইচ্ছে করছে কেমনভাবে ঘটলো এই বিস্ময়কর ঘটনাটা। এসো এখন আমরা এর কৌশলটা নিয়ে আলোচনা করি। এই খেলাটা করতে গেলে তোমাদের একটু ব্যাপার একটু পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে। জলের মধ্যে যদি সামান্য ফেনোফথেলিন এবং একটুখানি সোডিয়াম কার্বনেট মেশানো হয় তাহলে জলের রং লাল হয়ে যায়। প্রথমে এক গ্লাস জলে সামান্য ফেনোফথেলিন এবং এক চিমটি সোডিয়াম কার্বনেট মিশিয়ে নেবে। এতে জলের রং লাল হয়ে যাবে। এবারে তোমাদের বাজার থেকে এমন একটা গুঁড়ো লাল রঙ কিনতে হবে যেটা জলের সঙ্গে মেশালে পরে ঠিক ওই কেমিক্যাল তৈরি লাল রঙ-এর মতো দেখায়। বাজারে দু-তিন রকম লাল রং পাওয়া যায়। তার মধ্যে ঠিক কোন্টা তোমাদের কিনতে হবে সেটা ওই কেমিক্যালে তৈরি লাল জলটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে। এটুকুই শুধু পরীক্ষা করে দেখার ব্যাপার।

এবার কি করতে হবে বুঝে নাও। প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম গ্লাসে সাধারণ কলের জল রাখতে হবে। দ্বিতীয় গ্লাসের জলে একটু ফেনোফথেলিন এবং এক চিমটি সোডিয়াম কার্বনেট মিশিয়ে নিতে হবে, তাহলেই এটা লাল দেখাবে। চতুর্থ এবং ষষ্ঠ গ্লাসের জলের সঙ্গে বাজার থেকে কেনা লাল রঙ-এর গুঁড়ো পরিমাণমতো মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে একই রকম লাল দেখায়। নীচের তালিকাটা থেকে সহজেই বুঝতে পারবে কোন্ গ্লাসে কি রাখা হচ্ছে—

প্রথম গ্লাসে = সাধারণ জল ;

দ্বিতীয় গ্লাসে = ফেনোফথেলিন এবং সোডিয়াম কার্বনেট মেশানো জল ;

তৃতীয় গ্লাসে = সাধারণ জল ;

চতুর্থ গ্লাসে = লাল রঙ মেশানো জল ;

পঞ্চম গ্লাসে = সাধারণ জল ;

ষষ্ঠ গ্লাসে = লাল রঙ মেশানো জল।

এইভাবে গ্লাসগুলো পাশাপাশি রাখলে পরেই একটা অন্তর একটা গ্লাসে সাধারণ জল এবং লাল জল থাকবে। যে ছ'টা রুমাল দিয়ে গ্লাসগুলিকে চাপা দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে দুটি রুমালে কায়দা করা আছে। দ্বিতীয় গ্লাস এবং

পঞ্চম গ্লাস যে দুটি রুমালে চাপা দেওয়া হচ্ছে, সেই দুটি রুমালেই কায়দা করা থাকবে। এই দুটি রুমালেরই কোণে একটা করে পাতলা কাগজের পুরিয়া থাকবে। যে ধরনের পাতলা কাগজে ঘুড়ি তৈরি হয় সেই কাগজেই এই পুরিয়া বানাতে হবে। এই ধরনের কাগজকে 'টিসু পেপার' বলা হয়। এই কাগজের সুবিধা হল, এগুলি এতই পাতলা যে কেবল আঙুলের চাপ দিয়েই ছিঁড়ে ফেলা যেতে পারে। দ্বিতীয় গ্লাসটি যে রুমালে চাপা দেওয়া হচ্ছে সেই রুমালের কোণের কাগজের পুরিয়ার মধ্যে সামান্য একটু টারটারিক অ্যাসিডের গুঁড়ো থাকবে। প্রথমে এক টুকরো টিসু পেপার নিতে হবে, তার মধ্যে সামান্য একটু টারটারিক অ্যাসিডের গুঁড়ো দিয়ে কাগজটাকে মুড়ে একটা পুরিয়া করে নিতে হবে। এই পুরিয়াটি সামান্য একটু আঠার সাহায্যে রুমালের এক কোণে আটকে দিলেই হল। পঞ্চম গ্লাসটি যে রুমালে চাপা দেওয়া হচ্ছে, সেই

রুমালটিও অনুরূপভাবে প্রস্তুত। কেবল এর কোণের পুরিয়াটির মধ্যে সামান্য একটু লাল রঙ-এর গুঁড়ো থাকবে। এই বিশেষভাবে প্রস্তুত রুমাল দুটি অন্য চারটি সাধারণ রুমালের সঙ্গে রেখে দিতে হবে। রুমাল ছটি এমনভাবে টেবিলে পর পর রাখবে যাতে কোন্ দুটি কৌশলযুক্ত রুমাল তা তোমরা সহজেই বুঝতে পারো। এই রুমাল দুটির মধ্যে আবার কোন্টার কোণে টারটারিক অ্যাসিডের গুঁড়ো এবং কোন্টার কোণে লাল রং আছে তাও সহজেই বুঝতে পারা চাই। সবচেয়ে ভালো হয় যে রুমালের যে গ্লাসটা চাপা দেওয়া হচ্ছে, সেই গ্লাসের পেছনেই সেই রুমালটি রেখে দেওয়া। অর্থাৎ দ্বিতীয় গ্লাসের পেছনে টারটারিক অ্যাসিড যুক্ত রুমালটা রাখতে হবে এবং পঞ্চম গ্লাসের পেছনে লাল রঙ-ওয়ালা রুমালটা রাখতে হবে। বাকি চারটি সাধারণ রুমাল অপর চারটি গ্লাসের পেছনে রাখলেই হবে।

গ্লাস ছ'টিকে রুমাল দিয়ে চাপা দেওয়ার সময়ে তোমাকে একটু কায়দা করতে হবে। প্রথম গ্লাসটি সাধারণভাবেই চাপা দেবে। দ্বিতীয় গ্লাসটি চাপা দেওয়ার সময়ে রুমালের যে কোণে টারটারিক অ্যাসিডের গুঁড়ো রয়েছে সেই কোণটি গ্লাসের ঠিক ওপরে নিয়ে আসবে এবং আঙুলের চাপ দিয়ে পুরিয়াটা ছিঁড়ে ফেলবে। ফলে, এই টারটারিক অ্যাসিডের গুঁড়ো গ্লাসের মধ্যে পড়ে যাবে। এই গ্লাসের জলের মধ্যে ফেনোফথেলিন এবং সোডিয়াম কার্বনেট মেশার ফলে যে লাল রঙ-এর সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে টারটারিক অ্যাসিডের গুঁড়ো মিশলে পরেই আবার লাল রঙ অদৃশ্য হয়ে গিয়ে পরিষ্কার জলের আকার নেবে। এই অবস্থাতেই গ্লাসটা চাপা গিয়ে দিতে হয়, যাতে লাল রং-এর জল ইতিমধ্যেই পরিষ্কার জল হয়ে গেছে সেটা দর্শকদের নজরে না আসে। তৃতীয় এবং চতুর্থ গ্লাস সাধারণভাবেই রুমাল দিয়ে চাপা দিতে হবে। পঞ্চম গ্লাসটি চাপা দেওয়ার সময় এর কোণে রাখা লাল রঙ-এর গুঁড়ো আগের মতোই গ্লাসের জলে ফেলে দিতে হবে। এতে জলের সঙ্গে রঙ মিশে জলটা লাল হয়ে যাবে। এটাও যাতে দর্শকদের নজরে না আসে সেজন্য সঙ্গে-সঙ্গেই চাপা দিয়ে দিতে হয়। ষষ্ঠ গ্লাসটি সাধারণভাবেই চাপা দিয়ে দিতে হবে।

এখন তাহলে দর্শকদের অজ্ঞাতসারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গ্লাসে পরিষ্কার স্বচ্ছ জল হয়ে গেছে। একই ভাবে চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ গ্লাসে হয়ে গেছে লাল রঙ-এর জল। অর্থাৎ তোমার পক্ষ থেকে ম্যাজিকটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে—যদিও দর্শকদের তা জানা নেই। এবারে মিছিমিছি ম্যাজিকের মন্ত্র পড়ে গ্লাস-ঢাকা রুমালগুলো সরিয়ে নিলেই হল। তাহলেই দর্শকেরা দেখতে পাবেন যে তোমার মন্ত্রের গুণে লোহিত সাগরের লাল জল অদৃশ্যভাবে ভ্রমণ করে পাশাপাশি তিনটে গ্লাসে চলে এসেছে। একইভাবে পরিষ্কার জলও পাশাপাশি তিনটে গ্লাসে চলে গেছে। অন্যান্য কেমিক্যালের খেলাতে যে সব সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, এই খেলাতেও সেই সব সাবধানতা অবলম্বন করতে ভুলবে না।

নানা রঙের গল্প

মিমোর ইন্টারভিউ

প্রশান্ত রায় বর্মন

তেন্দুলকারের একটা ইন্টারভিউ পড়ার পর মিমোর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ইস্, এই সব বিখ্যাত লোকগুলোর কি ভাগ্য, কাগজে পত্র-পত্রিকায় ওঁদের ইন্টারভিউ ছাপা হয়। তেন্দুলকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কী কী ভাল্লাগে না, সব কিছুই মন খুলে বলতে পারে। কিন্তু মিমোর বেলায়? লবডঙ্কা। তেমন কোনো স্কোপই নেই।

মিমোর অনেক দিনের শখ ; ওর একটা ইন্টারভিউ ছাপা হোক। ছোটদের নানান সমস্যা, বড়দের বিরুদ্ধে ছোটদের হাজার অভিযোগ—এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় আলোকপাত করা হোক। কিন্তু কে শুনছে সে কথা?

সেদিন বড়দার সাথে এই নিয়ে কথা হচ্ছিলো। ওর কথাবার্তা শুনে বড়দা তো হেসেই খুন। আইডিয়াটা নাকি অদ্ভুত। কেন জিগ্যেস করায় তার উত্তরে বলেছিলেন, 'তুই একটা আস্ত গাধা। ক্লাস নাইনে পড়িস, অথচ কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। অমন একটা ইন্টারভিউ ছাপলে এডিটর মশাইকে লোকে পাগল ঠাওরাবে না'?

বড়দার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে মুষড়ে পড়েছিল মিমো। কিন্তু সুযোগ একদিন মিলে গেল।

মিমোর এক দুঃসম্পর্কের কাকা আছেন। উনি আবার পত্রিকার রিপোর্টার।

একদিন উনি বাড়িতে এলেন। মিমো তখন ইন্টারভিউয়ের কথাটা খুলে বলল। সব শুনে তনুকাকু অর্থাৎ রিপোর্টার কাকু মনে মনে হাসলেন যদিও, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করলেন না। বললেন, 'বেশ, আজই তোমার ইন্টারভিউ নেওয়া যাক'।

রিপোর্টার কাকু তৈরী হয়ে সোফায় বসলেন। একটা হাত কপালে রেখে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা মিমো, তুমি হঠাৎ ইন্টারভিউ দিতে চাও কেন? নাকি এটা নিছক শখ'।

'শখ? না না, একদম না। আসলে, ছোটদের তো অনেক সমস্যা—এই নিয়ে কিছু বলতে চাই'।

'তা, তোমাদের সমস্যাগুলো কী'?

'সমস্যা তো অনেক'।

'যেমন'?

'আমাদের কোনো খেলার মাঠ নেই। নতুন নতুন ফ্ল্যাট

বাড়ির দরুণ এক টুকরো জমিও খালি নেই। ক্রিকেট ফুটবল দূরে থাক, হুটোপাটি-দৌড় ঝাঁপ—কিছুই করতে পারি না।

'আরো আছে, শুনবেন? দু'নম্বরে লিখুন, লোডসেডিং। ওফ্, এত বেশি লোডশেডিং-এর দরুণ সন্ধের সময় পড়তেও পারি না।

'এদিকে তো বড়দের ধারণা ; পড়াশুনোয় আমরা কেবল ফাঁকি দিই। বদমাইশি করি। কিন্তু বড়রা কী ছোটদের এইসব অসুবিধা নিয়ে কিছু ভাববেন না?

'তনুকাকু, বড়দের মুখে শুনতে পাই—আমাদের নাকি স্বাস্থ্য খারাপ। কিন্তু আমরা তো খাঁটি জিনিস কিছুই খাই না। এখন তো সব জিনিসেই ভেজাল। মাটি-ঘাস কিছুই মাড়াই না। পাঁচ হাত দূরে দূরে বড় বড় বিল্ডিং। আকাশ

দেখতে পারি না। গাছপালা দেখি না। বড় করে, নিশ্বাসও নিতে পারি না। তাই স্বাস্থ্য-টাস্থ্য আমাদের কিছুই হচ্ছে না।'

তনুকাকু মুচকি মুচকি হাসছিলেন। বললেন, 'আচ্ছা মিমো, এবারে বল, স্কুলের পড়াশুনো সম্পর্কে তোমার কী অভিমত। লেখাপড়া নিয়ে কোনো অ্যালার্জি নেই তো'?

'একদম না। কিন্তু সিলেবাস সম্পর্কে আপত্তি আছে'।

'কীরকম'?

'আমাদের সিলেবাসটা কিন্তু বিশাল লম্বা। ওতে আছে এক গাদা সাবজেক্ট। ফলে পরীক্ষার আগে হাবুডুবু খেতে হয়। তখন বেছে বেছে ইম্পর্ট্যান্ট দাগাই। তাই বছরের শেষে রেজাল্টও খারাপ হয়।

'এদিকে তো বড়দের ধারণা ; বাড়িতে আলাদা টিউটর রেখে স্পেশাল কোচিং দেওয়া হয়। নামী স্কুলে ভর্তি করা হয়। আর রেজাল্টের বেলায় এই? কিন্তু বড়দের এই সব অভিযোগ মানতে পারছি না। আমাদের ওপর এত সাবজেক্টের বোঝা—সেটা নিয়ে কিছু ভাববেন না'?

—মিমো, তোমার কথা খানিকটা ঠিকই। কিন্তু এটাও তো ঠিক, তোমার বয়সী এমন কিছু ছেলে মেয়ে আছে, যাদের পড়াশুনোয় মন নেই। বাবা মা'কে মানবে না। কথায় কথায় স্কুল কামাই। সন্ধে হলেই টিভি দেখতে বসে যাও—এটা কিন্তু ঠিক না।

—আরেকটা ব্যাপার ; এখনকার ছেলে মেয়েরা কিন্তু অনেক ব্যাপারেই সুবিধা পাও। যেটা কিনা আমাদের সময়ে ছিল না। টিভির দৌলতে অলিম্পিক, বিশ্বকাপ ফুটবল, ক্রিকেট, এছাড়াও বাইরের দেশের অনেক প্রোগ্রাম ঘরে বসে দেখতে পাও। তাছাড়া আমাদের সময়ে তোমাদের মত এত রকম ম্যাগাজিনও পেতাম না। তাই অনেক ব্যাপারে তোমাদের মতো এত বেশি জানতাম না।

—তবে বড়দের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগগুলো একেবারেই উড়িয়ে দিচ্ছি না। বরং তোমার এই ভাবনাকে আমি প্রশংসা করছি। যাই হোক, এবারে বল, বড় হয়ে তুমি কী করতে চাও।

'আমি? তনুকাকু, একবার আমি বড় হই। দেখবেন, ছোটদের জন্য এতটুকু অসুবিধা রাখব না। পড়তে বসলে লোডসেডিং হবে না। রাস্তাঘাটে ট্র্যাফিক জ্যাম থাকবে না। ফলে ছোট্ট ছেলে মেয়েদের স্কুল বাসের লেট হবে না।

'শুধু, কী তাই? খেলার মাঠ থেকে শুরু করে কোনও কিছুরই অভাব রাখব না'।

তনুকাকু কিন্তু এতক্ষণ একটা পাতলা খাতায় ছেলেখেলা করছিলেন। আসলে, উনি কোনো ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন না। মিমোর চোখকে আড়াল করে কাগজের ওপর হিজিবিজি কাটছিলেন।

হুট করে কী হল ; হাতের খাতাটাকে উল্টে দিলেন। গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এগিয়ে এসে মিমোর কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, 'মিমো, তোমার এই ইচ্ছেটাকে আবার আমি প্রশংসা করছি। সত্যি যদি এরকম কাজ দেখাতে পার—আর বড় হয়ে ছোটদের জন্য এত কিছু করতে পার, তবেই জানব, তুমি তোমার কথা রেখেছ। সেদিন তোমার ইন্টারভিউ নেব। ইয়েস, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি'।

২

তারপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। মিমো আর ছোট্টটি নেই। কৈশোরের গণ্ডি কবেই পার হয়ে গেছে। ও এখন তরতাজা যুবক। গোটা এলাকার একজন কৃতী মানুষ।

মিমোর ধ্যান জ্ঞান, শুধুই এলাকার উন্নতি সাধন। রাস্তা ঘাট, খেলার মাঠ, জল নিষ্কাশন, ইত্যাদি।

সত্যি কথা বলতে কী ; গত চার বছরে গোটা এলাকায় মিমো অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কমিশনার হিসাবে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র।

তনুকাকু অবিশ্যি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। মিমো সম্পর্কে উনি সব কথাই শুনতেন। শুনে মনে মনে গর্বও অনুভব করতেন।

এক সকালে মিমোকে উনি টেলিফোনে ধরলেন। বললেন, 'মিমো, এবার কিন্তু তোমার ইন্টারভিউটা সত্যি নেব'। মিমো সেদিন রাজি হওয়ায় তনুকাকু ওর ইন্টারভিউ নিলেন। দুপাতা জুড়ে দুর্দান্ত ইন্টারভিউ। তবে এবারেরটা কিন্তু মিথ্যে নয়, একজন সার্থক মানুষের সত্যি ইন্টারভিউ।

ছবি : পার্থ মৈত্র

মজার গল্প

ছোলা

তাপস মুখোপাধ্যায়

হারাধন খুব গরিব। একটা অজ পাড়াগ্রামে বউকে নিয়ে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরে সে থাকে। ওদের কোনো ছেলেপুলে নেই। হারাধন দিনমজুরের কাজ করে। সকালে বেরিয়ে যায় সারাদিন কাজটাজ সেরে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরে মাঝে দুপুরবেলায় গ্রামের শেষে বাস রাস্তার ধারে যে চায়ের দোকান আছে সেখানে বসে একটু জিরোয়। ওই দোকানে বউ এসে তিনটে রুটি আর দুটো পেঁয়াজ বা কখনও কখনও একটু গুড়ও একটা টিফিন কৌটোয় এনে রেখে দিয়ে যায়।

হারাধনের দুপুরের খাবারের সময় ঠিক থাকে না। এজন্য টিফিনটা দোকানে রাখা থাকে। সময় পেলে সে এসে খাবারটা খেয়ে আবার কাজে চলে যায়। এইভাবেই দিন কাটছিল হারাধন আর হারাধনের বউয়ের।

একদিন হারাধন সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে যেতেই হারাধনের বউ ছোলা ভাজবে বলে উনুনে আঁচ দিয়ে ছোলাগুলো গামলায় রেখে সবে তৈরি হয়েছে এমন সময় বাড়ির দরজায় এক ভিখিরির মতো দেখতে একজন বুড়ি এসে হাজির।

—ও বউ, তুমি দেখছি ছোলা ভাজছো এখন। আমাকে কিছু ছোলাভাজা দেবে? বুড়ি বউটাকে বলল।

—আ মলো যা! আমাদেরই দু-বেলা খাবার জোটে না ; তার উপর লোককে দেব কী করে? এই ছোলা ভেজে হাটে বিক্রি করে দুটো পয়সা রোজগার করব ভেবেই তো ছোলা ভাজছি। তোমাকে দিতে পারব না। হারাধনের বউ গজগজ করতে করতে উত্তর দিল।

—দাও না একটু। কাতর স্বরে বুড়ি বলল।

—ওসব হবে না বললামই তো। যাও অন্য বড়লোকদের বাড়ি দেখ। বউটা এবার বেশ জোরেই কথাটা বলল।

—ঠিক আছে। তবে তোর সব ছোলাগুলো যেন বাচ্চা ছেলে হয়ে যায়। রেগেমেগে বুড়ি এই কথা বলা মাত্রই গামলা থেকে ছোলার মতই একশোটা বাচ্চা ছেলে লাফিয়ে নেমে এসে ঘরময় লাফাতে লাগল আর চ্যাঁচাতে লাগল—'মা খিদে পেয়েছে' 'মা, আমাকে কোলে নাও'। বাচ্চাগুলো ঘরের ঘাট, বিছানা, জানলা, দরজা মেঝে—চাদ্দিকে ছড়িয়ে একেবারে দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দিল। হারাধনের বউ তো অবাক। এরকম যে কিছু হতে পারে বিন্দুমাত্র কল্পনা করেনি সে। তার তো মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। ভয়-টয় পেয়ে হারাধনের বউ হামান দিস্তে দিয়ে পটাপট পটাপট বাচ্চাগুলোকে পিষে মারতে লাগল। যখন সে দেখল সবকটা মরে গেছে, তখন তার খুব দুঃখ হল। কান্না পেতে লাগল। 'ঈস্' রাগের মাথায় সবকটাকে মেরে ফেললাম। হায়রে। যদি অন্তত একটা বেঁচে থাকত তাহলে সংসারে কত না উপকার হতো।' এইসব নিজের মনে বউটা যখন ভাবছে তখন হঠাৎ চিঁচিঁ করে কে যেন বলে উঠলো—

—মা কেঁদো না। আমি এখনও বেঁচে আছি। হারাধনের বউ চমকে উঠল। খুশিও হয়ে উঠল খুব।

—কোথায় তুই? ও সোনা আমার? বেরিয়ে আয় শিগগির। বউটা ডাকল। একটা রান্নার ডেকচির তলা থেকে বেরিয়ে এসে বউটার সামনে এসে দাঁড়াল ইঞ্চি চারেকের ছোট্ট একটি বাচ্চা ছেলে।

—কী নাম রে তোর? খুব বাহাদুর ছেলে দেখছি।

—আমার নাম ছোলা।

—বাঃ, তা তুই আমার একমাত্র ছেলে হলি ছোলা, তাই তো?

—হ্যাঁ, মা। বল কী করতে হবে। ছোলা বলল।

—তা তুই তোর বাবার জন্য খাবার কী দিয়ে আসতে পারবি? হারাধনের বউ জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ, অবকোর্স পারব। ছোলা বলল।

হারাধনের বউ তখন ছোলার মাথায় খাবারের কৌটোটা দিল আর ভালো করে বুঝিয়ে দিল কোথায় তাকে যেতে হবে। ছোলা হাঁটতে শুরু করল। কেবল কৌটোটাই দেখা যাচ্ছে ; লোকে ভাবছে, কী হল ব্যাপারটা একটা কৌটো নিজে নিজেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। লোকজন রাস্তায় খুবই কৌতূহলী হয়ে বারবার কৌটোর দিকে তাকাচ্ছে। ছোলা যেতে যেতে দু-একবার লোককে ঠিকানাটা জিজ্ঞেস করতেই তারা তো ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে একাকার। এ কী রে বাবা! কৌটো আবার কথা বলে যে! শেষে দোকানে পৌঁছে দেখে যে বাবা বসে আছে খাবারের অপেক্ষায়।

—বাবা! ও বাবা! দেখো, আমি তোমার খাবার নিয়ে এসেছি। ছোলা তার বাবাকে ঠিক চিনতে পেরে বলল। হারাধন ভাবল, আমাকে কে বাবা বলে ডাকবে? আমার তো ছেলেপুলেই হয়নি! হঠাৎ তার নজরে পড়ে কৌটোটা তো তারই, আর কৌটোর তলা থেকে কে যেন মিহি স্বরে বলছে, "বাবা! এই কৌটোটা তুললেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার ছেলে, ছোলা। আজ সকালেই আমি জন্মেছি।" কৌটো তুলতেই হারাধন ছোলাকে দেখতে পেল!

—আরে! এত পুচকে তুই? যাক ভালোই হল। দাঁড়া আমি আগে খেয়েনি। হারাধন এই বলে চটপট খেয়ে নিয়ে ছোলাকে পকেটে পুরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল গ্রামের পথে। গল্প করতে করতে ওরা চলেছে রাস্তা দিয়ে আর রাস্তার লোকজন ভাবছে লোকটার মাথাটা নিশ্চয়ই খারাপ নাহলে কী কেউ নিজের সঙ্গে বকবক করতে পারে।

কয়েকজনের বাড়ি গিয়ে হারাধন কোনো কাজ আছে কী না জিজ্ঞেস করতেই সকলেই বলে উঠলো, "তোমার তো মাথা খারাপ। তুমি আবার কাজ করবে কী করে?"

—মাথা খারাপ? মোটেই না। তোমাদের চেয়ে সুস্থ আমি। হারাধন বলল।

—তোমাকে দেখেছি, শুনলামও যে তুমি নিজের

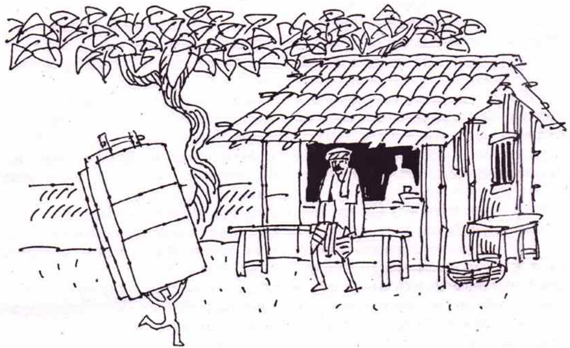

মনেই কতক্ষণ রাস্তায় কথা বলছিলে?

—ওঃ এই কথা! আসলে আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

—ছেলে? কোথায় সে?

—কেন আমার পকেটে?

—পকেটে? দেখলে, তোমার সত্যি মাথা খারাপ নাহলে কি ছেলে পকেটে থাকতে পারে।

—আচ্ছা, দ্যাখো তবে—এই বলে হারাধন পকেট থেকে ছোট্ট ছোলাকে বের করে আনল।

ছোলা তখন আঙুলের ডগায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

—ও! কী সুন্দর ছেলেটা তো!

ছেলেকে দেখে সকলে তখন বিশ্বাস করল না, হারাধন সত্যি হারাধনের মাথা খারাপ নয়। তার সত্যিই একটা সুন্দর বাচ্চা ছেলে আছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন সচ্ছল লোকেদের মধ্যে তখন একজন হারাধনকে তার আলুর খেতে হাফ বেলার মজুরির কাজ দিয়ে বলল।

—যাও, হারাধন তুমি আমার একটু দূরের আলুর খেতে কাজ করতে যাও। হাফ বেলার মজুরি পাবে। আর তোমার ছেলেকে এখানে আমার বাড়িতে রেখে যাও। আমার বলদগুলোকে ও পাহারা দেবে। এজন্য তোমাকে আরও হাফ বেলার মজুরি দেব।

হারাধন দারুণ খুশি হয়ে ছোলাকে রেখে আলুর খেতে কাজ করতে চলে গেল আর বলে গেল সন্ধেবেলায় তোকে নিতে আসবো।

হারাধন কাজে চলে গেল। আর ছোলা বাড়ির কাছের মাঠে বলদগুলোর পাহারার কাজে নেমে পড়ল। বলদ দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। সে একটা বলদের শিং-এর উপর বসে চাদ্দিক লক্ষ করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ তিনটে চোর চুপিচুপি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলদের দড়ি খুলতে শুরু করল। যেই ছোলার নজরে পড়ল, ছোলা সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠল—

—চোর! চোর! কর্তা, চোর এসেছে গো!

সচ্ছল চাষী বাড়িতেই ছিল। চিৎকার শুনে সে বেরিয়ে এলো। চোর তিনটি ততক্ষণে অবাক হয়ে গেছে। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে। চোরগুলো পালাবার চেষ্টা করল না। চাষী বেরিয়ে আসতেই তাকে জিজ্ঞেস করল—

—এই চিৎকারটা কে করল? কাউকেই তো ধারে কাছে দেখতে পাচ্ছি না।

—ও হচ্ছে ছোলা। চার ইঞ্চির এক বাচ্চা ছেলে। দেখছো না বলদের শিং-এ বসে ওদের পাহারা দিচ্ছে। চাষী বলল।

চোরগুলো ছোলাকে ভালো করে দেখল আর সত্যি অবাক হয়ে গেল।

—তা, কর্তা, তোমাকে এই হাজার খানেক টাকা দিচ্ছি ; তুমি যদি ওকে আমাদের সঙ্গে দু-দিনের জন্য পাঠাও তাহলে বড় চুরি করে তোমাকে এমন টাকা দেব যে তুমি বড়লোক হয়ে যাবে। চাষী টাকাটা নিয়ে রাজি হয়ে গেল। আর চোর তিনটের একজন ছোলাকে পকেটে পুরে হাঁটা দিল শহরের দিকে।

শহরের কাছে এক মস্ত ব্যবসায়ীর বাড়ি। বাড়ি বললে ভুল হবে প্রায় ছোটখাটো একটা প্রাসাদ। খুবই ধনী লোক সেই ব্যবসায়ী। তার রেসকোর্সে ঘোড়ার ব্যবসা। আস্তাবলে তার দারুণ টগবগে তিনখানা ঘোড়া। চোর তিনজন ছোলাকে নিয়ে মাঝরাতে হাজির হল ব্যবসায়ীর বাড়িতে। বাড়ির সদর দরজা বন্ধ কিন্তু ছোলা ফাঁক ফোকর দিয়ে বাড়িতে ঢুকে দরজা খুলে দিল। চোরগুলো বাড়িতে ঢুকে আলমারী দেরাজ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা সোনা-দানা চুরি করল তারপর বেরোবার সময় ঘোড়া তিনটে চুরি করে ছোলাকে নিয়ে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে সটান চলে এলে বহুদূরের এক গভীর জঙ্গলে। তখন প্রায় ভোর হয়। একটা টিলার নীচে ঘোড়াগুলোকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে চোর তিনজন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল ঘাসের উপর।

—ছোলা, এখন তুই ঘোড়াদের জন্য ঘাস, পাতা জোগাড় করে ওদের খেতে দে, আমরা খুব ক্লান্ত একটু ঘুমিয়ে নি। চোরেদের একজন ছোলাকে বলল।

—ঠিক আছে। আমি ব্যবস্থা করছি। ছোলা উত্তর দিল আর ঘাস পাতা জোগাড়ে লেগে পড়ল। তিনজন চোর তখন ঘুমে বিভোর। এদিকে ঘাসপাতা জোগাড় করতে করতে ছোলাও ক্লান্ত হয়ে একটা ঘোড়াকে খাবারের যে ঘাসপাতা দিয়েছিল তার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘোড়াটা তো ঘাস খেতে খেতে ছোলাকেও খেয়ে ফেলল। পেটে গিয়ে ছোলার ঘুম ভাঙল।

এদিকে চোর তিনজন ঘুম থেকে উঠে ছোলার খোঁজ করতেই ছোলা ঘোড়ার পেট থেকেই চিৎকার করে বলতে লাগল, "আমি এখানে, একটা ঘোড়ার পেটে।"

—কোন ঘোড়াটার?

—এই টার!

চোরেরা তখন একটা ঘোড়ার পেট চিরে ফেলল কিন্তু তার ভেতর ছোলাকে পেলো না।

—না! এটার ভেতরে তো নেই তাহলে কোন ঘোড়াটা রে?

—এই ঘোড়ার পেটে। ছোলা আওয়াজ দিল।

চোরেরা তখন দ্বিতীয় ঘোড়াটার পেট চিরে ফেলল কিন্তু তার ভেতরেও ছোলাকে পেলো না।

এমনি করে তিনটে ঘোড়ারই তারা পেট চিরে ফেলল কিন্তু ছোলাকে খুঁজে পেল না। আর ছোলারও কোনো আওয়াজ পেল না।

চোরগুলো ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। "না, আমাদেরই কপাল খারাপ। মনে হয় ঘোড়ার পেটে ছোলা মরেই গেছে।' চোরেদের একজন বলল।

—হ্যাঁ, তাই মনে হয়। তবে ও থাকলে সুবিধে হত। যাইহোক এখন আমরা টাকা পয়সাগুলো এবার তাহলে ভাগ-বাঁটোয়ারা করি।

এই বলে তিনজন টাকার ও সোনাদানা ভর্তি ব্যাগগুলো নিয়ে গুনতে বসল।

—এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ...

এদিকে ছোলা তো মরেনি। ঘোড়ার পেট চিরতেই সে বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঝোপে লুকিয়ে ছিল। সেও তখন পাশের ঝোপের আড়াল থেকে গুনতে আরম্ভ করল—এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ...

—আঃ! সবাই গুণলে তো গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শুধু আমি গুনছি। চোরেদের মধ্যে যে নেতা ধরনের সে বলল। আর বলেই প্রথম থেকে আবার গুণতে শুরু করল—এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ ছোলাও পাশ থেকে গুনতে শুরু করল—এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ।

—এবার যদি গুনতে শুনি তাহলে মেরে ফেলবো কিন্তু। যে চোরটা গুনছিল এবার সে রেগেমেগে বাকি দুজনের উদ্দেশ্যে বলল। মেজাজ হারিয়ে সে আবার প্রথম থেকে গুনতে শুরু করল—এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ ছোলা আবার আরম্ভ করল—এক...দুই...তিন...চার এবার যে চোরটা ততক্ষণ গুনছিল সে সত্যি মেজাজ হারিয়ে রাগের চোটে কোমর থেকে ছোরা বের করে পাশে বসে থাকা একটা চোরকে মেরেই ফেলল।

একটা চোরকে শেষ করে বাকি সঙ্গীটিকে সাবধান

করে দিল।

—দেখছো তো? বারবার ডিসটার্ব করছিল বলে ওকে খতম করলাম। তুমিও যদি ডিসটার্ব করো তবে তোমাকেও মেরে ফেলবো। এই বলে সে প্রথম থেকে আবার গুনতে শুরু করলো—এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ ছোলাও ঝোপের ভিতর থেকে আগের মতই গুনতে লাগল—এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ। সঙ্গী চোরটা দারুন ভয় পেয়ে বলে উঠল," বিশ্বাস করো, আমি গুনিনি।"

—আমাকে বোকা পেয়েছো, তাই না? তোমাকেও উচিত শিক্ষা দিচ্ছি। এই বলে যে চোরটা টাকা গুনছিল সে বাকি চোরটাকেও মেরে ফেলল।

—এবার আর কাউকে ভাগ দিতে হচ্ছে না। এখন শান্তিতে টাকাগুলো গুনে রাখি। নিজের মনে কথাটা বলে চোরটা আবার প্রথম থেকে একহাজার টাকার নোটগুলো গুনতে শুরু করলো—এক...দুই...তিন...চার ছোলাও গুনতে শুরু করলো—এক...দুই...তিন...চার—কে এখানে আছে? চোরটা গোনা বন্ধ করে চারদিকে তাকাল। ভয়ে তখন চোরটার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছে। নির্ঘাৎ এখানে ভূত আছে। এই শুনশান জায়গায় ভূতের খপ্পরে পড়েছে ও। প্রাণ বাঁচানো মনে হয় এবার দায় হবে। নিজের মনে মনে ভাবতে ভাবতে চোরটা হঠাৎ টাকা পয়সার থলি সব ফেলে দে—দৌড়।

চোরটা পালিয়ে যেতেই ছোলা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো। মাথায় যতটা পারল টাকার থলি নিল আর বাকিগুলো জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে চলল বাড়ির দিকে।

বাড়িতে পৌঁছে কড়া নাড়তেই মা দরজা খুলে দেখে একটা থলি। থলিটা ওঠাতেই থলির তলা থেকে বেরিয়ে এল ছোলা।

—আরে! এ যে আমাদের ছোলা। ছোলাকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরল তার মা।

—আর তোমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না মা। অনেক টাকা আছে থলিতে। জঙ্গলেও রেখে এসেছি। ছোলা মাকে ঘটনা বলল।

তারপর থেকে হারাধনের বাড়িতে শুধু খুশি আর আনন্দ। ওদের আর কোনো দুঃখ-কষ্ট রইল না। তিনজনে মহাআনন্দে থাকতে লাগল।

ছবি : সুব্রত মাজী

অনুভবের গল্প

পার্শ্বডাঙার কবি

মানিক সাহা

গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি সময়ে কবি তাঁর শৈশবের গ্রামে এসে দাঁড়ালেন। একপশলা শীতল বাতাস হৃদয়ে শান্তির প্রশান্তি বয়ে আনল। চেনা-চেনা মানুষ, চেনা-চেনা মুখ তাঁর কাছে কত প্রিয়। সেই আকাশ সেই বাতাস সবই যেন আগের মতো আছে। পালটে গেছে শুধু ঘরবাড়ি আর পরিবেশ। অসংখ্য অচেনা মুখ চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে। কবির তাদের ডেকে নাম-ঠিকানা জানার ইচ্ছে হয়। কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার কারণে কেমন যেন সংকোচ বোধ করেন।

কবির এখন অনেক নামডাক। টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি কোনও কিছুর অভাব নেই। মাসে মাসে দৈনিক পত্রিকাগুলো অগ্রিম তাগাদা দিয়ে যায়। বড়ো বড়ো প্রকাশনীগুলো আগে থেকেই অ্যাডভান্স করে। কবি একা একাই স্বচ্ছন্দে চলতে পারেন। তবুও বাইরে গেলে দু'-তিনজন লোক তাঁর সঙ্গে থাকে। হাতে সেলফোন, পিছনে অনুরাগী আর ভক্তদের সমাবেশ। সবকিছুই এখন নিত্য-দিনের ঘটনা।

কুড়ি বছর পর আবার এই জন্মভূমির মাটিতে। পার্শ্বডাঙার মতো এত প্রিয় গ্রাম কবির আর দ্বিতীয়টি জানা নেই। শুধু ভারত, বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে এমন গ্রামের অস্তিত্ব আশা করা যায় না! গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোর মধ্যে কত সহানুভূতি ছিল। দুর্গা পূজার উৎসবে ঈদের খুশির দিনে সবাই আনন্দ ভাগ করে নিত। হিন্দু মুসলিম বলে কারও মধ্যে কোনও রকম বিভেদ ছিল না।

কবি তাঁর প্রিয় গ্রামকে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন। উন্মুক্ত নীল আকাশ সবুজ শ্যামল দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে উদাসীন করে তোলে। গল্প কবিতায় কত বার পার্শ্বডাঙার কথা লিখেছেন, কিন্তু জন্মভূমির ঋণ তিনি আজও শোধ করতে পারেননি। লেখালেখি যতই হোক, জন্মভূমি তো মায়েরই মতো। বেঁচে থেকে এই ঋণ কোনওদিনও শোধ করা যায় না।

একদিন এই গ্রামের মাটিতেই হাসি-ঠাট্টা নিয়ে ঘুরে বেড়াত ভুবনকাকার মতো মানুষ। গ্রামের

এমন কোনও মানুষ নেই যার কথায় আনন্দ পায়নি। তার চাল-চলন কথা-বার্তা ছিল অদ্ভুত রকমের! কম বেশি সকলেরই হাসির খোরাক জোগাত। তেমন লেখনীর সান্নিধ্য পেলে হয়তো বা ভুবনকাকাই হয়ে উঠত পৃথিবীর সেরা হাসির মানুষ। হতে পারত গল্প, কবিতা কিংবা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ দাবিদার। আজ সেই মজার মানুষটি আর নেই। নেই তার সঙ্গী চঞ্চল দাদাও! সারা গ্রামে ঘুরে বেড়ায় সেইসব স্মৃতি। কান পাতলে এখনও শোনা যায়, চোখ মেললে এখনও দেখা যায়, ভুবনকাকার মধুর হাসির অদ্ভুত মুখ ভঙ্গিমা।

হাইস্কুলের কিছুটা অংশ আজও আগের মতো আছে। প্রাইমারি স্কুলের টিনের ঘর এখনও বিদ্যমান। কবি হাঁটতে হাঁটতে হাইস্কুলের দিকে এগিয়ে যান। অফিসঘরে ঢুকেই প্রিয় শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করেন। শিক্ষকরা কবিকে ঠিক চিনতে পারেন না। ইউনুস মাস্টার মশাই কবির খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শুধু শিক্ষক নয়, বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল। সুখে-দুঃখে তিনি ছিলেন হৃদয় অন্তরঙ্গ মানুষ। বেচারা কবির মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি একটু বিস্ময় প্রকাশ করেন, "আচ্ছা বাবা, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না!"

"আমাকে চিনলেন না স্যার। জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত আমি এক অধম সন্তান। আজকের দিনে যাকে 'কান্ত কবি' বলে চেনেন।"

"সত্যি, কাগজে কলমে টিভির পর্দায় তোমার নাম কত শুনি। কত দেখি। পরম সৌভাগ্য আজ তোমাকে কাছে পেলাম।"

"আমার কথা কি আপনার মনে আছে, স্যার?"

"মনে থাকবে না কেন। ছোটোবেলা তুমি ভীষণ দুষ্টু ছিলে। তোমার বাবা মাঝে-মাঝেই স্কুলে এসে বলতেন, ছেলেটাকে ভালো করে শাসন করবেন। বাড়িতে একদমই কথা শোনে না।"

"কই, আপনি তো কখনও শাসন করেছেন বলে মনে পড়ে না।"

"তোমাকে শাসন করব কী করে। বাড়িতে দুষ্টুমি করলেও স্কুলে ঠিকমতো পড়াশুনো করে আসতে। তাই শাসনের কোনও অবকাশ ছিল না।"

নিত্য মাস্টারমশাই কবির দিকে এগিয়ে আসেন। মলিন মুখে চুল দাড়ি পাকতে বসেছে। স্কুলজীবনে ভীষণ রাগী মানুষ ছিলেন। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে জোর করে পড়া আদায় করে নিতেন। আজকে তাঁকে দেখে তেমনটি বোঝার উপায় নেই। আসলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিবর্তন হওয়াটা বুঝি স্বাভাবিক।

"বাবা তুমিই বুঝি কান্ত কবি। তোমার লেখা বই আমার ভীষণ প্রিয়। ভাবলে গর্ব হয় আমার ছাত্র আজ এত বড়ো কবি। দেশ-বিদেশের লোক তাকে এক ডাকে চেনে।"

"আপনি যতটা বড়ো ভাবছেন, আমি আদৌ তা নই। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যেন নোবেল পুরস্কার পেয়েছি।"

"নোবেল পুরস্কার পাওয়াটায় বড়ো কথা না। কত ভালো লেখাও মূল্যায়নের অভাবে পুরস্কার পায় না। আসল কথা ভালো লেখা, সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ হওয়া।"

কবি একে একে কাদের মাস্টারমশাই, আফসার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে বাইরে বেরিয়ে আসেন। চারদিকে অসংখ্য মানুষের ভিড়। অনেকেই অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ব্যস্ত। কেউ কেউ ফিসফিস করে বলছে আমাদের গ্রামের ছেলে আজ এত বড়ো কবি ভাবতেই অবাক লাগে! সবার দিকে হাত তুলে 'কান্ত কবি' সৌজন্য প্রকাশ করেন।

বিকেলে কবি একা একাই গ্রাম পরিদর্শনে বের হন। খেলার মাঠ, বড়ো পুকুরে সবই ঠিক আগের মতো আছে। বড়ো পুকুরের দিকে তাকিয়ে মমতা ভরা চোখ দুটি দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে। এই পুকুরের জলেই শৈশবে কত সাঁতার কেটেছেন তিনি। তরুণ, বিশ্ব আর রবিউলদের নিয়ে 'টগে' খেলেছেন। কবির দিকে তাকিয়ে পুকুরও যেন একবুক শূন্যতা প্রকাশ করে। অশ্রু ঝরিয়ে সজল দৃষ্টিতে বলে 'আমার আর আগের মতো যত্ন নেই রে! অসংখ্য ছেলে মেয়ে সারা দিন স্নান করে। গ্রামের অনেকেই বর্জ্য পদার্থ ফেলে দূষিত করে তোলে। তোদের সময়ে আমার কত শান্তি ছিল। তোর ঠাকুরদার আমলে বড়ো সুখে ছিলাম।" কবি কোনও উত্তর দিতে পারেন না। এই পুকুরের জলেই একদিন তিনি হারিয়ে যেতে বসেছিলেন। পুকুরের দয়া আর ইনতাজের মতো ডানপিটে ছেলের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। পার্শ্বডাঙ্গার গ্রামে ইনতাজের মতো ভালো ছেলে আর

দ্বিতীয়টি নেই। কবি তাঁর ঋণ আজও শোধ করতে পারেননি। দেখা হলে নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

কবি মাঠের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করেন, একদল ছেলে ক্রিকেট খেলা নিয়ে ব্যস্ত। আগে এই মাঠে ফুটবল খেলা হত। এখন ফুটবলের পরিবর্তে ক্রিকেট। পাশেই বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি ছেলে। কবির মায়া হয়। একটু একটু করে একদম পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

"বাবা, তোমার মনখারাপ কেন? ওরা তোমাকে খেলতে নেয়নি? মন দিয়ে খেলা করো, নিশ্চয় নেবে। মানুষ চেষ্টা করলে অনেক কিছু করতে পারে।"

"আপনি কে?"

"তার আগে তোমার নামটা শুনি।"

"আমার নাম লিটন। আপনাকে তো এই গ্রামে কখনও দেখিনি।"

"তুমি 'কান্ত কবি' বলে কাউকে চেনো?"

"চিনব না কেন? আমাদের পড়ার বইয়ে ওঁর লেখা কবিতা আছে।"

"কোন কবিতাটা বলতে পারো।"

"আমাদের গ্রাম নিয়ে লেখা সেই কবিতাটা, "মনে হলে আজও আমার/হৃদয় চলে যায়/সুখ দুঃখ মায়ায় ঘেরা/পার্শ্বডাঙার গাঁয়/দিদির সাথে হাতটি ধরে/ আঁকা-বাঁকা পথে/রোজ সকালে স্কুলে যেতাম/আপন ইচ্ছা মতে/ভুলে গেছি নাম না জানা/কত রকম খেলা/বর্ষাকালে নদীর জলে/চড়েছি কলার ভেলা/রাম রহিম সবাই ছিল/অন্তরঙ্গ বন্ধু/জানতাম না আমরা কেহ/মুসলমান না হিন্দু/মনে হলে আজও আমার/হৃদয় চলে যায়/সুখ দুঃখ মায়ায় ঘেরা/পার্শ্বডাঙ্গার গাঁয়।"

"বাঃ বাঃ! আমি যদি সেই কান্ত কবি হই তুমি বিশ্বাস করবে?"

"তিনি এখানে আসবেন কী করে। তিনি তো অনেকদূরে থাকেন!"

"আমিই সেই কবি সোনা। ভালোবাসার টানে শৈশবের প্রিয় গ্রামকে দেখতে এসেছি। একটু পরেই এখান থেকে চলে যাব। আর হয়তো কোনওদিন আসা হবে না।"

কবির মনে পড়ে যায় গ্রামের মাঠে ঘুড়ি ওড়ানোর কথা। পার্শ্বডাঙ্গার আকাশে-বাতাসে আজও কত স্মৃতি খেলা করে। গ্রামের মানুষ ভুলে গেলেও কবি সেটা ভোলেননি। কত স্মৃতি স্পষ্ট মনে পড়ে। আবার কোনও কোনও স্মৃতি আবছা মনে আসে। এই দিনেই একবার বিউটিদের সঙ্গে দিক্‌শির বিলে পানিফল তুলতে গিয়েছিল। আজও সে কথা স্পষ্ট মনে আছে। ইতি, বিউটি আর আকলিদের সঙ্গে আপন ভাইবোনের মতো সম্পর্ক ছিল। তারা আজকে কোথায় কে জানে? দেখা হলে নিশ্চয় দু'দণ্ড গল্প করত। সেই যে ছোটোবেলার এ পেনটি বাইশ খোপ খেলার গল্প। মনে না পড়া আরও কত কিছু।

এদিকে সন্ধে নেমে আসে। পাখিরা বাসায় ফেরে। চারদিক তোলপাড় করে আযানের 'আল্লাহু আকবর' ভেসে আসে। কবির এখনই ফিরতে হবে শহরের উদ্দেশে। ইচ্ছে ছিল অন্তত দু-একটা দিন গ্রামের মাটিতে কাটাবেন। কিন্তু কারও কারও অনুরোধে সে ইচ্ছেও পূরণ হল না। অনেকেই নিষেধ করেছে কোনওমতেই যেন পার্শ্বডাঙা না থাকা হয়। কার মনে কী আছে বলা যায় না। তাই গ্রামে থাকা নিরাপদ নয়।

সারি সারি গাড়ি এসে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। কবির চোখে দু'ফোঁটা অশ্রুর ঝিলিক। লিটন নামের ছোট্ট শিশুটি তখনও পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কবি তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসে কবির চোখ।

আবছা অন্ধকারে এক ভদ্রলোক কবির দিকে এগিয়ে আসেন : "আমাকে চিনলে না বাবা? আমি ভাটোপাড়ার মাজিদ উদ্দিন। তুমি যে পার্শ্বডাঙ্গার জন্য কাঁদছ সে গ্রাম আর নেই বাবা। এখন সব বদলে গেছে। সেই ভালোবাসা, সেই মনুষ্যত্ব এখন আর কিচ্ছু নেই। এখানে থাকলেও শান্তি পেতে না।"

কবির দু'চোখে জল। কবি আস্তে আস্তে সামনের দিকে পা বাড়ান।

ছবি : পার্থ মৈত্র

বনজঙ্গলের গল্প

বাঘের দেখা

সঞ্জিতকুমার সাহা

সুধন্যখালির ওয়াচ-টাওয়ারে দাঁড়িয়ে সুন্দরবন দেখছিলাম। এত অপরূপ দৃশ্য পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই বোধহয় আছে। যেদিকে তাকাই ঘন কুয়াশার নীল জালের ভিতরে সুন্দরবন একটু একটু করে মুখ বের করে আকাশটাকে যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। তখনও ভোরের আলো ফুটে বের হয়নি। পুবের আকাশে আবছা আলোর ছটা। এই আকাশ ফুঁড়েই বেরিয়ে আসবে দিনের আলো। তখন সুন্দরবনের জঙ্গলের মাথার উপর থেকে নীল ও আবছা আবরণ সরে যাবে ধীরে ধীরে। আমি একটু একটু করে এইসব দেখছিলাম।

এই ওয়াচ-টাওয়ার থেকে নাকি বাঘ দেখা যায়। বাঘ দেখার জন্যই এই ওয়াচ-টাওয়ার। ওয়াচ-টাওয়ারের বাঁদিকে অর্থাৎ উত্তর ঘেঁষে একটা কৃত্রিম মিষ্টি জলের আধার তৈরি করা হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তাও আছে, ওই পথ দিয়ে বাঘেদের যাতায়াত। বাঘেরা নাকি ওই মিষ্টি জলের আধারে নিয়ম করে জল খেতে আসে। এই আশাতেই আমাদের এখানে আসা। আমাদের ওয়াচ-টাওয়ারে ওঠা। বয়স্করা লঞ্চেই আছেন। নদী থেকে নিরাপদ দূরত্বে লঞ্চটাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ বাঘেদের নাকি কোনোমতেই বিশ্বাস করা যায় না। নদীর কিনারে লঞ্চ দাঁড় করিয়ে রাখা নাকি এসব জায়গায় রীতিমতো বিপজ্জনক। বাঘ সুযোগ বুঝে পেল্লায় লাফ মারতে পারে। জলে সাঁতার কাটতে পারে। কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধও করতে পারে। অতএব সারেঙ্‌ কোনোপ্রকারেই কোনো ঝুঁকি নেবেন না। অল্পবয়সীরা অবশ্য হই হই করে

গা ছমছম করা এই ভয়াল অথচ আশ্চর্য সুন্দর জায়গায় নেমেই ওয়াচ-টাওয়ারের মাথায়। সেখান থেকে দূরবীন দিয়েও নাকি অনেক সময় বাঘ দেখা যায়। আমার পাশেই ছিলেন সত্যদা, তিনি তো দূরবীন দিয়ে আকাশ আর জঙ্গল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না, দুর্ এত কষ্ট করে, রাত জেগে, লঞ্চে চেপে ভোরের আলো ফুটে বের হওয়ার আগেই সুধন্যখালি এসেও বাঘ দেখা গেল না। তাঁর গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়তে থাকল। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন বনকর্মী, নামটা ভুলে গিয়েছি, অনুকূল বা নকুল মণ্ডল কিছু একটা হবে, তিনি বললেন, আপনেরা বাঘ দেখতে চাইছেন আর আমরা বনবিবির কাছে মানত করি, আমাদের যেন বাঘ দেখতে না হয়!

মানে! বিস্ময় ঝরে পড়ে আমারও গলা থেকে, কেন, বাঘ দেখার মতো আনন্দ আর আছে নাকি!

তবে শোনেন, কর্মীটি বলতে থাকলেন, এই তিনদিন আগে, আরও একটু বেলা হলি, আমি সহদেব ও নিতাই এয়েছিলাম আমাদের রোজকার ডিউটি সারতে। বলে হাত দিয়ে উত্তরের জলাশয়টি দেখালেন, আমরা যখন নিচে যাব তখন দেখবেন, জলের চারদিকে বাঁশবাতার তৈরি ছোটো ছোটো খাঁচা আছে, উপরটা খোলা, ওর ভিতরে শুয়োরের বাচ্চা রাখা হয়, আর মাঝেমধ্যে ওরকমই বাঁশের বাতার মাচা তৈরি করে তার উপরে রাখা আছে কাঠের মস্তো রেকাবি, সেখানে ভেজানো কাবুলি ছোলা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

কেন? তাঁর কথা না ফুরোতেই আমার কৌতূহল ফুটে ওঠে চোখেমুখে, ওসব কি হয়?

বনকর্মীটি আমার মুখের দিকে তাকালেন, আমাদের সরকার খুব উদার! বন্যপ্রাণীর যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেইজন্যি ওই ছোট্টো খাঁচাগুলিতে রাখা হয় শুয়োরের বাচ্চা। বাঘ শুধু জলে খাবে? জল খাওয়ার আগে বা পরে মুখে পুরে নিতে পারে একটি শুয়োরের বাচ্চা। এজন্য এই ব্যবস্থা।

আর রেকাবিতে ছোলা?

এই বনে হরিণ এখনও বেশ কিছু আছে, ওরাও আসে জল খেতে। ওরা তো মাংসাশী নয়। ওরা খেতে ভালোবাসে ছোলা। তাই ওখানে ছোলা রাখা হয়। বলে কর্মীটি বলে চললেন, আমরা সেদিন এয়েছিলাম ওই কাজটাই করতে। আমাদের নৌকা লাগানো ছিল ঘাটে। ছোলা-টোলা সব ঠিক আছে কিনা বা ফুরিয়ে গেলে আবার দিয়ে যাওয়া এই আমাদের ডিউটি।

এই অপূর্ব ডিউটির কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। এরকম রোজ রোজ আসতে গেলে তো বাঘ দেখা যাবেই! আমি বলেই ফেলি।

কর্মীটির চোখদুটো অমনি ছলছল করে উঠল, নিতাই আর আমি একসঙ্গেই কাজে ঢুকেছিলাম। বনবিবি সেদিন আমাদের মানত রাখল নি, নিতাইয়ের ওদিন প্রাতঃকৃত্য পেয়ে গিয়েছিল হঠাৎ, ওই পুকুরেরই একপাশে, একটু আড়ালে বসেছিল, ওর পিছনেই যে দক্ষিণরায় ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় ছিল আমরা বিন্দুবিসর্গ টের পেলুম নি। নিতাইকে পিছন থেকে তুলে নিয়ে গেল। বলে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

এবারে বুঝলাম, আমরা যারা শহরের মানুষ, যারা জীবনে এক-আধবার এইরকম গহীন অরণ্যে আসি, তাদের কাছে এর নৈসর্গিক আবেদন প্রশ্নাতীত। কিন্তু যাদের জীবিকা এই সুন্দরবনকে ঘিরে তাদের জীবন যে কত দুঃখের, কত কষ্টের, কত যন্ত্রণার তা' এদের না দেখলে, এদের সঙ্গে না কথা বললে বোঝাই যায় না।

বাস্তবিকই, সুন্দরবনের যেখানেই গেছি, গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা ওই একই কথা আওড়েছেন, ওরে বাবা, বাঘ! যত না দেখা যায় ততই ভালো। আর সেই জন্যই বনবিবির আরাধনা প্রায় সর্বত্র। এই তো গত মে-জুনে কম করে আট-দশটা খবর শুধু বাঘের। কখনও বাঘ ঢুকে পড়েছে লোকালয়ে, কখনও বাঘ জঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে মানুষকে। বাঘ লোকালয়ে ঢুকলে দিন-রাত্তির সমান হয়ে যায় মানুষের। গ্রামের লোকের ঘুম থাকে না তখন। এরকম ঘটনা আকছার ঘটে ঝড়খালি, সন্দেশখালি, গোসবা, কুলতলী, হিঙ্গলগঞ্জে। প্রতিবছর বাঘের পেটে কম করে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন মানুষ যায়। সেজন্যই সুন্দরবনের মানুষ বাঘের দেখা পেতে চান না। বাঘের দেখা যাতে না হয় সেজন্য নিয়মিত বনবিবির কাছে এদের মানত থাকে।

প্রতিবছর যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন (সরকারি হিসেব) মানুষ বাঘের পেটে সেঁধিয়ে যায় তা' কিন্তু খানিকটা মানুষের নিজেদের দোষেই। বাঘ যে লোকালয়ে এসে এলোপাথাড়ি মানুষ ধরছে আর মুখে পুরে নিয়ে

পালাচ্ছে তা' কিন্তু নয়। আসলে মানুষই যখন বাঘের ডেরায়, সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঠ কাটতে, মধু ভাঙতে যায় তখনই মানুষ বাঘের শিকার হয়ে যায়। আবার এর উল্টোটাও হয়। অর্থাৎ মানুষও বাঘ মারে। বাঘ শিকার করে। বাঘের চামড়া, বাঘের নখ, দাঁত ও হাড়ের নাকি ভীষণ দাম। এই লোভে বেশ কিছু মানুষ এখনও নিয়ম করে বাঘ হত্যা করে চলেছে। কিছুকাল আগে একটা সংবাদে দেখছিলাম, চিন দেশে নাকি বাঘের হাড়ের ভীষণ চাহিদা। এই হাড় গুঁড়ো করে নানাবিধ ঔষুধ তৈরি হয়। আর আগে তো রাজরাজড়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বাঘের চামড়া শোভিত হত তাঁর শৌর্যের প্রচারে। এখন অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম। পৃথিবীর বহু দেশের মতো আমাদের দেশেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন তৈরি হয়েছে। এই আইনের ফলে কেউ যদি বন্যপ্রাণী নিধন করে তাহলে তার গুরুত্ব অনুসারে এক থেকে সাত বছরের জেল হতে পারে সঙ্গে বিস্তর টাকার জরিমানাও। ১৯৭২ সাল থেকে এই আইন আমাদের দেশে লাগু হয়েছে। তাতেও কি বাঘ হত্যা বন্ধ আছে? না বন্যপ্রাণী হত্যা বন্ধ আছে? লুকিয়ে চুরিয়ে শিকার চলছেই। আর তা' না হলে, ১৯৮৯ সালে যেখানে সারা দেশে বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার, সেখানে এত আইন, সংরক্ষণ করেও এই সংখ্যাটা দারুণভাবে কমে গেল কেন?

কিছুদিন ধরে তো কোলকাতার পথের ধারে বড়ো বড়ো হোর্ডিং-এ শোভা পচ্ছে '১৪১১'!

অর্থাৎ সারা দেশে নাকি এখন সাকুল্যে বাঘের সংখ্যা ১৪১১-তে এসে ঠেকেছে। এই সংখ্যাটা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক থাকলেও, এটা সত্য যে বাঘের সংখ্যা কমে এখন প্রকৃতিপ্রেমীদের রীতিমতো উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। সংখ্যাটা যে ভীষণভাবে কমেছে সে-বিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। অথচ মাত্র একশ' বছর আগেও, আমাদের দেশে বাঘের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারেরও বেশি, ১৯৪০ সালেও নাকি বাঘ ছিল তিরিশ হাজারের মতো। তাহলে এমন কী হল যে আমাদের দেশ থেকে এই বিপুল সংখ্যায় বাঘ হারিয়ে গেল?

এর কারণ অবশ্য অনেক।

এক বাঘ তো থাকে বনে। আজ থেকে একশ' বছর আগে ভারত ভূখণ্ডের প্রায় আশি শতাংশই ছিল বন। এখন কমে তা' দাঁড়িয়েছে কুড়ি শতাংশেরও নিচে (পশ্চিমবঙ্গে বারো শতাংশ)। সুতরাং এ তো স্বাভাবিক, অরণ্য কমার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের সংখ্যাও কমেছে। এখানে বলা দরকার শুধু যে বাঘের সংখ্যা কমেছে তাই নয়, সামগ্রিকভাবে সবরকম বন্যপশুর সংখ্যাই কমেছে। এখন তো খবরে দল বেঁধে হাতির পালকে প্রায়ই দেখা যায় টিভির পর্দায়। এর কারণও বন্যপ্রাণীর আবাসভূমিতে মানুষের হস্তক্ষেপ, দারুণভাবে বনভূমি কমে যাওয়া।

বনভূমি কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ কিন্তু মানুষ। শুনলে অবাক হবে, আজ থেকে একশ' বছর আগে, আমাদের ভারতে (বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সহ) লোকসংখ্যা ছিল কমবেশি পঁচিশ কোটি। আর এখন এই তিন দেশের মিলিত লোকের সংখ্যা হবে, একশ' চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কোটির কাছাকাছি মানে প্রায় ছয় গুণ। শুধু ভারতেই একশ' পনের কোটির কাছাকাছি। এত এত লোকের বাসস্থান, হাট-বাজার, ইস্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, কল-কারখানা, খেলার মাঠ তৈরি করতেই তো বন ফুরিয়ে শেষ।

দুই, আর এই বন কমে যাওয়ার সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য পশুর সংখ্যারও কমে যাওয়া। যেমন বাঘের খাদ্য হরিণ, বুনোমহিষ, বুনো শুয়োর, জংলি খরগোশ, বড়ো বড়ো কাঁকড়া, সর্দার গোসাপ ইত্যাদি। হরিণ যে শুধু বাঘের খাদ্য

তাই নয়, মানুষের প্রিয় খাদ্য। তাই ক'বছর আগেও, বাসন্তীর ঝাড়খালিতে হাটে প্রকাশ্যে হরিণের মাংস বিক্রি হতে দেখা গেছে। এখনও আড়ালে আবডালে হরিণের মাংস পাওয়া যায়। তবে হরিণের সংখ্যা তো মারাত্মক হারে কমে গেছে সেজন্য হরিণের মাংস পাওয়াও এখন দুষ্কর।

তিন, আগে পশু শিকারের নামে বাঘ শিকার ছিল রাজকীয় শিরোপা। এখন কিন্তু লোভী মানুষের অর্থ উপার্জন এর অন্যতম উদ্দেশ্য শোনা যায়, সুন্দরবনের জঙ্গলে, এখনও চোরাগোপ্তা বাঘ শিকার হয়েই চলেছে। শোনা কথা, বাঘ মধু খেতে ভালোবাসে। তাই একদল ধূর্ত মানুষ ঝোলাগুড়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে জঙ্গলে রেখে আসে। দূর থেকে লক্ষ রাখে বাঘ সেটা খেল কিনা। তারপর সেই বাঘকে হাতের নাগালে পেতে খুব দেরি হয় না। বাঘের হাড় ও চামড়া চড়া দামে বিক্রি হয় বিদেশের বাজারে।

চার, জঙ্গল কমে যাওয়ায় জঙ্গলে বাঘের খাদ্য কমে যাওয়ায় বাঘকে এখন তাই মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে চলে আসতে হয়। আগে বনে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল বুনো শুয়োর, বুনো মহিষ, হরিণ। এখন সেসব কোথায় হারিয়ে গেছে! দ্বিতীয়ত হরিণের দেখা এখনও কিছু কিছু মেলে, কিন্তু হরিণ অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির হওয়ায় অনেক সময়ে শিকার ফসকে যায় বাঘের। তখন খানিকটা বাধ্য হয়েই লোকালয়ের দিকে পা বাড়ায়। মানুষ মারা লক্ষ্য নিয়ে বাঘ লোকালয়ে আসে না, আসে খাদ্য সংগ্রহে। গোরুটা, বাছুরটা, ছাগলটা, ভেড়াটা তুলে নেওয়াই থাকে প্রাথমিক লক্ষ্য। বাঘ লোকালয়ে ঢুকলে মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভয় পায়। তখন বাঘে মানুষে লড়াই বেধে যায় এবং এই লড়াইতে বাঘের মৃত্যু হয় বেশি। কখনও সখনও মানুষও দু'চারজন জখম বা মারা যান। আর সেজন্যই কাছাকাছি যারা থাকেন তাঁরা বাঘ দেখতে চান না। বাঘের দেখা পেতেও চান না।

তবু আমরা কিন্তু বাঘ দেখতে চাই। কারণ জীবজগতে বাঘের মতো অনিন্দ্যসুন্দর প্রাণী আর দুটো নেই। শৌর্য-বীর্যে, শক্তিতে বাঘের তুলনা নেই। আমরা বাঘ দেখতে চাই কারণ বাঘ থাকলে জীববৈচিত্র্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে। যেমন : বাঘকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আমাদের হরিণকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। হরিণকে বাঁচাতে গেলে গাছ-লতাপাতা-গুল্ম ইত্যাদিকেও বাঁচানোর কথা ভাবতে হবে। আবার লতা-পাতার গাছ বাঁচাতে গেলে বড়ো বড়ো গাছকেও টিকিয়ে রাখতে হবে। কারণ বড়ো গাছ না বাঁচলে ছোটো গাছপালাকে সূর্যের প্রখর তাপ থেকে রক্ষা করবে কে? ছোটো গাছ-লতা-পাতা খেতেই যে হরিণ ভালোবাসে। এগুলো হরিণের খাদ্য। এখানে সুন্দরবনের একটা উদাহরণ দিই : দেখা গেছে বাঘ থাকতে ভালোবাসে হেতালের জঙ্গলে। আবার হেতাল গাছের পাতা ও ফল হরিণের খুব প্রিয়। হরিণ আবার বাঘেদের খাদ্য তালিকায় এক নম্বর। সেজন্যই বোধহয় সুন্দরবনের জল-হাওয়া বাঘেদের এত প্রিয়। প্রাণীবিজ্ঞানীদের মতে, সুন্দরবনের আবহাওয়া বাঘেদের বসবাসের পক্ষে অনুকূল। এখানে তাপমাত্রা কখনই পঁয়ত্রিশ ডিগ্রির বেশি হয় না আবার আঠার-কুড়ি ডিগ্রির নিচেও নামে না। সুন্দরবনের এলাকা অনেক বড়ো (পঁচিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের মতো)। সবুজও আছে এখানে যথেষ্ট। আর সবুজ থাকা মানেই বনে সবরকম প্রাণীও মজুত। বাঘেদের খাদ্যের ঘাটতি হওয়ার কথাই নয়। এখানে জলজ শ্যাওলা থেকে শামুক-ঝিনুক যেমন আছে তেমনি আছে মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গ থেকে সাপ-বেজি এবং হরিণ-শুয়োর। খাদ্যশৃঙ্খলে একে অপরের পরিপূরক। সুতরাং যে বনে বাঘ থাকে সেখানে এইভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশেও ভারসাম্য বজায় থাকে। তাছাড়া সাধারণভাবে দেখা যায়, যে বনে বাঘ থাকে সচরাচর সেখানে মানুষজন যেতে চায় না। এর ফলেও বন সংরক্ষণ নিজে থেকেই হয়, বাঘের কল্যাণেই খানিক হয়ে থাকে।

সুন্দরবনে যে এখন ঠিক কত বাঘ আছে বলা মুস্কিল। কারণ সুন্দরবনের এলাকাটা এখন দুই দেশের মধ্যে ভাগ হয়ে রয়েছে। বেশিরভাগটাই পড়েছে বাংলাদেশে। আন্তর্জাতিকভাবে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে হলে দুই দেশের সম্মতিতে ছাড়পত্র নিয়ে তবে মানুষকে যেতে হয়। এক দেশ পাশপোর্ট দেয়, আরেক দেশ ভিসা দেয়। কিন্তু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যে সুন্দরবন সেখানে অন্তত বাঘেদের বেলায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে কোনও পাসপোর্ট-ভিসার দরকার হয় না। সেজন্য এই মুহূর্তে সুন্দরবনের বাঘের সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে মাঝে-মধ্যেই বাঘ গণনা হয়। বাঘ

তো আর মানুষের মতো গোণা যায় না। পুরোটাই অনুমান নির্ভর। বাঘের পায়ের ছাপ, মল, ইত্যাদির সাহায্যে গণনা করা হয়। তাছাড়া যেসময়ে বাঘ গণনা চলছে, সেসময়ে যে কতক বাঘ বাংলাদেশে চলে গিয়ে থাকবে না কে বলতে পারে? একইভাবে বাংলাদেশে যখন বাঘ গণনা হয়, তখনও যে কিছু বাঘ ভারতে বেড়াতে আসে না তাই বা কে বলতে পারে? সঠিক বাঘের সংখ্যা পেতে হলে দুই দেশকে একসঙ্গে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই কাজে নামতে হবে।

বাঘ গোটা বিশ্বেই এক বিস্ময়। প্রকৃতিপ্রেমিকরা বলছেন, সারা পৃথিবীতে এখন বাঘের সংখ্যা কমতে কমতে মাত্র হাজার আটেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে আবার অত্যন্ত হিংস্র, শক্তিশালী ও দেখতে অপূর্ব গোত্রের বাঘের সংখ্যা নাকি মাত্র তিন হাজার। বাঘের আটটি প্রজাতির মধ্যে এখন টিকে আছে মাত্র পাঁচটি উপ-প্রজাতি। এই উপ-প্রজাতির বাঘেরা আবার ছড়িয়ে আছে ভারত, চিন, রাশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং ইন্দোনেশিয়ায়। বালি, জাভা, কাসপিয়ান অঞ্চলেও একসময়ে বাঘ ছিল, এখন তা' সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত। শুনলে অবাক হবে, এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাঘের বাস ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে। ইন্টারনেট ঘেঁটে জানা যায়, এই দুই দেশ মিলিয়ে, শুধু সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা এখন চারশ' থেকে সাড়ে চারশ'র মধ্যে।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন এখন পৃথিবীর সব দেশেই চালু হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য : সংরক্ষিত বন্যপ্রাণীর শিকার এবং সেই সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ ও প্রতিরোধ করা। এছাড়াও এই আইনের মাধ্যমে সংরক্ষিত অঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্য ও খাদ্য-শৃঙ্খল রক্ষা করে পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখাও অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা যদি সুন্দরবনের দিকেই তাকাই তাহলে দেখব, এখানেও বাঘ সংরক্ষণের নামে জল ও মাটির সংরক্ষণও হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে বন সংরক্ষণ তো হচ্ছেই।

ইতিপূর্বে পৃথিবী থেকে বহু জীব চিরতরে হারিয়ে গেছে। এখনও মানুষের অবিবেচনার জন্য নিয়ম করে হারিয়ে যাচ্ছে বহু উপকারী কীট-পতঙ্গ ও প্রাণী। এই পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রতিটি গাছ, প্রতিটি প্রাণীর উপযোগিতা আছে। সেজন্যই বাঘ সংরক্ষণের নামে যদি আইনটাকে কঠোরভাবে রূপায়ণ করা যায় তাহলে সুন্দরবন অঞ্চলে স্পষ্টতই পরিবেশে সুস্থতা ও অনেকরকম দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীকে দেখার ও জানার সুযোগ তৈরি হবে। ফলে এলাকার পরিবেশেও ভারসাম্য বজায় থাকবে। এজন্য মানুষকেই নতুন করে বিষয়টা ভাবতে হবে। কারণ সরকার একটা আইন প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু তার যথাযথ প্রয়োগ মানুষকেই করতে হবে।

এজন্য স্থানীয় মানুষকে বুঝতে হবে বাঘ আসলে তাদের শত্রু নয়, বরং মানুষই বাঘের শত্রু। যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবা যায় তবে দেখা যাবে, সুন্দরবন অঞ্চল যেখানে শুধু বন্য প্রাণীর থাকার কথা সেখানে মানুষ গিয়ে থাবা বসিয়েছে। মানুষই বাঘেদের আবাসভূমিতে বসত গড়েছে, জঙ্গল কেটে জমি বানিয়েছে। গোটা সুন্দরবনকেই হালকা করে দিয়েছে। তাই লোকালয়ে বাঘ ঢুকছে না, বাঘ তো ওদের বাসভূমিতেই রয়েছে, সেখানেই ঘোরাঘুরি করছে। উলটে বাঘেদের চলাচলে মানুষই বাধার সৃষ্টি করছে। এখানে জানা দরকার, একটা বাঘের জন্য প্রয়োজন দশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা। এই এলাকায় যেমন থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছপালা তেমনি অন্যান্য প্রাণীও। তবেই প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় থাকবে। এই কথাটা এখন জীববিজ্ঞানী থেকে সংরক্ষণবিদ্ থেকে ব্যাঘ্র-বিশেষজ্ঞগণ সকলেই কিন্তু ভাবছেন। এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে ইতিমধ্যেই বহু দেশ এগিয়ে এসেছে, এসেছে অনেক সংস্থাও। এস, আমরাও বাঘ-সংরক্ষণের নামে সকলে মিলে পরিবেশ আন্দোলনে সামিল হই।

সুতরাং আমরা বাঘকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। বাঘকে বেশি বেশি করে দেখতে চাই।

ছবি ঃ পার্থসারথি মণ্ডল

নানারঙের গল্প

রুণুর কীর্তি

কৌশিক ঘোষ

রুণুর সকালটা আজ কেমন বেআক্কেলে। এতদিন পরে যাও বা সুযোগ এল, তাও হাতছাড়া হল। এরজন্য দায়ী ঘোষাল কাকুদের পাঁশুটে বেড়াল। ঘোষাল কাকুদের পাঁচিল ঘেরা এক টুকরো জমির ওপর দাঁড়ানো জাম গাছে টোপা টোপা জাম ঝুলতে দেখলেই কেমন যেন হাত নিসপিস করে রুণুর। মা আজ বাড়িতে নেই। বাবা পাড়ায় শিশির জ্যেঠুদের ক্লাবে তাস পেটাতে ব্যস্ত। জাম চুরি করার এটাই মোক্ষম সুযোগ! ভাঙা পাঁচিল টপকে যেই সে জাম গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে, কোথা থেকে ফ্যাসফ্যাস আওয়াজ করে লাফ মারল এই বেড়াল। অন্য সময়ে রুণু ভয় পায় না। এদিন কী যে হল! ভয় পেয়ে কাঁচা পাকা গাছের পাতা, শ্যাওলা ধরা ইঁটের পাঁজার ওপরে পা রেখে পালাতে গিয়েই যত বিপত্তি।

ধরা তো রুণু পড়েই গেল ঘোষাল জ্যেঠিমার কাছে। হাত পা কেটে একেবারে যাকে বলে নাস্তানাবুদ রুণু। তবে এই অপরাধে শাস্তি জোটেনি রুণুর। ঘোষাল জ্যেঠিমা আদর করেই বললেন,—এতই যদি তোর জাম খাওয়ার ইচ্ছা, আমাকে বললেই হত। রঘুকে দিয়ে গাছ থেকে জাম পাড়িয়ে দিতাম। রুণু কিরকম হতভম্ব হয়ে রইল। ঘোষাল জ্যেঠিমা মাটিতে পড়ে থাকা কয়েকটা জাম তুলে যেই রুণুর হাতে দিতে গেলেন, রুণু দে-ছুট।'

মায়ের কাছে খবরটা পৌঁছলে যে কি হতে পারে তা রুণু কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারে। কয়েকদিন আগেই স্কুলে রাজদীপের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল। ব্যাপারটা কিছুই নয়। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যেই দুটো দল করে খেলা হচ্ছিল। রাহুল আউট হয়ে যাবার পর রুণুরই ব্যাট করার কথা। রাজদীপ বায়না শুরু করল। সে আগে ব্যাট করবে।

এ নিয়েই শুরু হল তর্কাতর্কি। তারপরে সেখান থেকেই মারামারি। খেলা পণ্ড হয়ে গেল। রাজদীপ কাঁদতে কাঁদতে বড়দির কাছে নালিশ জানাল। বড়দিও ডেকে পাঠালেন রুণুর মাকে। বড়দির সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে এসে মা রুণুকে চড় থাপ্পড় তো মারলেনই, এমনকী সেদিন রাতে খেতেও দিলেন না রুণুকে। তারপরে বেশ কয়েকদিন কথা বলাও বন্ধ। সুতরাং জাম চুরির খবর মায়ের কানে গেলে কী হতে পারে তা কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারে বৈকি রুণু। তাই মা কিছু টের পাওয়ার আগেই বাড়িতে ঢুকে লক্ষ্মী ছেলের মতো রুণু পড়ার টেবিলে পড়তে বসে গেল।

পড়ায় রুণুর মন নেই। কিছুক্ষণ পরে মা বাড়ি ফিরলেন। রুণুকে অবেলায় পড়তে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—বন্ধুরা কেউ খেলতে আসেনি বুঝি। না কি স্কুলে পড়া পারোনি বলে শাস্তি পেয়েছ। তাতে মন খারাপ। তারপর একটু থেমে বললেন, কোথাও কোনো দুষ্টুমি করনি তো। এতক্ষণ যদি বা রুণু নিজেকে সামলে রাখছিল, শেষ কথায় কেমন যেন ঘাবড়ে গেল। গলা শুকিয়ে কাঠ। মুখ কাঁচুমাঁচু। মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজই বেরুল না রুণুর। রুণুর মা এবার হেসেই উঠলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। রুণু এইটুকু বুঝল, মা জাম চুরির কোনো খবর পায়নি। তার মনে হল, এ যাত্রায় সে বেঁচে গেল।

রুণুর এবার রাগ হল তার বন্ধু সন্দীপের ওপরেও। জাম পেলে সেও তো খাবে। সন্দীপই তো রুণুকে জাম খাওয়ানোর জন্য লোভ দেখিয়েছিল। রুণু যাই নিক না কেন, বন্ধুদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে খায়। কিন্তু কাজের বেলা কাউকেই দেখা যায় না। রুণু এখন ক্লাস ফাইভের মনিটর। একদিন বড়দিমণি নিজেই ক্লাসে এসে বলেছিলেন, ভালো ছেলে সেই হয়, যে সবার জন্য ভাবে। এই কথাটা কেমন যেন রুণুর মনে দাগ কেটে আছে। স্কুলে ভালো কেউ টিফিন আনলে তা যদি কেউ চুরি করে খায়, তাহলেও রুণুর রাগ হয়। একবার শুভাশিস এই ধরনের কাজ করেছিল। সুমনের মা টিফিনে বেশ কয়েকটা তালের বড়া করে পাঠিয়েছিলেন। শুভাশিস সব কটাই চুরি করে খেয়ে ফেলেছিল। রুণুর খুব কষ্ট হয়েছিল। সে নিজেই বড়দির কাছে শুভাশিসের নামে নালিশ জানিয়েছিল। রুণুর ইচ্ছে ছিল, যে কেউ কিছু চুরি করলেও, তা যেন ভাগ করে দেওয়া হয়। আর সেই জন্যই তার রাগ। তবে চুরি করা যে অপরাধ আর তার জন্য যে শাস্তি পাওয়া দরকার তা সেদিন রুণু বুঝেছিল। শুভাশিসের এই অপরাধের জন্য তাকে ক্লাসের বাইরে আধ ঘণ্টা নিল ডাউন হয়ে থাকতে হয়েছিল। এতসব জানা সত্ত্বেও গাছে ঝোলা প্রিয় ফল দেখলে রুণু নিজেকে সামলাতে পারে না।

সেদিন স্কুলে একটা অন্যরকম কাণ্ড ঘটল। রোজই দুপুরে টিফিনের সময়ে স্কুলে গরম খিচুড়ির সঙ্গে তরকারি কিংবা বেগুন ভাজার তুলনা মেলা ভার। অনেকে বাড়ি থেকে টিফিন আনে ঠিকই, কিন্তু টিফিনের সময়ে এই লোভ সামলাতে পারে না। এই খিচুড়ির লোভেই রুণুর অনেক বন্ধু সাত তাড়াতাড়ি স্কুলে এসে হাজির হয়। সেদিন টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেছে। অনেকের পেট চুঁই চুঁই করছে। কিন্তু খাবারের দেখা নেই। স্কুলে যে ভদ্রমহিলা রান্না করেন, তাকে সবাই রান্নাদি বলে ডাকে। টিফিন হওয়ার পর ক্লাসে ক্লাসে এসে রোল নম্বর ডেকে ছেলেদের খেতে দেওয়ার জন্য নিয়ে যান তিনি।

এদিন আর তাঁর দেখা নেই। ছাত্ররা অধীর আগ্রহে বসে বসে অবশেষে সবাই ছুটল বড়দির কাছে। বড়দি একটু লজ্জা পেয়ে সবাইকে বললেন, আজকে বাবা চালের বাড়বাড়ন্ত। আজ তাই রান্না করা হয়নি। আবার কাল থেকে সব পাবে।

আসলে যে চাল নিয়ে আসা হয়, তাতে এত কাঁকর ভর্তি থাকে যে তা বাচ্চাদের অনেক সময় দেওয়া মুশকিল হয়। ছেলেরাও ইদানীং আর খেতে পারছে না। কয়েকজন অভিভাবকও কয়েকদিন আগে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে চালের ব্যাপারে নালিশ করে এসেছে। যাইহোক, রুণুর মাথায় এবার চটজলদি একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ক্লাসের মনিটর হওয়ার সুযোগে ছেলেরা তাকে একটু মানে বৈকি। রুণু ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত সবকটি ঘরেই গিয়ে ছেলেদের বলতে লাগল, কাল বাড়ি থেকে আসবার সময়ে যে যা পারবে, যেমন আলু, পটল, ঝিঙে, চাল, নুন, তেল, ডাল নিয়ে আসবে। এগুলো সব জমা রাখা হবে রান্না দিদির কাছে। যেদিন আমাদের স্কুলের খাবার দেওয়া হবে না সেদিন এগুলি রান্না করে খাওয়া হবে। ছেলেরা খুব খুশি।

পরের দিন রান্না দিদির কাছে আলু, পটল, ঝিঙে থেকে

শুরু করে রান্নার তেল জমা পড়তে লাগল। রান্নার দিদি প্রথমে অবাক হয়ে গেল। তারপরে শুনল, রুণুর নির্দেশেই এই কাণ্ড ঘটেছে। তিনি গিয়ে বড়দিকে সমস্ত বিষয়টি বললেন। বড়দি সমস্ত বিষয়টি শুনে একটু বিরক্তই হলেন। রুণুকে ডেকে তিনি বকলেন—তুমি কেন আমাকে না জানিয়ে এসব করেছ। রুণু বলল—টিফিনের সময়ে বড্ড খিদে পায়। আমি তো চুরি করিনি। বড়দি এবার হেসেই ফেললেন। এরপর বললেন, অন্য ছেলেরা বাড়িতে কী এসব বলে এনেছে? রুণু কোনো উত্তর দিতে পারল না। বড়দি এবার নরম হয়ে বললেন, বাড়ি থেকে কোনো কিছু না বলে নিয়ে আসাও অপরাধ। এরপর রুণুর গালে একটা চুমু খেয়ে বড়দি বললেন, আচ্ছা এবার যাও। তোমাদের খাওয়া যাতে রোজ হয় তার ব্যবস্থা করে দেব।

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই কী একটা কারণে স্কুলে দুপুরের খাবার দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে এক হুলুস্থূল কাণ্ড। শুধু রুণুদের স্কুলেই নয়, শহরের কোনো স্কুলেই খাবার দেওয়া হচ্ছে না। বেশ কয়েকটা খবরের কাগজেও এই নিয়ে লেখা হয়েছে। বিষয়টি আর কিছুই নয়। চাল না পাওয়ার জন্যই এই সমস্যা। সরকার থেকে অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু ছেলেদের আর বোঝাবে কে? এইভাবে দু'একদিন যাওয়ার পরেই রুণুদের স্কুলের বড়দি ক্লাসে ক্লাসে এসে ঘোষণা করলেন, তোমরা সবাই তোমাদের অভিভাবকদের আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে।

পরের দিন যথারীতি, ছেলেদের অভিভাবকরা স্কুলে এসে হাজির। বড়দি মিটিং করে অভিভাবকদের জানালেন, যে যা পারেন সাধ্যমতো চাল, ডাল, আনাজ ছেলেদের সঙ্গে দিয়ে দিন। এগুলি সমস্তই স্কুলের রান্নার ভাঁড়ার ঘরে জমা থাকবে। এগুলি দিয়েই আপাতত রান্না করে খাওয়ানো হবে ছেলেদের। অভিভাবকরা বড়দির কথা মেনেও নিলেন। পরের দিন থেকে একে একে সব ছাত্র

www.banglabooks.in

বড়দির কথা মেনে রান্নার যাবতীয় কাঁচামাল কিছু না কিছু নিজের সাধ্যের মতো আনতে লাগল।

রুণু এবার খুব খুশি। আসলে এটা তো তার মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। পরে বড়দি রুণুর দেওয়া ফর্মুলাই গ্রহণ করেছেন। কোথাও যখন স্কুলের খাবার হচ্ছে না, তখন একমাত্র রুণুদের স্কুলেই এই খাবার পাওয়া যাচ্ছে। তাও আবার খিচুড়ি নয়। নানান স্বাদের হরেকরকমের খাবার রান্না দিদি ছেলেদের টিফিনে পাতে দিচ্ছে। দু'একজন যারা টিফিন আনত বাড়ি থেকে, তারাও তাদের টিফিন আর খায় না। সেই খাবারগুলো রান্না দিদিকে দিয়ে দেয়। মাঝখানে দু'একদিন পাশের স্কুলের ছেলেমেয়েরা রুণুদের স্কুলে এসে খেয়ে গেছে। রুণুদের স্কুলে এখন আর খাবারের অভাব নেই।

ধীরে ধীরে রুণুদের স্কুলের কথা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দু একটি সংবাদপত্রে রুণুদের স্কুলের মিড-ডে-মিল খাওয়ানোর গল্প প্রকাশিত হল। একদিন শহরের মেয়র হঠাৎই স্কুলে এসে হাজির। শহরে যখন স্কুলে মিড-ডে মিলের এই অবস্থা এমন এই স্কুলে এ হেন খাবারের আয়োজন দেখে তাঁর চোখ তো একেবারে ছানাবড়া। বড়দিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করে এতকিছু সম্ভব করলেন আপনি?

বড়দি একটু মুচকি হেসে বললেন, —এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের স্কুলের একটি ছোট্ট ছেলের বুদ্ধির ফলেই। মেয়র অবাক হয়ে গেলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বলেই ফেললেন,তার বুদ্ধির তারিফ না করে তো পারছি না। এই স্কুলকে মডেল স্কুল হিসেবে চিহ্নিত করা হোক। ছেলেটিকেও পুরস্কার দেওয়ার কথা আমি ঘোষণা করলাম।

মেয়রের কথায় বড়দি তো খুশি বটেই। স্কুলে উৎসবের ধুম পড়ে গেল। ঠিক হল, আগামী রবিবার স্কুলে রুণুকে সবার সামনে মেয়র পুরস্কার তুলে দেবেন।

সেদিন রাত্রে রুণুদের বাড়িতে কড়ানাড়ার শব্দ শুনে রুণুর মা বেরিয়ে দেখেন স্কুলের বড়দি। এত রাতে বাড়িতে বড়দিকে আসতে দেখে তিনি একটু ঘাবড়ে গেলেন। ভাবলেন, রুণু বুঝি আবারও কোনো দুষ্টুমি করেছে। এর আগেও বড়দি রুণুর দুষ্টুমির ব্যাপারে নালিশ জানাতে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছেন।

শুকনো গলায় রুণুর মা জিজ্ঞেস করলেন, রুণু আবার দুষ্টুমি করেছে! বড়দি একগাল হেসে বললেন, কী যে বলেন আপনি। রুণু এখন আমাদের হিরো। এরপর, একে একে রুণুর কাণ্ডকারখানা বললেন।

স্কুলের সামনে বড় সামিয়ানা টাঙিয়ে অনুষ্ঠান করা হল। মডেল স্কুল হিসেবে যে পুরস্কার ছিল, মেয়র বড়দির হাতে তুলে দিলেন। এরপর ডাকা হল রুণুকে। রুণুকে তার বুদ্ধির জন্য একটা মেডেল দিলেন মেয়র। যে রুণু অন্যসময়ে এত বীরত্ব দেখায়, আজকে সে কেমন চুপচাপ হয়ে ছিল। সবাই যখন রুণুকে দেখে হাততালি দিচ্ছিল, রুণু খুব লজ্জা পেয়েছিল। মেয়রের কাছ থেকে কোনোরকমে মেডেলটি হাতে নিয়ে এক দৌড়ে চলে এল সামিয়ানার সামনের সারিতে বসা তার মায়ের কাছে। রুণু দেখল, মায়ের চোখে জল চকচক করছে। তারপরেই রুণু মায়ের কোলে মুখ লুকলো। সেই ঘটনার পরে আজ অবদি মা তাকে আর বকেনি। তাকে দেখলে সবাই এখন সাবাস বলে পিঠ চাপড়ে দেয়।

ছবি : পলাশকান্তি বিশ্বাস

www.banglabooks.in

ভোরের ডাক

সুস্মিতা মৈত্র

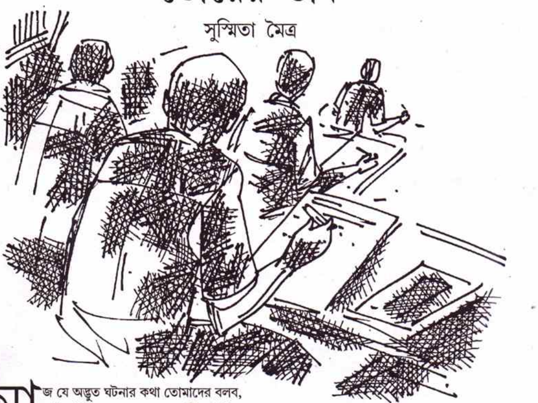

আজ যে অদ্ভুত ঘটনার কথা তোমাদের বলব, সেটা কিন্তু এখনকার নয়। এটি ঘটেছিল বেশ কিছু বছর আগে, ১৯৫০ সালে। কেউ কেউ শুনে বলে, "এ ত অদ্ভুত কিছু নয়। খুব সহজেই এর ব্যাখ্যা করা যায়।"

আবার কেউ কেউ কিন্তু বলে, "এটা শুনলে কেমন গা-টা ছম্‌ছম্ করে, তাই না?"

সে যাই হোক, এবার আসল ব্যাপারটা বলি।

প্রেসিডেন্সি কলেজ এখনও যেমন, অতদিন আগেও ছিল কলকাতার তথা সারা ভারতবর্ষের অন্যতম বিখ্যাত কলেজ। দূর দূর থেকে কত কষ্ট স্বীকার করে মেধাবী ছাত্ররা এই কলেজে পড়তে আসত। কোনও রকমে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে, টিউশনি করে তারা এই কলেজে পড়ে ভবিষ্যতের কর্ণধার হয়েছে, এমন অনেক উদাহরণ আছে। এই প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার স্বপ্ন অর্কও দেখত। বলতে গেলে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে সে পদার্থবিদ্যা নিয়ে ওই কলেজ থেকে পাশ করে ধীরে ধীরে গবেষণার লাইনে চলে যাবে। এই জন্যে বাইরের অনেক বইও পড়ত সে। কিন্তু ভাগ্য তো সবসময় মানুষের বন্ধু হয় না। ভালোভাবে স্কুলশেষের পরীক্ষা পাশ করার পর কলেজের অ্যাড্‌মিশন টেস্টের দিন অর্কের হয়ে গেল বেশ জ্বর। তার কাকা অবশ্য ব্যাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন যে পরীক্ষার টেন্‌শনেই এ-রকমটা হয়েছে। সে যাই হোক, জ্বর নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্যেই বোধহয় অর্ক ভালোভাবে উত্তর দিতে পারল না, জানা অঙ্কও বেশ কয়েকটা ভুল করে এল।

অ্যাড্‌মিশন টেস্টের ফল দেখে এসে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়ল অর্ক। খাবার ইচ্ছে নেই, মনে উৎসাহ সেই, তার জীবনের আশা-ভরসা যেন সব শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু অর্কের মনের এই গভীর অবসাদ থেকে উঠিয়ে আনলেন তার বাবা। বড় বড় রসগোল্লা কিনে এনে, ফুল্‌কো ফুল্‌কো লুচি দিয়ে প্লেটে করে সাজিয়ে এনে বললেন, "বোকা নাকি তুই? এ বছর অন্য কোনও কলেজে ভর্তি হয়ে ভালোভাবে পড়াশুনো করবি; সামনের বছর আবার পরীক্ষা দিবি। প্রত্যেক বছরই কি জ্বর হবে নাকি! দেখবি সামনের বছর ঠিক তোর নাম লিস্টে বেরোবে। লুচি-রসগোল্লা খা, তারপর কাল থেকেই আবার লেগে যা বইপত্তর নিয়ে। আমি যতটা পারি সাহায্য করব।" বাবার এই কথায় অর্কের চোখের সামনে যেন নতুন এক দরজা খুলে গেল। সত্যিই তো! একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আর সামনের বছরও সে যদি প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকতে না পারে, তাহলে তার জীবনের লক্ষ্য তাকে পালটে ফেলতে হবে।

অর্কের বন্ধু নীলাদ্রি। সে ভালোবাসে ইতিহাস। আর ইতিহাস নিয়েই সে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। নীলাদ্রি বন্ধু হলেও একটা কারণে কিন্তু অর্ক তাকে হিংসা করে। নীলাদ্রির বাড়ি ঠিক প্রেসিডেন্সি কলেজের উলটোদিকে কফি হাউসের গলিতে। বাড়ির দরজা দিয়ে বেরোলেই নীলাদ্রি অর্কের স্বপ্নের কলেজ দেখতে পায়। আর অর্ক থাকে ভবানীপুরে। হিন্দু স্কুলে ছোটবেলা থেকে দুজনে পড়েছে, তাই বন্ধুত্বও তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে গভীর হয়েছে।

নীলাদ্রি বলল, "অর্ক, বিকেলের দিকে অ্যাড্‌মিশন টেস্টের পাশ করা ছাত্রের লিস্ট টাঙায়। আমি দেখেই পরদিন ভোরে তোর কাছে ভালো খবর নিয়ে যাব, সামনের বছর, দেখিস। তখন কিন্তু আমাকে রাজভোগ খাওয়াতে হবে।" অর্ক ভিজে ভিজে চোখে বলে, "তা যদি হয়, তুই যা চাইবি তাই দেব রে ভাই। দেখে নিস।"

সময় তো থেমে থাকে না। এক একটা করে দিন যায়। নীলাদ্রি তার ইতিহাসের পড়া নিয়ে এগোতে থাকে। আর অর্ক কলেজের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের বছরের প্রেসিডেন্সি কলেজের অ্যাড্‌মিশন টেস্টের জন্যে তৈরি হতে থাকে। কলেজের টিচার, উঁচু ক্লাসের ছাত্র, মায়ের বন্ধুর ছেলে সবার কাছ থেকেই সে সাহায্য নেওয়ার জন্যে আগ্রহী। আর নীলাদ্রির সঙ্গে সপ্তাহের শেষে সে দেখা করে হয় শনিবার নাহলে রবিবার। কখনও নীলাদ্রির বাড়িতে নয়তো কলেজে উঠে বড়ো হয়ে গেছে বলে কলেজ স্ট্রিটের বসন্ত কেবিনে। ওখানকার চা আর ওমলেট বড্ড ভালো খেতে। এক ঘণ্টা মতো সময় কাটিয়ে অর্ক বাড়ি এসে আবার বইপত্তর নিয়ে বসে। এমনি করে বছর ঘুরে যায়। আবার অ্যাড্‌মিশন টেস্টের দিন আসে। বাবা অর্ককে পৌঁছে দিয়ে আসেন পরীক্ষার হলে। পরীক্ষা দিয়ে অর্ক খুব খুশি মনে হল থেকে বেরোয়। পরীক্ষা ওর সত্যিই খুব ভালো হয়েছে। অঙ্ক তো বোধহয় সবই ঠিক। অবশ্য একথা ভেবে অর্ক অবাক হয়ে যায় যে মানুষের মন কখনো একজায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। এখন যেন তার একবছরের পুরোনো কলেজের জন্যে, সহপাঠীদের জন্যে কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। যতটা নির্ভেজাল আনন্দ হবে মনে হয়েছিল ততটা হচ্ছে না।

যাই হোক দিন দশেকের মধ্যেই ফলাফল বেরিয়ে যাবে। অর্ক দাঁতে দাঁত চেপে এই সময়টা কাটানোর চেষ্টা করে। খবরের কাগজ প্রথম থেকে শেষ অব্দি পড়ে, পাড়ার ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখে, রাস্তায় হেঁটে দিনগুলোকে তাড়াতাড়ি পার করার চেষ্টা। সে সময় জানোই তো টেলিভিশন, কমপিউটার এসব সাধারণ লোকের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না। সারা পৃথিবীর খবর রাখেন এমন লোকেরা টেলিভিশনের কথা জানতেন। দিন আটেকের মাথায় অর্কের উত্তেজনা যেন চরমে উঠল। রাত্রে শুয়ে বিছানায় আর ঘুম আসে না। আগামীকাল মঙ্গলবার। আগামীকালই ফল বেরিয়ে যাবে নাতো? নীলাদ্রি সময় পাবে তো গিয়ে দেখে আসার? এ'কটা দিন নীলাদ্রির বাড়ি গিয়ে থেকে এলেই হত। সে নিজে চোখে ফলটা দেখে নিতে পারত। ছট্‌ফট্ করতে করতে অর্ক দেখতে পেল জানালা দিয়ে অল্প অল্প পেঁজা তুলোর মতো আলো ফুটছে। রাত্রির পেট চিরে বেরিয়ে আসছে আর একটা সকাল।

অর্কের শোবার ঘরের একটা দরজা বাইরের দিকে খোলে। এটা বাড়ির বাইরে যাওয়ার দ্বিতীয় দরজা। হঠাৎ অর্ক শুনতে পেল দরজায় কে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে। এত সকালে কে?

"অর্ক, অর্ক দরজা খোল। আমি নীলাদ্রি। তুই প্রেসিডেন্সিতে পেয়ে গেছিস।"

এটুকু শুনেই তড়াক্ করে উঠে পড়ে অর্ক। দরজা খুলতেই তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে নীলাদ্রি। বিছানায় বসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, "কাল পাঁচটায় রেজাল্ট টাঙিয়ে দিয়েছে। আমি কলেজ ফের্তা দেখে রাত্রে ভবানীপুরে এসে মামার বাড়ি থেকে গেছি। ভোরে হেঁটে এসে তোকে বলব বলে। টেলিফোন তো আমাদের কারো বাড়িতেই নেই।"

"আমার কত পোজিশান রে?"

"ভালোই। ফার্স্ট লিস্টে কুড়ি। ফার্স্ট লিস্টের ছাত্রদের সাতদিনের মধ্যে অফিসে গিয়ে দেখা করতে বলেছে। তুই কাল-পরশুই চলে যা।"

অর্ক নীলাদ্রির হাত দুটো ধরে বলে, "তোকে কি বলব রে? তোর মতো বন্ধু..." নীলাদ্রি হেসে ফেলে, "ওসব ছাড়। নিজে চোখে রেজাল্ট দেখার পর বসন্ত কেবিনে আমাকে চার চারটে কবিরাজী কাট্লেট, লুচি আর ঘুগ্নি খাওয়াতে হবে কিন্তু। তবে বুঝব তুই আমাকে বন্ধু বলে মানিস কি না। পরে রাজভোগ তোদের বাড়ি এসে খাব। কিন্তু এখন আমি যাইরে। মামিমা চা নিয়ে বসে থাকবে।"

নীলাদ্রি চলে যাওয়ার পরে অর্ক কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর দু গেলাস জল খায়। বুকের মধ্যে ধুক্-পুকুনি তাও কমে না। সত্যিই তাহলে তার স্বপ্ন সত্যি হল। ভবিষ্যতে বড় পদার্থবিদ্ হওয়ার স্বপ্ন সার্থক হলেও হতে পারে।

নীলাদ্রির আসার কথা, রেজাল্ট জানানোর কথা মাকে বলতেই মা আক্ষেপ করে বললেন, "ওকে যেতে দিলি কেন, মিষ্টি মুখ না করে? মিষ্টি গজা বানানো ছিল।" "ও ঠিক আছে, পরে চিংড়ি মাছের মালাই কারি করে খাইয়ে দিও। আর বড় বড় রাজভোগ।"

অর্ক হাওয়ায় উড়তে উড়তে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নেয়। তারপর যে শার্ট-প্যান্টটা পরে পরীক্ষা দিয়েছিল, সেটা পরে মায়ের কাছ থেকে বাসের ভাড়া নিয়ে কলেজ স্ট্রিটে প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। ওই শার্ট-প্যান্ট নিঃসন্দেহে লাকি!

নীলাদ্রির কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। কুড়ি নম্বরে পদার্থবিদ্যার লিস্টে অর্ক ভট্টাচার্যের নাম জ্বলজ্বল করছে। কলেজের অফিস থেকে এরপর কি করতে হবে জেনে নিয়ে অর্ক বাড়ি চলে আসে। ভর্তি হওয়ার জন্যে হাতে

এখনো দিন চারেক সময় আছে। আর পরদিনই মায়ের কাছ থেকে গোটা পনেরো টাকা নিয়ে ট্রামে উঠে সোজা চলে আসে কলেজ স্ট্রিটের বসন্ত কেবিনে। নীলাদ্রিকে যদি ওখানে দেখতে পায় তো ভালো, নাহলে ওর বাড়ি গিয়ে ওকে টেনে আনবে। তারপরে দু'জনে খাবে, গল্প করবে। আর নীলাদ্রি যদি কলেজে থাকে? তবে রাস্তায় ঘুরে বিকেল হওয়ার অপেক্ষা করবে। কিন্তু বসন্ত কেবিনে ঢুকে অর্ক দেখে কোণার দিকের টেবিলে নীলাদ্রি আর একটি ছেলের সঙ্গে বসে কথা বলছে। সামনে দু'কাপ চা। অর্ক পেছনে থেকে নীলাদ্রির পিঠে একটা চাপড় মারে। "একেই বলে মেন্টাল যোগাযোগ। কি করে বুঝলি আমি আজই আসব? চল, এবার কবিরাজী কাট্‌লেটের অর্ডার দেওয়া যাক।"

নীলাদ্রি বলে, "তুই বুঝি রেজাল্ট দেখে এলি?" "দেখার দরকার ছিল না। তোর কথাই যথেষ্ট। তবু একটা নিয়ম বলে তো কথা আছে। তোর ওই ভোর রাতে খবর দেওয়াতেই আমার মনের সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গিয়েছিল।" "আমার খবর দেওয়াতে? তার মানে?" এবার অর্ক থমকায়। "কেন, তুই যে ভোর রাতে আমার ঘরের দরজা ধাক্কে আমার পোজিশান অব্দি বলে এলি! আমাদের কবিরাজী কাটলেট খাওয়ার কথা হল। তাই তো এলাম রে।"

অর্ক গম্ভীর ভাবে বলে, "তুই কি বলছিস আমি বুঝতে পারছি না। গেছিলাম ভোর রাতে আমি ঠিকই। আগের দিন বিকেলে কলেজ ফের্‌তা ফল দেখে রাতেই মামার বাড়ি ভবানীপুরে চলে যাই। তারপর ভোর-ভোর হেঁটে গিয়ে তোকে খবরটা দেওয়ার জন্য দরজা ধাক্কাতে থাকি। কিন্তু তুই তো খুললিই না। অনেকবার ধাক্কে শেষে আমি ভাবলাম রাস্তার লোকেই বা কি বলবে! এখনো ভালো করে সকালই হয়নি। তার চাইতে আজ ফিরেই যাই। ভেবেছিলাম তোকে খুশির খবরটা দিয়ে তোর থেকে কবিরাজী কাট্‌লেট খাওয়ানোর কথা আদায় করে নেব। এই অজয়ের সঙ্গে তোর কথাই আলোচনা করছিলাম।"

অর্ক হতভম্ব হয়ে যায়। নীলাদ্রি যে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকল। আর লিস্টে কুড়ি পোজিশানে তার নাম? সেটা নীলাদ্রি না বললে সে জানল কি করে? সারা বাড়িকে তো সে তার ফল বলেছে লিস্ট দেখার আগেই? তবে?

নীলাদ্রি অবশ্য সব শুনে হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছে। তার মতে দুশ্চিন্তায় অর্কর রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। শেষ রাতে আধঘুমে দরজায় ধাক্কা সে শুনেছে ঠিকই আর ভেবেছে নীলাদ্রি ছাড়া এটা আর কেউ হতেই পারে না। ভেবেও সে কিন্তু শুয়েই থেকেছে আর স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে মনে করেছে সে দরজা খুলে দিয়েছে। এবার পরীক্ষা অর্কর খুব ভালো হয়েছে। কাজেই নীলাদ্রি ওই ভোররাতে যে তার পাশ করার খবরই আনবে এটা ওই আধঘুমেও অর্কর বুঝতে কোনওই অসুবিধা হয়নি। আর পাশের খবরের পর নীলাদ্রি তার প্রিয় বসন্ত কেবিনেই খাওয়াতে বলবে এতেও কোনও ভুল নেই!

কিন্তু এত সহজে কি ঘটনাটার ব্যাখ্যা করা যায়? কি করে অর্ক জানতে পারল যে তার স্থান কুড়ির ঘরে? ফল ঠিক আগের দিনই বেরিয়েছে এটাই বা তাকে কে বলল যদি নীলাদ্রির সঙ্গে তার কথাই না হয়? তোমরা জানো এর উত্তর?

ছবি : শংকর বসাক

নানারঙের গল্প

অবাক যাত্রা

শুভমানস ঘোষ

অফিসের কাজে দিল্লি গিয়েছিলাম, বাড়ি ফেরার তিনতিনেক পরে একদিন রাতে উদয়দা এসে হাজির। ছুটির দিন বলে সারাদিন বাড়িতেই বসেছিলাম, উদয়দাকে দেখে মন খুশিতে ভরে উঠল। স্ত্রীকে জমিয়ে চা করতে বলে দুজনে মিলে গল্প করতে লাগলাম।

উদয়দার আসল নাম উদয়ন ঘোষ। বিচিত্র লোক। ভ্রমণের পোকা যাকে বলে। ট্যুরিস্ট পার্টির মতো বাছা-বাছা জায়গায় শখের ভ্রমণে কোনওকালে তাঁর রুচি নেই, অদ্ভুত জায়গায় অদ্ভুত রকমের ঘোরাঘুরিতেই তার আনন্দ। ক'দিন আগে কাগজে এক তিব্বতির দণ্ডী খেটে তিব্বত থেকে বুদ্ধগয়ায় যাত্রার বিবরণ পড়ে একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন। ভদ্রলোককে মিট মরার জন্য বড্ড ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।

—কী হল উদয়দা, বুদ্ধগয়ায় যাননি? আমি বললাম, —যাবেন বললেন সেদিন?

—নাহ্ এ যাত্রা হল না! উদয়দা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন,—মিসেসের শরীরটা হঠাৎ বিগড়ে গেল, ব্যস আটকে গেলাম।

উদয়দা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,—বুঝলেন, বিয়ের আগেই বেশ ছিলাম, ঝাড়া হাত পা—যেখানে খুশি যখন খুশি বেরিয়ে পড়তে পারতাম, এখন হাতে হাতকড়া। বেঁচে আর সুখ নেই মশাই।

আমি তার দুঃখ শেয়ার করে পালটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম—যা বলেছেন। অফিসের কাজে দিল্লি গিয়ে ভেবেছিলাম, আরও দু-চার দিন থেকে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে

আসব আশপাশটা, হঠাৎ ফোন আপনার বউদির, ছেলের অ্যাডমিশন টেস্ট—গার্জেনের প্রেজেন্স মাস্ট। কী আর করি, সফর বরবাদ করে তড়িঘড়ি প্লেন ধরে ফিরে এলাম।

—প্লেন! উদয়দা আমার দুঃখে সাড়া না দিয়ে উলটে আমার প্লেন ভ্রমণেই আকৃষ্ট হলেন। বললেন,—আপনি প্লেনে ফিরেছেন। কী আশ্চর্য।

—কেন, কী হয়েছে তাতে? আমি একটু অবাকই হলাম,—পেমেন্ট তো করবে অফিস।

উদয়দা আবার একটা লম্বাচওড়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—প্লেনের কথা শুনলেই বুকটা কীরকম হু-হু করে ওঠে। ওই একটি জিনিস জীবনে আমার চড়া হল না মশাই।

—সে কী!

—হ্যাঁ, ওটা বাদ দিলে মোটামুটি সব রকম গাড়িতেই চড়েছি। ইভেন হেলিকপ্টার।

—প্লেনে চড়েননি, অথচ হেলিকপ্টারে চড়ে বসে আছেন।

—গাড়োয়াল হিমালয়ে একবার হয়েছিল—ধস নেমে রাস্তা আটকে সাতদিন আমার আটকা পড়েছিলাম, সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার এসে উদ্ধার করে আমাদের। আপনাকে একদিন বলব সে গল্প।

আমি প্রশ্ন করলাম,—জাহাজে চড়েছেন উদয়দা?

—চড়েছি। এইট্টি টুয়ে আন্দামান গিয়েছিলাম, তখন।

—জাহাজ! বিউটিফুল! এবার আমার মুগ্ধ হওয়ার পালা,—আপনার যেমন প্লেন, আমার তেমন জাহাজ! ওটা হলেই কমপ্লিট।

সঙ্গে সঙ্গে উদয় ঘোষের চোখ বড় হয়ে গেল, —কমপ্লিট?

—মোটামুটি।

—বটে?

চেয়ারে সোজা হয়ে বললেন উদয়দা,—দেখেছেন আমাকে। চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন,—বাস-ট্রাম-ট্রেন তো সবাই চড়েছে, আপনি মাটাডোরে চেপেছেন?

—ম্যাটাডোর? আমার মনে পড়ে গেল ঘাড় নেড়ে বললাম,—হ্যাঁ, বাড়ি চেঞ্জ করার সময় মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে একবার ম্যাটাডোর ভাড়া করতে হয়েছিল, তখন চেপেছিলাম।

—ও। টেম্পো?

—টেম্পো? আমি মাথা দোলালাম,—আমার ছোটকাকার একটা টেম্পো ছিল, ছোটবেলায় প্রচুর চেপেছি।

উদয়দা দেখছেন আমাকে। এবার কি লরি বা ঠেলাগাড়ির কথা জিজ্ঞেস করবেন ভদ্রলোক? তবে তাতেও ঘায়েল করতে হবে না আমাকে। জিজ্ঞেস করলাম,—কী দেখছেন আমাকে?

উদয়দা বললেন,—এবার লাস্ট আইটেম, আপনি মালগাড়িতে চড়েছেন কখনও? গুডস ট্রেন?

—মালগাড়ি।

—আমি থমকে গেলাম। হুঁ, এই প্রশ্নটা বড্ড শক্ত ছুড়েছেন উদয়দা।

—হুঁ, রেলের মালগাড়ি। বগির পর বগি, একটার পেছনে আর একটা। কখন চলে কখন থামে কিচ্ছু ঠিকঠিকানা নেই। রিয়েল ভবঘুরে।

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম। মালগাড়ি প্রচুর দেখেছি, দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির তলা দিয়ে লাইনও টপকেছি বার কয়েক, কিন্তু মালগাড়িতে চড়ে বসা। নাহ্ এ-জীবনে এখনও সৌভাগ্য হয়নি।

আমি ঘাড় নেড়ে পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বললাম, —না উদয়দা, মালগাড়িতে চড়িনি। শুনেছি ড্রাইভার আর গার্ড ছাড়া আর যারা মালগাড়িতে চড়ে তাদের বলে ওয়াগনব্রেকার। আপনিও তাদের দলে নাম লিখিয়েছিলেন না কি?

—ভালো বলেছেন। উদয়দা হা-হা করে হেসে আমার ঠাট্টা উপভোগ করে বললেন,—তবে আমরা যে মালগাড়িতে চড়েছিলাম তার গোটাটাই ছিল বিলকুল ফাঁকা। রৌরকেল্লা থেকে মাল খালাস করে টাটায় ফিরছিল। সে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এত আনন্দ জীবনে পাইনি।

হেলিকপ্টারের চেয়ে এটাই বেশি ইন্টারেস্টিং হবে বলে মনে হচ্ছে। বললাম,—শুনি কী রকম আনন্দ!

—শুনবেন? দাঁড়ান, বউদির চা আসুক আগে।

বলতে বলতেই উদয়দার বউদি এসে পড়লেন। হাতে প্লেটে বসানো ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ, সঙ্গে পটেটো চিপস। উদয়দার বউদির নিজের হাতে বানানো। কড়াং করে তার একটা টুকরো দাঁতে কেটে খুশ হয়ে গেলেন উদয়দা। প্রশংসায়-প্রশংসায় বউদিকে ভরিয়ে দিয়ে

বললেন,—আপনি বসুন বউদি, একটা ঘটনা বলি।

কিন্তু পৃথিবীর কারও বউদির কি দু-দণ্ড বসে গল্প শোনার উপায় আছে, না ছিল? বউদি ঠিক একটা কাজ বের করে ফেললেন, 'ও আমি পরে শুনে নেব' বলে ছুটলেন কিচেনে।

আরামে চোখ বুজে পটেটো চিপস চিবোতে-চিবোতে মনে-মনে একটু ঘটনা গুছিয়ে উদয়দা শুরু করলেন, —সেটা এইট্টি সেভেনের ঘটনা। তখন ম্যালেরিয়া ছিল, কিন্তু ফরেস্ট ম্যালেরিয়ার নাম শুনিনি। জঙ্গল ছিল, এখনকার থেকে অনেক গভীরই ছিল, কিন্তু জঙ্গলের ভেতরে বসে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কথা শোনা যায়নি। এমনকি এই উদয়ন ঘোষও ছিল, কিন্তু তার বিয়ে থা হয়নি, ওই যে বললাম, তখনও পর্যন্ত রিয়েল ঝাড়া হাত-পা, মনের সুখে পাহাড়-জঙ্গল তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি, পেছন থেকে জামা টেনে ধরবার কেউ নেই।

আমরা সেবার দলে ছিলাম তিন বন্ধু, ট্রেকিংয়ে গিয়েছিলাম জঙ্গলে। জেরাইকেল্লা থেকে হেঁটে ভালুলতা, ভালুলতা থেকে হেঁটে তিরুলপোষি, সেখান থেকে একেবারে থলকোবাদ। থলকোবাদের কথা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখায় পাওয়া যায়। এক চাঁদনি রাতে সেখানকার বনবাংলোয় তিনি রাত কাটিয়েছিলেন।

আমরা অবশ্য থলকোবাদে ছিলাম তিন রাত। লক্ষ্মীপুজোর ঠিক পরে পরেই গিয়েছিলাম। তাই চাঁদনি রাতের সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করেছিলাম।

শুধু তাই নয়, এক রাত গভীর জঙ্গলের মধ্যে ওয়াচ টাওয়ারে বসে কাটিয়েছিলাম। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। মাঝরাতে ঝিলের জলে জল খেতে আসা হাতির পালের জলকেলি আর উদ্দাম নাচ যে দেখেছে সে-ই জানে স্বর্গীয় দৃশ্য কাকে বলে। এত আনন্দ হচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে আমি গায়ে চিমটি কেটে দেখছিলাম বেঁচে আছি কি না।

চায়ে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে কাপটা প্লেটে নামিয়ে রেখে হঠাৎ চুপ করে গেলেন উদয়দা। গল্পটা শ্রোতাকে কতটা টানছে তা টেস্ট করার এটা তাঁর নিজস্ব টেকনিক। আমি তাঁর দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বললাম,—তার পর?

উদয়দা বললেন,—তিন দিন থলকোবাদে আনন্দ করে কাটিয়ে একদিন সকালে তল্পিতল্পা বেঁধে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সন্ধে-সন্ধে নাগাদ আমরা এসে পড়লাম বান্ডামুন্ডা বলে একটা জায়গায়। সেখানে এসেই আমরা রেললাইন দেখতে পেলাম, দেখতে পেলাম অন্য মানুষের মুখ।

বান্ডামুন্ডায় এখন কী হয়েছে জানি না, তখন সেখানে রেলের গার্ড আর ড্রাইভারদের থাকার জন্য একটা আস্তানা ছিল। আমরা তিন বন্ধু সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। যদি বলে-টলে মাথা গোঁজার একটা জায়গা মেলে সেখানে—এই রকমের ইচ্ছা আমাদের।

কিন্তু নাহ্, রেস্ট হাউসের একটা সিটও খালি নেই, সব ভরতি। অগত্যা রেস্ট হাউসের বাইরের বারান্দাতেই বিছানা লাগিয়ে দিলাম আমরা। শখের ট্যুরিস্ট তো নই, সব রকম অভ্যাস ছিল আমাদের। এমনকি, প্রয়োজনে না খেয়েও দু-একদিন আরামসে কাটিয়ে দিতে পারতাম আমরা।

যাই হোক, মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেলেও রেলের ক্যান্টিন থেকে খাবার অঢেল মিলল। একেবারে ফ্রি সার্ভিস। রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরের দিন ফেরার ব্যবস্থা কী করা যায় ভাবতে লাগলাম। হেঁটে এমনিতেই ক্লান্ত সকলে, আর হাঁটতে চাইছে না কেউ। কিন্তু না-হেঁটেও তো উপায় নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কেন, বান্ডামুন্ডায় ট্রেন ছিল না?

উদয়দার চা শেষ হয়ে গিয়েছিল, কাপটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন,—এখন কী হয়েছে জানি না, তখন বান্ডামুন্ডায় কোনও স্টেশন ছিল না। ফলে গাড়ি দাঁড়াবার প্রশ্নই ছিল না। টাটানগর বা রৌরকেল্লাগামী গুডস ট্রেনগুলোই একমাত্র দাঁড়াত সেখানে। গার্ড-ড্রাইভাররা গাড়ি রেখে সেখানে খাওয়া-দাওয়া করত, রেস্ট-টেস্ট নিত, ডিউটি বদলাবদলি করত।

উদয়দা বলতে থাকলেন,—আমরা একরাত্রির মধ্যে রেস্ট হাউসের ড্রাইভার আর গার্ড সাহেবের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছিলাম। তারা আমাদের ট্রেকিংয়ের গল্প শুনে তো হাঁ। আসলে শুধু দেশ দেখার জন্য মাইলের পর মাইল বেকার পায়ে হাঁটার ব্যাপারটা তাঁদের মাথাতেই ঢুকছিল না।

মানুষ যা বোঝে না তাকে ভয়েই হোক বা ভক্তিতে হোক, সমীহ করতে শুরু করে। ফলে রাতারাতি আমরা

তাঁদের কাছে ভি আই পি হয়ে গেলাম। কাল আমাদের বাইরে রাত কাটাতে হয়েছে বলে তাঁরা লজ্জায় একেবারে অধোবদন হয়ে গেলেন।

কথায়-কথায় জানতে পারলাম এদিন দুপুরে রৌরকেল্লা থেকে এমটি গুডস আসবে। এখানে গার্ড বদল হবে। আমরা ইচ্ছে করলে ওই গাড়ি ধরে টাটায় যেতে পারি। এই বলে তাঁরাই গার্ডসাহেবকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কেবিনের বাইরে রেলিং ঘেরা খোলা পোর্সনে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়লাম। দেদার ইয়ার্কি-ফুর্তি ছোটাতে শুরু করলাম।

ঘণ্টাখানেক থেমে থাকার পর গাড়ি চলতে শুরু করল। আমরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম। এই রকম আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ক'টা লোকের হয়? আমাদের রকম-সকম দেখে শ্রীবাস্তবজি মুচকি-মুচকি হাসতে থাকলেন।

দেখতে দেখতে গাড়ি গভীর বনের ভেতর ঢুকে

পড়ল। চারপাশে ছমছম করছে বন। এই দুপুরেও সূর্যের আলো সব জায়গায় ঠিক মতো পৌঁছায়নি।

গার্ডসাহেবের নাম অশোক শ্রীবাস্তব। মাঝারি হাইট, স্বাস্থ্য ভালো, মাথায় স্লাইট টাক, ভাঙা-ভাঙা বাংলাও জানেন। সব শুনে একটু না-না করে শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন। আনন্দে বুক ঢিপঢিপ করে উঠল আমাদের। একটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে আমাদের। লোককে বলার মতো।

তা হল। ট্রেনটার আসার কথা ছিল দুপুর একটা নাগাদ, এল সাড়ে তিনটেয়। আমরা আমাদের ঝোলাঝুলি নিয়ে টপাটপ গার্ডের কেবিনে উঠে পড়লাম।

গার্ডের কেবিন মানে তো বুঝতেই পারছেন, ছোট একটা কুঠুরি, আমাদের ভালো লাগবে কেন, আমরা

—হরিণ-হরিণ। হঠাৎ আমাদের বন্ধু শান্তনু চেঁচিয়ে উঠল।

আমরা তাকালাম। কয়েক সেকেন্ডের জন্য হরিণটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। এইসব জঙ্গলে হরিণ তো আছেই, খরগোশ আছে, ময়ূর আছে, বনবরা আছে, গোবাঘ আছে, তার থেকে বেশি আছে ভালুক আর হাতি। তাই অন্ধকার হলেই আমরা যেন ভেতরে ঢুকে আসি। গার্ডসাহেব বারবার করে একথা আমাদের মনে করিয়ে দিতে লাগলেন।

অক্টোবরের শেষ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঝপ করে অন্ধকার নেমে এল। কৃষ্ণপক্ষ হলেও দিন দুই হয়েছে পূর্ণিমা গেছে। চাঁদ উঠে গেল, আমরা হুড়মুড় করে গার্ডের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। শ্রীবাস্তবজি আমাদের কিছুতেই ধরে রাখতে পারলেন না।

বাইরে বেরিয়ে আমরা মোহিত হয়ে গেলাম। চাঁদ এখনও দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে কে যেন জঙ্গলের মাথায় সার্চলাইট জ্বেলে দিয়েছে। দূর থেকে বিয়েবাড়ি যেমন লাগে, অবিকল সেই ভাব। পেছনে চলন্ত রেলের লাইনে তার প্রতিফলন পড়ে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছিল জ্যোৎস্না। এত আনন্দ হল যে আমরা লাফালাফি জুড়ে দিলাম। আমাদের আর এক বন্ধু দীপনারায়ণ গান ধরে বসল, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে'। আমরা তার সঙ্গে গলা মেলালাম।

উদয়দা থামলেন। বিচিত্র আনন্দে আমার মন কানায়-কানায় ভরে উঠেছিল। বললাম,—বাহ্।

উদয়দাও আনন্দের সঙ্গে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলে চললেন,—তবে মালগাড়ি মানে তো জানেন, থামা-চলার মাথামুণ্ডু নেই। একটু করে যাচ্ছে, আর দাঁড়িয়ে পড়ছে। দাঁড়ানোর সময় এক ওয়াগনের সঙ্গে অন্য ওয়াগানের ধাক্কার কর্কশ শব্দও যে কত সুন্দর হয়, কতক্ষণ ধরে তার অপূর্ব অনুরণন চলতে থাকে, তা যে শুনেছে সে-ই জানে!

আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। হুঁ, মালগাড়ি থামার শব্দ তো আমরাও শুনি, কিন্তু তার মধ্যে এমন সংগীত আছে, কই, কোনওদিনও তো ভেবে দেখিনি। উদয়দা আমার চোখ খুলিয়ে দিলেন। বললাম,—ফার্স্টক্লাস!

উদয়দা একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন,—গাড়ি থামতেই আমাদের গানও থেমে গেল। আমরা পটাপট নেমে পড়ছিলাম নীচে। শ্রীবাস্তবজি বারণ করা সত্ত্বেও লাইনের ওপর ঘোরাঘুরি করে আসছিলাম। এইরকম ঘোরাঘুরি করতে-করতেই হঠাৎ আমার নেশা লেগে গেল, আমি একটা কাণ্ড করে বসলাম।

—কী রকম? আমি নড়ে বসলাম।

—বলছি। তখন রাত আটটা-সাড়ে আটটা হবে। মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে। দূরে সিগনালের লাল আলো জ্বলেই আছে, কখন সবুজ হবে কে জানে। আর সবুজ হলেই যে সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি চালু হয়ে যাবে তাও নয়। মালগাড়ির মতো অলস প্রাণী পৃথিবীতে নেই। ড্রাইভারের সঙ্গে-সঙ্গে তারও যেখানে সেখানে যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ার বাতিক আছে।

দু-পাশে ঠাসা বন। কান ফাটিয়ে ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গত করছে পোকামাকড় আর রাতচরা পাখির দল। গাছের বাসায় ফেরা পাখিরাও হঠাৎ-হঠাৎ চারপাশ কাঁপিয়ে ডানা ঝাপটে উঠছিল। আমার ঘোর লেগে গেল বুঝলেন। বন্ধুদের 'এক্ষুনি আসছি' বলে হাঁটতে শুরু করলাম বনের দিকে।

—একা? আমি চমকে উঠলাম।

—একা! বন্ধুরা তো আমাকে চেনে, তাই আটকাল না, শ্রীবাস্তবজিও ঠিক নজর করতে পারলেন না, আমি হাঁটতে শুরু করলাম। অনেকক্ষণ ধরেই জঙ্গল আমাকে টানছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, চলেই তো যাচ্ছি, শেষবারের মতো একবার বনের পায়ের ধুলো নিয়ে আসব না?

এই ভেবে গাছপালা ঠেলে কিছুটা আগাতেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। এইরকম ফাঁকা জায়গা জঙ্গলের মধ্যে মাঝে-মাঝেই দেখা যায়।

কিন্তু আর একটু এগোতেই আমার ভুল ভাঙল। দেখলাম, যেটাকে ফাঁকা জায়গা বলে মনে করেছি, আসলে একটা রাস্তা। জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে রেললাইনের দিকে চলে গেছে। তার মানে ভেতরে কাছাকাছির মধ্যেই গ্রাম-ট্রাম আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছি, ঠিক তখনই চোখে পড়ল দৃশ্যটা।

উদয়দা থামলেন। দেখছেন আমায়। আমার পিঠ সোজা হয়ে গেল। বললাম,—কী, ভাল্লুক?

—উহুঁ।

—হাতি?

—উহুঁ।

—তবে?

—আগুন! দেখি দূর থেকে শূন্যে আগুন হেঁটে আসছে।

—ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না উদয়দা।

—আমিও কি ছাই বুঝেছিলাম প্রথমটা। দেখতে-দেখতে আগুন চলে এল আমার কাছে। জঙ্গলে রাত-বিরেতে নানারকম অলৌকিক দৃশ্য দেখা যায়। আমি নিজেও বহুবার দেখেছি, কিন্তু লোকে বিশ্বাস করবে না ভেবে কাউকে বলিনি। কাঠ হয়ে চেয়ে আছি হঠাৎ দেখলাম আগুন নেই,

সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে একটি মেয়ে। তার মাথায় ছোট একটা সরা গোছের। একহাতে সেটা সে ধরে আছে। আগুনটা ওই সরার মধ্যে থেকেই বেরোচ্ছিল। তার জন্যই মনে হচ্ছিল শূন্যে আগুন হাঁটছে।

যাক, তাহলে অলৌকিক কিছু নয়। আমার সাহস ফিরে এল। চেঁচিয়ে উঠলাম,—অ্যাই কে রে, কে? দাঁড়াও!

মেয়েটা চমকে গেল। এক সেকেন্ডের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। আমিও ছুটলাম তার পিছু-পিছু। ছুটতে-ছুটতে বন থেকে সে খোলা রেললাইনে উঠে এল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঘড়ঘড় করছে আমাদের গাড়ি। বন্ধুরা লাইনের ওপর বসে সিগারেট টানছে। আমাকে দেখে তারা ধড়মড় করে উঠে পড়ে আমার সঙ্গে জয়েন করল।

মেয়েটা আমাদের সঙ্গে পারল না, ধরা পড়ে গেল, বড় টর্চ জ্বালিয়ে শ্রীবাস্তবজি ছুটে এলেন। ড্রাইভারের কেবিন থেকেও একজন আমাদের সঙ্গে ছুটে গেল। ধরা পড়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল মেয়েটা। আদিবাসী। রোগা কাঠির মতো চেহারা, একমাথা চুল, সারা মুখ ফেটেফুটে একাকার। অবিকল যেন জটেবুড়ি।

উদয়দা থামলেন। এইরকম জায়গায় থামা মানে উদয়দার ইঙ্গিত, আর-এক কাপ চা চাই। বারবার স্ত্রীকে আর কত বিরক্ত করা যায়? আমি নেমে পড়লাম বিছানা থেকে।

—কী হল, নামলেন কেন? উদয়দা জিজ্ঞেস করলেন।

—আর এক কাপ হবে না কি উদয়দা।

—না না চায়ের জন্য থামিনি। ব্যাপারটা কী আইডিয়া করতে পারেন?

আমি আবার বসে পড়লাম বিছানায়। ঘাড় নেড়ে বললাম,—চোর-ডাকাত না কি?

—উহুঁ, ডাইনি।

—অ্যাঁ।

—হ্যাঁ। জেরা করে আমরা এক এক করে সব জানতে পারলাম। এই বনের মধ্যে তার গ্রাম। বর মরে যাওয়ার পর সে একাই থাকে। কিন্তু লোকের বিশ্বাস সে ডাইনি। তাই গ্রামে কিছু অকল্যাণ ঘটলেই তাকে ধরে জরিমানা আদায় করা হয়। এই করে সে তার জমি জায়গা, এমনকি, বসত ভিটেও হারিয়েছে।

এতদিন এই রকমই চলছিল। হঠাৎ পুজোর পর গ্রামের কয়েকজন লোক পর পর মারা যাওয়ায় সকলে খেপে উঠেছে। সালিসি ডেকে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ঠিক হয়েছে, আগামীকাল তাকে পাথর ছুঁড়ে মারা হবে। তাই প্রাণ বাঁচাতে মেয়েটা পালাচ্ছে। পথে যাতে কেউ ধরতে না পারে তার জন্যই এই টেকনিকটা নিয়েছে। যার মাথার ওপর আগুন জ্বলে কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে তার কাছে ঘেঁষে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—আগুনটা কী করে করেছিল সে?

—স্রেফ কাঠকুটোর আগুন। তার ভেতর মধ্যে-মধ্যে একটু করে ধুনো ফেলে দিচ্ছিল, আগুন ফোঁস করে উঠছিল। আগুনের ঠিক নীচেই মুখ বলে দূর থেকে মুখটা চোখেই পড়ছিল না, মনে হচ্ছিল, অবিকল যেন কন্ধকাটা হেঁটে যাচ্ছে। রাতবিরেতে দেখলে আচ্ছা-আচ্ছা লোকের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। গ্রামের মেয়ের কীরকম বুদ্ধি একবার ভাবুন।

আমার তাক লেগে গেল। হেলিকপ্টার ছেড়ে খুব খারাপ করিনি দেখছি। বললাম,—তারপর?

—তারপর আর কী, আমরা তাকে জিজ্ঞেস করে আরও জানতে পারলাম, কাছেই একটা জায়গায় তার জন্য অপেক্ষা করছে এই গ্রামেরই একটা ছেলে। দুজনে মিলে তারা আজ রাতেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবে শহরে। সেখানে গিয়ে তারা সংসার পাতবে বলে ঠিক করেছে।

এইসব বনবাসী মানুষজন আর যাই হোক, মিথ্যে কথা বলে না। সব শুনে আমরা আর ঝামেলা না বাড়িয়ে ছেড়ে দিলাম তাকে। যে বাঁচতে চায় তাকে বাঁচতে দিতে হয়, বাঁচার পথে আগিয়ে দিতে হয়। আমরাও তাকে গার্ড করে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের মালগাড়ি ভ্রমণের এই একখানা কংক্রিট প্রাপ্তি আমাদের। জীবনে কখনও ভুলব না।

উদয়দা থেমে গেলেন। আমি বললমা, তারপর আর পথে কিছু ঘটেনি?

—ঘটেনি মানে? তার পরেই তো আসল ঘটনা ঘটতে শুরু করল। আদিবাসী মেয়েটিকে নিয়ে এত কান্ডের মধ্যে গাড়ি যখন সিগনাল পেয়ে গেছে খেয়াল করতে পারিনি। আমরা হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম গাড়িতে, নড়েচড়ে উঠল গাড়ি।

গাড়ি তখন সবে সিগনাল পেয়ে দৌড়তে শুরু

করেছে। আসার সময় ক্যান্টিন থেকে আমরা রাতের খাবার নিয়ে এসেছিলাম। খাব বলে সব গোছগাছ করে বসেছি, হঠাৎ বনের মাথা থেকে টপাস করে চাঁদ উঠে এল মাথার ওপর।

—চাঁদ।

—হ্যাঁ মশাই চাঁদ। আফ্, সে কী দৃশ্য কী বলব আপনাকে। সমুদ্রের ফেনার মধ্যে নাচতে শুরু করলাম আমরা যেন। নাচছি আমরা, নাচছে আমাদের ছুটন্ত গাড়ি, পেছনে হু-হু করে ছোট হতে হতে দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া রেলের লাইন, কানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের মতো বাতাস।

খাবারদাবার সব রইল পড়ে, আমরা হাঁ করে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলাম অপূর্ব জ্যোৎস্না। আমার সমস্ত শরীরে সে যে কী আনন্দের হিল্লোল বইছিল ভাষায় বোঝাতে পারব না। খুব আনন্দে মানুষ কেঁদে ফেলে জানেন? আমি সত্যি সত্যি সেদিন কেঁদে ফেলেছিলাম! ব্যস, ঘটনা বলতে সেদিন রাতে এইটুকুই ঘটেছিল।

উদয়দা থামলেন। দেখছেন আমাকে। তাঁর চোখের ভেতর এখনও যেন চকচকে করছে সেদিনের চাঁদের আলো। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন,—বুঝলেন, পাহাড়-জঙ্গলে জীবনে বহু ঘুরেছি। হিমালয়ের আচ্ছা-আচ্ছা স্পটগুলোয় একাধিক বার গিয়েছি, কিন্তু সেদিন চলন্ত মালগাড়িতে আমরা তিনবন্ধু যে আনন্দ পেয়েছিলাম জীবনে ভুলব না। মরে যাওয়ার সময় লোকে চায় ভগবানের নাম করতে, আমি কিন্তু মরবার সময় সেই রাতটাই, সেই আনন্দই আর একবার ফিরে পেতে চাইব।

আমার গায়ে কাঁটা দিল, চুপ করে রইলাম। কখনও-কখনও কথাকে বিশ্রাম দিতে হয়।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে উদয়দা আবার বললেন,—সেদিন সারারাত ট্রেন চলল। ভোরের দিকে আমরা পৌঁছে গেলাম টাটানগরে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে সেদিনই ফিরে এলাম বাড়িতে।

—এক্সেলেন্ট! আমি নেমে পড়লাম বিছানা থেকে। উদয়দা ব্যস্ত হলেন,—আরে নামলেন কেন? এখনও অল্প একটু আছে। বসুন বসুন।

—আছে?

আমি আবার বসে পড়লাম বিছানায়। উদয়দা গল্পের নামে বেশ ভালোই ওঠবোস করাচ্ছেন আমাকে।

—আছে বইকি। উদয়দা মিটিমিটি হাসতে-হাসতে বললেন,—বাকিটা শুনুন, খুব মজার। বাড়ি ফিরে আসার পর দুদিন যায়, পাঁচদিন যায়, সাতদিন যায়, বন্ধুদের টিকির পাত্তা নেই। এদিকে আমিও এমন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি কারও খোঁজ নিতে যেতে পারছি না। আর তখন তো এখনকার মতো ঘরে-ঘরে ফোন হয়নি, যে ফোনে কথা হয়ে যাবে।

দশ দিনের দিন দীপনারায়ণ এসে হাজির। রোগা হয়ে গেছে বেশ, চোখের নীচে কালি। ব্যাপার কী? না, সে ফেরার পরই ম্যালেরিয়ায় পড়েছিল, দিন দুই হল উঠেছে। এদিকে তিনতিনেক হল অন্য বন্ধু শান্তনুও ম্যালেরিয়ায় বিছানা নিয়েছে।

—সে কী! আমি চমকে উঠলাম।

দীপ মাথা নেড়ে বলল,—তোর এখানে আসার পথে শান্তনুর বাড়ি গিয়েছিলাম, নিজের চোখেই দেখে এলাম। আমি তো ভেবেছিলাম, তোকেও ধরেছে, তাই ভয়ে-ভয়ে আসছি।

এই বলে আমি ভালো ছিলাম, অথচ কারও খোঁজ নিইনি বলে আমাকে খুব বকাবকি করে দীপনারায়ণ চলে গেল। সে চলে যেতেই ভয়ে গা কেঁপে উঠল আমার। জঙ্গলে গিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরেছি, যা তা খেয়েছি, সঙ্গে ফ্রি মশার কামড়। সারা রাত ধরে ওয়াচ টাওয়ারে মশাদের মোচ্ছাবে নিজের গোটা বডিটাই উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম বলতে গেলে। ম্যালেরিয়া কি আমাকে ছাড়বে?

না ছাড়ল না, পরের দিনই সকালে দেখলুম কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে, চাদর টেনে সেই যে শুয়ে পড়লাম উঠলাম পাক্কা পনেরো দিন পরে। স্ট্রং ম্যালেরিয়া। হতচ্ছাড়া দীপনারায়ণটা না এলে আমার এ-দুর্গতি হত না বলে আমার আজও বিশ্বাস।

ছবি : পলাশকান্তি বিশ্বাস

মজার গল্প

ছোটমেসোর কেরামতি

বিশ্বজিৎ

ছোটমেসো ইদানীং ঠিক ঠিক সময়ে চেম্বারে বসতে পারছেন না। রোগীরা অধৈর্য হয়ে গালাগালি দিয়ে চলে যান। কারণ তিনি এখন খুব ব্যস্ত।

ছোটমেসোর বড়দার ভাষায় যেটা দাঁড়ায় তার মর্মার্থ হল ওর দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

কিন্তু ছোটমেসোর গবেষণা যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ব্যাপার তাও নয়, বড়মেসো এটা ভালোই জানেন তবু এই নিয়ে বাড়িতে মাঝে মাঝে অশান্তি, তর্কাতর্কি।

ছোটমেসো বললেন, বুঝলে বড়দা অ্যালোপ্যাথি ওষুধে এ টু জেড সব ভেজাল মাল সাইড এফেক্ট আছেই। ও দিয়ে চিকিৎসা করা যায় না, ব্যবসা করা যায় ভালো।

ছোটমেসো যত সব বুনো গাছ লতাপাতা শিকড় বাকড় কুড়িয়ে এনে ঘরভর্তি করছেন। যত সব আদিখ্যেতা!

একটু আগেই বাড়িতে তুমুল হৈ-হট্টগোল হয়ে গেছে। ছোটমেসো মনের ভুলে এক বোঝা কালমেঘা গাছ কোথা থেকে এনে বড়মেসোর বিশ্রামের খাটের ওপর রেখেছিলেন।

মেসোর বড়দা ঘরে ঢুকতেই চক্ষু চড়ক গাছে। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, নোংরা জঞ্জাল এনে খাটের ওপরে তুলেছিস ওখানে রাতে আর শোয়া যাবে!

ছোটমেসো বললেন, জানো বড়দা পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান গাছ হচ্ছে এই কালমেঘা। একে তুমি অবহেলা

করো না। আমি এখনই নামিয়ে রাখছি। তাড়াহুড়ো করে মালটা এখানেই রেখেছিলুম নামিয়ে রাখতে আর কতক্ষণ লাগবে।

বড়মেসো পেছন ঘুরিয়ে 'হুম' একটা শব্দ করে দ্রুত বারান্দায় চলে গেলেন।

বাড়িতে সত্যিই ইদানীং আর তিল ধরানোর ঠাঁই নেই। আলমারির মাথায় আমলকি হরিতকি বহেড়ার পাহাড়। খাটের নীচে কাঁচা হলদি টেবিলের নীচে কাঁচা বেলের আড়ত, সিঁড়ির পাশে বুনো লতাপাতার জঙ্গল। টেবিলে অ্যালোপ্যাথি ওষুধের ক্যাটালগ চাপা পড়েছে থানকুনি কাঁটাকুলে নানা লতাপাতার স্তূপে। বাড়িটা দেখলে সত্যিই ডাক্তারের বাড়ি মনে হয় না। মনে হয় যেন একটা জঙ্গল। কিন্তু মেসোর বড়দা চিরদিনই একটু ফিটফাট গোছানো মানুষ তাঁর চোখে এই সব পড়লে সত্যিই বড় বেমানান ঠেকে।

গত রাতে ছোটমেসো আমাকে হামানদিস্তা ঠুকতে দিয়েছিলেন। আমি পারিনি তিনি বলেছিলেন প্যাকটিস কর কবজি মজবুত হবে। ভবিষ্যতে কুস্তি করে সোনার কাপ জিতে আনতে পারবে।

আমি বলেছিলুম, বড্ড বেশি ভারি, আমি অত ওজন তুলতে পারি না।

তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'লেজি'! তারপর নিজেই দুমাদুম হামানদিস্তায় আমলকি, হরিতকি চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে কপালের ঘাম মুছে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আবার যেন দিদাকে বল না ছোটমেসো সবসময় গালাগাল দেন। দিদা অর্থাৎ ছোট মাসির শাশুড়ি তিনি বাতের ব্যথায় দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে পড়েছিলেন। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি করে করেও নিরাময় করতে পারেননি শেষে একেবারে ধরাশায়ী।

ছোটমেসো নিজে দীর্ঘদিন অ্যালোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেছেন, তাঁর স্যারকে দেখিয়েছেন তবুও নিরাময় হয়নি। অবশেষে কোথা থেকে একটি কবিরাজি বই সংগ্রহ করে লতাপাতা আর রসুন আদা দিয়ে আরও কি কোথায় মশলা স্বহস্তে জ্বালিয়ে তেল পাক করে দিয়ে ম্যাসেজ করে তবে নিরাময় হয়। সেই থেকেই ধন্বন্তরী গাছগাছড়া ও লতাপাতার ওপর ছোট মেসোর শ্রদ্ধা ভক্তি বেড়ে গেছে। এই হল ছোটমেসোর হাতে কলমে পরীক্ষা। মাকে তিনি খুব ভক্তি করেন। আর অ্যালোপাথি বিদ্যায় তাঁকে সুস্থ করতে পারেননি অথচ গাছগাছড়ার গুণাগুণ তাঁকে যে ম্যাজিক দেখিয়েছে, সেই থেকেই অ্যালোপ্যাথির ওপরে ছোটমেসোর অবহেলা। আর অন্যদিকে কবিরাজি চিকিৎসার ওপর ভক্তি। দিদা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সেও ছোটমেসোর কেরামতিতে।

ছোটমেসো এম. বি. বি. এস. পাশকরা ডাক্তার, বিশাল চেম্বার। সারাদিন রোগীর ভিড় থাকত কিন্তু কিসে যে কি হল এখন ওদিকে তাঁর আর ভ্রূক্ষেপ নেই।

যষ্ঠি মধু, কাবাবচিনি, অর্জুন ছাল চূর্ণ, শিমুলমূল চূর্ণ, জোয়ান, বিট লবণ দশকর্মার দোকান উপুড় করে নিজের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কবিরাজি মাল মশলার দিকে তাঁর লক্ষই আলাদা! ইদানীং ছোটমেসোর চেম্বারে অধিকাংশ সময়ই প্রায় তালা ঝোলে, বাড়িতে কোনো রোগী এলে তিনি এলাও করেন না। হ্যাঁ, বিনা টাকাতেই তিনি কবিরাজি ওষুধের স্যাম্পেল দিয়ে দেন।

বড়মেসো কিছুক্ষণ পূর্বে একবার চক্কর মেরে ঘুরে গেছেন। ছোটমেসোর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি এখন খুব ব্যস্ত। পাড়ার কেষ্ট ঠাকুর এক ঝাঁকা জগ ডুমুর দিয়ে গেছে সেগুলি তিনি নিজের হাতে মুঠো মুঠো তুলছেন আর সুরক্ষিত স্থানে যত্ন করে রাখছেন! ছোটমেসোর মুখ চুড়বুড় করছে তিনি বললেন, হ্যাঁ অমৃত ফলই এই জগ্নি ডুমুর। অসাধ্য সাধনে এর জুড়ি নেই।

দেশের মাটিতে মিশে আছে অমৃত কণা। যা খেলে যা ব্যবহার করতে জানলে সকলেই অসুখ বিসুখ থেকে বিরত থাকতে পারে। সে কেউ ভুলেও স্পর্শ করবে না অথচ ভেজাল মাল শোকেসে সাজানো থাকবে সেই দিকেই সবার লক্ষ ; বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে মানুষের মগজ ব্যাপারিরা একেবারে ধোলাই করে দিয়েছে।

ছোটমেসোর তিনমাস চেম্বারে বসার কোনো ঠিকঠাক নিয়ম নেই। তবু মাঝে মাঝে ঘর ঝাড়পোঁছ করার জন্যে দরজা খুলতেই হয় আর তখনই শুরু হয়ে যায় রোগীর ভিড়।

ছোটমেসো অ্যালোপ্যাথির প্রেসক্রিপশন করেন ঠিক কিন্তু বিকল্প গাছ-গাছড়ার ব্যবহারের পরামর্শও না দিয়ে পারেন না।

ছোটমেসোর বড়দা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি যেমন রাশভারী তেমনই গম্ভীর। কদিন ধরে বুকের কাশিতে খুব

কষ্ট পাচ্ছেন। বড় বড় ডাক্তারের হাত ছুঁয়ে অবশেষে তিনি ছোটমেসোর গাছ-গাছড়া জমা করা জঙ্গল ভর্তি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, ছোটমেসো খাঁটি মধুর বোয়েমটা পেড়ে কি কোথায় চূর্ণ সব এক পাত্রে ঢেলে চামচ দিয়ে মাখছিলেন। কাজে এতই ব্যস্ত কে এসেছেন তিনি লক্ষ করেননি।

আমি ঘরের এক প্রান্তে বসে ছোটমেসোর কর্মচঞ্চলতা লক্ষ করছিলুম।

মেসোর বড়দা কাতরাতে কাতরাতে ফ্যাঁস ফেসে গলায় বললেন, বুকে বড় সর্দি জমেছে রে হাঁফ লাগছে দম আটকে আসছে আর সহ্য করতে পারছি না।

মুখ না তুলেই তিনি বললেন, পৃথিবীতে যত রকমের অসুখ আছে তার সব নিরাময় প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যেই জমা রয়ে গেছে। শুধু একটু চেষ্টা করলেই হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।

মেসোর বড়দা খুকুর খুকুর করতে করতে একেবারে একটানা দম আটকে যায় যায় অবস্থা।

ছোটমেসো এইবার চোখ তুলে তাকালেন। তাকাতেই হল। ছোট মেসোর অন্তরে আবার একটু দয়া মায়ার খনি আছে। তিনি অন্যের ব্যথায় সবসময়েই কাতর। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এসো, আমার সামনের চেয়ারটায় বসো, দেখে নিচ্ছি। তারপর কানে স্টেথসকোপের নল খাটিয়ে বুক পিঠে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে জোরে জোরে দম নিতে এবং ছাড়তে বললেন। ছোটমেসোর রাশভারী বড়দা একেবারে বাধ্য ছেলের মতো চেয়ারটায় বসে কাত হয়ে ঘুরে ফিরে কখনও লম্বা শ্বাস ফেলে কখনও ঘন ঘন শ্বাস টেনে নিয়ে ছোট ভাই-এর মর্জি মাফিক আজ্ঞা পালনে মনোনিবেশ করলেন। মেসোর বড়দার বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা দেখে আমার বেজায় হাসি পাচ্ছিল। আমি হাসি চাপার চেষ্টা করছিলুম কিন্তু পারলুম না।

ছোটমেসো তার দাদাকে বেড়ে চিৎ করে শুইয়ে ফেলে বুকের ওপর দু আঙুল দিয়ে টুং টাং করে বাড়ি দিলেন। পেশার মাপলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, জঙ্গলে

মধু আর আগাছা কুগাছা দিয়ে একটা সিরাপ করে দেব দুটো দিন একটু কষ্ট করে খেতে পারবে তো?

—আগাছা কুগাছা বলছিস কীরে?

—হ্যাঁ আগাছাই! তুলসী গাছ যাতে রোজ সকাল বিকেল দুপুর সব সময় কুকুরে ঠ্যাং তুলে প্রস্রাব করে দেয় তাকে আগাছা বলব না তো কি বলব!

ব্লাড পরীক্ষা করেছি, এক্সেরে হয়ে গেছে, রিপোর্টগুলো দেখবি না?

—না দেখলেও চলবে। ছোট মেসো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলতে বলতে স্টেথসকোপের নল দুটো কান থেকে খুলতে লাগলেন।

—অনুমানে ঢিল ছুঁড়ছিস নাতো?

—না, না, আমি তোমাকে অ্যালোপ্যাথি করছি না লাংসের ওপরে সর্দি জমে আছে। রোজ ওকে ধাক্কা দিয়ে তুলতে হবে। জং ধরে গেছে। ওর জন্যে জঙ্গুলে উপাদানই অব্যর্থ! লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, ভয় নেই।

—তোর হাবভাব আমার মোটেও ভালো ঠেকছে না।

—তার মানে আমি হাতুড়ে? আমাকে অবিশ্বাস? ভাবছ গাছ-গাছড়া হামানদিস্তা শেকড় বাকড় সব ভেলকিবাজি?

—ধুস্, আমি তা বলছি না, তবে কিনা প্রায় তিন মাস কাশছি রাতে ঘুম নেই দম আটকে আসে, অত দামি দামি ওষুধ ব্যবহার করলুম কিছুতেই কিছু হল না আর তুলসী পাতা, বাশক পাতায় এত বড় সাংঘাতিক রোগ নিরাময় হবে?

জঙ্গলে মধু তুলসী আর বাশক পাতা শুধু নয় ওর সঙ্গে আরও অনেক অনুপান মিশিয়ে তবে সিরাপ। যতটা হেলাফেলা ভাবছ অতটা নয় দাদা। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন চিকিৎসা হল হেকিমি চিকিৎসা।

মহাসাধক শিবকালী ভট্টাচার্যের নাম কে না জানে! তিনি বনবাদাড় ঘেঁটে ঘেঁটে অনেক তথ্য উপাদান রেখে গেছেন। সেগুলো তোমাদের অ্যালোপ্যাথিকে এখনও টেক্কা দিতে পারে। ছোটমেসোর কথায় সেই পুরানো ঝাঁঝটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

মুখে একটা বিরক্ত ভাব থাকা সত্ত্বেও ছোট মেসোর মন্তব্যে বড়দা আর কথা বাড়াতে পারলেন না। তিনি বেড থেকে উঠে পড়লেন। বললেন, কখন তাহলে সিরাপ পাব?

ছোটমেসো বললেন, এ ওষুধ তো অ্যালোপ্যাথি নয় যে প্রেসক্রিপশন করে দিলেই দোকানে মিলবে। এটা সম্পূর্ণ অন্য অভিজ্ঞতা। আমাকে মাত্রা মতো নিজের হাতে তৈরি করে দিতে হবে।

মেসোর বড়দা ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মেসো অন্য কাজ কাম দূরে সরিয়ে রেখে এইবার সর্দি ওঠার সিরাপ তৈরির দিকে মনোনিবেশ করলেন। টেবিলে সিরাপের সমস্ত মাল মশলা সংগ্রহ করতে করতে বললেন, বুঝলে চঞ্চল, বাউলরা বলছে, এ দেহতরী বইতে জানলে দম লাগে না দেহে...।

ডাকাতর মেসো এইবার আমাকে বাউল তত্ত্ব বোঝাতে মেতে উঠলেন অথচ হাত আর মন তাঁর সিরাপ তৈরির কর্মেই ব্যস্ত।

সিরাপ খাওয়ার দিন চারেক পরে ছোট মেসো বড়দাকে হাসতে হাসতে বললেন, কেমন বুঝলে দাদা? মালটা জব্বর বানিয়ে দিয়েছিলুম না?

তিনি খুশিতে ডগমগ করতে করতে বললেন, ভীষণ কফ উঠে গেছে। সত্যিই জাদু মন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। বুকটা আমার একেবারে হালকা হয়ে গেছে।

এই জন্যেই তো বলি নির্ভেজাল মাল নিতে হলে কবিরাজিই একমাত্র শিবরাত্রির সলতে।

—কিন্তু এত টাকা পয়সা খরচা করে যে ডাক্তারি পড়লে চেম্বারে ভিড় উপছে পড়ছিল। সেগুলো কে দেখবে?

—শোন দাদা, মানুষ ঠকিয়ে ব্যবসা করবার জন্য অনেক পথ আছে। চিকিৎসা জগৎটা বোধকরি ভিন্ন। নাইবা করলুম ওমন ব্যবসা। আমার হাকিমি চিকিৎসাতেই তো রয়ে গেছে মোক্ষম দাওয়াই।

—ডিগ্রি ডিপ্লোমার তবে কি প্রয়োজন ছিল?

—ছিল, ছিল শরীর তত্ত্ব না বুঝতে পারলে সব কিছু বোঝা যায় না।

—অল রাইট।

ছবি : শংকর বসাক

দুর্যোগের দুর্বিপাকে

শিশির বিশ্বাস

দুর্যোগের দিনে বাড়ি থেকে বের হতে মানা করেছিল সবাই। গনেনবাবু কান দেননি। কিন্তু তাইতে শেষ পর্যন্ত এমন দুর্বিপাকে পড়বেন ভাবতেই পারেননি। আসলে অফিসে কাজ অন্তপ্রাণ গনেনবাবু ওরফে গনেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি একেবারেই সৃষ্টিছাড়া মানুষ। টেলিফোন অফিসে ঢুকেছিলেন সেই আটত্রিশ বছর আগে। বাবা হঠাৎ মারা যেতে সংসারের পুরো দায় তখন কাঁধে। সামাল দিতে শুরু করেছিলেন ওভারটাইম। প্রথমে উইক ডে। তারপর সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও। অফিসে এসে সেই যে কাজ নিয়ে পড়তেন, টিফিনের আগে আর ওঠার সময় পেতেন না। অফিস থেকে বেরোতে সেই আটটা। ওই ওভারটাইমের টানেই তেমন ছুটিও নেননি। সংসারের দিকে তাকিয়ে তখন ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন হাসি মুখেই। তারপর কবে যে সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে টেরও পাননি।

এক-এক করে বোনেদের বিয়ে দিয়েছেন। ছোট ভাই হিমাংশু কলেজ থেকে বের হয়ে এখন ব্যাঙ্কের চাকুরে। বিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু নিজে আর ওসবে যাননি। মা

বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজি করাতে পারেননি। তারপর সময় পালটেছে। সংসারের ঝক্কি তেমন আর সামলাতে হয় না। হিমাংশুই এখন সেই দায়িত্বে। কিন্তু গনেনবাবুর পরিবর্তন হয়নি। অফিসে ওভারটাইম বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিন। কিন্তু ছুটির দিন ছাড়া তিনি অফিস কামাই করেছেন, এমন বিশেষ হয়নি। সেবার ব্যাপার হয়েছিল একটা।

সেদিন শনিবার বিকেল। মাথা চুলকোতে-চুলকোতে হাতে একটা ছুটির দরখাস্ত নিয়ে ইনচার্জ রায়সাহেবের ঘরে ঢুকলেন গনেনবাবু। কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'আর পারলাম না স্যার। দিন কয়েকের ছুটি নিতেই হবে এবার।'

এস.ডি.ই রায়সাহেব বছর পাঁচেক আছেন এই অফিসে। বিলক্ষণ চেনেন মানুষটিকে। এমন কাজের মানুষ বড় একটা দেখেননি। সেই মানুষ হঠাৎ ছুটি নেবেন শুনে অবাক হয়েই বললেন, 'তা দরকার থাকলে নেবেন বই কী।'

'কিচ্ছু দরকার নয় স্যার।' রায়সাহেবের কথায় আরও কাঁচুমাচু হয়ে গেল গনেনবাবুর মুখ। 'বাড়ির সবাই চাঁদিপুর বেড়াতে যাচ্ছে। দিন দুয়েক থাকবে। সেখান থেকে নাকি আরও কোথায়-কোথায় যাবে। ভাই সেজন্য গাড়িও ভাড়া করেছে। আমাকেও নিয়ে যাবে সঙ্গে। কী কাণ্ড বলুন দেখি! অনেক করে বললুম, শুনলে না কিছুতেই। ভাইপো দুটো তো আরও এক কাঠি। সাফ জানিয়ে দিয়েছে, জেঠু রাজি না হলে স্রেফ বেঁধে তুলে নেবে গাড়িতে।'

গনেনবাবু করুণ গলায় বললেও প্রবীণ মানুষ রায়সাহেব কিন্তু খুশিই হলেন। বললেন, 'তা বাড়ির সবাই যখন বলছে, দিন কয়েক ঘুরেই আসুন না।'

'আপনিও দেখছি স্যার ওই দলে!' একরাশ ক্ষোভ ঝরে পড়ল গনেনবাবুর গলায়। বিরস মুখে ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটা রেখে বের হয়ে গেলেন। পরের দিন রবিবার। সোমবার ফাস্ট হাফে জি. এম অফিসে জরুরি মিটিং ছিল। সেটা সেরে বেলা দুটো নাগাদ রায়সাহেব নিজের অফিসে ফিরে কাজ করছেন, হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন গনেনবাবু। একগাল হেসে বললেন, 'আজ সকালেই ট্রেন ধরে পালিয়ে এসেছি স্যার! ওসব পোষায় আমাদের? বাপরে! এক বেলাতেই দম বন্ধ হবার জোগাড়!'

এহেন গনেনবাবু ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা'র খবরে অফিস কামাই করবেন, তাই হয়! গত রাত থেকেই টি.ভি আর রেডিওতে ঘন-ঘন হুঁশিয়ারি চলছে। বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ প্রবল ঘূর্ণিঝড় হয়ে ধেয়ে আসছে দক্ষিণ বঙ্গের দিকে। সুন্দরবন হয়ে আজ সকালের মধ্যেই আছড়ে পড়বে কলকাতার উপর। শেষ রাত থেকে তার নমুনাও পাওয়া যাচ্ছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সেই সাথে দমকা হাওয়ার বেগ বাড়ছে ক্রমশ। কিন্তু তাতে পরোয়া করেননি। গত আটত্রিশ বছরে এমন দুর্যোগ মাথায় করে কত দিন অফিস করেছেন। বরং আজ একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। বিরাটি থেকে বরাবর বাসেই যাওয়া-আসা করেন। বাড়ির কাছেই স্ট্যান্ড, বসেই যেতে পারেন। কিন্তু আজ এই অবস্থায় সময়মতো বাস পাবেন না বুঝে সোজা চলে এসেছেন স্টেশনে। প্রায় ফাঁকা ট্রেনটা পেয়ে গিয়েছিলেন একটু পরেই। ঘন-ঘন হুঁশিয়ারির দরুন অফিস-যাত্রী তেমন কেউ যে আজ বাড়ি থেকে বের হয়নি, তা বেশ বোঝা যায়। আরামে বসেই একসময় পৌঁছে গিয়েছেন শিয়ালদহ। গোলমালটা হয়ে গেল তারপরেই।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বাইরে বের হয়ে সামনে সাবওয়ে পড়তে গনেনবাবু ঢুকে পড়েছিলেন সেই পথে। কিন্তু কপাল খারাপ। খানিক এগোতেই ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। এমারজেন্সি বাতিগুলো সাথে-সাথে জ্বলে উঠল বটে, তবে তাতে অন্ধকার কাটল সামান্যই। সেই আধো অন্ধকারে গনেনবাবু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন দীর্ঘ সাবওয়ের ভিতর তিনি একেবারেই একা। আশপাশে কেউ কোথাও নেই। রীতিমতো শক্ত মনের মানুষ হলেও গনেনবাবুর সারা শরীর হঠাৎ কেমন ছমছম করে উঠল। সেই আধো অন্ধকারে প্রায় হোঁচট খেতে-খেতে একসময় ওপ্রান্তে পৌঁছে দিনের আলোর দেখা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবেন, চারপাশে তাকিয়ে থতমত খেয়ে গেলেন আবার। সামনে ফ্লাইওভার, এ.পি.সি রোড তেমনই আছে বটে, কিন্তু এ কী অবস্থা আজ শিয়ালদহের! মানুষের ভিড়ে সারাদিন গমগম করে যে জায়গা, আয়লার হুঁশিয়ারিতে আজ একেবারে শুনশান। ফুটপাতে হকার, অস্থায়ী দোকান, সব উধাও। পথে কোনও মানুষজনের দেখা নেই। খাঁ খাঁ করছে চারপাশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফুটপাতে কোনও হকার বসতে ভরসা পায়নি হয়তো, কিন্তু পথে কোনও মানুষও কি থাকতে নেই!

একটু হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিতে সময় লাগল না। কিন্তু সমস্যা হল অন্য কারণে। ভেবেছিলেন সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে বাস পেয়ে যাবেন। কিন্তু এই অবস্থায় বাসের ভরসায় পড়ে থেকে লাভ নেই। অফিস এমন কিছু দূরে নয়। সঙ্গে ছাতাও রয়েছে, কিন্তু ঝড়ের যা তেজ তাতে ছাতায় সুবিধা হবে না। কী করবেন ভাবছেন, বৃষ্টিটা বাড়ল আবার। ঠিক ওই সময় ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে একটা পুরোনো আমলের ঘোড়ার গাড়ি সামনে এসে দাঁড়াল। উপরে বসে হালকা লিকলিকে চেহারার এক কোচোয়ান। গালে খোঁচা দাড়ি লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে ছোট এক সেলাম ঠুকে বলল, 'আসেন কত্তা, আব্দুলের ছ্যাকরায় আসেন।'

কলকাতার রাস্তায় হঠাৎ ঘোড়ার গাড়ি দেখবেন, আশা করেননি গনেনবাবু। মনে আছে, সবে তখন চাকরিতে ঢুকেছেন, এই শিয়ালদহ হয়েই যাওয়া-আসা করতেন। নতুন স্টেশন-বাড়ি তখন তৈরি হয়নি। পুরোনো স্টেশনের সামনে ছিল বিশাল এক চত্বর। তারই একধারে ট্রাম গুমটি ঘেঁষে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত গোটা কয়েক ঘোড়ার গাড়ি। রাস্তায় তখনও ঘোড়ার গাড়ি চলত। তারপর ধীরে-ধীরে সেসব উধাও হয়ে গেছে কলকাতার রাস্তা থেকে। কিন্তু এমন অদ্ভুত আকারের সেকেলে ছ্যাকরা কলকাতার রাস্তায় কখনও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না।

'কী ভাবচেন গো কত্তা? কেরাঞ্চি আজ আর পাবেন না। এই ঝড়-তুফানের দিনে সব ঘরে খিল দিয়েচে।'

হঠাৎ লোকটার কথায় চিন্তায় ছেদ পড়ল গনেনবাবুর। কপালের ভাঁজগুলো কুঁচকে উঠল আরও। কিন্তু ওই সময় কোচোয়ান লোকটা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। হাতে ঘোড়ার দড়িতে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে খরখরে গলায় বলল, 'কত্তা তাহলে কেরাঞ্চির জন্যই থাকেন।'

কোচোয়ানের ইঙ্গিত পেয়ে ততক্ষণে নড়ে উঠেছে ঘোড়াটা। দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গনেনবাবু। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন গাড়িতে। প্রায় মুহূর্তে ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজে চলতে শুরু করল নড়বড়ে গাড়িটা।

এই দুর্যোগের দিনে সুযোগ যখন মিলেছে তখন সেটা ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না বুঝেই গাড়িতে উঠেছিলেন গনেনবাবু। কিন্তু তারপর ভাবনাটা যেন আরও চেপে বসল মাথায়। স্কুলে ভালো ছাত্র ছিলেন। পড়ার বইয়ের বাইরেও প্রচুর বই পড়তেন তখন। শুধু গল্পের বই নয়। অন্য বইও। সংসারের ঘূর্ণিপাকে পড়ে বই পড়ার সেই অভ্যাস হারিয়ে গেলেও অনেক কিছুই ভোলেননি এখনও।

সত্তরের দশকের গোড়ায় যখন তিনি চাকরিতে ঢুকেছিলেন, তার আগেই কলকাতা থেকে ছ্যাকরা বিদায় নিয়েছে। তবু হয়তো মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ওই কেরাঞ্চি! সেই স্কুল জীবনেই একটা বইতে কেরাঞ্চি-গাড়ির কথা পড়েছিলেন। ওটা এক ধরনের ঘোড়ার গাড়ি। সেই আঠারো শতকের কথা। কলকাতা শহর তখন সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। আজকের ডালহৌসি পাড়ায় একটা দুটো করে কোম্পানির অফিস, কোর্ট-কাছারি চালু হয়েছে। সেসব অফিসে সাহেব 'রাইটার' অর্থাৎ কেরানিদের সঙ্গে কিছু বাঙালি বাবুও ঢুকতে শুরু করেছেন। গোড়ায় তাঁরা অফিসে আসতেন হেঁটেই। তারপর চালু হল ছ্যাকরা-গাড়ি। কিন্তু তাতে ভাড়া একটু বেশি বলে সামান্য মাইনের বাবুদের কাছে তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি। তাই অল্পদিনের মধ্যেই রাস্তায় এসে পড়ল দুই ঘোড়ায় টানা কেরাঞ্চি-গাড়ি। হাড়জিরজিরে ঘোড়া, কিম্ভুত খাঁচার আদলে তৈরি সেই গাড়িতে পাঁচ থেকে ছ'জনের বসার ব্যবস্থা থাকত। জনপ্রতি ভাড়া তাই বেশ কম হত। বাঙালি বাবুদের অনেকেই তখন অফিসে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করত ওই কেরাঞ্চি-গাড়ি। কিন্তু অনেক দিন হল সেসব ইতিহাস হয়ে গেছে।

নড়বড়ে আসনে বসে সেই কথাই ভাবছিলেন গনেনবাবু। হঠাৎ মনে পড়ল, কোচোয়ান লোকটাকে তো গন্তব্যস্থানের কথাই বলা হয়নি! জানতে চায়নি ওপক্ষও। ধড়মড়িয়ে উঠে সেই কথাই বলতে যাবেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন বিষম খেলেন। এ কোথা দিয়ে চলেছে গাড়িটা! জলকাদায় ভরা কাঁচা পথ। দু'ধারে গাছপালার ফাঁকে নির্ভেজাল খড়-পাতা নয়তো টালির ঘর। তারই ফাঁকে এক আধটা একতলা কোঠাবাড়ি। পরিচিত কলকাতা শহরের ছিটেফোঁটা চিহ্নও নেই। এই সামান্য সময়ের মধ্যে লোকটা কোথায় নিয়ে এল তাকে! কোনও বদ মতলব নেই তো? ধড়মড়িয়ে উঠে বললেন, 'দাঁড়াও। দাঁড়াও বাপু। এ কোথায় নিয়ে এলে?'

নড়বড়ে ছ্যাকরা গনেনবাবুর নড়াচড়ায় ততক্ষণে টালমাটাল হয়ে উঠেছে। কোচোয়ান আব্দুল গাড়ি থামিয়ে ব্যাজার হয়ে বলল, 'কেন, লালদিঘির দিকেই তো যাচ্ছি কত্তা!'

লোকটা লালদিঘি বলতে যে ডালহৌসিপাড়া অর্থাৎ বি.বা.দি বাগ বোঝাচ্ছে সেটা বুঝতে ভুল হয়নি গনেনবাবুর। তাড়াতাড়ি বললেন, 'না-না লালদিঘি নয়। আমার অফিস ওয়েলিংটনের ওদিকে।'

'ও-ওয়েংটন!' হঠাৎ যেন থতমত খেল আব্দুল। 'সেটা কোতা গো কত্তা?'

'ওয়েংটন নয়, ওয়েলিংটন। ধর্মতলার ওদিকে।' গনেনবাবু বললেন।

'এই মাটি কল্লেন! সে তো সেই খালের ওধারে! আগে কইবেন তো।' গজগজ করে লোকটা বলল। আর সেই কথায় প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন গনেনবাবু। এতদিন কলকাতায় যাওয়া আসা করছেন, ধর্মতলার ওদিকে কোনও খাল নজরে পড়েনি কখনও। কিন্তু সেকথা বলবেন কী! তার আগেই আব্দুল গাড়ি ঘুরিয়ে খরখরে গলায় বলল, 'ওদিকের পথঘাট ভালো নয় কত্তা? ঝড়জলে আবার বান ডেকেছে গঙ্গায়। নড়াচড়া না করে সাবধানে বসেন দেখি।' বলতে-বলতে লোকটা হুড়মুড়িয়ে পাশের সরু এক গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। এবড়ো-খেবড়ো গলির জলকাদায় পড়ে নড়বড়ে চাকায় আর্তনাদ তুলে গাড়ি টালমাটাল হয়ে উঠল আরও। দু'ধারের খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে যেতে পারেন, সেই ভয়ে টাল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন গনেনবাবু।

কাঁচা হলেও আগের রাস্তা তবু ভালো ছিল অনেক। দু'পাশে বাড়ি-ঘরও কিছু ছিল। এদিকে সরু গলির দু'ধারে শুধু ঝোপঝাড় আর জঙ্গল। তার উপর ঝড়ের বেগ হঠাৎ যেন বাড়তে শুরু করেছে। অঝোরে বৃষ্টির সঙ্গে শোঁ-শোঁ শব্দে যা দমকা বাতাস, গনেনবাবুর ভয় হল পলকা ছ্যাকরা উলটে না যায়। দু'ধারে গাছপালা ঝড়ে যেভাবে দুলছে গাড়ির উপর ভেঙে পড়াও বিচিত্র নয়।

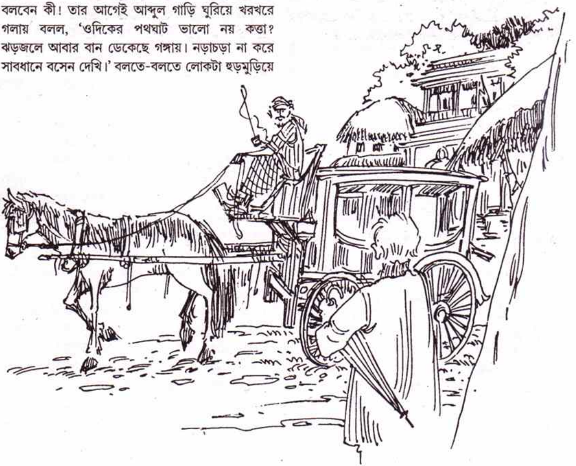

ওই সময় পথের পাশে গোটা কয়েক ঝুপড়ি নজরে পড়ল গনেনবাবুর। পাশে গোটা কয়েক মাঝধরার ঘুনি পড়ে থাকতে দেখে বুঝলেন, জেলেদের আস্তানা। ঝড়ে চাল উড়ে গেছে। ফাঁকা মাটির দেওয়ালগুলো হাঁ করে রয়েছে। জনমানুষ নেই। প্রাণ বাঁচাতে পালিয়েছে সবাই। এই প্রথম গনেনবাবুর মনে হল, বাড়ি থেকে আজ না বেরোলেই ভালো করতেন। ঠিক করে ফেললেন, অফিসে নয়, শিয়ালদহতেই ফিরে যাবেন আবার। গলা ঝেড়ে সেই কথাই বলতে যাবেন, গাড়িটা পথের বাঁকের কাছে এসে থামল। আব্দুল ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'এবার নামেন গো কত্তা।'

নামবেন কী! সামনে নজর পড়তে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল গনেনবাবুর। সামনে অল্প দূরে মস্ত এক খাল। এই দুর্যোগের দিনে তাকে দুরন্ত এক নদী বললেও ভুল হয় না। বানের ঘোলা জলে থইথই। বড়-বড় ঢেউয়ের মাথায় জমাট ফেনার রাশি। খালের উপর নড়বড়ে এক কাঠের সাঁকো ঢেউয়ের দোলায় যেভাবে কাঁপছে, ভেসে যাবে যে কোনো মুহূর্তে। দু'চোখ বিস্ফারিত করে সেদিকে খানিক তাকিয়ে গনেনবাবু বললেন, 'এ কোথায় এনে ফেললে ভাই! আ-আমি যে ধর্মতলার দিকে যাব!'

'কত্তা নতুন নাকি কলকাতায়!' কোচোয়ান আব্দুল ভিজে নেয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে অবাক হয়ে তাকাল গনেনবাবুর দিকে। তারপর বলল, 'সাঁকো পার হয়ে খানিক গেলেই ধর্মতলা! ওদিকে ছ্যাকরা যায় না কত্তা। নামেন এবার।' ফের তাগাদা লাগাল সে।

ততক্ষণে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে গনেনবাবুর। কোনোমতে একটা ঢোঁক গিলে বললেন, 'ন-না বাপু। ধর্মতলায় কাজ নেই। তুমি আমায় শেয়ালদাতেই নিয়ে চলো আবার।'

'শ-শেয়ালদা!' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল লোকটা, 'সেটা আবার কোথা?'

'ক-কেন? সেই যেখান থেকে ছ্যাকরায় উঠেছিলাম।' থতমত খেয়ে গনেনবাবু বললেন।

'ও বৈঠকখানা? তাই বলেন। কিন্তু ফিরতি পথের ভাড়া লাগবে কত্তা।'

ফিরতি পথের ভাড়া কেন, গনেনবাবু তখন তার বেশি দিতেও প্রস্তুত। সেই কথাই বলতে যাবেন, তার আগেই এক ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেল। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়ছিল। গাঢ় মেঘ, ঘন গাছপালার মাঝে আলোও ক্ষীণ হয়ে আসছিল ক্রমশ। হঠাৎ ঝুপ করে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার। মড়মড় শব্দে আশপাশে অনবরত ভেঙে পড়ছিল গাছপালা। আচমকা সেসব ছাপিয়ে প্রবল দমকা ঝড়ে হুড়মুড় করে চারদিক কাঁপিয়ে কী যেন ধেয়ে এল ওদের দিকে। সেই সাথে অনেক মানুষের অন্তিম আর্তনাদ। দারুণ আতঙ্কে চোখের পলক তখন স্থির হয়ে গিয়েছে গনেনবাবুর। কড়-কড়াৎ শব্দে চোখ-কান ধাঁধিয়ে কাছেই বাজ পড়ল কোথাও। আর সেই সুতীব্র আলোয় গনেনবাবু এক ভয়ানক দৃশ্য দেখতে পেলেন। গোড়ায় মনে হয়েছিল মড়মড় শব্দে গাছপালা ভেঙে বিশাল এক দৈত্য যেন হাঁ করে সেই খাল পথে ধেয়ে আসছে। কিন্তু তারপরেই বুঝলেন, দৈত্য-দানো নয়, লম্বা মাস্তুল, দড়িদড়াসহ বড় এক জাহাজ। চোখের পলকে সেটা মড়মড় শব্দে আছড়ে পড়ল ছ্যাকরার উপর।

কোচোয়ান আব্দুলের আর্ত চিৎকার, ঘোড়ার ত্রাহিরব তখনও কানে বাজছে, তারই ভিতর হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে এল গনেনবাবুর। গোড়ায় মনে হয়েছিল, তিনি আর বেঁচে নেই। কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হল না। ছ্যাকরা থেকে ছিটকে পড়লেও বেঁচেই রয়েছেন। তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই বুঝলেন, শুধু বেঁচেই নেই, শরীরে কুটোর আঁচড়টিও লাগেনি। কিন্তু এ কোথায় তিনি! চারপাশে ভালো করে চোখ ফেরাতে ফের চমকে উঠলেন গনেনবাবু। সেই জলকাদায় ভরা কাঁচা পথ, বনবাদাড় খাল, আব্দুলের ছ্যাকরা, কিছুর চিহ্নমাত্রও নেই। ভয়ানক ঝড়বৃষ্টির ভিতর প্রায় কাকভেজা হয়ে পড়ে রয়েছেন ওয়েলিংটনের পাশে ফুটপাতের উপর।

অ্যাডভান্স ইনটিমেশন ছাড়া এই প্রথম অফিস কামাই করলেন গনেনবাবু। এরপর আর অফিসে যেতে ভরসা পাননি। এক ট্যাকসিকে রাজি করিয়ে সোজা শিয়ালদহ। তারপর ট্রেন ধরে বাড়িতে। বলা বাহুল্য ওই কাকভেজা অবস্থায় বাড়ি ফিরতেই পড়তে হল এক ঝাঁক প্রশ্নের মুখে। কিন্তু কিছুই বলতে পারেননি কাউকে। বললে বিশ্বাসও করত না কেউ। তাঁর নিজেরই তো মনে হচ্ছিল, পুরো ব্যাপারটা মনের ভুল বা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। শিয়ালদহে ওই অন্ধকার সাবওয়ে থেকে বেরিয়ে বাস না পেয়ে

ঝড়বৃষ্টি মাথায় একরকম ঘোরের মধ্যে ওয়েলিংটন পর্যন্ত হেঁটে চলে গিয়েছিনে। বাকিটা সেই ঘোরের মধ্যে দেখা নিছক এক আজগুবি স্বপ্ন। কিন্তু সেটাও যুক্তি দিয়ে মেলাতে পারেননি। বেশ মনে আছে, ট্রেন থেকে নেমে ঘড়িতে সময় দেখেছিলেন, আটটা কুড়ি। আর ওয়েলিংটনের ফুটপাতে যখন তাঁর সংবিৎ ফেরে তখন ঘড়িতে সময় সাড়ে আটটা। ওই ঝড়বৃষ্টির ভিতর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে অতটা পথ হেঁটে যাওয়া এই বয়সে তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। বরং বাড়ি ফিরে-ঠান্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ যেন অন্য এক ব্যাপার খুঁজে পেলেন।

পরের দিনই অফিসে লম্বা এক ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন গনেনবাবু। বরাবরই জেদি স্বভাবের মানুষ। সহজে হাল ছাড়েননি কোনও দিন। এবারেও ব্যতিক্রম হল না। প্রথমে পাড়ার লাইব্রেরি, তারপর ন্যাশানাল লাইব্রেরি থেকে বইপত্র জোগাড় করে খোঁজখবর করতেই পুরোনো কলকাতার এক ঘটনার কথা জানতে পারলেন। সে ১৭৩৭ সালের কথা। কলকাতা শহর তখন সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ওই ১৭৩৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ভয়ানক এক ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছিল কলকাতার বুকে। অবশ্য শহর বলতে যা বোঝায়, সবে গড়ে ওঠা সেদিনের কলকাতায় তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। গঙ্গার একটা খাল বনবাদাড়ে ভরা সেই কলকাতায় আজকের হেস্টিংস স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল সল্টলেকের বাদার জলার দিকে। বড়-বড় নৌকো চলত।

সেই ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে সেদিন তছনছ হয়ে গিয়েছিল কলকাতা শহর। প্রবল বানে ফুলে উঠেছিল নদীর জল। গঙ্গায় নোঙর করা কোনও জাহাজ আর আস্ত থাকেনি। তাদেরই একটা দড়িদড়া ছিঁড়ে হঠাৎ ভেসে এসেছিল সেই খাল দিয়ে। তারপর ওয়েলিংটনের কাছে ডাঙায় আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কোনও লেখায় আবার অন্য রকমও আছে। প্রবল ঝড়ে গোটা জাহাজটাই নাকি গঙ্গা থেকে উড়ে এসে পড়েছিল ওই জায়গায়। ভয়ানক এক ভূমিকম্পও হয়েছিল ওই সময়। জায়গাটার নাম সেই থেকে হয়ে গিয়েছিল 'ডিঙ্গিভাঙ্গা'। পরে সেই খাল বুজিয়ে যে রাস্তা তৈরি হয় লোকমুখে তারও নাম হয়ে যায় ডিঙ্গিভাঙ্গা। সেই রাস্তার খানিক অংশই আজকের ক্রীক রো।

রহস্যের হদিস খানিকটা হলেও এরপর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল গনেনবাবুর কাছে। এই ২০০৯-এর আয়লা ঘূর্ণিঝড়ের সকালে তিনি বের হয়েছিলেন বাড়ি থেকে। সন্দেহ নেই, তারপর শিয়ালদহে অন্ধকার সাবওয়ে দিয়ে যেখানে হাজির হয়েছিলেন, তা দু'শো বাহাত্তর বছর আগের কলকাতায় আর এক ঘূর্ণি ঝড়ের দিন। আব্দুলের ছ্যাকরা, কলকাতার কাঁচা রাস্তা, গলিপথ, ওয়েলিংটনের কাছে গঙ্গার খাল, নড়বড়ে সাঁকো, সবই সেই পুরোনো দিনের কলকাতা শহরের। টাইম মেশিনের গল্প বইতে পড়েছেন। ইদানীং টাইম টানেলের কথাও বলছেন কেউ। সময়ের মধ্যেও নাকি কখনও ফাটল ধরে, তৈরি হয় সুড়ঙ্গের। তখন সেই সুড়ঙ্গপথে একবার ঢুকে পড়তে পারলে মুহূর্তে পৌঁছে যাওয়া যায় দূর অতীত কিংবা ভবিষ্যতে। ব্যাপারটা তাই কিনা, অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারেননি।

তবে অন্য একটা ব্যাপার হয়েছে। লম্বা ছুটির পর অফিসে জয়েন করেই গনেনবাবু জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ভি.আর নেবেন এবার। চাকরি অনেক দিন করেছেন। এবার বাকি জীবনটা একটু বইপত্র নিয়ে কাটাবেন।

ছবি : পার্থসারথি মণ্ডল

ভূতের গল্প

কোলিয়ারির কবিতা উৎসব

বীথি চট্টোপাধ্যায়

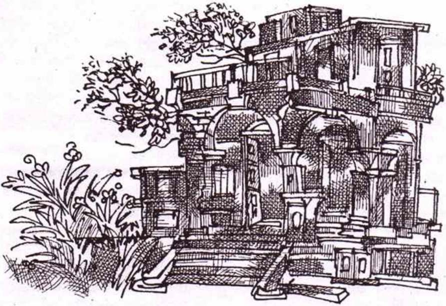

ভয় জিনিসটাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। কেউ একবার ভয় পেয়েছে তো ব্যস! ভয় আর তাকে ছাড়বে না। ওপরে ভয়, নীচে ভয়, পাশে ভয়, বুকের মধ্যে ভয়। এইসব ভয়-টয়কে পাত্তা না দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই সেবার মিশর বেড়াতে গিয়ে শুনলাম, কোনও-কোনও মমি নাকি অন্ধকার হলেই জেগে ওঠে। আমি ওসব মনের কোণাতেও জায়গা দিই না। কিন্তু অমন নিঝুম-নিস্তব্ধ প্রান্তরে একা অত মমির সামনে গেলে গা ছমছম করবেই। ওটা ভূতটুতের ব্যাপার নয়। যেমন আমাদের মিউজিয়ামে যদি কেউ রাতে একা থাকতে পারে, তাহলে বুঝব তিনি মহামানব।

—মধুমিতা তুমি থেকো গিয়ে। আমার আবার মিউজিয়ামের নামে জ্বর আসে। তার চেয়ে বরং এতগুলো কবি রয়েছে, গানটান হোক না।

—ওই তোমাদের এক বস্তা পচা ব্যাপার। কাছে পিঠে দলবেঁধে কোথাও বঙ্গসন্তানরা বেড়াতে গেলেই শেয়ালের মতো কোরাস ধরা! দূর! এমন ঘোর বর্ষা, এই ভূতুড়ে বাংলো, হু-হু হাওয়া, মুড়ি, আলুর চপ, ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ, এবং এই জনমানবহীন কয়লাখনির মধ্যে ভূত ছাড়া অন্য সবকিছু বেমানান। এখানে ভয় মানে কী, ভয়ের উৎস এবং শেষ কোথায়, আর এইসব সূত্র ধরে অবশ্যই ভূত।

—এই...এইসব এই পরিবেশে ভালো লাগে না। তুমি চুপ করো তো মিতাদি।

—তুই চুপ কর শান্তনু!...না গো মিতাদি, ভূত সম্বন্ধে যা-যা জানো, সব বলো।

—সেসব বলব। কিন্তু তোমরা আমার কথা এত মন দিয়ে শুনছ দেখে শান্তনুর রাগ হচ্ছে।

—আমার রাগ করতে বয়েই গেছে, তুমি বলো, যা

খুশি! ভূতপ্রেত, সব বলো।

—বলবই তো। এখন ভূতই আইডিয়াল। কাল সকালেই তো আফটার ব্রেকফাস্ট বেরিয়ে পড়তে হবে, এবং সেই এক কবিতা পাঠ। আমরা তো আসি একসঙ্গে আড্ডা দেব বলেই।

—ঠিক বলেছ। এই পাণ্ডববর্জিত কোলিয়ারিতে কে যে কবিতা শুনবে! তার চেয়ে আজ অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হোক।

—আমি ঠিকই বলি চিরু। তবে ভূতটুত মজা করে বলছিলাম। আসার সময় ওই অন্ধকারে জঙ্গল পেরিয়ে আসতে আমার খুবই ভয় করছিল। যদি ডাকাত-ফাকাত ধরত। কী সাংঘাতিক ঘটনাই না ঘটত।

—ধরলে আর কী এমন হতো মিতাদি? এতগুলো কবির কবিতা শুনে ডাকাতরা ছেড়ে দিত।

—এটা ঠিক শ্রমণা। তবে ভয় করলেও তেমন কষ্ট হয়নি, এমন ঠান্ডা ওয়েদার, আর অত গান—বেশ এনজয় করেছি। গানগাড়ি নামটাও ভালো দিয়েছে শিবাশিস। ড্রাইভার আসার সময় বলছিল না যে, এখানে ব্রিটিশ আমলে সেনা ছাউনি ছিল, যুদ্ধ বিমান ঘাঁটি ছিল। আরও ছিল বন্দিদের জেল এবং তাদের নৃশংসভাবে খুন করত মিলিটারিরা। মিলিটারিদের ভারী বুটের আওয়াজ এখনও গভীর রাতে শোনা যায়। আর শোনা যায় সেইসব হতভাগ্য মৃতদের দীর্ঘশ্বাস।

টিঙ্কু প্রায় কেঁদে ফেলেছে ভয়ের চোটে। বলে,—অন্য কিছু বলো না তোমরা? সারারাত যদি কারেন্ট না আসে, বাপরে! এই অন্ধকার ধারেকাছে কোনও জনবসতি নেই...ওরে বাবা, এখানে না এলেই হতো।

মিতা জিজ্ঞেস করে টিঙ্কুকে, তুমি কি জানো এই বাড়িটাও ছিল এক জেলারের বাংলো। তাকে রেনোভেসন করে আজকের এই বাংলো।

শিবাশিস বলল,—জমে যাবে। এই বৃষ্টি এমন ঠান্ডা এই ভূত বাংলোতে যদি ভূত আসে ফাটাফাটি ব্যাপার হবে। চলো সবাই চেঞ্জ করে নিই। চা শেষ হয়েছে।

যে যার ঘরে ফ্রেশ হতে চলে গেল কবিরা। এরপর এই কোলিয়ারির জেনারেল ম্যানেজার আসবেন কবিদের সঙ্গে ডিনারে যোগ দিতে। পরিচয়পর্ব গভীর হবে।

এমন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তার সঙ্গে ঝড়ের তাণ্ডব। মনে হচ্ছে, এবার বুঝি একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে। আর এমন ঠান্ডা লাগছে যে এই ফাল্গুন মাসে মনে হচ্ছে শীতের দার্জিলিং-এ রয়েছি।

ডাইনিং হলে আড্ডার আসর বসেছে। সবাই বেশ আরাম করে চাদর মুড়ি দিয়ে গরম স্যুপের বোলে চামচ ডোবাচ্ছে। জেনারেল ম্যানেজার, মিঃ ঘটক। আড্ডার মধ্যমণি। খুব আক্ষেপ করে বললেন,—এখানকার জীবন বড় নীরস, এখানে কোনও বিনোদন নেই। আজ আপনাদের মতো বিখ্যাত মানুষজন এসেছেন, আমরা ধন্য, ভীষণ খুশি। আজ বৃষ্টি না-হলে বাগানের লনে বসলে আর একটু ভালো লাগত। আজ দোলপূর্ণিমার রাত। আকাশে চাঁদ ভাসিয়ে দিত বিশ্বচরাচর। আপনারা কলকাতায় কখনোই এমন চাঁদ পেতেন না। তবে হ্যাঁ, বৃষ্টিরও আলাদা আমেজ আছে। আশাকরি আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না। কারণ, আপনাদের সেবায় যাদের নিযুক্ত করা হয়েছে তাদের বেছে-বেছে আনা হয়েছে। ওরা রান্নাবান্না সব করবে...

মিতা কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করে,—এই বাংলোতে কোনও স্থায়ী কর্মচারী নেই?

—না ম্যাডাম। গত দু-বছর ধরে এই বাংলো বন্ধ পড়ে আছে। কে আর এখানে থাকতে আসবে বলুন? একজন মালি অবশ্য আছে। সেই বাগানে ফুল-টুল করে।

—কেন এটা যাঁদের গেস্টহাউস, তারা আসেন না?

—টাউনে নতুন গেস্টহাউস তৈরি হয়েছে। ওখানেই থাকে। এতদূর কী করতে আসবে? তারপর লোকে তিলকে তাল করে। তবে যতই নতুন গেস্টহাউস হোক, এ-বাড়ির ঐতিহ্যই আলাদা। এত বড়-বড় ঘর, ওধারে লাইব্রেরি, এছাড়াও এর একটা ইতিহাস আছে।

প্রায় সব কবিকুল একসঙ্গে বলে ওঠে,—প্লিজ, বলুন, কী ইতিহাস আছে।

—তেমন কিছু নয়। আসলে এটা বহুদিন আগে জেলার সাহেবের বাংলো ছিল। আর ওই দিকটায়, ছিল বিশাল জেল। আমরা ওই দিকটায় লাইব্রেরি আর ক্লাব করেছিলাম। তবে লাইব্রেরিটা এখন বন্ধ আছে।

পিনাকী জিজ্ঞেস করে, ওখানে কি ফাঁসি-টাসি হতো?

—তা ঠিক জানি না। তবে একটা ফাঁসিঘর ছিল। সেটা তো আমরা বন্ধ রেখেছি। প্ল্যান আছে ওই ঘরটা ভেঙে একটা মন্দির-টন্দির করার।

শ্রীজাত কাঁচুমাচু মুখে বলল,—এতো ভয়ানক জায়গা!

—না-না আপনারা ভয় পাবেন না। ওসব ভূত কবেই মরে ভূত হয়ে গেছে। তবে শোনাকথা, ওখানে নাকি অনেক বন্দি আত্মহত্যা করেছিল।

—এইয়ে, প্লিজ, এইসব গল্প ভালো লাগছে না। এই অন্ধকারে ঝড়ের আওয়াজের সঙ্গে কীসব অদ্ভুত আওয়াজ আসছে। ওইসব অশরীরীদের কথা রাতে আলোচনা করলে, তাদের শব্দ শোনা যায়।

—বাবাঃ টিঙ্কু! তুই এত ভিতু!

রাহুলকে থামিয়ে মিঃ ঘটক বললেন,—সবাই রাতের অন্ধকারে এই বাংলোতে একটু-একটু ভয় পায়।

—না-না আমরা ভয় পাওয়ার পাত্র নই।

—আরে মশাই, ভয়ও তো একধরনের রোমাঞ্চ, যেটা অনুভব করতে হয়। এমন নির্জন নিঝুম জায়গায় আসতে হয়। চারধারে কয়লাখনি, মাঝে একটা পরিত্যক্ত জেলারের বাংলো। সেটা নিয়ে অনেক আধিভৌতিক কথা ছড়ানো। পাশে অতবড় পুরোনো জেল! ভাবুন তো, মরে যাওয়া জেলবন্দিরা তাদের ওপর অত্যাচার অবিচারের কথা আপনাদের যদি বলতে আসে।

এলে তো ভালোই হবে। বেশ নতুন অভিজ্ঞতা হবে।—রাহুল প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে এবার জিজ্ঞেস করে মিঃ ঘটককে, আপনি কি আমাদের ভয় দেখাতে চাইছেন?

—মোটেও নয়। আপনারা তো এমনিতেই ভয় পাচ্ছেন। সবাই পায়, এমন পরিবেশে। আপনারাই তো জানতে চাইছিলেন, তাই একটু পুরোনো কথা।

পিনাকী বলে,—যাকগে। ভয় পাওয়ানোর বা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত না হয়ে, আপনি বরং এই জায়গাটার সম্বন্ধে কিছু বলুন। আসার সময় যেমন মনে হচ্ছিল এ জায়গাটার মাটি পুরো ফাঁপা।

—ঠিক। খনি অঞ্চলের মাটি তো ফাঁপা হবেই। কতবার ধস নেমেছে, কত শ্রমিক মারা যায়, আর খনিতে মৃত্যু মানেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, একসঙ্গে একদল মেয়েমরদের মৃত্যু। তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সৎকারও হয় না অনেক সময়ে। পচে যায় বডি, বাতাস ভরে যায় বিষ গন্ধে। শকুনগুলো বসে থাকে স্তূপাকৃতি কয়লার পাহাড়ে। আর কী কান্না তাদের। আর জানেন, ওই শকুনেরা যখন কাঁদে, ঠিক মনে হয় মানুষের বাচ্চার কান্না! চমকে উঠতে হয়। গা শিরশির করে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ওই শকুনেরা যখন কাঁদে তখনই কোনও দুর্ঘটনা ঘটে খনিতে।

মিতা ঘটকবাবুকে থামিয়ে বলে,—এতদিন তো আমরা জানতাম, কুকুর যদি কাঁদে তবে কোনও খারাপ ঘটনা ঘটে।

—হ্যাঁ, তেমনই শকুনের কান্নাও। চলুন, রাত বেশ হয়েছে। এবার আমাকেও ফিরতে হবে অনেকটা পথ। ডিনার সেরে নেওয়া যাক।

কিন্তু এখানে ডাকাত-টাকাত আসবে না তো?—দীপাঞ্জনের গলায় যথেষ্ট আতঙ্ক।

—না তেমন কোনও সম্ভাবনা নাই। এখানে বন্দুকধারী সিকিওরিটি আছে অনেকজন।

ডিনার অবশ্য চমৎকার। আলু-পটলের ডালনা, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, মাংস, চাটনি, ভাত এবং লুচি। সন্দেশ।

এবার যে-যার ঘরে। ক্লান্ত সবাই, এতটা পথ এসে। মিতা ঘরে এসেই আগে টর্চ, মোমবাতি, দেশলাই গুছিয়ে হাতের কাছে রেখে দিল। কারণ মুহূর্তে-মুহূর্তে কারেন্ট চলে যাচ্ছে এবং বেশি রাতে নাকি কারেন্ট একেবারেই অফ হয়ে যায়। নিজের চাদর বের করে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। তার আগে অবশ্য দেখে নিল, জানালা-দরজা সব

ঠিকঠাক বন্ধ আছে কিনা। জানালাগুলো দেখলেই গা ছমছম করে। লোহার জাল দেওয়া জানালার শিকগুলো মরচে ধরে লাল। কতকাল যে এগুলো বন্ধ তা ভূতই জানে। ঘরের রঙও অনুজ্জ্বল, ড্যাম্প ধরা। বিছানায় ছাপা বেডসিট, শুতেই ক্যাঁচ করে উঠল। বাথরুমের দরজা বন্ধ করা গেল না। বাথরুমের মধ্যে একটা বড় আলমারি আর তার পাশে মেঝেতে বড় একটা কাঠেরা বাক্স।

মিতা আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছিল মশারির খোঁজে। কিন্তু সেটি বন্ধ। কালো রঙের আলমারির গায়ে সাদা রং দিয়ে অনেক নম্বর লেখা ছিল। দেখলে কেমন অস্বস্তি হয়। বাথরুমের আলো জ্বলছিল, ঘুম আসছিল না মিতার। শুধুই চোখ চলে যাচ্ছে ওই আলমারিটার দিকে। মিতা ভাবে ওতে নিশ্চয়ই খুব দরকারি কিছু আছে, না হলে খোলাই থাকত। আচ্ছা, ওই ঢাউস বাক্সটাতেই বা কী থাকতে পারে? ধ্যুৎ, ঘুমের দফাগয়া।

মিতার মনে হল, বাইরে গিয়ে একটু ঘুরলে হতো। এমন দমবন্ধ করা অবস্থা ঘরের মধ্যে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। উঠে বাইরে আসতেই নাকে কাঠ চাঁপার গন্ধ ভেসে এল, ঠান্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। কিন্তু এমন খাঁ-খাঁ শুনশান পুরো গেস্টহাউস যে, যে-কোনও মানুষেরই গা হিম হয়ে যাবে। যে-যার ঘরে ঢুকে গেছে। যারা রান্নাবান্না করছিল তারাও যেন উবে গেছে। টানা বারান্দা পেরিয়ে গেটের কাছে এসে মিতা দুজন বন্দুকধারী পাহারাদার ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেল না।

মিতা ভাবছিল, কাউকে দেখতে পেলে আলমারি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করত। বড্ড অস্বস্তিতে ফেলেছে ওই আলমারি। আবার নিজেকেই নিজে শাসন করে মিতা। যদি কাউকে পেত সে, জিজ্ঞেস করলে তাকে নির্ঘাত পাগল ভাবত। ভাবত কবিরা এমনই পাগল হয় হয়তো। মাঝরাতে উঠে—আর কিছু না আলমারি!

তার এভাবে এই অচেনা জায়গায় একা-একা আসাটাও ঠিক হয়নি। লোকে তো আওয়াজ দেবে এসব জানলে। ঘরে ফিরে যায় মিতা। এবং ভাবে এই যে কোনও কারণ ছাড়াই অদ্ভুত একটা মনের অবস্থা, ভূত-প্রেত নয়, খুনে ডাকাত নয়। একটা আলমারি দেখে এমন কেউ বিচলিত হতে পারে। এটাই বোধহয় ভয়। এইসব ভয়টয়কে পাত্তা দিলেই মাথায় চেপে বসবে। ধুর!

ঘরে এসে দরজায় খিল এঁটে আবার শুয়ে পড়ে। কিন্তু সেই এক কেস! চোখ চলে যাচ্ছে আলমারির দিকে। এর কারণ একটি বই হতে পারে, যেটি রাতে মিতা শুয়ে চোখ বোলাচ্ছিল। অ্যালান পোর একটি ভৌতিক গল্প। বইটিতে অ্যালান পো লিখেছিলেন, এমনই একটি আলমারি, যার দিকে কোনও এক অজানা কারণে চোখ চলে যাচ্ছিল নায়কের। এরপর ওই আলমারি থেকে উদ্ধার হয় একটি পচাগলা মৃতদেহ, যা দেখে শিউরে উঠতে হয়।

মিতার স্থির বিশ্বাস, এই আলমারিতে অমন কিছু থাকবে না। শুধুই ওই গল্পের প্রভাবে আলমারিটি অস্বস্তিতে ফেলেছে। আজ রাতে ঘুম-টুম হবে না মিতার। কারণ এমন হানাবাড়ি, মশা ও নানাধরনের পোকা। একটা মশারি-টশারিও নেই। মশারি থাকলে অন্তত মশা-পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচা যেত। পাশের ওই কাঠের বাক্সে হয়তো মশারি থাকতে পারে। ওটা খোলাই আছে। কিন্তু খুলে যদি অন্য কিছু...

মনকে শাসন করে মিতা,—সে-কি কচি খুকি নাকি! এত ভয় কীসের? দেখা যাক বাক্সে কী আছে। কার যেন নিশ্বাস পড়ছে তার শরীরে। অসহ্য অবস্থা। চোখ-কান বুজে বাক্সটা খুলে ফেলে মিতা। অবাক হওয়ার পালা। সত্যিই একটি মশারি বাক্সের মধ্যে। খাটের চারকোণে মশারি বেঁধে মশারির মধ্যে ঢুকে মিতা ভাবল, বাঁচা গেল! অন্তত মশা-পোকার হাত থেকে। যদিও মশারিতে বেশ বড়-বড় ফুটো। শুয়েও নানান চিন্তা, ওই বাক্সে ওগুলো কীসের চাবি? আলমারিটার নয়তো?

এই ঠান্ডায় কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। নিজের হার্টবিট নিজে শুনতে পাচ্ছে। জোর করে বোঝাচ্ছে নিজেকে, কেন কি দরকার ওই আলমারি খোলার, ওর মধ্যে যাই থাক তার কি? কিন্তু অ্যালান পোও তো অমন খুলব না খুলব না করে খুলে দেখলেন...! নাহ্, এইসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু এমন ভূতুড়ে পরিবেশে এইসব চিন্তা মাথা ছেড়ে কিছুতেই যায় না।

দূর, যা হয় হবে! মশারি থেকে নামে মিতা। চাবি দিয়ে বেশ কয়েকবার ঘোরাতেই খুলে গেল আলমারি। আর্তনাদের মতো বিকট আওয়াজ করে। কেঁপে উঠল মিতার হৃৎপিণ্ড। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কাছেই কোথাও। বিদ্যুতের তীব্র আলো জানলার কাঁচ দিয়ে ঠিকরে পড়ল ঘরে। আলমারিতে ভ্যাপসা গন্ধ এবং প্রচুর পুরোনো কাগজপত্র। হাত দিতেই হুড়মুড়িয়ে পড়ল মেঝেতে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এত ধুলো! ধুলো উড়ে অন্ধকার করে দিল বেশ খানিকটা জায়গা। চোখেমুখে ধুলো ঢুকে মিতা কাশতে লাগল। সর্বনাশা! এই কাগজ এবার গুছিয়ে তুলে রাখতে হবে যথাস্থানে।

কাগজ জড়ো করতে-করতে হঠাৎই চোখে পড়ল, ওই ধূসর কাগজে কাদের যেন সাদাকালো ছবি। তাতে বিবর্ণ কালো কালিতে টাইপ করা তাদের নাম। নাম, সাজার পরিমাণ, জন্মসাল। এরা কেউই আর পৃথিবীতে নেই।

এইবার মিতার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। হিম হয়ে যাচ্ছে শরীর, ওইসব মুখের ছবি দেখে, এক-একজনের মুখ একেক রকম। কেউ-বা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে, কারও মুখে বিস্ময়। কারও মুখে ভয়, কেউ-বা অবাক, কেউ-বা হাসি-হাসি, কেউ বীভৎসভাবে ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে আছে।

কোনওরকমে নিশ্বাস বন্ধ করে কাগজপত্র তুলে আলমারি বন্ধ করে মশারিতে ঢুকে পড়ে মিতা। জল খায় অনেকটা। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড জ্বর এসেছে তার। বালিশে হাত দিয়ে উঠে বসে। ভাবে কখন ভোর হবে। বালিশে নিজের ধুলোমাখা হাতের ছাপ দেখে, হার্টফেল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। সে বুঝতে পারছে ওই ধুলো তার হাতে ছিল। তারই ছাপ, তবুও অমন গলা শুকিয়ে কাঠ। হাত ধুতে হবে এবং বাথরুমে আবার যেতে হবে। উঃ, নাঃ।

শুধু মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে সময় কাটছিল মিতার। বুকের শব্দ যেন ঘড়ির মতো, টিক্‌টিক। যত রাজ্যের ভয়ের কথা মনে পড়ছিল। সেদিন বিভাসদা বলেছিল, জান আমি থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে বহুকাল ধরে আছি। আমি বিশ্বাস করি, মৃত্যুর পরেও আত্মা থাকে। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পথ বড় ভয়াবহ। সে পথে যে যাচ্ছে তার শুধু আত্মাদের সঙ্গে দেখা হয়। তখন সে যদি ভয় পেয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে তখনই হয় ভয়ানক অবস্থা...।

ওঃ, মিতা আর ভাবতে পারে না। দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুলে মনে হচ্ছে কারা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে পিঠের ওপর। স্পষ্ট যেন কার নিশ্বাস ঘাড়ের কাছে লাগছে। আবার আয়নার দিকে ফিরে শুলে মনে হচ্ছে ওই আনয়নায় ভেসে উঠছে আবছা কাদের মুখ।

ভোর হল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। দরজা খুলতেই ঠান্ডা হওয়া, সাদা আলো। সবকিছু অনেক স্বাভাবিক।

ডাইনিং হলে তখন ওদের জন্য চা জলখাবার তৈরির তোড়জোড় চলছে। রান্নার লোকেদের একজন বহুদিন আগে এ-বাড়িতে থাকত। সে হঠাৎ-ই মিতাকে জিজ্ঞেস করে, গুড মর্নিং ম্যাডাম। রাতে ভালো ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে?

—নাঃ, ঘুম হল না। যা মশা-পোকা নানা রকমের, কেউ ঘুমোতে পারে?

—কত নম্বরে আছেন ম্যাডাম? আপনার ঘরে চা দিয়ে আসব। আপনি ঘরে যান, এখন একটু বিশ্বাস করে নিন।

আশ্চর্য ব্যাপার! সে এখানে বসে থাকলে ওদের কী অসুবিধে হচ্ছে?

মিতা বিরক্তির সুরে বলল,—ওই একেবারে শেষ ঘরটা।

—অ্যাঁ! একশো চার নম্বর ঘর?

ছেলেটির ভয়ার্ত গলা শুনে মিতা বলে, কেন বলুন তো?

—না, এমনি। আপনি আজই চলে যাবেন?

—হ্যাঁ। স্নান-টান সেরে ব্রেকফাস্ট করে বেরুব। তারপর কবিতা উৎসব শেষে আজই কলকাতা ফিরব। আচ্ছা, আপনি ওই বারান্দার শেষ ঘরে শুনে ভয় পেলেন মনে হল। কেন বলুন তো?

—না, তেমন কিছু নয়। তবে এখানে যখন যারাই ওই ঘরে রাত কাটিয়েছে। তারাই ভয় পেয়েছে কেন বলুন তো? ও ঘরে নাকি অশরীরীদের বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

মিতা একটু হেসে জিজ্ঞেস করে,—কোথায়, ওই আলমারিতে?

—রাম-রাম-রাম-রাম ম্যাডাম, ওসব কথা বলবেন না।

—কেন, আমি তো মশারি খুঁজতে গিয়ে চাবি পেয়ে খুলেছিলাম ওই আলমারি। কোনও ভূত-ভবিষ্যৎ কিছুই পেলাম না।

ছেলেটি কিছু না-বলে বিড়বিড় স্বগতোক্তি বরল, —আবার তারা জেগে উঠবে দেখবেন। ঠিক জেগে উঠবে। গাড়ি করে এতদূর যাবেন। কোনও বিপদ না-হয়! দুগ্গা, দুগ্গা!

ছবি : শংকর বসাক

আবিষ্কারের গল্প

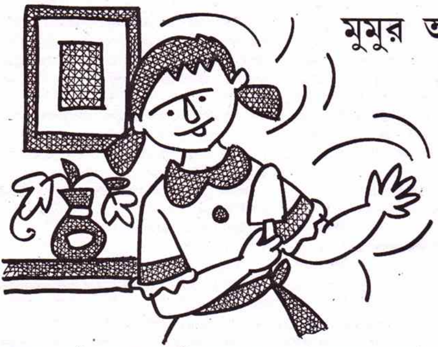

মুমুর আইসক্রিম

উজ্জ্বলকুমার দাস

মুমু প্রায়ই বায়না করে আইসক্রিম খাওয়ার জন্য। আমাকে কিনেও দিতে হয়। কত করে বলি, এত আইসক্রিম খাস না। ঠান্ডা লেগে যাবে, কে কার কথা শোনে।

আজকে খুব ঠান্ডা পড়েছে, রাতের বেলায় হঠাৎ মুমু আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'বাপি, একটা কথা বলব?'

আমি বললাম, 'বলো'।

'এখনটা একটা আইসক্রিম খেতে বড্ড ইচ্ছে করছে।'

'এই কনকনে ঠান্ডায় আইসক্রিম খাবি?'

'আরে এই ঠান্ডায় আইসক্রিম খাওয়ার মজাই আলাদা। তুমি কিছু জানো না।'

'এই ঠান্ডায় যদি তোকে আইসক্রিম কিনে দিই, তাহলে তোকে ও আমাকে একসঙ্গে তোর মা বাড়ি থেকে বের করে দেবে।'

'মা টেরই পাবে না।'

'আরে বাবা তোর মা হল বড় গোয়েন্দা। ঠিক টের পেয়ে যাবে।'

'তা অবশ্য যা বলেছ।'

'আচ্ছা তুই কি জানিস এই আইসক্রিম একসময় খুব ধনীদের খাবার ছিল। সাধারণ মানুষেরা আইসক্রিম খেতেই পারত না। এটা আজকের যুগে শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও এটি ছিল সম্পূর্ণ সত্যি।'

'কেন?'

'রেফ্রিজারেটর আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত তো আইসক্রিম ছিল ভীষণ দুর্লভ বস্তু। ভীষণ দামি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য ধরে নানা কায়দায় আইসক্রিম তৈরি করা হয়।'

'বাঃ বাঃ এতসব ঘটনা!'

'তা আর তোকে বলছি কি!'

'আচ্ছা বাপি, আমাদের এই পৃথিবীতে কবে থেকে আইসক্রিম পাওয়া যেতে শুরু হল?

'আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ার পুরাতন সভ্যতার যুগে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে আইস হাউসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ সালে পারস্য সাম্রাজ্যে গরমের সময় পুডিং জাতীয়

ঠান্ডা খাবার পরিবেশনের কথাও শুনতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে গোলাপ জল ও অন্যান্য জিনিস মেশানো থাকত। খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ সালে চিনের Sjih Ching-এর কবিতা থেকে জানা যায় যে, প্রাকৃতিক শীতের বরফকে তারা গরমকালের জন্য আইস হাউস বানিয়ে সংরক্ষণ করত। আইসক্রিম যে কে আবিষ্কার করেছিলেন, তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায়নি।'

মুমু খুব অবাক হয়ে বলল, 'বলো কী? আর তাছাড়া যেই আবিষ্কার করে থাকুন না কেন, তিনি কিন্তু একটা ভালো জিনিসই আবিষ্কার করেছিলেন।'

'তবে ৬২ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট নিরো তাঁর ভোজনসভায় যে মিষ্টি তুষার পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন সেটি আইসক্রিম আবিষ্কারের প্রথম ধাপ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। ৫৪ খ্রিস্টাব্দে নিরো রোমের সম্রাট হওয়ার পর থেকে তাঁর ভোজনসভায় নানারকম নতুন নতুন খাবারের প্রচলন করেছিলেন। মিষ্টি তুষার পরিবেশনের জন্য নিরোর ক্রিতদাসেরা পাহাড়ের চূড়ার তুষার সংগ্রহ করে আনত। তারপর তাতে বাদাম, মধু ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি করত তারা। আবার অনেকে বলে থাকেন ইতালিয়ান অভিযাত্রী মার্কো পোলো প্রথম ইউরোপে আইসক্রিম তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। মার্কো পোলো দীর্ঘ সতেরো বছর চিন ভ্রমণের সময় তিনি এক ধরনের আঠালো দুধ দেখতে পেয়েছিলেন। এই আঠোলো দুধ তাঁকে খুব অবাক করেছিল, অনেকে মনে করেন, এই আঠালো দুধ থেকেই হয়তো মার্কো পোলো ইউরোপে আইসক্রিম তৈরির পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন। ১৬৬০ সালে ধনী ইউরোপিয়ানদের মধ্যে একধরনের বরফখণ্ড খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেই সময়কার কারিগরেরা বুদ্ধি খাটিয়ে বিভিন্ন রকম ছাঁচ তৈরি করে সেটি দিয়ে নানারকম ডিজাইনের আইসক্রিম তৈরি করে বেশ চড়া দামে বিক্রি করত।'

মুমু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, সে এবার বলল, 'তাহলে বাপি, আমরা যে এখন নানা আকৃতির আইসক্রিম খাই, তার সূত্রপাত তাহলে ইউরোপ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল তাই না!'

'হ্যাঁ, নানা আকৃতির আইসক্রিম প্রথম ইউরোপিয়ানরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, এই ফ্রান্সের আইসক্রিমের গল্প শোনাব তোকে।'

'শোনাও। আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে।'

'ফ্রান্সে বুটালেনটি নামে একজন কারিগর ফ্রেঞ্চ কোর্টে পরিবেশনের জন্য আইসক্রিম তৈরি করেছিলেন এইটিই ফ্রান্সে আইসক্রিম তৈরির প্রথম ধাপ বলে ধরা হয়ে থাকে। ১৬৭০ সালে 'ফ্রানসিস্কো' পকোপিয়ো নামের এক সিসিলিয়ান ভদ্রলোক আইসক্রিমের একটি দোকান চালু করেছিলেন। সেখানে আইসক্রিম এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে ১৬৭৬ সালের মধ্যে কেবলমাত্র প্যারিসেই ২৫০টির মতো আইসক্রিমের দোকান চালু হয়ে গিয়েছিল।'

মুমু বলল, 'মাত্র ছয় বছরের মধ্যে ২৫০টি আইসক্রিমের দোকান। তাহলে বাপি বুঝতেই পারছ যে আমিই শুধু আইসক্রিম ভালোবাসি না, ফ্রান্সের লোকেরাও আইসক্রিম ভালোবাসে।

'এবার যুক্তরাষ্ট্রের আইসক্রিমের কথা বলি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'১৭৪৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আইসক্রিমের প্রথম দেখা মেলে। সেখানকার এক ডিনার পার্টিতে আইসক্রিম পরিবেশন করা হয়েছিল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন-এর মতো বিখ্যাত মানুষেরা আইসক্রিমের খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।'

মুমু বলল, 'দেখছো তো আইসক্রিম ভালোবাসে না এমন মানুষ সারা পৃথিবীতে খুঁজলেও পাবে না।'

'তা যা বলেছিস। তোর মতো আইসক্রিম পেটুক লোক সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে রয়েছে, তা যা বলছিলাম—১৮৮০ শতকে আইসক্রিম বানানোর পদ্ধতি প্রথম ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৭১৮ সালে Mrs. Mary Eales নামে এক ভদ্রমহিলা প্রথম আইসক্রিম বানানোর নিয়ম লেখা আকারে প্রকাশ করেছিলেন। ১৭৮০ সালে জেফারসন সাহেব কূটনৈতিক হিসেবে ফ্রান্সে নিযুক্ত হয়ছিলেন, সেখানকার ভ্যানিলা আইসক্রিম খেয়ে তিনি এতটাই মোহিত হয়েছিলেন যে দেশে ফিরে আসবার সময় ভ্যানিলা আইসক্রিম তৈরির নিয়ম-কানুন লিখে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর উৎসাহতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্যানিলা আইসক্রিম প্রচলিত হয়েছিল। আজকের পৃথিবীর সব দেশেই ভ্যানিলা ফ্লেভারের আইসক্রিম সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়।'

মুমু বলল, 'আমারও না বাপি, ভ্যানিলা ফ্লেভারের আইসক্রিম খেতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।'

'তা তো আমি জানি, ১৮৫০ সালে জ্যাকার ফাসেল নামের এক ভদ্রলোক বাণিজ্যিকভাবে আইসক্রিম তৈরির কারখানা চালু করেছিলেন। তখন থেকেই আইসক্রিম আর ধনীদের খাবার রইল না। সাধারণ মানুষদের হাতে খুব অল্প দামে পৌঁছে গেল নানা স্বাদের ও নানা আকারের আইসক্রিম। তবে আইসক্রিমের এই সহজলভ্যতার জন্য আইসক্রিম তৈরির মেসিনের আবিষ্কর্তা ন্যান্সি জনসনকে তোমাদের নানা আইসক্রিম পেটুকদের একবার ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

মুমু বলল, 'একবার কেন? ন্যান্সি জনসনকে এক কোটিবার আমি ধন্যবাদ দেবো।'

'তা তো দেবেই। উনি যদি ওই মেশিনটা না বানাতেন, তাহলে তো তোমাদের আইসক্রিমই খাওয়া হতো না। ১৮৪০ সালে ন্যান্সি জনসন যে আইসক্রিম তৈরির মেশিনটি তৈরি করেছিলেন সেটির চেহারা খুবই সাধারণ। কিন্তু এই মেশিনটি আইসক্রিম তৈরি করবার কাজটিকে খুব সহজ করে তুলেছিল। এর ফলে আইসক্রিম সাধারণ মানুষরা খুব অল্প দামে আইসক্রিমের স্বাদ গ্রহণ করতে পারল, আর সেই সঙ্গে আইসক্রিমের জনপ্রিয়তাও ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। কেবলমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ১ থেকে ৬ বিলিয়ন গ্যালনের আইসক্রিম তৈরি হয়, যার জন্য খরচ হয় প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের মতো।'

মুমু বলল, 'আচ্ছা বাপি আমরা যে কোণ আইসক্রিম খাই। তার সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?'

'হ্যাঁ। ১৯০৪ সালে এই কোণ আইসক্রিমের জন্ম হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সিসৌরী রাজ্যের সেন্ট লুইসে সেইসময় একটা বড় মেলা বসত। সেখানে একবার আর্নেস্ট হাসুই নামে সিরিয়া থেকে আসত এক কেক বিক্রেতা কোণ আকৃতির কেক বিক্রি করছিলেন। আর এই কেকের দোকানের পাশের দোকানটিই ছিল আইসক্রিমের। আইসক্রিমের দোকানে বাটির সংখ্যা কমে আসায়, তাঁরা হাসুই-এর পরামর্শে কেকের ওপর আইসক্রিম রেখে আইসক্রিম বিক্রি করতে শুরু করলেন, ব্যস! মেলায় যে সব লোকেরা এসেছিলেন, তাঁরা ওই আইসক্রিম খেয়ে খুব খুশি হলেন। বিক্রিও হল প্রচুর, আর তার পর থেকেই কোণ আইসক্রিমের প্রচলন শুরু হয়ে গেল।'

মুমু বলল, 'বাঃ বেশ মজার ঘটনা তো। আচ্ছা বাপি আমরা যে কাঠি আইসক্রিম খাই তার প্রচলন কীভাবে শুরু হয়েছিল?'

'বলছি সময়টা ১৯১৯ সাল। ওই বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের থাইওয়া রাজ্যের ডেনমার্ক থেকে ক্রিশ্চিয়ান নেলসন নামের একজন ভদ্রলোকের দোকানে একটি ছোটো ছেলে চকোলেট কিনতে এসেছিল। কিন্তু তার কী মনে হল যে, সে চকোলেট কিনবে না, কিনবে আইসক্রিম। বুদ্ধিমান নেলসন আইসক্রিমের ওপর চকোলেট মাখিয়ে একটি কাঠিতে আটকে দেয়। ওই ছোটো ছেলেটি চকোলেট মাখানো কাঠিতে আটকানো আইসক্রিম পেয়ে মহাখুশি হয়। ব্যাস, তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেল কাঠি আইসক্রিম, যা আজও সমান জনপ্রিয়।'

মুমু বলল, 'দারুণ ব্যাপার তো।'

'তা আর বলে। এবার তোকে আর্জেন্টিনার আইসক্রিমের গল্প বলব। আইসক্রিম বানানোর পদ্ধতি ইতালিয়ানরাই প্রথম আর্জেন্টিনাতে নিয়ে গিয়েছিল। তারপরা থেকে সেখানকার লোকেরা এই মজাদার খাবারের স্বাদ পেতে শুরু করেছিলেন।'

এই কথা বলে আমি একটু চুপ করতেই মুমু বলল, 'কী গো চুপ মেরে গেলে যে!'

'আরে বাবা বলছি, এবার তোকে যে খবরটা শোনাবো না, সেটা শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি।'

'কী খবর বাবা!'

'একটা পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের লোকেরা প্রত্যেক বছর ১৮ থেকে ২০ লিটার পর্যন্ত আইসক্রিম খেয়ে থাকে আর সবচেয়ে বেশি আইসক্রিম খায় আমেরিকার লোকেরা তারা প্রত্যেক বছর ২৩ লিটার আইসক্রিম খান।

মুমু অবাক হয়ে বলল, 'তাহলে বাপি, দেখ, ওরা কত কত আইসক্রিম খায়। আর আমি দু-চারটে আইসক্রিম খেলেই মা রে রে করে তেড়ে আসে। সবই ভাগ্য। এর পরের জন্মে আমি আমেরিকাতেই জন্মাবো, তাহলে অনেক অনেক আইসক্রিম খেতে পারব।'

ছবি : শংকর বসাক
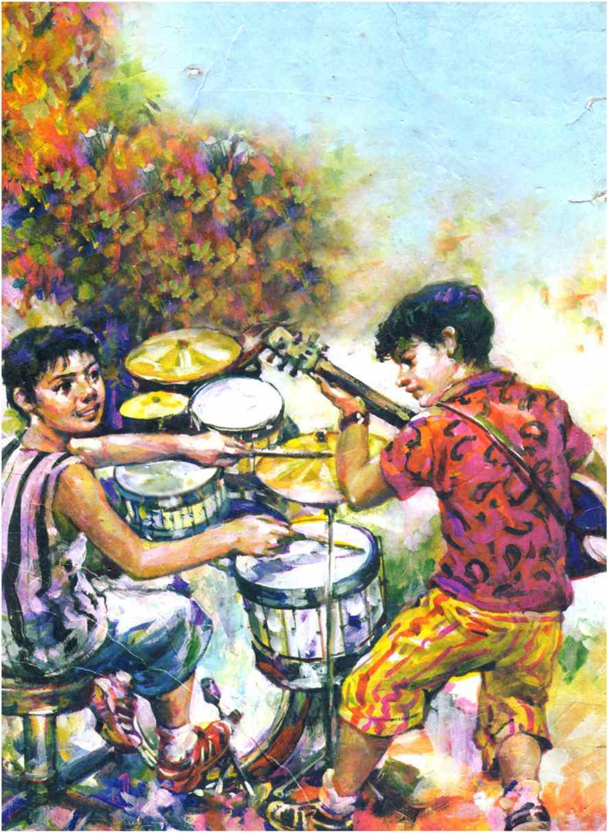
If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here